ফাল্গুন ১৩৪৫, February 1939. 4 annas per copy

জীবনকে উপভোগ করিতে

সূচী

ফাল্গুন—১৩৪৫

শনিবারের চিঠির নিয়মাবলী

১। শনিবারের চিঠির বার্ষিক চাঁদা ডাকমাশুলসহ ৩।০ ভি-পিতে ৩।৶০ ; ষাণ্মাসিক ১।৵০, ভি-পিতে ১৸ ব্রহ্মদেশে ৩৷৵০, ভি-পিতে ৩৷৶০ ; ও ভারতের বাহিরে বার্ষিক ৪৵০ । প্রতি সংখ্যা ।০, ডাকে ।১০ ।

২। শনিবারের চিঠির বর্ষ কার্তিক হইতে গণনা করা হয়।

৩। নমুনার জন্য সাড়ে চারি আনার স্ট্যাম্প পাঠাইতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ চিঠি লিখিবার সময় গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ করিবেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

[কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত]

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার ইতিহাস। বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠার বিবরণও সমসাময়িক উপাদানের সাহায্যে ইঁহাতে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে।

মূল্য দেড় টাকা

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্মকাল ১৮১৮ হইতে ১৮৩৯ সন পর্য্যন্ত প্রকাশিত সকল সাময়িক-পত্রের বিস্তৃত ইতিহাস ও রচনার নিদর্শন।
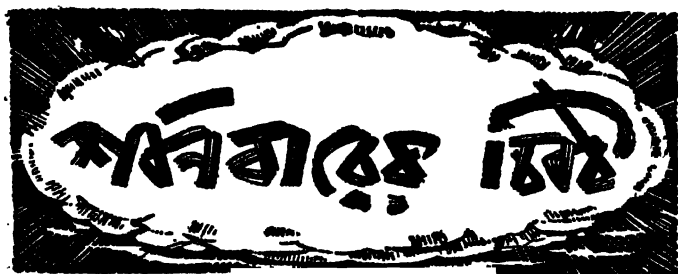
মূল্য দুই টাকা

দুইখানি পুস্তক একত্র লইলে মাত্র আড়াই টাকায় পাইবেন।

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস

২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

১১শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৪৫ [৫ম সংখ্যা

বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক

১

আধুনিক যুগ সাহিত্য-রসের যুগ নহে; কেন নহে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। ইহা লইয়া দুঃখ করিবার কারণ থাকিলেও তাহাতে লাভ নাই। দেহের পক্ষে পথ্যাভাব এবং মনের পক্ষেও নানা কুপথ্যের প্রাচুর্য্যে এ যুগে যে সকল ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাহাতে সাহিত্য মাথায় উঠিয়াছে, বুকের কাছে তাহার আর টিকিয়া থাকিবার জো নাই। যাঁহারা, 'render unto Cæser what is Cæser's due'—এই আশ্বাসবাক্যে বাস্তবের সহিত রফা করিয়াই রসের স্বর্গরাজ্যে বাস করিবার আশা রাখেন, তাঁহারা হয়তো এখন সংখ্যায় আরও অল্প; এবং বোধ হয় সেই কারণেই, যাহারা শিশ্নোদর ছাড়া আর কিছুই মানিবে না, এবং যাহাদের সংখ্যা এ যুগে ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে, তাহারা এই রসব্রহ্মের পূজারীদিগকে কেবলমাত্র ভোটের জোরে

পিষিয়া শেষ করিতে চায়। সত্য কোন্ পক্ষে, ন্যায় কোন্ পক্ষে ধর্ম্ম কোন্ পক্ষে—আজিকার রাষ্ট্রনীতিতেও সে প্রশ্নের মীমাংসা যে ভাবে হইয়া থাকে—অর্থাৎ, একমাত্র দেখিবার বিষয় কোন্ পক্ষ সংখ্যায় বা জড়শক্তিতে প্রবল, তেমনই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রসিকের কথা গ্রাহ্য নয়; যাহারা সংখ্যায় অধিক সেই শিশ্নোদরপরায়ণ জনমণ্ডলী রসের যে নূতন অর্থ করিবে, তাহাই পণ্ডিত-মূর্খ রসিক-বেরসিক নির্ব্বিশেষে সকলকে মানিয়া লইতে হইবে এবং ব্যাস-বাল্মীকি হইতে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত—বেদ-উপনিষদের ঋষি হইতে আধুনিক মন্ত্রদ্রষ্টা পর্য্যন্ত সকলকে বাতিল করিয়া দিয়া, 'প্রগতি' নামক একটি অনার্য্য শব্দকে বিশাল বংশদণ্ডে বাঁধিয়া, ভদ্রবেশী বর্ব্বরগণের অগ্রণী হইয়া, আধুনিক নগর-চত্বরের পণ্যবীথি প্রকম্পিত করিতে হইবে!

যুগধর্ম্ম তাহাই বটে, এবং তজ্জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। জীবনের সহিত রসের যে আত্মিক সম্বন্ধ, তাহা একালে রক্ষা করা বড়ই দুরূহ; এমন কি, রসিকজনের পক্ষে যেখানে-সেখানে সেই রস নিবেদন করিতে যাওয়াও নিরাপদ নহে। কিন্তু একটা বিষয় ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়; রসকে যাহারা স্বীকার করে না, তাহার সেই ধ্বংসাবশেষের ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে শিবির-সন্নিবেশ করিতে তাহারা এতই অনিচ্ছুক কেন? গত দুই আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর রসিক-সমাজ যে বস্তুকে যে নামে ও যে রূপে সাক্ষাৎ করিয়াছে সৃষ্টি করিয়াছে এবং উপভোগ করিয়াছে, তাহা যদি একালে একান্তই অচল হয়, তবে এই নূতন দেশ ও কালের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন নামে একটা নূতন বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিলে তো আর কোনও বাদ-বিসম্বাদের কারণ থাকে না। 'প্রগতি'র মতলব তাহা নয়, সেই সাহিত্যের বুকের উপরে বসিয়া, সেই রসেরই জাত মারিয়া, আপন মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে

হইবে, নতুবা ভুঁইফোঁড় হওয়ার একটা অসুবিধা আছে। অতএব জোর গলায় ঘোষণা করা চাই যে, 'প্রগতি'ও রসেরই প্রগতি, রস এতদিন বদ্ধ অবস্থায় ছিল, আমরা তাহাকে every aspect of life জুড়িয়া—অর্থাৎ নালা-নর্দ্দমা পর্য্যন্ত, মুক্তধারায় বহাইয়া দিয়াছি। যাহারা অতীতকালের অপ্রগতিজনিত মধুদুগ্ধ-পিপাসাকেই রসপিপাসা বলিয়া মনে করে, তাহারা শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করে নাই—চা খাইতে শেখে নাই। আড়াই হাজার বৎসরেও মানুষের যে যৌবনলাভ ঘটে নাই, বিংশ শতাব্দীর একপাদ পূর্ণ না হইতেই সেই যৌবন উপস্থিত হইয়াছে; এত যুগ এত জাতি ও এত বিভিন্ন ভঙ্গির কাব্য-সাহিত্যে যে রসের শাশ্বত ভিত্তি টলে নাই, আজ সহসা তাহার আয়ু ফুরাইয়াছে! যদি ফুরাইয়াই থাকে, তবে তাহা লইয়া এত লাফালাফি কেন?

পৃথিবী যে ঘুরিতেছে, সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে স্থির হইয়া নাই, এই প্রগতিতত্ত্ব তো বহুপূর্ব্বে আবিষ্কৃত ও ঘোষিত হইয়াছে। স্থির পরিণাম অপেক্ষা গতিই যে শ্রেষ্ঠতর, রূপের জড়-পরিসমাপ্তি অপেক্ষা ভাবের অনিয়ত চিৎ-প্রেরণাই যে মহত্তর, এইরূপ চিন্তা বা দার্শনিক মতবাদ তো বহুকাল প্রচলিত আছে। তথাপি এইরূপ মতবাদ সত্ত্বেও সেই প্রাচীন রসবাদ কাব্যে ও কলাশিল্পে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চিরদিন জড়-নিয়মের উর্দ্ধে আপন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আধুনিক প্রগতিবাদীর দল এমন কি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, এমন কোন্ অজ্ঞাত সত্যের সন্ধান দিয়াছে, যাহার ফলে মানুষের আত্মা একেবারে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইতে বাধ্য হইবে?

আসল কথা, এই 'প্রগতি'র ধ্বজাধারীগণ এতদিন এই ভূমণ্ডলেই অন্য নামে পরিচিত ছিলেন; বিদগ্ধ রসিক-সমাজও যেমন সকল দেশে

সকল কালেই ছিল ও আছে, এই পণ্ডিতম্মন্য অসভ্য বর্ব্বরেরাও তেমনই সকল যুগে সকল সমাজে বিদ্যমান ছিল। আজ যুগধর্ম্মের সুযোগে মানব-সভ্যতার এই অতিশয় সঙ্কটময় দুর্দ্দিনে, ইহারা, এই রস-অধিকার-বঞ্চিত হরিজনেরা, জাতে উঠিবার জন্য বিষম কোলাহল সুরু করিয়াছে। যাহাদের রসবোধের অভাব জন্মগত, রস কি বস্তু সেই চৈতন্যই যাহাদের নাই, তাহারাই আজ রসের অধিকার দাবি করিয়া সাহিত্যিক হইতে চায়। ইহারাই রস-ব্রহ্মের ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারকে পদাঘাত করিয়া আপনাদের শূদ্রতারই জয়ঘোষণা করিতেছে। কাল তাহাদের অনুকূল, আজ দিকে দিকে মানবাত্মার দুর্গতি, মানবজাতির সুদীর্ঘ সাধনার পরমধনের অপচয়, যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ তাহারই ধূলিধূসর পরিণাম জ্ঞানী ভক্ত ও রসিকের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে—এ হেন সময়ে, যাহারা পৃথিবীর ব্রাহ্মণ-সমাজে কখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেই ইতর মানুষেরা মহা সুযোগ লাভ করিবে, ইহাই তো স্বাভাবিক।

২

'প্রগতি' শব্দটির যাহা অর্থ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইংরেজীতে progress বলিতে যাহা বুঝায়, তাহারই বিশেষ ও ব্যাপক অর্থ বাংলায় প্রকাশ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ এই শব্দটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শব্দের মোহ ও মাহাত্ম্য কম নয়, তাই এই শব্দটিকেই আশ্রয় করিয়া ক্রমশ ইহার অর্থগত বিদেশী ভাব আমাদের ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজের বড় কাজে লাগিয়াছে। সম্প্রতি ইহারা নিখিল-ভারতীয় প্রগতি-কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাঁহাদের এই উপবঙ্গীয় প্রগতিবাদকে বঙ্গবাসীর চক্ষে, প্রীতিপ্রদ না হউক, ভীতিপ্রদ করিবার চেষ্টা

করিয়াছেন, তাঁহারা সাহিত্যে প্রগতিবাদ প্রচার করিয়াছেন। রাষ্ট্রে, সমাজে এবং জাতির জীবনঘটিত নানা সমস্যায় প্রগতিতত্ত্বের অবকাশ আছে; এবং সেই সকল ব্যাপারে তাহার আলোচনা ও প্রচারমূলক গ্রন্থরাজিকে প্রগতিবাদী সাহিত্য বলিতে কাহারও আপত্তি নাই; কারণ, ইংরেজীতেও literature শব্দটি অতিশয় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যসংক্রান্ত বিবরণও literature আখ্যা পাইয়া থাকে। কিন্তু সাহিত্যের নামেই এই যে প্রগতির দাবি, ইহা একপ্রকার সাহিত্যকেই অস্বীকার করা—ইহার মূলে আছে রসের বিরুদ্ধে বেরসিকের আক্রোশ। এই প্রগতিবাদ হইতে সাহিত্যের আদর্শকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য ইদানীন্তনকালে য়ুরোপীয় সাহিত্যাচার্য্যগণ কাব্যরসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। যাহারা এইরূপ প্রগতিবাদী তাহাদের সহিত সাহিত্যের কোনও সম্পর্কই নাই, বরং সম্পর্ক অস্বীকার করাই উভয় পক্ষে মঙ্গলকর। ওদেশে সে চেষ্টা যথেষ্টই হইতেছে; আমাদের দেশে এ কাজ করিবার কেহ নাই, তাই অপর পক্ষের অনাচার এত বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই প্রগতিবাদীর দল সাহিত্যের অর্থান্তর করিতে চায়, কিন্তু নামান্তর করিতে রাজি নহে। জীবনকে ইহারা যন্ত্ররূপেই ভাবনা করে, যন্ত্রের কালোপযোগী পরিবর্ত্তন আছে, নূতন অংশ যোজনা ও পুরাতন অঙ্গসংস্কার অবশ্যম্ভাবী। এবং যেহেতু যন্ত্রের ক্রিয়াও তদনুরূপ হইতে বাধ্য, অতএব সে বিষয়ে আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না। সাহিত্যও সেই জীবন-যন্ত্রেরই একটা ক্রিয়াবিশেষ। মানব-সমাজের গতি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই জীবন-যন্ত্রও জটিলতর হইতেছে, সেই জটিলতাই তাহার গৌরব। অভাব যত বাড়িতেছে, ততই যন্ত্রও চক্রবহুল হইয়া উঠিতেছে; এই সকল চক্রের মিলিত ঘর্ঘরধ্বনি

চক্রবৃদ্ধির হারে কালক্রমে বিশালতর হইতেছে; সাহিত্যও তাই চক্রমুখরতায় পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর ঘোরনাদী হইয়া উঠিতেছে। ইহাই সাহিত্যের প্রগতি, এই নাদের উগ্রতাই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। সাহিত্যও স্বষ্টিধর্ম্মী নয়, যন্ত্রধর্ম্মী; ইহাতে কেবল যুগের গতিধর্ম্মই আছে, কোনও শাশ্বত আদি-অন্তের স্থিতিধর্ম্ম নাই। আমাদের দেশের প্রগতিবাদী যাঁহারা, তাঁহাদের মত এতখানি বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজনও নাই, কারণ সেই মত কোনও মূলতত্ত্বের অপেক্ষা রাখে না। তথাপি যে তত্ত্বকে তাঁহারা অতিশয় সুলভ বিদ্যায় কতকগুলি বাক্যের সাহায্যে আয়ত্ত করিয়া, আপনাদের রিপুবিশেষকে চরিতার্থ করিতেছে, তাহার মূলে এইরূপ ধারণাই আছে। সাহিত্য স্বষ্টিধর্ম্মী অর্থাৎ প্রাণধর্ম্মী, তাহা যে যন্ত্রধর্ম্মী নয়, তাহার প্রমাণ কোনও উৎকৃষ্ট কবিকীর্ত্তি এ পর্য্যন্ত বাতিল হইয়া যায় নাই; বাতিল হওয়া দূরের কথা, সেই কাব্যের অন্তর্নিহিত রসরূপ কালে কালে নবনবোন্মেষিত হইয়া উঠে, সে রসের বিকাশধারার শেষ নাই। এ বিকাশ আর ঐ যান্ত্রিক বিবর্ত্তন এক নয়—যাহা একবার সত্যকার স্বষ্টিপদবী লাভ করিয়াছে, রসের জগতে তাহার আর মৃত্যু নাই, মৃত্যুনির্জ্জিত মানুষও তাহার প্রসাদে অমর হইয়া উঠে। অতএব সাহিত্যের প্রগতি বলিতে যদি ইহাই বুঝিতে হয় যে, এক কালের সাহিত্য অন্য কালে অচল, যাহা অগ্রবর্ত্তী তাহাই পশ্চাৎবর্ত্তী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তবে তাহা প্রগতি হইতে পারে, কিন্তু কদাপি সাহিত্য নহে। যত প্রাচীন হউক, কোন কাব্য যদি উৎকৃষ্ট হয়, তবে তাহার প্রকৃতি কিরূপ, সে সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ কবি-রসিকের এই উক্তি রসিকসমাজকে আশ্বস্ত করিবে—

All high poetry is infinite, it is as the first acorn, which contained all oaks potentially. Veil after veil may be withdrawn, and the inmost naked beauty of the meaning never exposed. A great poem is

a fountain for ever overflowing with the waters of wisdom and delight; and after one person and one age has exhausted its divine effluence which their peculiar relations enable them to share, another and yet another succeeds, and new relations are ever developed, the source of an unforeseen and an unconceived delight.

—কিন্তু প্রগতিবাদীরা, বিশেষত আমাদের দেশের ইহারা, এ কথা স্বীকার করিবেন না ; তার কারণ, তাঁহাদের যা সাহিত্য তাহাতে poetry-র বালাই নাই—high poetry আবার কি ? ও দেশের নব্য সম্প্রদায় এ সকল কথা নিত্য শুনিতেছে, এবং শুনিয়া তাঁহার পাল্টা জবাব দিতে নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করিতেছে। কারণ তাহারা আমাদের এই ধনুর্দ্ধরদের মত এতটা নিরঙ্কুশ নহে। তাই যখন তাহারা শোনে—

I quite freely admit, that to a man hesitating between socialism and anarchy, or between polygamy and eugenics, or between overhead and underground connexions for tramways, *The Tempest* or *Macbeth* would have very little to say of any profit.

তখন তাহারা বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্যও চুপ করিয়া থাকে।

৩

আমাদের প্রগতিওয়ালারা সেদিন সভা করিয়া, যে ভাষায় ও যে অর্থে, সাহিত্যের সদ্‌গতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা শুনিলে ওদেশের গুরুভাইয়েরা লজ্জা পাইত, সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের দিন যে গত হইয়াছে, এবং এক্ষণে তাঁহাদের দিন আসিয়াছে, ইহা কি আর কাহাকেও ডাকিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে ? সেই জন্যই তো দেশে যে কয়জন ভদ্র সাধু-সজ্জন অবশিষ্ট আছে, তাহারা ঘটি-বাটি সামলাইতে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রীয় পরিষদে যেমন ক্রমাগতই মন্ত্রীমণ্ডলের পদত্যাগ

এবং অধিকতর দুঃসাহসী বিপ্লববাদী ব্যক্তিসংঘের মন্ত্রীপদলাভ রাজনৈতিক প্রগতির লক্ষণ, তেমনই রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্য-নায়কগণের পরাজয় ও এইরূপ যষ্টিধারীদের অভ্যুদয় সাহিত্যিক প্রগতির অকাট্য প্রমাণ। তুলনাটা আদৌ অসঙ্গত নয়; এই সকল বহ্বাস্ফোট-সম্বল বীরগণ, আর কোনও ক্ষেত্রে তাদৃশ প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, অগত্যা বাংলা দেশের নির্ব্বিকার ও নিৰ্জ্জীব সাহিত্য-সমাজে প্রতিপত্তি লাভের জন্য হাঁকডাক করিতেছেন। উপরি-উদ্ধৃত উক্তির সেই profit-ই ইঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, সাহিত্যের দোহাই দিয়া কিছু profit করিয়া লইবার জন্যই ইঁহারা এই অপেক্ষাকৃত নরম মাটিতে কুস্তির আখড়া স্থাপন করিয়াছেন; সাহিত্য-হিসাবেই সাহিত্যের ভাবনা করিতে ইঁহারা অক্ষম; কিন্তু সাহিত্য যাঁহাদের ধর্ম্ম ও সাধনার ধন, তাঁহাদের একজন এই ম্লেচ্ছদের সম্বন্ধে বড় দুঃখে বলিয়াছেন—

It is an awful truth, that there neither is, nor can be, any genuine enjoyment of poetry among nineteen out of twenty of those persons who live or wish to live, in the broad light of the world—among those who either are, or are striving to make themselves, people of consideration in society. This is a truth, and an awful one, because to be incapable of a feeling of poetry, in my sense of the word, is to be without love of human nature and reverence of God.

—ইহাই উদ্ধৃত করিয়া একজন অপর মনীষী বলিতেছেন—'That is an emphatic answer'।

কিন্তু শুনিবে কে? Love of human nature এবং reverence of God—মানব-প্রীতি ও ভগবদ্ভক্তিকে যে কাব্যরস-রসিকতার ভিত্তি বলিয়া একজন কবি-ঋষি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আধুনিক প্রগতির ধাপ্পাবাজি যাহাদের রসিকতার চরম পরিণাম, তাহাদের অভিধানে সেই প্রেমভক্তির বিন্দুবিসর্গও নাই। Human nature বা humanity

বলিতে ইহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব চরিত্র, আত্মগত অভিমান বা অহংচর্চ্চা, এবং শিশ্নোদরসাধন বুদ্ধিবৃত্তিই বোঝে। যত বড় বড় কথা তাহারা বলুক, এবং যত বড় পাণ্ডিত্য ও পৌরুষই তাহাতে থাকুক, মূল বক্তব্য সেই একই, অর্থাৎ আমরা যাহা খুশি বলিব, যাহা খুশি করিব, এবং যাহা খুশি খাইব ; এই 'যাহা-খুশি'কে 'আহা-মরি' করাইতে না পারিয়াই তাহারা রাগিয়া কাঁদিয়া অনর্থ করিতেছে। নিজের নিদারুণ অক্ষমতা ও অন্তঃসারশূন্যতাকেই গৌরবান্বিত করিতে হইবে; তাই, রবীন্দ্রনাথের যুগ আর নাই—ইহাই চীৎকার করিয়া বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের মত আক্ষেপ করিতেছে, আমাদের লেখা কেহ পড়িতেছে না। ইহাতে যেমন অকালপক্কের মর্কটকাঠিন্য আছে, তেমনই এক প্রকার করুণরসের নাকিকান্নাও আছে। কিন্তু বিকাল-পক্ক প্রবীন যিনি, যাঁহার পাণ্ডিত্য-দম্ভের সীমা নাই, তাঁহার আস্ফালন কৃত্তিবাসী অঙ্গদ-রায়দরবারকেও লজ্জা দিয়াছে। তাঁহার বাণীতে সত্যকার বীরত্ব আছে—

> Croakers are not wanting to tell you—with sighing glances fixed on the past these men would tell you...

—এই 'tell you' যে কি, তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না, কারণ এই প্রবন্ধই তো তাহাই—কত বড় croakers আমরা! কিন্তু—

> To these gloomy judgments I take the liberty respectfully to demur, and I claim that despite the wailings of these defeatists...the literature produced by lesser personalities today, is neither lacking in art, nor in any way, of the qualities that make high class literature. This literature, I claim, can, as pure works of art, hold its own against any literature in the rest of India, and perhaps of the world outside.

সেই দামু আর চামু! বাংলা সাহিত্যে ইহারা আর মরিল না, অমর হইয়াই রহিল! কি ওজস্বিনী ভাষা, রসনার কি দিগন্তবিসর্পী লেলিহতা! "I claim"—অবশ্যই! সেইটাই যে আসল কথা;

কারণ, বাংলার এই প্রগতি-সাহিত্যের অনেকখানিই তিনি যে নিজের অংশে দাবি করেন! "High class literature" "pure works of art"—এ সব যে তাঁহার নিজেরই কীর্ত্তির জয়গান! এইরূপ মনোবৃত্তি যাহাদের তাহাদেরই সম্বন্ধে ঋষি-কবির সেই উক্তি স্মরণ করিতে হইবে—"those who either are, or are striving to make themselves, people of consideration in society"। ইহারা যে কস্মিনকালেও কোন জন্মে সাহিত্যরসের ধার ধারে না, ইহাদের রচিত সাহিত্য পড়িলে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে? পণ্ডিত হইয়াও এমন অপণ্ডিতের মত কথা বলে, ইহার কারণ কি? কারণ, যে দেশ ও যে সমাজ হইতে ইহারা সাহিত্যিক অভিযানে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, সে সমাজে রসবোধের বালাই, উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা কোনও কালেই ছিল না; কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সেই উক্তি যে বিদ্বেষবিজৃম্ভিত নয়, তাহা যে অতিশয় সত্য, আজ এই প্রগতিসম্প্রদায়ের মনোভাব ও সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকে না।

বাংলা দেশের প্রগতি-সাহিত্যের নেতা সাহিত্যের উপর প্রগতির শাসন প্রচার করিয়াছেন এই বলিয়া যে—

No writing deserves the name of literature unless it marks some progress beyond the literature of the past.

The name of literature! ইংরেজীর জোর কম নয়! Name of literature-এর সংজ্ঞা দিন দিন যেরূপ ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আমরা তো ইহাই বুঝি যে, যে কোনও writing—এমন কি কবিরাজী মোদকগুলির বিজ্ঞাপনও literature-নামের দাবি করিতে পারে। তাহাই যদি না হইবে, তবে এই সিনিয়র

প্রগতি-মহাশয় সাহিত্যের বিধানদাতা হইলেন কেমন করিয়া ? সে কোন্ সাহিত্য ? সেকালের কথা ছাড়িয়া দিই একালে পৃথিবীর সাহিত্যিক-সমাজে যাঁহারা সাহিত্যরস ও তাহার তত্ত্ব-আলোচনায় নিখিল রসিক-সমাজকে বিস্মিত ও পুলকিত করিতেছেন, তাঁহাদেরও কেহ সাহিত্যের এমন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হন নাই; সেই জন্যই কি ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, মর্ম্মাহত ও পরিশেষে ক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের এই বাঙালী সাহিত্য-বীর সাহিত্য-সম্বন্ধে এত বড় একটা সত্য 'একাং লজ্জাং পরিত্যজ্য' এমন ভাবে ঘোষণা করিয়া ফেলিলেন ? রসজ্ঞান না হয় নাই থাকিল—সকলের তাহা থাকে না; কিন্তু এমন বুদ্ধিনাশ হইবার কারণ কি ? সাহিত্য পড়িতে পড়িতে বুড়া হইয়া গেলাম; এত কবি, এত ক্রিটিক, এত মনীষী—প্রাচীন ও আধুনিক এত পণ্ডিতের এত কথাই শুনিলাম, কিন্তু এমন মগজভেদী উক্তি আর কোথায়ও শুনি নাই! হোমার-শেক্সপীয়রকে লইয়া এখনও যাহারা খাঁটি সাহিত্যসৃষ্টির গবেষণা করে, ব্যাস-বাল্মীকির মধ্যে এখনও যাহারা কাব্যরসের অন্ত পাইল না—তাহারা তো এই "Some progress beyond the literature of the past"-এর কথা কখনও ভাবিল না! সাহিত্যের রসটাই বড় কথা নয়—বড় কথা ওই progress ? প্রগতি—প্রগতি—প্রগতি!—Progressive literature বাক্যটি একটি tautology! 'কোনও সাহিত্যই সাহিত্যপদবাচ্য নয়, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই'; অস্যার্থ—সাহিত্য ক্রমাগতই সাবালক হইতেছে, তারিখ যতই আগাইয়া যাইতেছে, ততই তাহা শেয়ানা হইয়া উঠিতেছে। অতএব যত আধুনিক হইতেছে, ততই তাহার দাবি বাড়িতেছে, পূর্ব্বের বইগুলিকে পিঁজরাপোলে অর্থাৎ মিউজিয়মে রাখিয়া দিতে হইবে। এই নব-অভিনবগুপ্তের মাপ-লাঠিতে আজিকার

সাহিত্য কালিকার সাহিত্যের কাছে হাত-পা ভাঙিয়া পড়িয়া থাকিবে—কেন না, progress চাই; সাহিত্যরস, ও রামা-শ্যামার দল বাঁধিয়া 'হাম্-বড়া'মির হুল্লোড়—এ দুইই যে একই পদার্থ! 'প্রগতি',—অর্থাৎ আপনাদের কীর্ত্তির কৃতিত্ব ঘোষণার জন্য পূর্ব্বযুগের সকল কবি-মহাকবিকে হঠাইয়া দিতে হইবে, যাহারা কবিকুলপুঙ্গব তাহারা এই মূষিকের দলকে প্রণাম করিবে! তার কারণ—

By a long course of evolution we have reached an ampler synthesis which embraces equal freedom for all and freedom in every aspect of life; and social organisations till yesterday were striving to achieve this freedom in as full measure as possible.

—অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য অপেক্ষা আধুনিক সাহিত্য শ্রেষ্ঠ না হইবে কেন? এ যে কোন্ রসের সাহিত্য, তাহা ওই 'every aspect of life' এবং 'social organisations' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এ আর কিছুই নয়—সেই শিশ্নোদরসমস্যারই কথা; সেই জন্য আর সকল সাহিত্য বাতিল হইয়া গিয়াছে। 'Freedom in every aspect of life'—ইহাই যে আধুনিক সাহিত্যের মূলমন্ত্র! আমরাও তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি, কেবল ইহাই বুঝিতে পারিতেছি না যে, এই মন্ত্রটির সাধনার জন্য একটা নূতন পঞ্চবটীর প্রতিষ্ঠা করিলেই তো ভাল হইত—পূর্ব্ববর্ত্তীদের সেই আসনটির উপরেই এত লোভ কেন? ঐ সাহিত্য নামটাকেও বর্জ্জন করিয়া একটা নূতন নামে এই 'brave new world'-এর পত্তন করিলে তো আর কোনও হাঙ্গাম হইত না। কিন্তু তাহা যে ইহাদের মনঃপূত নয়, তার কারণ, 'সাহিত্য' নামটার একটা বনিয়াদী প্রতিপত্তি আছে, অসাহিত্যিক হইয়াও সেই প্রতিপত্তি-টুকু চাই। শূদ্রের ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষের কারণও তাহাই—যাহাকে বলে দারুণ inferiority complex; ব্রাহ্মণত্বের প্রতি সভয় শ্রদ্ধা আছে,

লোভও কম নয়; কিন্তু তাহা যে হইবার উপায় নাই, জন্মক্ষণেই বিধাতা বাদ সাধিয়াছেন—তাই এত আক্রোশ, এত চীৎকার।

এই আক্রোশের বশেই ছোট প্রগতি-মহাশয় এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইতে চান যে, রবীন্দ্রনাথের দিন গিয়াছে, এবং রবীন্দ্রোত্তর কবি-সাহিত্যিকগণ গড্ডলিকাবৃত্তি করিয়া সেই মৃতযুগের মৃতভার বহন করিতেছেন। এ আশ্বাস যে চাই-ই, নতুবা বাঁচে কেমন করিয়া? কিন্তু ইহাতেও একটু গোল রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথকে যাহারা কেবলমাত্র অনুকরণ করিয়াই বাঁচিতে চায়, তাহাদের কথা বলি না; কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যে রসের যে আদর্শ রহিয়াছে, তাহা যে সর্ব্বযুগের আদর্শ—রবীন্দ্রনাথও যে গড্ডলিকাবৃত্তি করিয়াছেন! তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথও কখনও বাঁচিয়া থাকেন নাই—খাঁটি-প্রগতিতত্ত্ব অনুসারে রবীন্দ্রযুগও একটা পৃথক যুগ নয়, যেহেতু তাহাও পূর্ব্বতন যুগের মূল রসপ্রেরণাকে বাতিল করিয়া দিতে পারে নাই, সেও মৃতযুগের মৃতভার বহন করিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত এই দাঁড়ায় যে, ইহারা সাহিত্যকেই চায় না, চায়—যাহা খুশি বলিব, যাহা খুশি করিব, এবং যাহা খুশি খাইব; এবং যে সমাজ তাহাতে আপত্তি করিবে, তাহাকে decadent, vicious ও putrescent বলিয়া গালি দিব।

৪.

বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক দলের মতি-গতি ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম; ইহাদের কথার জবাব দিবার চেষ্টা অনর্থক, তার কারণ—প্রথমত, যাহারা সাহিত্য বোঝে না এবং

বিশ্বাসও করে না, আত্মপ্রতিষ্ঠাই যাহাদের একমাত্র অভিপ্রায়, তাহারা কোনও জবাব মানিবে না। দ্বিতীয়ত, যে দেশ হইতে এইরূপ সাহিত্য-তত্ত্বের আমদানি হইয়াছে এবং এখানকার জল-মাটির গুণে তাহার এমন বৈজ্ঞানিক ভাষ্য প্রস্তুত হইয়াছে—সেই দেশেই বিষলতাও যেমন জন্মিয়াছে, তেমনই বিষঘ্ন ভেষজের অভাব ঘটে নাই। সেখানে আচার্য্যকল্প সাহিত্যিকের মুখে সাহিত্যবস্তুর যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ শোনা যাইতেছে, ইংরেজী-অভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকের পক্ষে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই অ যে কয়টি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটি বিভিন্ন ব্যক্তির ; পরে আরও কিছু উদ্ধৃত করিব, তাহা হইতে অন্তত এইটুকু সপ্রমাণ হইবে যে—প্রকৃত সাহিত্য-জ্ঞান এখনও পৃথিবী হইতে লুপ্ত হয় নাই। একালেও সভ্যতম সমাজের শিক্ষিততম ব্যক্তিরাই সাহিত্যের প্রসঙ্গে অসাহিত্যিক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতেছেন না। সমাজে যেমন্ চোর আপনা হইতেই চোরের দলে আকৃষ্ট হয়—সাধু সাধুর দলে, তেমনই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রসিক রসিকের দলে, এবং বেরসিক বেরসিকের দলে মিশিয়া থাকে। অতএব দল গড়িলেই কোন-কিছুর প্রাধান্য প্রমাণিত হয় না ; বরং, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নানা স্থানে শাখা স্থাপন করিয়া একটা 'নিখিল'-রকমের বড় দল গড়িয়া তুলিলেই বুঝিতে হইবে, উদ্দেশ্যটা সাহিত্যের দিক দিয়া সৎ বা সত্য নহে। এই সকল প্রগতিপন্থী সাহিত্যিক-বীরকে আকাশে তুলিয়া সংবাদপত্রে পত্রপ্রেরকদিগের যে হুড়াহুড়ি লাগিয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, আমাদের দেশে শিক্ষাবিস্তারের অনুপাতে কাল্‌চার কত কমিয়া গিয়াছে—সাহিত্য-রসবোধ দুর্লভ হইয়াছে বলিয়াই যশ এত সুলভ হইয়াছে।

বাংলার প্রগতি-সাহিত্য যে প্রগতির পরিচয় কিছুকাল যাবৎ দিয়া

আসিতেছে, এতদিনে তাহা কোনও সুস্থ ও সহৃদয় ব্যক্তির অবিদিত নাই। এই সাহিত্য অতিশয় আধুনিক হইলেও ইহার লক্ষণ নূতন নহে, এবং ইহার সম্ভাবনা কোনও কালেরই অগোচর ছিল না; তাহার প্রমাণ, ১৩১৩ সালে, প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

আমাদের প্রবৃত্তি উগ্র হইয়া উঠিলে বিধাতার জগতের বিরুদ্ধে নিজে যেন সৃষ্টি করিতে থাকে। তখন চারিদিকের সঙ্গে তাহার আর মিল খায় না। আমাদের ক্রোধ, আমাদের লোভ নিজের চারিদিকে এমন সকল বিকা...পাদন করে, যাহাতে ছোটই বড় হইয়া উঠে, বড়ই ছোট হইয়া যায়; যাহা ক্ষণকালের তাহাই চিরকালের বলিয়া মনে হয়, যাহা চিরকালের তাহা চোখেই পড়ে না। যাহার প্রতি আমাদের লোভ জন্মে তাহাকে আমরা এমনি অসত্য করিয়া গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড় বড় সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়, চন্দ্রসূর্য্যতারাকে সে ম্লান করিয়া দেয়। ইহাতে আমাদের সৃষ্টি বিধাতার সঙ্গে বিরোধ করিতে থাকে।

—পড়িয়া মনে হয় নাকি যে, এ যেন এই প্রগতি-সাহিত্যের সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের একটি অতি-আধুনিক উক্তি? ঐ যে 'freedom'-এর অভিযান—সাহিত্যে তাহার এই দলবদ্ধ আস্ফালনই 'বিধাতার জগতের বিরুদ্ধে' আধুনিক মানুষের চীৎকার। আমি এই সাহিত্যকে শিশ্নোদর-সর্ব্বস্ব বলিয়াছি—বাক্যটি অশ্লীল হইলেও, অর্থটি সত্য অতএব সাধু। সেকালের সত্যদর্শী ঋষিগণ আধুনিক প্রগতিবাদের অর্থ বুঝিতেন—পৃথিবীময় আজ যে মানুষের দল "freedom in every aspect of life" বলিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের সেই ব্যাধির নিদান এক কথায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য তাঁহারা ঐ অতিশয় সাধুবাক্যটি সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অতএব আমাদেরও লজ্জিত হইবার কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ ঋষি নহেন, তিনি কবি; তাই তিনি অতখানি নগ্নতার পক্ষপাতী হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার বক্তব্য সেই একই, অতিশয়

ভদ্রভাবে তিনি বলিয়াছেন, "যাহার প্রতি আমাদের লোভ তাহাকে এমনি অসত্য করিয়া গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড় বড় সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়।" প্রগতি-সাহিত্য হইতেই ইহার উদাহরণ দিব। বাংলা কাব্যে প্রেমের কবিতা প্রায় নাই বলিলেই হয়—'অত বড় ইংরেজী সাহিত্যেও তেমন প্রেমের কবিতা ঝুড়ি ঝুড়ি নাই'—ইহাই বুঝাইবার জন্য মহাপণ্ডিত ও মহাসাহিত্যিক ছোট প্রগতি-মহাশয় এক স্থানে লিখিয়াছেন—

যৌন অভিজ্ঞতা জীবনে বেশির ভাগ মানুষেরই হয় কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা কবিদের মধ্যেই বা ক'জন বর্ণনা করতে পেরেছেন?...ব্যাপারটা যদি এতই সহজ হ'ত তা'হলে যে-কোনো মানুষই কি অল্প 'নৈপুণ্যের' দ্বারা তার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে পারতো না?

এই জন্যই প্রেমের কবিতা বাংলায়, এমন কি ইংরেজীতেও, এত দুর্লভ! যৌন অভিজ্ঞতাই যে-প্রেমের গভীরতম উপলব্ধির মূল, এবং তাহার "যে শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া" উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতায় নিখুঁত ভাবে অঙ্কিত হওয়া চাই, তাহা পশুর মতই মানুষের পক্ষেও অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া—তেমন কবিতা লেখা বড়ই দুরূহ। সে যে কত দুরূহ, তাহা বুঝে না বলিয়াই সাধারণ মানুষেরা এইরূপ কবিতার কবিকে ন্যায্য সম্মান দান করিতে চাহে না। এইরূপ সার্থক রচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক এই লাইন কয়টি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, এ রকম পংক্তি জগতে খুব বেশি লেখা হয় না"—

The moment of desire! the moment of desire! the virgin that pines for the man shall awaken her womb to enormous joys in the secret shadows of her chamber.

হায় বাল্মীকি, হায় কালিদাস! হায় শেক্সপীয়র, হায় রবীন্দ্রনাথ! বাংলার বৈষ্ণবপদাবলী তো গোল্লায় গিয়াছে। কারণ, এমন রজকিনী

পাইয়াও দ্বিজ-কবি 'শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া'র মশলাগুলি কবিতার রসে মিশাইতে পারেন নাই। আমার 'শিশ্নোদরপরায়ণ' কথাটা কি মিথ্যা? না, রবীন্দ্রনাথ ভুল বলিয়াছেন?—'যাহার প্রতি আমাদের লোভ তাহাকে এমনি অসত্য করিয়া গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড় বড় সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়, চন্দ্রসূর্য্যতারাকেও সে ম্লান করিয়া দেয়।'

এইরূপ মনোবৃত্তি যাহাদের, তাহারাই যদি সাহিত্যিক হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের আদর্শ কি হইবে, তাহা তো জানাই আছে। একজন ইংরেজ সমালোচক আধুনিক সাহিত্যিকদিগকে একটি নাম দিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন, সে নাম অবশ্য তাহারা গৌরবের সহিত গ্রহণ করিবে; কারণ, কিছুতেই তাহাদের গৌরবহানি হয় না। এই লেখক বলিতেছেন—

If we fasten then, one label on these books, on which is one word materialists, we mean by it that they write of unimportant things; that they spend immense skill and immense industry making the trivial and the transitory appear the true and the enduring.

শেষের বাক্যটি যেন হুবহু রবীন্দ্রনাথেরই অনুবাদ! লেখক ইহাদিগকে নাম দিয়াছেন—materialists, অর্থাৎ জড়বাদী; এবং কি অর্থে, তাহাও বুঝাইয়া বলিয়াছেন। সে দেশের আধুনিকদের সম্বন্ধে ইহাই হয়তো যথার্থ; কিন্তু আমাদের এই প্রগতির দল জড়বাদীও নহে, জড়েরও যে ধর্ম্ম আছে, ইহাদের তাহা নাই; কারণ জড়েরও প্রকৃতি-গুণ আছে, ইহারা সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। ইহাদের এই যে অনাচার, এই যে অসত্যের আরাধনা, ইহাতে immense skill and immehse industryর প্রয়োজন হয় না; কারণ, তাহার সাড়ে পনেরো আনাই অনুকরণ, ইহাদের জীবধর্ম্মই স্তিমিত, জড়ধর্ম্ম বরং ভাল ছিল।

উপরি-উক্ত সমালোচকের আর একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। আমাদের এই 'শিশুবিদ্যা-গরীয়সী' প্রগতি-প্রতিভার যাঁহারা গুরু, সেই ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের বিখ্যাত কয়েকজনের নাম করিয়া, তাঁহাদের তথাকথিত বাস্তবতার অজুহাত সম্বন্ধে, এই লেখকই বলিতেছেন—

Let us hazard the opinion that for us at the moment the form of fiction most in vogue more often misses than secures the thing we seek. Whether we call it life or spirit, truth or reality, this, the essential thing has moved off......we suspect a momentary doubt, a spasm of rebellion, as the pages fill themselves in the customary way. Is life like this? Must novels be like this?

পরিশেষে আর এক আধুনিক মনীষীর একটিমাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। যাহারা অন্তরে ধর্ম্মহীন, আধুনিক যুগের অহং-মদমত্ততায় যাহারা প্রাণের স্থৈর্য্য হারাইয়াছে, যাহারা মৃত্যুকেই মোক্ষ জানিয়া চিরকালের উপর ক্ষণকালকে আসন দিয়াছে, এবং সর্ব্বশেষে যাহারা বিকৃত দেহ-মনের স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যকেই প্রজ্ঞা ও প্রতিভার নিদান বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহারাই প্রগতির ধূয়া তুলিয়া সাহিত্যকে বিকারগ্রস্ত করিতেছে। যে ধরণের প্রগতিবাদের দম্ভ ইহারা করিয়া থাকে তাহাতে তত্ত্বগত প্রগতিও নাই—কালের প্রবহমানতাকেই ইহারা কার্য্যত অস্বীকার করে। নিজের আত্মাভিমানের অনুকূল করিয়া ইহারা কালকে বিচ্ছিন্ন বর্ষসমষ্টিরূপে ধারণা করে, এক একটি বর্ষসমষ্টি আপনাতেই সমাপ্ত। যেন কালের কোনও সুনিয়ত প্রবাহ নাই, তাহার প্রত্যেক অংশই এক একটি স্বতন্ত্র ঘূর্ণি। অতীত নাই, ভবিষ্যৎও ভাবনার বহির্ভূত; প্রেম নাই, বিশ্বাস নাই—আছে কেবল স্বাধিকার, স্বাতন্ত্র্য, ও পাশব স্বার্থের অসৎ উত্তেজনা। ইহাদের মনস্তত্ত্বে রসতত্ত্বের স্থান নাই—থাকিতে পারে না; তাই ইহারা কাব্যরসের চিরনির্ঝরকে বিদ্রূপ করে, মানুষের জীবনে যে বস্তুর প্রয়োজন সবচেয়ে

বেশি, যাহার অভাবে মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না, তাহাকে ইহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পায়। তাই যাঁহারা যুগে যুগে মানুষের অধ্যাত্মজীবন পুষ্ট করিয়া, সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া মানুষকে অশেষ ঋণে ঋণী করিয়াছেন, সেই অমৃত-সমাজ কবিগণের চিরনবীনতাময়ী বাণীকে ইহারা অতীতের আবর্জ্জনাস্তূপ বলিয়া মনে করে। তাহার কারণ, ইহারা জড়বাদী নাস্তিক, প্রেমহীন ও ধর্ম্মহীন। কিন্তু যাঁহাদের আত্মা এখনও সুস্থ আছে, যাঁহারা জ্ঞানে ও প্রেমে সমান বলীয়ান, কবিত্বের অমৃত-হ্রদে অবগাহন করিয়া যাঁহাদের কান্তি উজ্জ্বল ও শান্তিসুস্নিগ্ধ হইয়া উঠে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। এমনই একজন জগতের মহাকবিদিগের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

To men such as these the debt of humanity is inestimable. They, above all others, keep the souls of men alive; they do not *tell* us of spiritual felicity; they *create* it in us from the substance of our coarser elements....Not that Shakespeare was a Christian, any more than the poet is a mystic. But he was religious, as all great poets must be. For high poetry and high religion are at one in the essential that they demand that a man shall not merely think thoughts, but feel them—that this highest mental act be done with all his heart and with all his mind and with all his soul.

আমাদের যুগন্ধর সাহিত্যিকদিগের যে সকল উক্তি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সহিত এই উক্তি তুলনা করিলে, যাহারা মানুষ, পশু নয়, তাহারা কি বুঝিতে পারে না, কোন্ উক্তিটির মধ্যে, কাহার কণ্ঠস্বরে, মানুষের সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্ব মহত্তর ও বৃহত্তর ছন্দে স্পন্দিত হইতেছে? মনে হয়, জাতিতে জাতিতে যেমন, মানুষে মানুষেও তেমনই কত তফাৎ! নহিলে আমাদের দেশে, এই অতি-আধুনিক সাহিত্যিক সমাজে, এমন কথা এ পর্য্যন্ত কাহারও মুখে শুনিতে পাইলাম না কেন? প্রগতি তো সে দেশেও আছে।

ধাত্রী দেবতা

উনিশ

শ্রাবণের শেষ, আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া মেঘের সমারোহ জমিয়া উঠিয়াছে। কলেজের মেসের বারান্দায় রেলিঙের উপর কনুইয়ের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া হাত দুইটির উপরে মুখ রাখিয়া শিবনাথ মেঘের দিকে চাহিয়া ছিল। মাঝে মাঝে বর্ষার বাতাসের এক একটা দুরন্ত প্রবাহের সঙ্গে রিমিঝিমি বৃষ্টি নামিয়া আসিতেছে, বৃষ্টির মৃদু ধারায় তাহার মাথার চুল সিক্ত, মুখের উপরেও বিন্দু বিন্দু জল জমিয়া আছে। পাতলা ধোঁয়ার মত ছোট ছোট জলীয় বাষ্পের কুণ্ডলী সনসন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, একের পর এক মেঘগুলি যেন এদিকের বড় বড় বাড়িগুলির ছাদের আড়াল হইতে উঠিয়া ওদিকের বাড়িগুলির ছাদের আড়ালে মিলাইয়া যাইতেছে। নীচে জলসিক্ত শীতল কঠিন রাজপথ—হ্যারিসন রোড। পাথরের ইটে বাঁধানো পরিধির মধ্যেও ট্রাম-লাইনগুলি চকচক করিতেছে। একতলার উপরে ট্রামের তারগুলি স্থানে স্থানে আড়াআড়ি বাঁধনে আবদ্ধ হইয়া বরাবর চলিয়া গিয়াছে। তারের গায়ে অসংখ্য জলবিন্দু জমিয়া জমিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। এই দুর্যোগেও ট্রামগাড়ি মোটর মানুষ চলার বিরাম নাই। বিচিত্র কঠিন শব্দে রাজপথ মুখরিত।

কলিকাতাকে দেখিয়া শিবনাথের বিস্ময়ের এখনও শেষ হয় নাই। অদ্ভুত বিচিত্র ঐশ্বর্যময়ী মহানগরীকে দেখিয়া শিবনাথ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। সে বিস্ময়ের ঘোর আজও সম্পূর্ণ কাটে নাই। তাহার বিপুল বিশাল বিস্তার পথের জনতা যানবাহনের উদ্ধত

ক্ষিপ্র গাত দেখিয়া শিবনাথ এখনও শঙ্কিত না হইয়া পারে না। আলোর উজ্জ্বলতা, দোকানে দোকানে পণ্যসম্ভারের বর্ণবৈচিত্র্যে বিচ্ছুরিত হইয়া আজও তাহার মনে মোহ জাগাইয়া তোলে; স্থান কাল সব সে ভুলিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে ভাবে, এত আছে, এত সম্পদ আছে পৃথিবীতে—এত ধন, এত ঐশ্বর্য্য!

সেদিন সে সুশীলকে বলিল, কলকাতা দেখে মধ্যে মধ্যে আমার মনে হয় কি জানেন, মনে হয় দেশের যেন হৃৎপিণ্ড এটা: সমস্ত রক্ত-স্রোতের কেন্দ্রস্থল।

সুশীল প্রায়ই শিবনাথের কাছে আসে, শিবনাথও সুশীলদের বাড়ি যায়। সুশীল শিবনাথের কথা শুনিয়া হাসিয়া উত্তর দিল, উপমাটা ভুল হ'ল ভাই শিবনাথ। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে, হৃৎপিণ্ড অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত সঞ্চালন করে, সঞ্চার করে, শোষণ করে না। কলকাতার কাজ ঠিক উল্টো, কলকাতা করে দেশকে শোষণ। গঙ্গার ধারে ডকে গেছ কখনও? সেই শোষণ-করা রক্ত ভাগীরথীর টিউবে টিউবে ব'য়ে চ'লে যাচ্ছে দেশান্তরে, জাহাজে জাহাজে—ঝলকে ঝলকে। এই বিরাট শহরটা হ'ল একটা শোষণযন্ত্র।

এ কথার উত্তর শিবনাথ দিতে পারে নাই। নীরবে কথাটা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সুশীল আবার বলিল, মনে করুন তো আপনার দেশের কথা, ভাঙা বাড়ি, কঙ্কালসার মানুষ, জলহীন পুকুর, সব শুকিয়ে যাচ্ছে এই শোষণে।

তারপর ধীরে ধীরে দৃঢ় আবেগময় কণ্ঠে কত কথাই সে বলিল, দেশের কত লক্ষ লোক অনাহারে মরে, কত লক্ষ থাকে অর্দ্ধাশনে, কত লক্ষ লোক গৃহহীন, কত লক্ষ লোক বস্ত্রহীন, কত লক্ষ লোক মরে কুকুর-বেড়ালের মত বিনা চিকিৎসায়। দেশের দারিদ্র্যের দুর্দ্দশার

ইতিহাস আরও বলিল, একদিন নাকি এই দেশের ছেলেরা সোনার ভাঁটা লইয়া খেলা করিত, দেশে বিদেশে অন্ন বিতরণ করিয়া দেশজননী নাম পাইয়াছিলেন অন্নপূর্ণা। অফুরন্ত অন্নের ভাণ্ডার, অপর্য্যাপ্ত মণিমাণিক্য-স্বর্ণের স্তূপ। শুনিতে শুনিতে শিবনাথের চোখে জল আসিয়া গেল।

সুশীল নীরব হইলে সে প্রশ্ন করিল, এর প্রতিকার?

হাসিয়া সুশীল বলিয়াছিল, কে করবে?

আমরা।

বহুবচন ছেড়ে কথা কও ভাই, এবং সেটা পরস্মৈপদী হ'লে চলবে না।

সে একটা চরম উত্তেজনাময় আত্মহারা মুহূর্ত্ত। শিবনাথ বলিল, আমি—আমি করব।

সুশীল প্রশ্ন করিল, তোমার পণ কি?

মুহূর্ত্তে শিবনাথের মনে হইল, হাজার হাজার আকাশস্পর্শী অট্টালিকা প্রশস্ত রাজপথ কোলাহল-কলরবমুখরিত মহানগরী বিশাল অরণ্যে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার অরণ্যতলে দূর হইতে যেন অজানিত গম্ভীর কণ্ঠে কে তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে, তোমার পণ কি? সর্ব্বাঙ্গে তাহার শিহরণ বহিয়া গেল, উষ্ণ রক্তস্রোত দ্রুতবেগে বহিয়া চলিয়াছিল; সে মুহূর্ত্তে উত্তর করিল, ভক্তি।

তাহার মনে হইল, চোখের সম্মুখে এক রহস্যময় আবরণীর অন্তরালে মহিমমণ্ডিত সার্থকতা জ্যোতির্ম্ময় রূপ লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। তাহার মুখ-চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে সে সুশীলের মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল।

সুশীলও নীরব হইয়া একদৃষ্টে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, শিবনাথ অধীর আগ্রহে বলিল, বলুন সুশীলদা, উপায় বলুন।

বিচিত্র মিষ্ট হাসি হাসিয়া সুশীল বলিল, ওই ভক্তি নিয়ে দেশের সেবা কর ভাই, মা পরিতুষ্ট হয়ে উঠবেন।

শিবনাথ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, আপনি আমায় বললেন না!

বলব, আর একদিন।—বলিয়াই সুশীল উঠিয়া পড়িল। সিঁড়ির মুখ হইতে ফিরিয়া আবার সে বলিল, আজ আমাদের ওখানে যেও। মা বার বার ক'রে ব'লে দিয়েছেন; দীপা তো আমাকে খেয়ে ফেললে

দীপা সুশীলের আট বছরের বোন, ফুটফুটে মেয়েটি, তাহার সম্মুখে কখনও ফ্রক পরিয়া বাহির হইবে না। সুশীল তাহাকে বলিয়াছে, শিবনাথের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে; সে শাড়িখানি পরিয়া সলজ্জ ভঙ্গিতে তাহার সম্মুখেই দূরে দূরে ঘুরিবে ফিরিবে, কিছুতেই কাছে আসিবে না; ডাকিলেই পলাইয়া যাইবে।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া মৃদু বর্ষাধারায় ভিজিতে ভিজিতে শিবনাথ সেদিনের কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে দীপার প্রসঙ্গে আসিয়াই মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; এমন একটি অনাবিল কৌতুকের আনন্দে কেহ কি না হাসিয়া পারে!

কি রকম? আকাশের সজল মেঘের দিকে চেয়ে বিরহী যক্ষের মত রয়েছেন যে? মাথার চুল গায়ের জামাটা পর্য্যন্ত ভিজে গেছে, ব্যাপারটা কি?—একটি ছেলে আসিয়া শিবনাথের পাশে দাঁড়াইল।

তাহার সাড়ায় আত্মস্থ হইয়া শিবনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল, বেশ লাগছে ভিজতে। দেশে থাকতে কত ভিজতাম বর্ষায়!

ছেলেটি হাসিয়া বলিল, আমি ভাবলাম, আপনি বুঝি প্রিয়ার কাছে লিপি পাঠাচ্ছেন মেঘমালার মারফতে। By the by, এই ঘণ্টা দুয়েক

আগে, আড়াইটে হবে তখন—আপনার সম্বন্ধী এসেছিলেন আপনার সন্ধানে—কমলেশ মুখার্জি।

চকিত হইয়া শিবনাথ বলিল, কে?

কমলেশ মুখার্জি। চেনেন না নাকি?

শিবনাথ গম্ভীর হইয়া গেল। কমলেশ! ছেলেটি হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, আমরা সব জেনে ফেলেছি মশায়। বিয়ের কথাটা আপনি স্রেফ চেপে গেছেন আমাদের কাছে। আমাদের feast দিতে হবে কিন্তু।

শিবনাথ গম্ভীর মুখে নীরব হইয়া রহিল।

সামান্যক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকিয়া ছেলেটি বলিল, আপনি কি রকম লোক মশাই, সর্ব্বদাই এমন serious attitude নিয়ে থাকেন কেন, বলুন তো?

শিবনাথের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কমলেশের নামে, তাহার এখানে আসার সংবাদে তাহার অন্তর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তবুও সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, কি করব বলুন, মানুষ তো আপনার স্বভাবকে অতিক্রম করতে পারে না। এমনিই আমার স্বভাব সঞ্জয়বাবু।

সঞ্জয় বারান্দার রেলিঙের উপর একটা কিল মারিয়া বলিল, You must mend it, আমাদের সঙ্গে বাস করতে হ'লে দশজনের মত হয়ে চলতে হবে।—কথাটা বলিয়াই সদর্প পদক্ষেপে সে চলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে তখন কোন একটা কারণে প্রবল উচ্ছ্বাসের কলরব ধ্বনিত হইতেছিল।

শিবনাথ একটু হাসিল, বেশ লাগে তাহার এই সঞ্জয়কে। তাহারই সমবয়সী সুন্দর সুরূপ তরুণ, উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, যেখানে হৈচৈ সেখানেই সে আছে। কোন রাজার ভাগিনেয় সে; দিনে পাঁচ ছয় বার বেশ-

পরিবর্ত্তন করে, আর সাগর-তরঙ্গের ফেনার মত সর্ব্বত্র সর্ব্বাগ্রে উচ্ছ্বসিত হইয়া ফেরে। ফুটবল খেলিতে পারে না, তবুও সে forward lineএ left outএ গিয়া দাঁড়াইবে, চীৎকার করিবে, আছাড় খাইবে; অভিনয় করিতে পারে না, তবুও সে কলেজের নাটকাভিনয়ে যে কোন ভূমিকায় নামিবে; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, গতি তাহার অতি স্বচ্ছন্দ, কাহাকেও আঘাত করে না, আর সে ভিন্ন কোন কলরব-কোলাহল যেন সুশোভনও হয় না।

কিন্তু কমলেশ কি জন্য এখানে আসিয়াছিল? যে তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে পর্য্যন্ত লজ্জা করে, সে কি কারণে এখানে আসিল? নূতন কোন আঘাতের অস্ত্র পাইয়াছে নাকি? তাহার গৌরীকে মনে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপরের আকাশের দুর্য্যোগ তাহার অন্তরে ঘনাইয়া উঠিল। একটা দুঃখময় আবেগের পীড়নে বুকখানি ভরিয়া উঠিল।

সিঁড়ি ভাঙিয়া দুপদাপ শব্দে কে উঠিয়া আসিতেছিল, পীড়িত চিত্তে সে সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। উঠিয়া আসিল একটি ছেলে, পরণে নিখুঁত Boys-scoutএর পোষাক, মাথার টুপিটি পর্য্যন্ত ঈষৎ বাঁকানো; মার্চের কায়দায় পা ফেলিয়া বারান্দা অতিক্রম করিতে করিতেই বলিতেছিল, হ্যালো সঞ্জয়, a cup of hot tea my friend, oh, it is very cold।

ছেলেটির গলার সাড়া পাইয়া ঘরের মধ্যে সঞ্জয়ের দল নূতন উচ্ছ্বাসে কলরব করিয়া উঠিল। ছেলেটির নাম নিত্য, শিবনাথের সঙ্গেই পড়ে। চালে চলনে কায়দায় কথায় একেবারে যাহাকে বলে নিখুঁত কলিকাতার ছেলে। আজও পর্য্যন্ত শিবনাথ তাহার পরিচিত দৃষ্টির বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে।

ধীরে ধীরে শিবনাথের উচ্ছ্বসিত আবেগ শান্ত হইয়া আসিতেছিল; মেঘমেদুর আকাশের দিকে চাহিয়া সে উদাস মনে কল্পনা করিতেছিল, একটা মহিমময় নিপীড়িত ভবিষ্যতের কথা। গৌরী তাহাকে মুক্তি দিয়াছে, সেই মুক্তির মহিমাতেই সে মহামন্ত্র পাইয়াছে, 'বন্দে মাতরম্, ধরণীম্ ভরণীম্ মাতরম্'।

পিছনে অনেকগুলি জুতার শব্দ শুনিয়া শিবনাথ বুঝিল, সঞ্জয়ের দল বাহির হইল।—হয় কোন্ রেস্তোরাঁয় অথবা এই বাদল মাথায় করিয়া ইডেন গার্ডেনে।

Hallo, is, it true you are married? নিত্যর কণ্ঠস্বরে শিবনাথ ঘুরিয়া দাঁড়াইল, সম্মুখেই দেখিল একদল ছেলে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে, দলের পুরোভাগে নিত্য, কেবল সঞ্জয় দলের মধ্যে নাই। শিবনাথের পায়ের রক্ত যেন মাথার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

সে অসঙ্কুচিত ভঙ্গিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া অকুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিল, Yes, I am married।

এমন নির্ভীক দর্পিত স্বীকারোক্তি শুনিয়া সমস্ত দলটাই যেন দমিয়া গেল, এমন কি নিত্য পর্য্যন্ত। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই কিন্তু নিত্য মাত্রাতিরিক্ত ব্যঙ্গভরে বলিয়া উঠিল, Shame!

ছেলের দল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দলটার পিছনে আপনার ঘরের দরজায় বাহির হইয়া সঞ্জয় ডাকিল, Well boys, tea is ready। বাঃ, ওকি, শিবনাথবাবুকে নিয়ে আসছ না কেন, he is not an outcaste! একি, শিবনাথবাবুর মুখ এমন কেন? It is you নিত্য, তুমি নিশ্চয় কিছু বলেছ। না না না, শিবনাথবাবু, আপনাকে আসতেই হবে, you must join us।

চায়ের আসরটা জমিয়া উঠিল ভাল। মনের মধ্যে যেটুকু উত্তাপ জমিয়া উঠিয়াছিল, সেটুকু ধুইয়া মুছিয়া দিল ওই সঞ্জয়। ঘরের মধ্যে বসিয়া স্টোভের শব্দে নিত্য এবং অন্যান্য ছেলেদের কথা হাসি সে শুনিতে পায় নাই। চায়ের জলটা নামাইয়া ফুটন্ত জলে চা ফেলিয়া দিয়া নিত্যদের ডাকিতে বাহিরে আসিয়াই শিবনাথের মুখ দেখিয়া ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। সমস্ত শুনিয়া সে শিবনাথের পক্ষ লইয়া সপ্রশংস মুখে বলিল, That's like a hero. বেশ বলেছেন আপনি শিবনাথবাবু! বিয়ে করা সংসারে পাপ নয়। বিয়ে করা পাপ হ'লে scout হওয়াও সংসারে পাপ।

এমন ভঙ্গিতে সে কথাগুলি বলিল যে, দলের সকলেই এমন কি নিত্য পর্য্যন্ত না হাসিয়া পারিল না। সঞ্জয় বলিল, নিত্য, তুমি shame বলেছ যখন, তখন শিবনাথবাবুর কাছে তোমাকে apology চাইতে হবে। You must।

All right! ভুলের সংশোধন করতে আমি বাধ্য, I am a scout, শিবনাথবাবু।

শিবনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, না না না, আমি কিছু মনে করি নি। We are friends।

Certainly।

You must prove it, both of you।—একজন বলিয়া উঠিল।

নিত্য বলিল, How? প্রমাণ করতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

বক্তা বলিল, তুমি দুটাকা দাও, আর শিবনাথবাবু দুটাকা—

সঞ্জয় বলিয়া উঠিল, No, not শিবনাথবাবু, say শিবনাথ। নিত্য দুটাকা, শিবনাথ দুটাকা and my humble self দুটাকা। নিয়ে এস খাবার।

নিত্য বলিল, All right, কিন্তু not a copper in my pocket now; any friend to stand for me?

শিবনাথ বলিল, I stand for you my friend। চার টাকা এনে দিচ্ছি আমি।—সে বাহির হইয়া গেল।

সঞ্জয় হাঁকিতে আরম্ভ করিল, গোবিন্দ গোবিন্দ!—গোবিন্দ মেসের চাকর।

শিবনাথ টাকা কয়টি সঞ্জয়ের হাতে দিতেই নিত্য নাটকীয় ভঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমার একটা amendment আছে। We are eight, আটজনে দুটাকা cinema, একটাকা tram and tea there, আর three rupees এখানে খাবার।

অধিকাংশ ছেলেই কলরব করিয়া সায় দিয়া উঠিল। সঞ্জয় বলিল, All right, তা হ'লে এখানে শুধু চা, খাওয়া-দাওয়া সব cinemaয়। কিন্তু চার আনার সীট বড় nasty, আট আনা না হ'লে বসা যায় না! চাঁদা বাড়াতে হবে শিবনাথ, তুমি তিন, নিত্য তিন, আমি তিন; ন টাকার পাঁচ টাকা সিনেমা, চার টাকা খাবার।

শিবনাথও অমত করিল না, পরম উৎসাহভরেই সে আবার টাকা আনিতে চলিয়া গেল। এ মেসে আসিয়া অবধি সুশীল ও পূর্ণের আকর্ষণে সে সকলের নিকট হইতে একটু দূরে দূরেই ছিল। সুশীল, পূর্ণ ও তাহাদের দলের আলোচনা, এমন কি হাস্য পরিহাসেরও স্বাদ-গন্ধ সবই যেন স্বতন্ত্র; তাহার ক্রিয়া পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র। সে রসে জীবন-মন গম্ভীর গুরুত্বে থমথমে হইয়া উঠে। এমন কি, মাটির বুক হইতে আকাশের কোণ পর্য্যন্ত যে অসীম শূন্যতা, তাহার মধ্যেও সে রসপুষ্ট মন কোন এক পরম রহস্যের সন্ধান পাইয়া অনুচ্ছ্বসিত প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে গম্ভীর হইয়া উঠে। আর সঞ্জয়ের দলের আলাপ-আলোচনা মনকে

করে হাল্কা রঙিন, বুদ্বুদের মত একের পর এক ফাটিয়া পড়ে, আলোকচ্ছটার বর্ণবিন্যাস মনে একটু রঙের ছাপ রাখিয়া যায় মাত্র। তাই আজ এই আকস্মিক আলাপের ফলে সঞ্জয়দের সংস্পর্শে আসিয়া শিবনাথ এই অভিনব আস্বাদে উৎফুল্ল না হইয়া পারিল না।

এবারে আপনার ঘরের মধ্যে আসিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল, সুশীল তাহার সীটের উপর বসিয়া আছে। নীরবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে বাহিরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। শিবনাথ তাহার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, সুশীলদা!

হঁ্যা।

কখন এলেন? আমি এই তো ওঘরে গেলাম!

আমিও এই আসছি। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বলুন।—শিবনাথ একটু বিব্রত হইয়া পড়িল।

দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও।

শিবনাথ দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার কাছে আসিয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, দেরি হবে? তা হ'লে ওদের ব'লে আসি আমি।

না। তোমার কাছে টাকা আছে?

কত টাকা?

পঞ্চাশ।

না।—আমার কাছে দশ-পনরো টাকা আছে মাত্র।

তাই দাও, দুটো টাকা তুমি রেখে দাও। না, এক টাকা রেখে বাকি সব দাও।

শিবনাথ আবার বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার নিজের ও নিত্যর দেয় দুই টাকা যে এখনই লাগিবে!

সুশীল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, তাড়াতাড়ি কর শিবনাথ। আর্জেন্ট, পঞ্চাশ টাকায় দুটো রিভল্‌ভার। জাহাজের খালাসী তারা, অপেক্ষা করবে না।

শিবনাথ একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বাক্স খুলিয়া বাহির করিল সোনার চেন। চেনছড়াটি সুশীলের হাতে দিয়া বলিল, অন্তত দেড়শো টাকা হওয়া উচিত। বাকি টাকাও কাজে লাগাবেন সুশীলদা।

বিনা দ্বিধায় চেনছড়াটি হাতে লইয়া সুশীল উঠিয়া বলিল, আর একটা কথা, এদের সঙ্গে যেন বেশিরকম মেলা মেশা ক'র না।—বলিতে বলিতেই সে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকাল।

এখনও বাদল সম্পূর্ণ কাটে নাই। শিবনাথ অভ্যাসমত ভোরে উঠিয়া পূর্ব্বদিনের মত বারান্দার রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সিক্ত পিচ্ছিল রাজপথে তখনও ভিড় জমিয়া উঠে নাই। শেয়ালদহ স্টেশন হইতে তরি-তরকারি, মাছ, ডিমের ঝুড়ি মাথায় ছোট ছোট দলে বিক্রেতারা বাজার অভিমুখে চলিয়াছে; দুই-একখানা গরুর গাড়িও চলিয়াছে। এইবার আরম্ভ হইবে ঘোড়ার গাড়ি রিক্স ট্যাক্সির ভিড়। যাত্রীবাহী ট্রেন এতক্ষণ বোধ হয় স্টেশনে আসিয়া গিয়াছে।

শিবনাথের বর্ষার এই ঘনঘটাচ্ছন্ন রূপ বড় ভাল লাগে। সে দেশের কথা ভাবিতেছিল, কালী-মায়ের বাগানখানির রূপ সে কল্পনা করিতেছিল; দূর হইতে প্রগাঢ় সবুজ বর্ণের একটা স্তূপ বলিয়া মনে হয়। মধ্যের সেই বড় গাছটার ডাল বোধ হয় এবার মাটিতে আসিয়া ঠেকিবে। আমলার গাছে নূতন চিরল চিরল ছোট ছোট পাতাগুলির উজ্জ্বল কোমল সবুজবর্ণের সে রূপ অপরূপ! বাগানের কোলে কোলে

কাঁদড়ের নালায় নালায় জল ছুটিয়াছে কলরোল তুলিয়া। মাঠে এখন অবিরাম ঝরঝর শব্দ, এ জমি হইতে ও জমিতে জল নামিতেছে। শ্রীপুকুর এতদিনে জলে থৈথৈ হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে। ঘোড়াটার শরীর এ সময় বেশ ভরিয়া উঠিবে; দফাদারি পুকুরে এখন অফুরন্ত দলদাম। পিসীমা এই মেঘ মাথায় করিয়াও মহাপীঠে এতক্ষণ চলিয়া গিয়াছেন; মা নিশ্চয় বাড়িময় ঘুরিতেছেন, কোথায় কোন্খানে ছাদ হইতে জল পড়িতেছে তাহারই সন্ধানে।

সিঁড়িতে সশব্দে কে উঠিয়া আসিতেছিল, শিবনাথের মনের চিন্তা ব্যাহত হইল। সে সিঁড়ির দুয়ারের দিকে চাহিয়া রহিল। একি, সুশীলদা! সুশীল আসিতেছিল যেন একটা বিপুল বেগের উত্তেজনায় অস্থির পদক্ষেপে। মুখ চোখ যেন জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে।

Great news, শিবনাথ!—সে হাতের খবরের কাগজটা মেলিয়া ধরিল।

"ইউরোপের ভাগ্যাকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা। অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ প্রিন্স ফার্ডিনাণ্ড গুলির আঘাতে নিহত। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অষ্ট্রিয়ান গভর্মেণ্টের রুমানিয়ার নিকট কৈফিয়ৎ দাবি। যুদ্ধসজ্জার বিপুল আয়োজন।"

শিবনাথ সুশীলের মুখের দিকে চাহিল। সুশীল যেন অগ্নিশিখার মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শিবনাথ বলিল, রুমানিয়ার মত ছোট একফোঁটা দেশ—

বাধা দিয়া সুশীল বলিল, ক্ষুদ্র শিশিরকণায় সূর্য্য আবদ্ধ হয় শিবনাথ, ক্ষুদ্রতা দেহে নয়, মনে। তা ছাড়া ইউরোপের রাজনীতির খবর তুমি জান না। যুদ্ধ অনিবার্য্য। শুধু অনিবার্য্য নয়, সমগ্র ইউরোপ জুড়ে যুদ্ধ। এই আমাদের সুযোগ।

কিঙ্করকে প্রণাম করিয়া নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। কমলেশও নত-মুখে অকারণে জুতাটা ফুটপাথের উপর ঘষিতেছিল।

রামকিঙ্কর আবার বলিলেন, এস, গাড়িতে এস; আমাদের ওখান হয়ে আসবে।

শিবনাথ বলিল, না। আমি এখন একজন বন্ধুর ওখানে যাচ্ছি।

বেশ তো, চল, গাড়িতেই সেখান হয়ে আমাদের বাসায় যাব। মা এসেছেন কাশী থেকে, ভারী ব্যস্ত তোমাকে দেখবার জন্যে।

মা? নান্তির দিদিমা? তবে—! শিবনাথের বুকের ভিতরে যেন একটা আলোড়ন উঠিল। নান্তি, নান্তি আসিয়াছে—গৌরী!

'ইহার পর কোন ভদ্রকন্যা-ভদ্ররমণীর বাস অসম্ভব' এই কথাটা তাহার মনে পড়িয়া গেল। আরও মনে পড়িয়া গেল তাহার মা-পিসীমার সহিত রামকিঙ্করবাবুর রূঢ় আচরণের কথা। তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহের ঔদ্ধত্যে উদ্ধত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে ঔদ্ধত্যের প্রকাশ হইবার লগ্নক্ষণ আসিবার পূর্ব্বেই তাহার নজরে পড়িল, দূরে একটা চায়ের দোকানে দাঁড়াইয়া সুশীল বার বার তাহাকে পূর্ণর নিকট যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। সে আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিল না, পথে পা বাড়াইয়া বলিল, না, গাড়িতে সেখানে যাবার নয়; আমি চললাম, সেখানে আমার জরুরি দরকার।

মুহূর্ত্তে রামকিঙ্করবাবু উগ্র হইয়া উঠিলেন, কঠোর উগ্র দৃষ্টিতে তিনি শিবনাথের দিকে চাহিলেন, কিন্তু ততক্ষণে শিবনাথ তাঁহাদিগকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া আপন পথে দৃঢ় দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

কমলেশের ঠোঁট দুইটি অপমানে অভিমানে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

কুড়ি

রামকিঙ্করবাবু সামাজিকতা বা আত্মীয়তার ধার কোন দিনই ধারিতেন না। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে নিদ্রাভিভূত হইবার মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত তাঁহার একমাত্র চিন্তা,—বিষয়ের চিন্তা, ব্যবসায়ের চিন্তা, অর্থের আরাধনা। ইহার মধ্যে আত্মীয়তা কুটম্বিতা এমন কি সামাজিক সৌজন্য-প্রকাশের পর্য্যন্ত অবকাশ তাঁহার হইত না। ধনী পিতার সন্তান, শৈশব হইতেই তাঁবেদারের কাঁধে কাঁধে মানুষ হইয়াছেন, যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই তাহাদের মালিক ও প্রতিপালকের আসনে বসিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, ফলে প্রভুত্বের দাবি, মানসিক উগ্রতা তাঁহার অভ্যাসগত স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর একটি বস্তু—সেটি বোধ হয় তাঁহার জন্মগত, কর্ম্মী পিতার সন্তান তিনি, কর্ম্মের নেশা তাঁহার রক্তের ধারায় বর্ত্তমান। এই কর্ম্মের উন্মত্ত নেশায় তিনি সব কিছু ভুলিয়া থাকেন; আত্মীয়তা কুটুম্বিতা সামাজিক সৌজন্য-প্রকাশের অভ্যাস পর্য্যন্ত এমনই করিয়া ভুলিয়া থাকার ফলে অনভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু আসল মানুষটি এমন নয়। এই কৃত্রিম অভ্যাস করা জীবনের মধ্যে সে মানুষের দেখা মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, যে মানুষের আপনার জনের জন্য অফুরন্ত মমতা; অদ্ভুত তাঁহার খেয়াল, যে খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া স্বর্ণমুষ্টিও ধূলায় ফেলিয়া দিতে পারেন। কাশীতে অকস্মাৎ প্লেগ দেখা দিতে কমলেশ তাহার দিদিমা ও গৌরীকে লইয়া কলিকাতায় আসিতেই রামকিঙ্করবাবু গৌরীকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, নাস্তি যে অনেক বড় হয়ে গেলি রে, এ্যাঁ!

গৌরী মামাকে প্রণাম করিয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই দুই মাসের মধ্যেই গৌরীর সর্ব্ব অবয়ব হইতে জীবনের গতির

স্বাচ্ছন্দ্য পর্য্যন্ত ঈষৎ ক্ষুণ্ণ ম্লান হইয়া গিয়াছে। শিবনাথকে যে পত্র সে লিখিয়াছিল, সে পত্রের ভাষা তাহার স্বকীয় অভিব্যক্তি নয়, সে ভাষা অপরের, সে তিরস্কার অন্যের; শিবনাথের প্রতি তাহার নিজের অকথিত সকল কথা ধীরে ধীরে তাহার রূপের মধ্যে এমনই করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। গৌরীর রূপের সেই অভিনব অভিব্যক্তি রামকিঙ্করবাবুর চোখে পড়িল, তিনি পরমুহূর্ত্তেই বলিলেন, কিন্তু এমন শুকনো শুকনো কেন রে তুই?

নাস্তির দিদিমা—রামকিঙ্করবাবুর মা এতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন আপনার পূজার ঝোলাটির সন্ধানে; ঝোলাটি লইয়া উপরে উঠিতে উঠিতে তিনি রামকিঙ্করের কথাগুলি শুনিয়া সিঁড়ি হইতেই বলিলেন, তুমিই তো তার কারণ বাবা। মেয়েটাকে হাতে পায়ে বেঁধে জলে দিলে তোমরা। আবার বলছ, এমন শুকনো কেন?

গৌরী দিদিমায়ের কথার ধারা লক্ষ্য করিয়া সেখান হইতে সরিয়া বাড়ির ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। রামকিঙ্করবাবু চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার সব মনে পড়িয়া গেল, শিবনাথের মায়ের কথা, পিসীমায়ের কথা, সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের সেবাকার্য্যের পরম প্রশংসার কথাও মনে পড়িল। আরও মনে পড়িল, শিবনাথের সঙ্গে গৌরীর দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত নাই। তিনি বলিলেন, দাঁড়াও, আজই খোঁজ করছি শিবনাথ কোন্ কলেজে পড়ে, কোথায় থাকে। আজই নিয়ে আসছি তাকে।

কমলেশ বলিয়া উঠিল, না মামা।

কেন?—রামকিঙ্করবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন।

রামকিঙ্করবাবুর মা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, না, নিয়ে আসতে হবে না তাকে, সে একটা ছোটলোক, ইতর; একটা ডোমেদের মেয়ের মোহে—

বাধা দিয়া রামকিঙ্কর বলিলেন, ছি ছি, কি বলছ মা তুমি? কে, কার কথা বলছ তুমি?

ক্রোধ হইলে নাস্তির দিদিমায়ের আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, তিনি দারুণ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া ডোমবধূর সমুদয় ইতিবৃত্তটি উচ্চ-কণ্ঠে বিবৃত করিয়া কহিলেন, তুই করেছিস এ সম্বন্ধ; তোকেই এর দায় পুরোতে হবে। কি বিধান তুই করছিস বল আমাকে, তবে আমি জল-গ্রহণ করব।

রামকিঙ্কর বলিলেন, কথাটা একেবারে বাজে কথা ব'লেই মনে হচ্ছে মা। আমি আজই আমাদের ম্যানেজারকে লিখছি, সঠিক খবর জেনে সে লিখবে। আমার কিন্তু একেবারেই বিশ্বাস হয় না মা।

চিঠি সেইদিনই লেখা হইল; কয়দিন পরে উত্তরও আসিল। ম্যানেজার লিখিয়াছেন, "খবর আমি যথাসাধ্য ভালরকমই লইয়াছি; এমন কি এখানকার দারোগাবাবুর কাছেও জানিয়াছি, ওটা নিতান্ত গুজবই। দারোগা বলিলেন, ও সব ছেলের নাম পাপের খাতায় থাকে না। ওদের জন্য আলাদা খাতা আছে। কথাটা ভাঙিয়া বলিতে বলায় তিনি বলিলেন, সে ভাঙিয়া বলা যায় না, তবে এইটুকু জানাই যে, ও রটনাটা রটাইয়াছে ওই বউটার শাশুড়ী এবং ভাসুর; মেয়েটা আসলে পলাইয়াছে তাহার বাপের বাড়ির গ্রামের একজন স্বজাতীয়ের সঙ্গে। সে লোকটা কলিকাতায় থাকে, সেখানে মেথর বা ঝাড়ুদারের কাজ করে। এখানে সর্ব্বসাধারণের মধ্যেও কোন ব্যক্তিই কথাটা বিশ্বাস করেন নাই। বরং শিবনাথবাবুর এই সেবাকার্য্যের জন্য এতদঞ্চল তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।"

চিঠিখানা পড়িয়া কমলেশকে ডাকিয়া রামকিঙ্করবাবু হাসিয়া বলিলেন, পড়। ম্যানেজার সেখান থেকে পত্র দিয়েছেন।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে কান্নার আবেগে কমলেশের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। শিবনাথ তাহার বাল্যবন্ধু, তাহার উপর গৌরীর বিবাহের ফলে সে তাহার পরম প্রিয়জন, তাহার প্রতি অবিচার করার অপরাধবোধ অন্তরের মধ্যে এমনই একটা পীড়াদায়ক আবেগের সৃষ্টি করিল। কমলেশ শিবনাথকে খুব ভাল করিয়া জানিত, উলঙ্গ শৈশব হইতে তাহারা দুইজনে খেলার সাথী, বাল্যকাল হইতে তাহাদের মধ্যে প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা জাগিয়াছে, কৈশোরের প্রারম্ভে তাহারা কর্ম্মের সহযোগিতার মধ্যে পরস্পরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যৌবন-জীবনে প্রবেশ করিয়াছে; একের শক্তি দুর্ব্বলতা দোষ গুণ অন্যে যত জানে, সে নিজেও আপনাকে তেমন ভাল করিয়া জানে না। তাই কমলেশের অপরাধবোধ এত তীক্ষ্ণ হইয়া আপনার মর্ম্মকে বিদ্ধ করিল। সে যেন কত ছোট হইয়া গেল শিবনাথের নিকট, গৌরীর নিকট সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া!

রামকিঙ্কর বলিলেন, যাও, মাকে চিঠিখানা প'ড়ে শুনিয়ে এস। আর দেখ, নান্তিকে চিঠিখানা পড়তে দিও।

চিঠিখানা শুনিয়া নান্তির দিদিমা খুব খুশি হইয়া উঠিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাঁকডাক সুরু করিয়া বলিলেন, নান্তি, নান্তি, অ নান্তি।

নান্তি তাহার সমবয়সী মামাতো মাসতুত বোনদের সহিত গল্প করিতেছিল, দিদিমার হাঁকডাক শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, এই নে হারামজাদী, এই পড়। চিলে কান নিয়ে গেল ব'লে সেই কে চিলের পেছনে পেছনে ছুটেছিল, তোর হ'ল সেই বিত্তান্ত। কে কোথা থেকে কি লিখলে, আর তাই তুই বিশ্বেস ক'রে কেঁদে-কেটে—বাবাঃ, এ কালের মেয়েদের চরণে দণ্ডবৎ মা!

গৌরী রুদ্ধশ্বাসে চিঠিখানা হাতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। দিদিমায়ের মনের আবেগ তখনও শেষ হয় নাই, তিনি তাঁহার অপরাধটুকু গৌরীর স্কন্ধে আরোপিত করিয়া কহিলেন, তা একাল অনেক ভাল মা, তাই পরিবার এখন স্বামীর ওপর রাগ করতে পারছে। সেকালে বাবুদের তো ওসব ছিল কুকুর-বেড়াল পোষার সামিল। ওই কি বলে শ্যামাদাসবাবুর ভালবাসার লোক ছিল—কাদম্বিনী; সে বলেছিল, বাবু, তোমার পরিবারের গোবরের ছাঁচ তুলে এনে আমাকে দেখাও, সে কেমন সুন্দরী। তোরা হ'লে তো তা হ'লে গলায় দড়ি দিতিস, না হয় বিষ খেতিস।

গৌরীর চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। চোখের জলের লজ্জা গোপন করিতেই সে চিঠিখানা ফেলিয়া দিয়া দ্রুত সেখান হইতে চলিয়া গিয়া আপনার বিছানায় মুখ লুকাইয়া শুইয়া পড়িল।

কমলেশ নতমুখেই বলিল, দিদিমা!

দিদিমা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, তুই ছোঁড়াই হচ্ছিস ভারী হেপো। একেবারে রেগে আগুন হয়ে লেক্‌চার-মেক্‌চার ঝেড়ে এই কাণ্ড ক'রে ব'সে থাকলি। যা এখন, যা, খোঁজখবর ক'রে নিয়ে আয় তাকে।

সে যদি না আসে?

আসবে না? কান ধ'রে নিয়ে আসবি। গৌরী কি আমার ফেলনা নাকি? সে বিয়ে করেছে কেন আমার গৌরীকে?

তারপর তাঁহার ক্রোধ পড়িল কলিকাতার বাসায় যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের উপর। কেন তাঁহারা এতদিন শিবনাথের সংবাদ লন নাই। তাঁহাদের নিজের জামাই হইলে কি তাঁহারা এমন করিয়া সংবাদ লইতে ভুলিয়া বসিয়া থাকিতেন? শেষ পর্য্যন্ত তিনি মৃতা কন্যা—গৌরীর মায়ের জন্য কাঁদিয়া ফেলিলেন। একি দারুণ বোঝা সে তাঁহার বুকের উপর চাপাইয়া দিয়া গেল!

ইহারই ফলে কমলেশ ও রামকিঙ্করবাবু শিবনাথের নিকট আসিয়াছিলেন সমাদর করিয়া শিবনাথকে লইয়া যাইবার জন্য, কিন্তু শিবনাথ একটা তন্ময় শক্তির আবেগে তাঁহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া মেঘ মাথায়

করিয়া ভিজিতে ভিজিতে আপন পথে চলিয়া গেল, তাঁহারা যেন তাহার নাগাল পর্য্যন্ত ধরিতে পারিলেন না।

নাস্তির দিদিমায়ের নির্ব্বাপিত ক্রোধবহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার ক্রোধ পড়িল শিবনাথের পিসীমা ও মায়ের উপর। শিবনাথ যে তাঁহাদিগকে এমন করিয়া লঙ্ঘন করিয়া গেল, এ শিক্ষা যে তাঁহাদেরই, তাহাতে আর তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি অত্যন্ত দৃঢ় ভঙ্গিতে বার্দ্ধক্যনত দেহখানিকে সোজা করিয়া তুলিয়া বলিলেন, আমি আমার নাস্তিকে রাণী ক'রে দিয়ে যাব। আসতে হয় কি না হয় আমার নাস্তির কাছে, আমি ম'লেও যেখানে থাকি সেইখান থেকে দেখব।

রামকিঙ্করবাবুও মনে মনে অত্যন্ত আহত হইয়াছিলেন, তিনি মায়ের কথার প্রতিবাদ করিলেন না, গম্ভীরভাবে নীচে নামিয়া গেলেন। কমলেশ চুপ করিয়া বারান্দায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গৌরী ঘরের মধ্যে জানালার ধারে বসিয়া উল বুনিতেছিল; জানালাটা দিয়া পথের উপরটা বেশ দেখা যায়, তাহার হাতের আঙুল রচনা করিতেছিল উল দিয়া ছাঁদের পর ছাঁদ, দেখিতেছিল সে পথের জনতা। সমস্ত শুনিয়া তাহার হাতের কাজটি থামিয়া গেল, পথের দিকে চাহিয়া সে শুধু বসিয়াই রহিল।

সেদিন সন্ধ্যায় সমগ্র পরিবারটিকেই রামকিঙ্করবাবু থিয়েটার দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

ঠিক মাসখানেক পর।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গে তরঙ্গে সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল, বৃটেন জার্ম্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ফ্রান্স রাশিয়া বেলজিয়াম রুমানিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। সমগ্র কলিকাতা যেন চঞ্চল সমুদ্রের মত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। হাজার হাজার মাইল পশ্চিমের মানুষের অন্তরের বিক্ষোভ আকাশ-তরঙ্গে আসিয়া এখানকার মানুষকেও ছোঁয়াচ লাগাইয়া দিল শেয়ার-মার্কেটে সেদিনের সে ভিড়, ব্যবসায়ী-মহলে সেদিনের ছোটাছুটি দেখিয়া কমলেশের মন বিপুল উত্তেজনায়

ভরিয়া উঠিল। প্রত্যেক মানুষটি যেন উত্তেজনার স্পর্শে দৃঢ় দ্রুত পদক্ষেপে সোজা হইয়া চলিয়াছে।

কয়লার বাজার নাকি হু-হু করিয়া চড়িয়া যাইবে, প্রচুর ধন, অতুল ঐশ্বর্য্যে বাড়িঘর ভরিয়া উঠিবে। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা করিতে করিতে অকস্মাৎ তাহার শিবনাথকে মনে পড়িয়া গেল; তাহার মনে হইল, আর একবার খোঁজ করিতে দোষ কি? সেদিন সত্যই হয়তো তাহার কোন কাজ ছিল। আর তাহার সহিত একবার মুখোমুখী সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া লওয়ারও তো প্রয়োজন আছে। মোট কথা, যুক্তি তাহার যাহাই হউক না কেন, যাওয়ার উত্তেজিত প্রবৃত্তিই হইল আসল কথা। তাহাদের ভাবী সৌভাগ্যের সম্ভাবনার কথাটাও শিবনাথকে জানানো হইবে।

শিবনাথ ঘরে বসিয়া আপন মনে কি লিখিতেছিল। কমলেশ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এই যে!

মুখ তুলিয়া শিবনাথ তাহাকে দেখিয়া লেখা কাগজখানা বাক্সের মধ্যে পুরিয়া অতি মৃদু হাসিয়া বলিল, এস।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কমলেশ সবিস্ময়ে বলিল, একি, এমন উস্কোখুস্কো চেহারা কেন তোমার? অসুখ করেছে নাকি? সত্যই শিবনাথের রুক্ষ চুল, মার্জ্জনাহীন শুষ্ক মুখশ্রী, দেহও যেন ঈষৎ শীর্ণ বলিয়া মনে হইতেছিল।

হাসিয়া শিবনাথ বলিল, না, অসুখ কিছু না। আজ নাওয়া-খাওয়াটা হয়ে ওঠে নি।

এই সামান্য বিস্ময়ের হেতুটুকু লইয়া কমলেশ বেশ স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল, সে বলিল, কেন? নাওয়া-খাওয়া হ'ল না কেন?

কাজ ছিল একটু, সকালে বেরিয়ে এই মিনিট পনরো ফিরেছি।

কলেজ যাও নি?

যাক গে সে কথা। তারপর দেশে কবে যাবে বল।

দেশে এখন যাব না, এইখানেই পড়ব ঠিক হয়েছে। কিন্তু তোমার খবর কি বল তো? সেদিন মামা নিজে এলেন, আর তুমি অমন ক'রে-চ'লে গেলে যে?

বলেছিলাম তো, কাজ ছিল।

কি এমন কাজ যে, দুটো কথা বলবার জন্যে তুমি দাঁড়াতে পারলে না?

এবার শিবনাথ হাসিয়া বলিল, যদি বলি কোন নতুন love affair, যার মোহে মানুষ আপনাকে একেবারে হারিয়ে ফেলে!

কমলেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যাক, বুঝলাম, বলতে বাধা আছে।

শিবনাথ এ কথার কোন জবাব না দিয়া একটা পেপার-ওয়েট লুফিতে লুফিতে বলিল, চা খাবে একটু?—বলিতে বলিতেই সে বারান্দায় বাহির হইয়া হাঁকিল, গোবিন্দ, দু পেয়ালা চা!

কমলেশ খবরের কাগজটা টানিয়া লইয়া বলিল, আজকের news একটা great news!

হাসিয়া শিবনাথ বলিল, নতুন ইতিহাসের সন তারিখ বন্ধু,—Ninteen Fourteen—Fourth August!

আজই business market-এ অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে গেল। কয়লার দর তো হু-হু ক'রে বেড়ে যাবে। মামা বলছিলেন, প'ড়ে কি হবে, এবার business-এ ঢুকে পড়। তোমার কথাও বলছিলেন। অবশ্য তোমার যদি পছন্দ হয়।

Business অবশ্য খুবই ভাল জিনিস।

হাসিয়া কমলেশ বলিল, কিন্তু কবিতা লেখা ছাড়তে হবে তা হ'লে। আমাকে দেখে লুকোলে, ওটা কি লিখছিলে? কবিতা নিশ্চয়।

না।

তবে? কি, দেখিই না ওটা কি?

এবার শিবনাথ হাসিয়া বলিল, ওটা নতুন love affair—প্রেমপত্র একখানা; সুতরাং ওটা দেখানো যায় না।

কমলেশ আবার নীরব হইয়া গেল। চাকরটা আসিয়া চা নামাইয়া দিল, কমলেশ নীরবে চায়ের কাপ তুলিয়া লইয়া তাহাতে চুমুক দিল। তাহার নীরবতার মধ্যে শিবনাথও অন্যমনস্ক হইয়া জানালার দিকে নীরবেই চাহিয়া রহিল।

এ অশোভন নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সেই প্রথম বলিল, তোমরা কি কাশীর বাসা তুলে দিয়েছ?

হ্যাঁ।

অ।

কমলেশ বলিল, দিদিমা, নাস্তি এখানেই চ'লে এসেছে আমার সঙ্গে।

শিবনাথ নীরব হইয়া গেল।

কমলেশ এবার বলিল, আমাদের বাসায় চল একদিন।

হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া শিবনাথ যেন তন্ময় হইয়া গিয়াছে।

কমলেশ বলিল, গৌরী দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। তার মুখ দেখলে আমাদের কান্না আসে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শিবনাথ বলিল, আজও আমার কলঙ্ক-মোচন হয় নি কমলেশ, আমি যেতে পারি না।

কমলেশ যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা। Mischievous লোকের রটনা ওসব—আমরা খবর নিয়ে জেনেছি।

শিবনাথের মুখ চোখ অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ দীপ্তিতে প্রখর হইয়া উঠিল। সে বলিল, কিন্তু আমায় তো বিশ্বাস করতে পার নি। যেদিন নিজেকে তেমনই বিশ্বাসের পাত্র ব'লে প্রমাণ করতে পারব, সেইদিন আমার সত্যকার কলঙ্কমোচন হবে।

কমলেশের মাথাটা আপনা হইতেই লজ্জায় নত হইয়া পড়িল। সে নীরবে ঘরের মেঝের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। শিবনাথ মৃদু হাসিয়া আবার বলিল, 'সময় যেদিন হইবে, আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।'

একটি ছেলে দরজার সম্মুখেই বারান্দায় রেলিঙে ঠেস দিয়া নিতান্ত উদাসীনভাবেই দাঁড়াইয়া ছিল; তাহাকে দেখিয়াই শিবনাথ ঈষৎ চঞ্চল হইয়া বলিল, এখানেই যখন থাকবে, মাঝে মাঝে এস যেন। একদিনে সকল কথা ফুরিয়ে দিলে চলবে কেন?

উঠিতে বলার এমন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত কমলেশ বুঝিতে ভুল করিল না। সে উঠিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরবেই বাহির হইয়া গেল।

কমলেশ বাহির হইয়া যাইতেই ছেলেটি শিবনাথের ঘরে আসিয়া বলিল, হয়ে গেছে সেটা ?

শিবনাথ বাক্স খুলিয়া সেই কাগজখানা তাহার হাতে দিয়া বলিল, সুশীলদাকে একটু দেখে দিতে বলবেন।

কাগজখানা একটা বৈপ্লবিক ইস্তাহারের খসড়া।

কাগজখানি সযত্নে মুড়িয়া পরনের কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া ছেলেটি বলিল, পূর্ণদার সঙ্গে একবার দেখা করবেন আপনি। জরুরি দরকার।

করব।

ছেলেটি আর কথা কহিল না, বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

পূর্ণ যেমন মৃদুভাষী, কথাবার্ত্তাও তাহার তেমনই সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনের অধিক একটি কথাও সে বলে না। শিবনাথের জন্যই সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। শিবনাথ আসিতেই ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া সে বলিল, আপনাকে এইবার একটা বিপদের সম্মুখীন হতে হবে শিবনাথবাবু।

শিবনাথ প্রশান্তভাবে বলিল, কি বলুন।

পূর্ণ বলিল, অরুণের ওপর পুলিসের বড় বেশি নজর পড়েছে। তার কাছে কিছু আর্ম্‌স আছে আমাদের। সেগুলো এখন সরাবার উপায় পাচ্ছি না। আপনি মেস বদল ক'রে অরুণের মেসে যান। আর্ম্‌সগুলো আপনার কাছে থেকে যাবে, অরুণ অন্য মেসে চ'লে যাক। তা হ'লে অরুণের জিনিসপত্র সার্চ করলে তার আর ধরা পড়বার ভয় থাকবে না। পরে আপনার কাছ থেকে ওগুলো আমরা সরিয়ে ফেলব।

শিবনাথের বুক যেন মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। ওই মুহূর্ত্তটির মধ্যে তাহার মাকে, পিসীমাকে মনে পড়িয়া গেল। ম্লানমুখী গৌরীও একবার উঁকি মারিয়া চলিয়া গেল।

পূর্ণ বলিল, আপনি তা হ'লে দু তিন দিনের মধ্যেই চ'লে যান। সম্ভব হ'লে কালই। এই হ'ল অরুণের মেসের ঠিকানা।

ততক্ষণে শিবনাথ নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। সে এবার বলিল, বেশ।

পূর্ণ তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিল, good luck!

সমস্ত রাত্রিটা শিবনাথের জাগরণের মধ্যেই কাটিয়া গেল।

নানা উত্তেজিত কল্পনার মধ্যেও বার বার তাহার প্রিয়জনদের মনে পড়িতেছিল। সহসা এক সময় তাহার মনে হইল, যদি ধরাই পড়িতে হয়, তবে পূর্ব্বাহ্নে মা-পিসীমার চরণে প্রণাম জানাইয়া বিদায় লইয়া রাখিবে না? গৌরী, আজিকার দিনেও কি গৌরীকে সে বঞ্চনা করিয়া রাখিবে? না, সে কর্ত্তব্য তাহাকে সুশেষ করিতেই হইবে। মাকে ও পিসীমাকে খুলিয়া না লিখিয়াও ইঙ্গিতে সে বিদায় জানাইয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিল। তারপর পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল গৌরীকে। লিখিতে লিখিতে বুকের ভিতরটা একটা উন্মত্ত আবেগে যেন তোলপাড় করিয়া উঠিল। এত নিকটে গৌরী, দশ মিনিটের পথ, একবার তাহার সহিত দেখা করিয়া আসিলে কি হয়, হয়তো জীবনে আর ঘটিবে না! অর্দ্ধসমাপ্ত পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে জামাটা টানিয়া লইয়া গায়ে দিতে দিতেই নীচে নামিয়া গেল।

গেট বন্ধ। রাত্রি এগারোটায় গেট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মেসটি নামে মেস হইলেও কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত; মেস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে চাবি থাকে। রুদ্ধ দুয়ারের সম্মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শিবনাথ উপরে আসিয়া আবার চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠিখানি শেষ করিয়া বিছানায় সে গড়াইয়া পড়িল শ্রান্ত-ক্লান্তের মত। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাহার মনে হইল, সে করিয়াছে কি! ছি, এত দুর্ব্বল সে! এই বিদায় লওয়ার কি কোন প্রয়োজন আছে? কিসের বিদায়, আর কেন এ বিদায় লওয়া? আবার সে উঠিয়া বসিয়া দেশলাই জ্বালিয়া পত্রগুলি নিঃশেষে পুড়াইয়া ফেলিল।

কোথায় কোন্ দূরের টাওয়ার-ক্লকে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। মনকে দৃঢ় করিয়া সে আবার শুইয়া পড়িল। অভ্যাসমত ভোরেই তাহার ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই সে অনুভব করিল, সমস্ত শরীর

যেন অবসাদে ভাঙিয়া পড়িতেছে। তবুও সে আর বিছানায় থাকিল না, মন এই অল্প বিশ্রামেই বেশ স্থির হইয়াছে, সম্মুখের গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া উঠিয়া পড়িল। মনের মধ্যে আর কোন চিন্তা নাই, আছে শুধু ওই কর্ম্মের চিন্তা। কেমন করিয়া কোন্ অজুহাতে কলেজের মেস পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবে?

একে একে ছেলেরা উঠিতেছিল। সঞ্জয়ও উঠিয়া বাহিরে আসিল; সঞ্জয় তাহার অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে নাই, কিন্তু অতি দূরত্বের ব্যবধানও আর নাই। সঞ্জয় তাহাকে দেখিয়াই বলিল, হ্যালো শিবনাথ, তোমার ব্যাপার কি বল তো? কলেজেও যাচ্ছ না, এখানেও প্রায় থাক না। একি, তোমার চেহারা এমন কেন হে? অসুখ নাকি? ঠাণ্ডা লাগিও না, ঘরে চল, ঘরে চল।

শিবনাথ সঞ্জয়ের সঙ্গে তাহারই ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সম্মুখেই দেওয়ালে একখানা প্রকাণ্ড বড় আয়না। পূর্ব্বদিন হইতে অস্নাত অভুক্ত রাত্রিজাগরণক্লিষ্ট শিবনাথ আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সত্যই তো একি চেহারা হইয়াছে তাহার, কিন্তু সে তো কোন অসুস্থতা অনুভব করে না!

সঞ্জয় বলিল, অনিয়ম ক'রে শরীরটা খারাপ ক'রে ফেললে তুমি শিবনাথ। কি যে কর তুমি, তুমিই জান। সত্যি বলত কি, তুমি রীতিমত একটা mystery হয়ে উঠেছ। প্রত্যেকের notice attracted হয়েছে তোমার ওপর।

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, জান, জীবনে এই আমি প্রথম কলকাতায় এসেছি। কলকাতা যেন একটা নেশার মত পেয়ে বসেছে আমাকে। সোজা কথায়, পাড়াগাঁয়ের ছেলে কলকাত্তাই হয়ে উঠছি আর কি।

ঘাড় নাড়িয়া সঞ্জয় বলিল, not at all; বিশ্বাস হ'ল না আমার। However আমি তোমার secret জানতে চাই না। কিন্তু আমার একটা কথা তুমি শোন, তুমি বাড়ি চ'লে যাও, you require rest, শরীরটা সুস্থ করা প্রয়োজন হয়েছে।

শিবনাথের মন মুহূর্ত্তে উল্লসিত হইয়া উঠিল, শরীর-অসুস্থতার অজুহাতে বাড়ি চলিয়া যাওয়ার ছলেই তো মেস ত্যাগ করা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্প তাহার স্থির হইয়া গেল। সে হাতের আঙুল দিয়া মাথার রুক্ষ চুলগুলি পিছনের দিকে ঠেলিয়া দিতে দিতে বলিল, তাই ঠিক করেছি ভাই, শরীর যেন খুব দুর্বল হয়ে গেছে; আজই আমি বাড়ি চ'লে যাব। দেখি, আবার সুপারমশায় কি বলেন!

বলবে? কি বলবে? চল, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। আমাদের দেশটাই এমনই, healthএর দাম এখানে কিছু নয়, degree is everything here; nonsense! জান, আমি এই জন্যে ঠিক ক'রে ফেলেছি and it is certain, এই I.A. examinationএর পরেই আমি বিলেত যাব। মামা warএর জন্যে আপত্তি করছিলেন, কিন্তু time is money, পড়ার বয়স চ'লে গেলে বিলেত গিয়ে কি হবে?

শিবনাথ সঞ্জয়কে শত ধন্যবাদ দিল তাহার সুপরামর্শের জন্য, তাহার সাহায্যের জন্য। সঞ্জয় নিজেই তাহার জিনিসপত্র গুছাইয়া দিল, বিদায়ের সময় বলিল, বেশিদিন বাড়িতে থেকো না যেন। percentage কোন রকমে দু বছরে কুলিয়ে যাবে।

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, যত শিগগির পারি ফিরব।

হাসিয়া সঞ্জয় বলিল, তোমার better halfকে আমার নমস্কার জানিও।

জানাব।

এদিকে অরুণের মেসে সকল বন্দোবস্ত হইয়াই ছিল। অরুণ তাহার কিছুক্ষণ পূর্বেই মেস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মারাত্মক অস্ত্রের ছোট স্যুটকেস একটি ঘরের কোণে কাগজের মধ্যে চাপা ছিল।

শিবনাথ সেটিকে তাহার নিজের ট্রাঙ্কের মধ্যে বন্ধ করিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আপনার জিনিসপত্র গুছাইতে মনোনিবেশ করিল।

জিনিসপত্র গুছাইয়া সে চাকরকে ডাকিয়া বলিল, ঘর-দোরটা একবার পরিষ্কার ক'রে দাও দেখি। বড্ড নোংরা হয়ে রয়েছে।

চাকর বলিল, অরুণবাবু—ওই যে বাবুটি এ ঘরে ছিলেন, তাঁর মশাই ওই এক ধরণ ছিল। কিছুতেই ঘর ভাল ক'রে পরিষ্কার করতে দিতেন না। তা দিচ্ছি পরিষ্কার ক'রে।

কিছুক্ষণ পর সে মেসের ঝাড়ুদারণীকে সঙ্গে করিয়া ঘরে আসিয়া তাহাকে বলিল, এক টুকরো কাগজ যেন না প'ড়ে থাকে। ভাল ক'রে পরিষ্কার ক'রে দাও।

শিবনাথ স্তম্ভিত বিস্ময়ে মেয়েটির দিকে চাহিয়া ছিল। এ কে? এ যে সেই নিরুদ্দিষ্টা ডোমবউ! শরীর তাহার সুস্থ সবল, শহরের জল-হাওয়ায় বর্ণশ্রী উজ্জ্বল, কলিকাতার জমাদারণীদের মত তাহার গায়ে পরিষ্কার জামা, সৌষ্ঠবযুক্ত শাড়িখানি ফের দিয়া আঁটসাঁট করিয়া পরা, তাহাকে আর সেই ডোমবধূ বলিয়া চেনা যায় না, তবুও শিবনাথের ভুল হইল না, প্রথম দৃষ্টিতেই তাহাকে চিনিয়া ফেলিল।

মেয়েটিও তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রথমটা বিস্ময়ে যেন হতবাক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য, পরমুহূর্তেই তাহার মুখখানি যেন দীপালোকের মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, মুখ ভরিয়া হাসিয়া সে পরম ব্যগ্রতাভরে সম্ভাষণ করিল, বাবু! জামাইবাবু! সঙ্গে সঙ্গে হাতের ঝাঁটাটা সেইখানে ফেলিয়া দিয়া সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

ক্রমশ

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ'

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সে যাহা হউক, আমরা এই স্থলে উভয় কবির নির্লজ্জতার কিঞ্চিৎ২ তুলনা করি, যথা।

সুন্দরের উক্তি।

-সুন্দরীর করে ধরি, সুন্দর বিনয় করি,
কহে শুন শুন প্রাণেশ্বরি।
আজি দিনে দুপ্রহরে, দেখিলাম সরোবরে,
কমলিনী বাঁধিয়াছে করী॥
[২৬] গিরি অধোমুখে কাঁদে, এ কথা কহিতে চাঁদে,
কুমুদিনী উঠিল আকাশে।
সে রস দেখিতে শশী, ভূতলে পড়িল খসি,
খঞ্জন চকোর মিলে হাসে॥"

অন্য মর্ম্ম।

"রায় বলে আমি করী, তুমি কমলিনীশ্বরী,
বাঁধহ মৃণাল ভুজপাশে।
আমি চাঁদ পড়ি ভুমি, ফুল্ল কুমুদিনী তুমি,
উঠ মোর হৃদয় আকাশে॥
নয়ন খঞ্জন মোর, নয়ন চকোর তোর,
দুহে মিলে হাসিবে এখনি।
ঘাম হলে কুচগিরি, কাঁদিবেক ধীরি ধীরি,
করি দেখ বুঝিবে তখনি॥

বীনসের উক্তি।

"Fondling," she saith, "since I have hemm'd thee here
[২৭] Within the circuit of this ivory pale,
I'll be a park, and thou shalt be my deer ;
Feed where thou wilt, on mountain or in dale :
Graze on my lips ; and if those hills be dry,
Stray lower, where the pleasant fountains lie.

"Within this limit is relief enough,
Sweet bottom-grass, and high delightful plain,
Round rising hillocks, brakes obscure and rough,
To shelter thee from tempest and from rain :
Then be my deer, since I am such a park ;
No dog shall rouse the, though a thousand bark."

[২৮]

অস্থার্থ।

গজদন্ত সম, ভাতি অনুপম, দুই বাহু বেড়া প্রায়।
আদরে তোমারে, চারু মৃগাগারে, বন্ধ করিয়াছি তায়॥
আমি মৃগালয়, তুমি রসময়, কুরঙ্গ স্বরূপ ধর।
শেখরে গহ্বরে, যথা ইচ্ছা করে, ওষ্ঠ গিরিপরে চর॥
যদি ওষ্ঠাধর, যুগ্ম গিরিবর, রসশূন্য হয় তায়।
তবে অনুরাগে, গেলে নিম্নভাগে, পাবে সুখ কুহারায়॥
এই সীমা মাত্র, ওহে রসরাজ, বিশ্রামের দ্রব্য ভান।
আছয়ে প্রচুর, তৃণ সুমধুর, সুখপ্রদ উচ্চ স্থান॥
উন্নত বর্ত্তুল, গিরি স্থূল স্থূল, জঙ্গল তিমিরাবৃত।
ধারা বরিষণে, ঝড় প্রবহনে, রবে তথা লুক্কায়িত॥
প্রিয় বাক্য ধর, হও মৃগবর, আমা সম মৃগাগারে।
সহস্র কুকুরে, যদি বা ফুকুরে, তব কি করিতে পারে॥

রসতৃষ্ণাতুর মত্ত মাতঙ্গবৎ সুন্দরের আকর্ষণে অবিকচ পঙ্কজিনী বিদ্যা কহিয়াছিলেন,

"ক্ষম হে পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে।
[২৯] নব যৌবন বিক্রম * যোগ্য নহে॥
রস লাভ হবে রহিয়া ফুটিলে।
বল কি হইবে কলিকা দলিলে॥
রস না হইবে করিলে রগড়া।
অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া॥

ইউরোপীয়দিগের কাম দেবতার জননী প্রফুল্ল চির যৌবনবতী লীলারসবিহ্বলা বীনসের দ্বারা অজ্ঞাত-যৌবন এডোনিস্ আলিঙ্গিত হইয়া কহিতেছেন, যথা।

"Who wears a garment shapeless and unfinish'd?
Who plucks the bud before one leaf put forth?
If springing things be any jot diminish'd,
[৩০] They wither in their prime, prove nothing worth:
The colt that's back'd and burden'd being young
Loseth his pride, and never waxeth strong."

And again,—

"No fisher but the ungrown fry forbears:
The mellow plum doth fall, the green sticks fast,
Or being early pluck'd is sour to the taste."

অস্যার্থ।

অঙ্গহীন অপ্রস্তুত বস্ত্র কেবা পরে
অস্ফুট কুসুম কলী কে চয়ন করে॥

---

* মূল গ্রন্থে "জোরের" ইতি শব্দ আছে, কিন্তু তাহাতে ছন্দপতন দোষ হয় এই জন্য আমি "বিক্রম" শব্দ প্রয়োগ করিলাম।

কোন দ্রব্য পায় যদি অঙ্কুরে আঘাত।
শুখায় কোমল কালে, আশায় ব্যাঘাত।
শিশুকালে অশ্ব যদি বহে গুরু ভার।
বল বীর্য্যবান্ কভু নাহি হয় আর।

[৩১] অন্যচ্চ।

শিশু মীন ধরে নাকো ধীবর সকলে।
পাক! কুল আপনি খসিয়া পড়ে তলে।
দৃঢ়রূপে লগ্ন ডালে অপক্ক বদরী।
আস্বাদনে অম্ল লাগে যদি ছিন্ন করি।

আমারদিগের অসভ্য কবি ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন।

ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে।
রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে।
বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে।
রসিয়া পশিল ভ্রমরা কমলে।

ইংরাজদিগের সুসভ্য কবি শেক্ষপিয়র কহিতেছেন।

What wax so frozen but dissolves with tempering,
And yields at last to every light impression?
Things out of hope are compass'd oft with venturing,
[৩২] Chiefly in love, whose leave exceeds commission:

অস্যার্থ।

কঠিন জমাট মোম গলালে গলিবে।
ছোঁবামাত্র তাই হবে যেরূপ গঠিবে।
অসাধ্য সাধন হয় করিলে সাহস।
বিশেষতঃ প্রেমে, যার বিদায়েতে রস।

এই ক্ষণে ভারতচন্দ্রের একটি প্রভাতী এবং শেক্সপিয়রের একটি সাঁজাই গাইয়া এই নির্লজ্জতার প্রস্তাব সাঙ্গ করি, যথা।

বিদ্যাসুন্দরের প্রভাতী।

আসি বলি বাসায় বিদায় হৈল রায়
কুমুদ মুদিল আঁখি চন্দ্র অস্ত যায়।
বিদ্যা বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ।
পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান
ও নয়ন চকোর ও মুখ সুধাকর।
না দেখে কেমনে রব এ চারি প্রহর।
[৩৩] বিরহদহনদাহে যদি রহে প্রাণ।
রজনীতে করিব ও মুখ সুধাপান।

বীনস্ এবং এডোনিসের সাঁজাই।

এডোনিসের উক্তি।

"Look, the world's comforter, with weary gait,
His day's hot task hath ended in the west;
The owl, night's herald, shrieks, 't is very late;
The sheep are gone to fold, birds to their nest;
The coal-black clouds that shadow heaven's light
Do summon us to part, and bid good night."

অস্যার্থ।

দেখ, জগতের সুখদাতা দিনপতি।
শ্রান্ত হয়ে পশ্চিমেতে করিতেছে গতি।
নিশাচর নিশাচর ডাকে, দিবা শেষ।
বিহঙ্গ বাসায় যায়, গোষ্ঠ ভেজে মেষ।

আকাশের আলো ঢাকে ঘনাসিত ঘন।
বিদায় হইতে তারা কহিছে বচন।

বীনসের উক্তি।

"Sweet boy," she says, "this night I 'll waste in sorrow,
For my sick heart commands mine eyes to watch.
Tell me, Love's master, shall we meet to-morrow?
Say, shall we? shall we? wilt thou make the match?"

অন্যার্থ।

প্রিয় কিশোর, এ যামিনী মোর, যাতনায় গত হবে।
রোগী মম মন, প্রহরী নয়ন, কাযেই জাগিয়ে রবে।
বল প্রাণনাথ, হইলে প্রভাত, দেখা হবে পুনরায়।
হবে সন্দর্শন, সুখদ মিলন, কিম্বা যাবে বৃথায়।

এই ক্ষণে আমি আপনারদিগের সম্মুখে এক বাক্স [৩৫] রিয়েল লণ্ডন বেকেড্ স্থইট্‌মীট্ এবং এক খুঞ্চে আসল কৃষ্ণনগুরে সরভাজা উপস্থিত করিলাম, আপনারদিগের অভিরুচি, যাঁহার যাহাতে ইচ্ছা, তিনি তাহাই গ্রহণ করুন, কিন্তু এই কথা যেন মনে থাকে, বিলাতী মেঠাই হজম করিতে ভাল কাষ্টিলিয়ন লাল জলের আবশ্যক, সরভাজা পাকে নির্ম্মল খড়িয়া নদীর এক পাত্র জলই যথেষ্ট হইবেক।

প্রিয় প্রতিযোগী যগুপি কহেন, ইংলণ্ডীয় কবিতা বৃদ্ধাকালে তপস্বিনী অর্থাৎ সদাচারশালিনী হইয়াছেন, কিন্তু এ কথা সপ্রমাণ হইবার নহে; আমরা যেমন ব্যাস বাল্মীকির পর কালিদাসকে মহাকবি বলিয়া মানি, ইংরাজেরাও সেইরূপ শেক্সপিয়র মিল্টনের পর লার্ড বাইরণকে মান্য করিয়া থাকেন, কিন্তু লার্ড বাহাদুরের লিখিত ডন্ জুয়ান্ কাব্যের

কিয়দংশ পাঠ করিলেই ইংরাজী কবিতার বিলক্ষণ সাধ্বীত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—কৈলাস বাবু কহিতে পারেন, ইংরাজী কবিতায় যেমন অধমতা আছে, তেমন উত্তমতাও সমধিক আছে, সত্য কথা, এ কথা লঙ্ঘন [৩৬] করিতে কে পারে? ফলে বাঙ্গালা কবিতায় অপকৃষ্টতা ব্যতীত উৎকৃষ্টতার অভাব বলিয়াই কি তাহা কোন কালে উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হইবেক না? যদি বালুকানির্ম্মিত সেতু দ্বারা স্রোতস্বতীর স্রোতঃ রুদ্ধ হয়, যদি নবীন নিবিড় নীরদ কর্তৃক দিনকরের খরতর কর প্রচ্ছন্ন হয়, যদি মণিময় পেটিকায় বদ্ধ বিধায় মৃগনাভীর মনোহর সৌরভ স্থগিত হয়; তবেই জানিব এবং মানিব, দৈবানুগ্রহরূপ কবিতাশক্তি পরাধীনতাশৃঙ্খলে জড়িতা হইয়া স্বীয় প্রভা প্রকাশে অক্ষম হইবেক।

বসু বাবু বিদ্যার রূপ বর্ণনের কিয়দংশ পাঠ ও তদনুবাদ করিয়া গত সভায় অতীব রহস্য রসোদ্দীপন করিয়াছিলেন, অতএব এই স্থলে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিদুল্লেখ করা কর্ত্তব্য; প্রতিযোগী অঙ্গহীনা বঙ্গভাষার যথার্থ ভঙ্গী অবগত আছেন কি না, সন্দেহস্থল; কিন্তু অনায়াসে বীর-সিংহবালা বিদ্যা বিনোদিনীর রূপ বর্ণনা পাঠ করিয়া তাঁহাকে ভয়ঙ্করী নিশাচরী ভাবিয়া থর থর কম্পিত কলেবর হইয়াছিলেন,—এই [৩৭] ক্ষণে উক্ত নিন্দিত বর্ণনার আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, যথা "নব নাগরী নাগর মোহিনী। রূপ নিরুপম সোহিনী॥ শারদ পার্ব্বণ, শীধু ধরানন, পঙ্কজ কানন মোদিনী। কুঞ্জরগামিনী, কুঞ্জবিলাসিনী, লোচন খঞ্জনগঞ্জিনী॥ কোকিলনাদিনী, গীঃপরিবাদিনী, স্ত্রীপরিবাদবিধায়িনী। ভারতমানস, মানস সারস, রাসবিনোদবিনোদিনী॥"—কৈলাস বাবু এই কতিপয় পংক্তির দোষ ধরিবেন, যদি ধরিতে পারেন, তবে আমি তদপেক্ষা ইংরাজ কবিদিগের অধিক দোষ দেখাইয়া দিব। অপিচ

'বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥" বিপক্ষ মহাশয় কহিয়াছিলেন, কেশের সহিত সর্পের তুলনা অতি ভয়ানক, তবেই বলিতে হইল, তিনি বেণী শব্দের অর্থাবগত নহেন, হিন্দু কামিনীগণ কালসর্পাকারে বিনোদ বেণী বিনাইয়া থাকেন, প্রিয় সখা কি তাহা দেখেন নাই. অহো দেখিয়াছেন বই কি? তবে বুঝি ইংরাজী [৩৮] বিদ্যাপ্রভাবে তেঁহ খাট খাট রাঙ্গা চুলের প্রিয় হইয়া থাকিবেন। "কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥" কৈলাস বাবু এই অত্যুক্তি ধরিয়া বিস্তর উপহাস করিয়াছিলেন, এবং শেক্সপিয়রের রোমীয় নায়কের জুলিয়েট্ নায়িকার রূপ বর্ণনায় অত্যুক্তি বিধানকল্পে কহিয়াছিলেন, প্রেমিকের মুখে প্রিয়তমার রূপ বর্ণনায় অত্যুক্তিপ্রয়োগ দোষাবহ না হইয়া গুণভাজন হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উক্ত মহাকবি স্বীয় উক্তিতে লুক্রিশিয়ার পয়োধরের সহিত দন্তিদন্তনির্ম্মিত যুগল ভূগোলের তুলনা করিয়া যদ্যপি নিস্তার পান, তবে অভাগা ভারতচন্দ্র কি জন্য এত গালাগালি খান? প্রেমিকের মুখে অত্যুক্তি রসদায়িকা বটে, কিন্তু নায়ক নায়িকাদিগের সহায়স্থলীস্বরূপা দূতীর মুখে তদুভয়ের রূপ গুণ বর্ণনায় অত্যুক্তি প্রয়োগ কোন মতেই অসঙ্গত নহে। সে যাহা হউক, ধরাস্থিত বিবিধ জাতির রূপানুভাবকতা শক্তি বিভিন্ন প্রকার, ভারতবর্ষে কটা চক্ষু, কটা কেশ এবং বরফের ন্যায় শ্বেতবর্ণ নিন্দনীয়, কিন্তু [৩৯] ইউরোপীয়দিগের নিকট তত্তাবৎ আদরণীয়, চীনদেশীয় লোকেরা অঙ্গুলের ন্যায় পদ এবং কুঁচের ন্যায় চক্ষু সুদৃশ্য জ্ঞান করে বলিয়া তাহারদিগের সৌন্দর্য্যানুভাবকতা শক্তি অপকৃষ্টতর বলা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বায়রণের কবিত্ব অতি সুন্দর অলঙ্কার এবং যথার্থ মানসিক ভাবসমন্বিত বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু তদ্‌গ্রন্থের উপমা সকল অধিকাংশই

আমারদিগের নিকটে অতি জঘন্যতর বোধ হয়; সলোমন অর্থাৎ যাহাকে মুসলমানেরা স্থলেমান কহে, সেই মহাপুরুষের টপ্পা গীতাবলী যাহাকে খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর পরস্পর প্রেম প্রকাশ বলিয়া উল্লেখ করেন, ফলে চোর কবি-রচিত পঞ্চাশৎ শ্লোকের মধ্যে যেরূপ দ্ব্যর্থ অর্থাৎ একার্থ কা‍ন্‍লী পক্ষে, অন্যার্থ বিদ্যা পক্ষে হয়, স্থলেমানের টপ্পাতে তদ্রূপ দ্ব্যর্থ অন্বেষণ করা ব্যর্থ, এবং যদিও কোন২ স্থলে তাহা ঘটাইতে পারা যায়, তাহা কষ্টকল্পনা মাত্র; ইংরাজী উদ্ধৃত করা বাহুল্য হয়, এজন্য আমি বাঙ্গালা অনুবাদ কিঞ্চিৎ গ্রহণ [৪০] করিলাম, শ্রোতৃবর্গ বিবেচনা করুন, খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মপুস্তকে কিরূপ কবিতাশক্তি মূর্ত্তিমতী আছেন, যথা।—

"হে আমার প্রিয়ে, তুমি স্থন্দরী ও তুমি পরম স্থন্দরী; ঘোমটার মধ্যে তোমার চক্ষু কপোতের চক্ষুর ন্যায়, এবং গিলিয়দের পার্শ্বে চরে এমত ছাগপালের ন্যায় তোমার কেশ। এবং যে২ মেষী পুষ্করিণী হইতে ধৌতা হইয়া আগতা ও যমজবৎসবিশিষ্টা হয় এবং যাহাদের মধ্যে একও বন্ধ্যা নাই, এমত ছিন্নলোম মেষপালের ন্যায় তোমার দন্ত। এবং সিন্দূরবর্ণ স্থত্রের ন্যায় তোমার ওষ্ঠাধর, ও তোমার বাক্য অতি মনোহর, ও তোমার ঘোমটার মধ্যস্থিত গণ্ডদেশ দাড়িম্বখণ্ডের ন্যায়। এবং অস্ত্রাগারের নিমিত্তে নির্ম্মিত এক সহস্র বলবানের ঢালবিশিষ্ট দায়ুদের দুর্গের ন্যায় তোমার গলদেশ। এবং শোশন্ পুষ্পের মধ্যে ভক্ষণকারী মৃগের দুই যমজ বৎসের ন্যায় তোমার দুই স্তন। * * * *

"হে রাজকন্যে, তোমার চরণপাদুকাদ্বারা কিবা শোভা [৪১] পাইতেছে! তোমার কটিমণ্ডল নিপুণ কর্ম্মকারদ্বারা নির্ম্মিত মণিময় হারস্বরূপ। এবং তোমার নাভিদেশ মিশ্রিত দ্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ এক গোল পাত্রের ন্যায়, এবং তোমার উদর শোশন্‌পুষ্পবেষ্টিত গোধূমরাশির

ন্যায়। এবং তোমার স্তনদ্বয় যুগলহরিণবৎসের ন্যায়। এবং তোমার গলদেশ হস্তিদন্তময় উচ্চগৃহের ন্যায়। এবং তোমার চক্ষু বৈৎরব্বীমের দ্বারের নিকটস্থ হিশ্‌বোণের সরোবরের ন্যায়, এবং তোমার নাসিকা দম্মেষকের সম্মুখস্থ লিবানোনের উচ্চগৃহের ন্যায়। এবং তোমার মস্তক কর্ম্মিল্‌ পর্ব্বতের ন্যায়, ও তোমার মস্তকের বেণী বাগুণীয়া রঙ্গের কেশবন্ধনীর ন্যায়। তোমার কেশবেশেতে রাজা বদ্ধ আছে।"

"হে প্রিয়ে, তুমি প্রেমদ্বারা সন্তোষ দিবার জন্যে কেমন সুন্দরী ও মনোহারিণী! তোমার দীর্ঘতা তালবৃক্ষের ন্যায়, ও তোমার স্তন তাহার ফলস্বরূপ। আমি কহিলাম, আমি তালবৃক্ষে আরোহণ করিব ও তাহার বাগুড়া ধরিব; এখন তোমার স্তন দ্রাক্ষাফলের গুচ্ছস্বরূপ ও তোমার নাসিকার গন্ধ তপুহ [৪২] ফলের ন্যায়। যে উত্তম দ্রাক্ষারস পান করা প্রিয়ের সুখদায়ক হয় ও তন্দ্রাযুক্ত লোককে কথা কহায়, তাহার ন্যায় তোমার কথা"—এই পর্য্যন্তই ভাল, আর কায নাই।

অনেকে কহেন, রায় গুণাকর অনেক স্থানে ভাব চুরি করিয়াছেন, কিন্তু ভিন্ন২ জাতীয় আদি কবিগণ ব্যতীত এই দোষ কোন কবিতে দৃশ্যমান না হয়, মহাকবি বারজিলের এবং মিণ্টনের কি এই দোষ নাই ? ভারতচন্দ্র রায় মূর্খ কবি ছিলেন না, তিনি আপনিই স্থানে২ পরিচয় দিয়াছেন, সংস্কৃত এবং পারস্য শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, ফলতঃ সামান্য ধনচোরদিগের ন্যায় ভাবচোরদিগেরও সতর্কতা এবং কৌশলের আবশ্যকতা আছে, অপিচ এমত সকল প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে, মূল অপেক্ষা অনুবাদে অধিকতর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের প্রাবল্য হইয়াছে, অন্যে পরে কা কথা, ভারতচন্দ্র রায় কাশীদাসের মহাভারত হইতেও অনেক ললিত পদাবলী অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, আমি ভারত[৪৩]চন্দ্রের দোষের কথাই কহিয়া যাইতেছি, কিন্তু তিনি

যে প্রকৃত দৈবশক্তিমান্ কবি ছিলেন, তৎপ্রমাণে আমরা কিছুই কহিলাম না; অতএব তাদ্বিষয়ে কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে, যথার্থ কবির চিহ্ন যথার্থ বর্ণন অর্থাৎ কবি যে বিষয়ে বর্ণনা করিবেন, সে বিষয় পাঠ করিতে২ বোধ হইবেক, যেন তাহা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হইতেছে, "Thoughts that breathe and words that burn" ভারতচন্দ্র রায়ের গাথায় শ্বাস প্রবহন এবং ভাবজালে অনল প্রভবন হইয়াছে কি না, তাহা রতিবিলাপ এবং বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ প্রথম মিলনের পূর্ব্বাবস্থা পাঠ করিলেই প্রমাণীকৃত হইবেক, আমারদিগের ইয়ং বেঙ্গাল বাবুরা যদি বিলাতীয় বিজাতীয় কুসংস্কার এবং দ্বেষ মৎসরতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত বর্ণনা সকল পাঠ করেন, তবে তত্তাবতে লার্ড বাইরণের ন্যায় প্রখর ভাবসমূহ দেখিতে পাইবেন। কবিকঙ্কণের ন্যায় ভারতচন্দ্র রায় যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময়ের প্রচলিত দেশাচার প্রভৃতি যথার্থরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার [৪৪] কাব্য সকলের বয়ঃক্রম অদ্য একশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তথাচ এই শতাব্দের মধ্যে অস্মদ্দেশের আচার ব্যবহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা মনে করিলে নয়নপথে অশ্রুধারার শেষ হয় না! ভারতের শব্দসৌন্দর্য্য ভাবের মাধুর্য্য এবং রসের প্রাচুর্য্য ও প্রাখর্য্যের কথা অধিক কি বর্ণনা করিব, বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ সুমিষ্ট রচনা অদ্যাবধি আর দ্বিতীয় হয় নাই, ভারতের পদ্য পংক্তি পাঠকালীন বোধ হয়, যেন মধুকরনিকরের ঝঙ্কার হইতেছে, রায় গুণাকর বাঙ্গালা ছন্দে সন্তুষ্ট না হইয়া স্থানে২ ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূনক, তোটক প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ ঋণ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু অপার্য্যমানে স্থানে২ ছন্দপতন দোষ হইয়াছে, সংস্কৃত ছন্দাবলীর যতি অর্থাৎ বর্ণের লঘুত্ব গুরুত্ব রাখিয়া অন্য ভাষায় কবিতা রচনা করা অতি কঠিন কর্ম্ম,— ভারতচন্দ্রের বিষয়ে এতাবন্মাত্র উক্তি করিয়া অন্যান্য কবিদিগের প্রতি কিয়দুক্তি করিয়া প্রস্তাব সাঙ্গ করি।

উল্লেখিত প্রসিদ্ধ২ বাঙ্গালি কবি ব্যতীত বাঙ্গালা [৪৫] দেশে শতাবধি ব্যক্তি কবিত্বপ্রকাশে চেষ্টা করিয়াছেন, এতাবন্মধ্যে রামপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ, রামচন্দ্র, রামেশ্বর, এবং দেওয়ান রঘুনাথ রায়, রাজা রামমোহন রায়, নিধুবাবু, রামবসু ও রাধামোহন সেন, তথা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনুরাগ পাইয়াছেন, রামপ্রসাদ প্রকৃত কবির অনেক চিহ্ন দর্শাইয়াছেন, তৎকৃত গীতাবলীতে পৌত্তলিক তান্ত্রিক কল্পনা সকল কল্পিত হইয়াছে, তথাপি তাহা কবিত্বশূন্য নহে, যেহেতু কল্পনাই কবিতার জীবনস্বরূপ হইয়াছে, তন্ত্রের কোন২ কল্পনা সুচারুতর রূপক ব্যতীত আর কিছুই নহে, বিশেষতঃ রামপ্রসাদী পদের স্থানে২ এরূপ বলবতী ভাষায় মনের কথা সকল কথিত হইয়াছে, কোথায় এপ্রকার সদুপদেশ সকল প্রদত্ত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা তাঁহার দৈবশক্তির প্রতি কোন সন্দেহই থাকে না, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর যদিও ভারতের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় সুন্দরতর না হউক, ফলতঃ পঠনীয় বটে, তদ্ব্যতীত কালীকীর্ত্তনে তিনি বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্গাপ্রসাদের গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী কবিতারসের তরঙ্গিণী বটেন, কিন্তু সে [৪৬] তরঙ্গিণী সুরতরঙ্গিণীর ন্যায় প্রবলা না হইয়া ক্ষুদ্র এক নির্ঝরপ্রভূতা সুনির্ম্মলজলধারিণী কুলু২ শব্দকারিণী তটিনীর ন্যায় প্রবাহিত আছে; রামচন্দ্র এবং রামেশ্বরের কবিতা তেজস্বী জাঙ্গল লতার ন্যায়। দেওয়ান রঘুনাথ রায় অর্থাৎ যিনি অকিঞ্চন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহার গীতাবলীর মধ্যে কোন২ গীত এরূপ অনুতাপ ভাবোদ্দীপক এবং ঔদাস্য-জনক যে, কালী এবং তারা শব্দের পরিবর্ত্তে খ্রীষ্ট কিম্বা খোদা শব্দ প্রয়োগ করিয়া খ্রীষ্টানেরা ও মুসলমানেরা স্বচ্ছন্দে গান করিতে পারেন, দেওয়ান মহাশয় স্বয়ং গায়ক এবং গীতশাস্ত্রে পরিপক্ক ছিলেন, সুতরাং স্বরানুমেলকতাগুণে সুনিপুণ ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের কৃত

কতিপয় পরমার্থসংগীতে কবিত্বলক্ষণ ঈক্ষণ করা যায়, রাজা মহাত্মা কবিতার প্রতি মনোযোগ করিলে বাঙ্গালা ভাষার অনেক গণ্য কবি হইতেন, কিন্তু তিনি পদ্যলেখক হইলে আমরা তাঁহার নিকটে যে উপকার প্রাপ্ত হইতাম, তিনি গৌড়ীয় ভাষার আদি গদ্যলেখক এবং স্বদেশীয় লোকের চরিত্রসংশোধক হওয়াতে আমরা তদপেক্ষা সহস্রগুণ উপকার প্রাপ্ত [৪৭] হইয়াছি। রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধুবাবুর প্রেমরসের সংগীত সকল অধিকাংশই অপহৃতভাবে সংকলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ ব্যাকরণ-দোষও আছে, কিন্তু কোন২ টপ্পা এরূপ স্বভাবিপূর্ণ যে, তাহাতে বিশেষ কবিত্ব প্রকাশও পাইয়াছে, নিধুবাবুর ভাষা. সহজ প্রকার হওয়াতে তিনি অধিকাংশ লোকের প্রিয় হইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যা দেবী প্রকীর্ণ প্রভায় উদিতা হইলে তাঁহার আদর সমভাবে থাকা কঠিন হইয়া উঠিবেক; রামবসুর বিরহ কবিতায় এরূপ সুরস আছে যে, অনবরত শ্রবণপথে তাহা পান করিলেও তৃষা কৃশা হয় না। রাধা-মোহন সেন সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার কবিতা অথবা গীতে ছন্দ অলংকার অথবা ব্যাকরণের দোষ দৃষ্ট হয় না, তাহার সঙ্গীত সকল অধিকাংশই সংস্কৃত শ্লোক বা কবিতার অনুবাদ মাত্র। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কুকবি নহেন, সুকবিও নহেন, তদ্বিরচিত বাবুবিলাস বিবিবিলাস দূতীবিলাস গ্রন্থে ইয়ং বেঙ্গাল ওল্ড বেঙ্গালের যথার্থ চিত্র বিচিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার লেখাও প্রাচীন হইয়া পড়িল, [৪৮] যেহেতু. তাঁহার জীবদ্দশাতেই কলিকাতার ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে, ধর্ম্মসভার গয়া গঙ্গা লাভ হইয়াছে, সভ্যতা এবং স্বাধীনতার পথ পরিমুক্ত হইয়া আসিতেছে, এই ক্ষণে আর গোবর ভক্ষণ, হুঁকা বারণ, বিষ্ণু স্মরণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের প্রথা প্রসিদ্ধ নহে, হিন্দু সন্তানগণ এবং স্বধর্ম্মত্যাগী খ্রীষ্টানেরা একাসনে উপবেশনপূর্ব্বক

দেশের মঙ্গলামঙ্গল বিষয় বিবেচনা করিতেছেন; অতএব কি আহ্লাদ! কি আহ্লাদ! এরূপ কাহার মনে ছিল যে, কলিকাতার স্বদেশীয় বিদেশীয় বিদ্বান্ লোকেরা একত্রে বসিয়া বাঙ্গালা কবিতার বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন? অতএব হে সভাস্থ মহোদয়গণ, হে দেশীয় ভ্রাতৃবর্গ, হে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা কবিতার বন্ধুবর্গ, আপনারা আর কালবিলম্ব করিবেন না, বাঙ্গালা কবিতা-হার যাহাতে সভাকণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হয়েন, এমত উদ্যোগ করুন, উর্ব্বরা ভূমি আছে, বীজ আছে, উপায় আছে, কেবল কৃষকের আবশ্যক, অতএব গাত্রোত্থান করুন, উৎসাহসলিল সেচন করুন, পরিশ্রমরূপ হল চালনা করুন, [৪৯] দ্বেষ প্রভৃতি জাঙ্গল কণ্টকবৃক্ষ উৎপাটন করুন, তবে ত্বরায় সুশস্যলাভ হইবেক, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! আপনারদিগের মধ্যে অনেকে অনায়াসে প্রাপ্য স্বদেশীয় শস্যকে ঘৃণা করিয়া বিলাতী ফসল ফলাইতে যান, অথচ বিবেচনা করেন না, যেরূপ বকুলবৃক্ষে আম্রমুকুল উদয় হয় না, সেইরূপ বাঙ্গালি কর্ত্তৃক ইংরাজী কবিতা অথবা ইংরাজ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা কবিতা রচনা অসম্ভব হয়, যদি বলেন—বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত এবং রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি বাবুরা যে সকল ইংরাজী কবিতা রচনা করিয়াছেন, সে সকল কবিতা কি কবিতা হয় নাই? উত্তর—হইয়াছে, হইবেক না কেন, অশ্বতর শব্দের অগ্রে কি অশ্ব শব্দ যোজিত নাই? উক্ত বাবুরা ইংরাজী কবিতা রচনা কল্পে যেরূপ আয়াস, যেরূপ পরিশ্রম এবং যেরূপ আকুঞ্চনের দাসত্ব করিয়াছেন, বাঙ্গালা কবিতা রচনায় যদ্যপি সেইরূপ আয়াস, সেরূপ পরিশ্রম এবং সেইরূপ আকুঞ্চন অথবা তাহার কিয়দংশের অনুবর্ত্তী হইতেন, তবে তাঁহারা গণ্যমান্য বাঙ্গালি কবি হইতে পারি-[৫০]তেন, এবং তাহা হইলে কত বড় আস্পর্দ্ধার বিষয় হইত? অদ্যতনী সভায় আমার এই এক পরম ক্ষোভের বিষয়

যে, প্রতিযোগীদিগের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে প্রস্তাববাহুল্য হইল, অতএব বাঙ্গালা কবিতার স্বরূপ বর্ণনা এবং ছন্দ প্রভৃতি বিষয়ে কোন উক্তি করিতে পারিলাম না, পুস্তকান্তরে এই ক্ষোভ নিবারণ করণের ইচ্ছা আছে। বাবু নবীনচন্দ্র পালিত গত সভায় বর্ত্তমান বাঙ্গালি কবিদিগের বিষয়ে যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আমার অধিক বক্তব্য নাই, যেহেতু যথার্থ কথা কহিলে বন্ধুবিচ্ছেদ হওনের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু একথা অবশ্যই বলিব, মনুষ্য বড় বিদ্বান্ হইলেই যদ্যপি বড় কবি হইতেন, তবে শেক্সপিয়র অপেক্ষা বেন্ জন্সন এবং কালিদাস অপেক্ষা বররুচি শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেন; পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার কাব্যশাস্ত্রের পয়োধিবিশেষ এবং প্রকৃত কবিত্ব অনেক লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু অস্মদ্ ক্ষুদ্র বিবেচনায় বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তদপেক্ষা অধিকতর কবিতাশক্তি ধারণ করেন, [৫১] বোধ করি ঈশ্বর বাবু বিদ্যা বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হইলে নবীন বাবু তাঁহাকেই অগ্রগণ্য করিতেন। অক্ষয় বাবুর কাব্যগ্রন্থ আমি দেখি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি, তেঁহ উক্ত কাব্যের জনকত্ব স্বীকারে অধুনা লজ্জিত হয়েন।

আমরা অদ্য যে মহাত্মার নামে প্রতিষ্ঠিত সভায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, সেই মহাত্মা বাঙ্গালা কবিতার একজন বিশেষ বান্ধব ছিলেন, তিনি মৃত্যুর কিয়ৎ মাস পূর্ব্বে এ অকিঞ্চনের প্রতি এবং অন্য এক বন্ধুকে এই বিষয় সম্পাদনার্থ স্বতন্ত্র রূপে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এই ক্ষণে কে আমারদিগকে উৎসাহ দিবেক? অতএব যে মহাশয় বাঙ্গালা দেশের, বাঙ্গালা ভাষার এবং বাঙ্গালা কবিতার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন, সেই মহাত্মা জন, এলিয়েট, ড্রিঙ্কওয়াটর বীটন ঈশ্বরসমীপে অনন্ত নির্ম্মলানন্দ সম্ভোগ করুন, এবং তাঁহার নাম ঘোষক, তাহার মত পোষক, সজ্জনমনস্তোষক এই বীটন সমাজ চন্দ্রাদিত্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকুক, ইহাই আমারদিগের ঐকান্তিকী প্রার্থনা।

সমাপ্ত।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে

হে বন্ধু, কল্পনা করি, শিশুকৃষ্ণ যশোদার কোলে,
বিগলিত স্নেহরস মার বুকে স্বতঃ উথলায় ;
দুয়ারে প্রতীক্ষা করে ক্রীড়াসঙ্গী গোপবালকেরা,
প্রাঙ্গণেতে ব্রজধেনু হানে ক্ষুর অধীর আগ্রহে,
গোঠের সময় হ'ল—প্রভাতেই গোধূলি-বিভ্রম !

বিমুগ্ধা জননী হেরে অকস্মাৎ শঙ্কিত বিস্ময়ে—
কোলের সন্তান তাঁর সঞ্জীবিত নিখিলের প্রেমে,
লক্ষ বাহু তার পানে স্নেহভরে নিত্যপ্রসারিত ।
হর্ষে মুদে আসে আঁখি, আনন্দাশ্রু ঝরে অবিরাম,
জননী কৃতার্থা—তাঁর একান্তই বুকের দুলাল—
তার মুখ চেয়ে আছে চরাচর পরম আগ্রহে ।

তোমারে বক্ষেতে পেয়ে ভাগ্যবতী মাতা বীরভূমি
নিভৃতে লালন করি সুগভীর সন্তান-সোহাগে—
অরণ্য কান্তার আর শস্যক্ষেত দিগন্তপ্রসারী
গুল্ম-নুড়ি-কঙ্করের লালমাটি ডাঙায় ডাঙায়
খোয়াই রচিয়া চলে ঝিরিঝিরি গিরি-নির্ঝরিণী,
উঠানে মরাই বাঁধা, লাউমাচা পালঙের ক্ষেত,
খড়ো কুটিরের গ্রাম—পুরাতন ইষ্টক-পঞ্জর,
ডোবায় বিস্মৃত-স্মৃতি অতীতের দীর্ঘিকা বিশাল,

শিবের দেউল কোথা, শ্মশানের দিগম্বরী দেবী,
শৃগালদেবতা আসে সুনির্দিষ্ট পূজার প্রহরে,
গ্রামশেষে হরিধ্বনি জেগে রহে চব্বিশ প্রহর,
বৈষ্ণবের আখড়ায় গ্রামান্তের বাউলেরা আসে।

পারে নি রাখিতে মাতা এরই মাঝে তোমারে ভুলায়ে,
দূরের ইসারা জাগে চোখে চোখে রাঙা কম্বলের,
টানিল অজানা পথ—ঘণ্টাধ্বনি বল্লমের শিরে
গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ছুটে চলে ডাকহরকরা,
নিশীথে পেচক ডাকে, হাঁকে [illegible] টহলদারের।
এদেরই ইঙ্গিতে বন্ধু, তোমারে টানিয়া নিল দূরে,
মুছে গেল রসকলি, নাগরদের জলসা-আসরে
ঘনায় জীবনরস বাঈজীর নূপুর নিক্বণে
সারেঙ্গীর সুরে সুরে টলমল কাচের গেলাসে।

মাধবী-যামিনী শেষ, ভেঙে গেল সুখের আসর,
চৈতালীর ধ্বনি জাগে অট্টহাসি কালবৈশাখীর,
ভাঙিল পাষাণপুরী—হে বন্ধু, সে ঝঞ্ঝার প্রহারে
তুমি বাহিরিলে পথে, পথ ও পথিক চিরন্তন,
আজ আছে কাল নাই, অপরূপ বেদের চাউনি,
গৈরিক সরণি শেষ সাপুড়ের বাঁশী বাজে দূরে।
হে বন্ধু, দেখেছ তুমি আগুন লেগেছে লোকালয়ে,
জ্বলিতেছে দাউ দাউ—দেবতা হাসিছে শান্ত হাসি,
নিরুদ্দেশ যাত্রা তব, মাতৃভূমি প্রতীক্ষা-ব্যাকুল।

পরিব্রাজকের ডায়েরি

কোলেদের দেশ

সিংহভূম জেলার একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। নিকটে একটি পার্ব্বত্য নদী, তাহারই কূলে নাকি এক অতি প্রাচীন কালে মানব বাস করিত। তখনও ধাতুর আবিষ্কার হয় নাই, পাথরের অস্ত্রশস্ত্র দিয়াই মানুষ নিজের সব কাজ চালাইত। সেই যুগের কিছু অস্ত্র এ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে শুনিয়া এখানে অনুসন্ধানের জন্য আসিয়াছি। সকাল হইতে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া দুইখানি চমৎকার কুঠার খুঁজিয়া পাইয়াছি, নীল কঠিন পাথরে তৈয়ারি, কি তাহার ধার, কি সুন্দর গড়ন!

সেই যুগের মানুষের কথা ভাবিতেছি। শুধু কুঠার কেন? ইহারা কি কেবল যুদ্ধই করিত? পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ইহাদের ছিল না? না, তাহা হয় না। হয়তো চাষবাসের যন্ত্রগুলি তাহারা কাঠের দ্বারা নির্ম্মাণ করিত, এখনও পৃথিবীর কোন কোন জাতি তাহা করিয়া থাকে। হয়তো পাথরের কুঠারগুলি অন্য কোনও উপায়ে ব্যবহার হইত, যাহা আমাদের এখন জানা নাই। যাক, বৃথা কল্পনা করিয়া লাভ নাই। এই রকম পাথরের অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে কত পরিশ্রম লাগে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।

নিকটে নদীর জল কলকলস্রোতে বহিয়া যাইতেছিল। দূরে অনাবৃত দেহে কয়েকজন কোল-রমণী স্নান করিতেছিল, কেহ বা পিতলের কলস মাটি দিয়া মাজিতে বসিয়াছিল। যাহারা স্নান করিতেছিল, তাহারা অনাবৃত দেহের আনন্দে হাসিতেছিল। আর দুইজন পরণের কাপড় পাথরের উপরে শুকাইতে দিয়াছিল। তাহাদের গায়ে শুধু ক্ষুদ্র কটিবস্ত্র ছিল বলিয়া পিছন ফিরিয়া কতক্ষণে কাপড় শুকায়, তাহারই

অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। জলে নামিয়া দুইখানি ভাল পাথর কুড়াইয়া ভাঙিতে বসিলাম। ঠক ঠক শব্দে ঠুকিয়া ঠুকিয়া যাহা গড়ি, তাহাকে কল্পনার সাহায্যেই বলিতে হয়, ইহা কুঠার, ইহা কোদাল। দেখিয়া বলে কাহার সাধ্য? তবু ছাড়িলাম না, ঠুকিতে ঠুকিতে মোটামুটি যখন একখানি অস্ত্রের মত পদার্থ গড়িয়া আনিয়াছি, তখন হঠাৎ শেষের আঘাতে তাহার অগ্রভাগ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। দুঃখ হইল বটে, কিন্তু প্রাচীন মানবের প্রতি আমার ভক্তি সহসা বাড়িয়া গেল। তাহাদের পরিপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর কুঠার তো আমার পাশেই রহিয়াছে! কতখানি পরিশ্রম, কত কৌশল এবং অভিজ্ঞতাই না ইহার পিছনে লুকাইয়া আছে! পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করিত বলিয়াই কি তাহারা অসভ্য? ধাতু ব্যবহার তখনও মানুষে শিখে নাই। কিন্তু যাহা জানিত, তাহার জন্য তো কম বুদ্ধি, কম অধ্যবসায় ব্যয় করে নাই!

অলস মধ্যাহ্নে এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম। দূরে মাঠ ধূ ধূ করিতেছিল। মাঘ মাসের শেষ, মাঠে আর ধান নাই, সব কাটা হইয়া গিয়াছে। কেবল নদীর পরপারে ক্ষুদ্র ক্ষেতে খেসারি ও ছোলার গাছ হইয়াছিল, সেখানে খড়ের সামান্য নীড় বাঁধিয়া একজন লোক পাহারা দিতেছিল। রাখাল-বালকেরা গরু-মহিষের পাল লইয়া জলের ধারে নামিয়া আসিতেছিল। তাহার মধ্যে একজন বাঁশের বাঁশীতে অতি সাধারণ একটি সুর বার বার সাধিতেছিল, সুরটির মিষ্টতার যেন আর শেষ নাই। নদীর ধারে কোথাও বা এক-আধটি কুলগাছ। কোল-রমণীগণ ইতস্তত জ্বালানি-কাঠ সংগ্রহ করিতে আসিয়া কুল পাড়িতে লাগিয়াছিল। একজন গাছ ধরিয়া নাড়া দেয়, পাঁচজনে তাহা কুড়াইয়া খায়। ইহারা বনের মধ্যে একা চলে না, দুই চারি জন একসঙ্গে যায়। বোধ হয়, একা যাইতে ভয় করে।

ওপারে যে ক্ষুদ্র গ্রামখানি দেখা যাইতেছিল, তাহার প্রান্তে গভর্মেণ্টের পাকা সড়ক চলিয়া গিয়াছে। একদল কোল-রমণী সেই পথে মজুরি করিয়া ফিরিতেছিল। রৌদ্রতপ্ত অপরাহ্ণে তাহারা এক বৃক্ষের ছায়ায় বসিল। আমি পাথরের উপর বসিয়াই তাহাদের দেখিতে পাইতেছিলাম। সিংহভূমের অধিকাংশ অধিবাসী কোল হইলেও অনেক সময়ে বাংলা গান গাহিয়া থাকে। রমণীগণ ছায়ায় বসিয়া গান ধরিল। কি গান, ভাল বুঝিতে পারিলাম না; তবে দুই তিনটি পরিচিত শব্দ কানে ভাসিয়া আসিল—পিরীতি, কালা, রমণী। এই খোলা মাঠের দেশে, যেখানে দূরে বনে ভরা শ্যামল পাহাড়ের মালা দিগন্ত ঘিরিয়া আছে, সুরটি যেন সেখানে চারিপাশের সঙ্গে মিশিয়া যায়। অনেকক্ষণ তাহাদের টানিয়া টানিয়া গান গাওয়া শুনিলাম। পথ দিয়া একখানি মোটর-লরি যাত্রীর দল লইয়া ধূলা উড়াইয়া ছুটিয়া গেল। বোধ হয় কেহ রসিকতা করিয়া থাকিবে, রমণীগণের কলহাস্যে চকিত হইয়া উঠিলাম। তাহারা হাসিয়া উঠিয়া পড়িল এবং আবার পথ বাহিয়া চলিয়া গেল।

অলস দিবস পার হইয়া সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। জলের প্রান্তে নামিয়া আসিলাম। কত বিচিত্র রঙের পাথরের উপর দিয়া স্বচ্ছ জলধারা বহিয়া যাইতেছিল, তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। কোনটি লাল, কোনটির গায়ে সমান্তরাল কৃষ্ণরেখার মালা, জলের তরঙ্গে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। কোনটি বা নীলাভ, চতুষ্কোণ, তরঙ্গের আঘাতে তাহার নীল আভা যেন নৃত্য করিতেছে। পাথরগুলিকে কুড়াইয়া লইলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, হাতে লইতেই তাহাদের শোভা নিমেষে অন্তর্হিত হইল। তাহারা প্রাচীন স্থাণু পাথরের খণ্ডে পরিণত হইয়া গেল। কোথায় বা তাহাদের রূপ, কোথায় বা সেই রঙ!

কোলেদের জীবননাট্যের কথা ভাবিতে লাগিলাম। তাহারা আমাদের দেশের লোকের মতই পরিশ্রম করে, লজ্জা পায়, ভয় করে, গান গায়, বাঁশী বাজায়। সবই করে, কিন্তু জীবনের কলরবে তাহাদের সবই যেন সুন্দর দেখায়। সেই একই মানুষের মন, এখানেও যেমন, আমাদের দেশেও তেমনই, প্রভেদ কেবল প্রকাশের রীতিতে। আমরা লজ্জা পাই, ভয় শ্রম সকলই করি, কিন্তু স্পষ্টভাবে যেন সব কথা প্রকাশ করিতে পারি না। কোলেরা প্রকাশ করিতে ভয় পায় না। আনন্দ হইলে সে গান গায়, খেলার ইচ্ছা হইলে খেলে। আবার স্ত্রীর নাচগান পছন্দ না হইলে চেলা-কাঠ লইয়া তাহাকে তাড়া করে, স্ত্রী ভয়ে পলাইয়া যায়। কিন্তু তাহার প্রতি স্বামীর অনুরাগের আভাস পাইয়া পুলকিত মনে হাসে, ইহাও দেখিয়াছি। এই স্বচ্ছ প্রকাশেই ইহাদের জীবনকে আমাদের অপেক্ষা লীলায়িত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের জীবনের উপর দিয়া যেন স্বল্পতোয়া পার্ব্বত্য নদী মুখর শব্দে বহিয়া চলিয়াছে, আমাদের জীবনের অন্তস্তল যেন সভ্যতার গভীর জলে ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। তাহার না আছে গতি, না আছে স্বচ্ছতা। আবরণের ভারে আমরা নিষ্পেষিত হইয়া আছি, জীবনের অন্তরে যাহা ঘটিতেছে, তাহা ঋজু সরল ভাবে ভাবিতে বা করিতে আমাদের হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনের কথা ভাবিতে আর ভাল লাগিল না। নদী পার হইয়া মাঠ ভাঙিয়া প্রবাসের ঘরের দিকে ফিরিতে লাগিলাম। ওপারে গ্রামের প্রান্তে, নদীর কূলে দেখিলাম, কাহার একখানি নূতন সমাধি রচিত হইয়াছে। বোধ হয় কোনও নারী হইবে, তাহাকে উত্তর শিয়রে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। মাটি একান্ত কাঁচা রহিয়াছে, সমাধির উপরে কতকগুলি পাথর চাপানো, যেন শেয়াল-কুকুরে শবদেহ

লইয়া না যায়। আর তাহার উপরে একখানি দড়ির খাটিয়া পায়া ভাঙিয়া রাখা হইয়াছে। এই খাটেই নারীর দেহ শেষ প্রবাসের যাত্রায় আসিয়াছিল। কাছে একখানি কুলার উপরে লালপাড় শাড়ির ছিন্ন অংশ এবং কয়েকখানি হরিদ্বর্ণ পত্র সযত্নে সজ্জিত ছিল। আত্মীয়েরা হয়তো স্মৃতির উদ্দেশে বসন ও ভূষণের এই সামান্য আয়োজন নিবেদন করিয়া গিয়াছে।

মনটা ভারী হইয়া গেল। পথের উপর দিয়া ধীরে ধীরে ফিরিতে লাগিলাম। দূরে পাঁচ'ছয় জন লোক একটি বাঁশে এক মৃত গাভীর চারি পা একত্র বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছিল। আশ্চর্য্য হইবার কিছুই ছিল না। গাভীর মাথাটি নেতাইয়া পড়িয়াছিল এবং বাহকগণের অসমান গতির জন্য দুলিতেছিল। হয়তো অল্পক্ষণ আগেই ইহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু কাছে আসিতে হঠাৎ চমক লাগিল। গাভীটির পশ্চাদ্‌ভাগে অর্দ্ধপ্রসূত বৎসের দেহার্দ্ধ প্রলম্বিত হইয়া ছিল, তাহার মাথা ও একটি পা যেন বাহির হইবার বিপুল চেষ্টায় টান হইয়া হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম, এই অনাগত বৎসই মাতার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। বাহকগণের পশ্চাতে এক ব্যক্তি আসিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মর গয়া? সে আমার দিকে না চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিল, হাঁ বাবু, মর গয়া।

হায় রে! জন্ম এবং মৃত্যুর এই দুর্জ্ঞেয় পটভূমির সম্মুখে আমরাই বা কি, আর এই অবোধ জীবই বা কোথায়? দুইজনের মধ্যে প্রভেদ তো কোথাও নাই, ব্যথা তো দুইজনেই সমান পায়। মানুষে মানুষেই বা প্রভেদ কোথায়? কেহ বা ক্ষণেকের আনন্দে কলরব করিয়া উঠে, কেহ বা করে না। কিন্তু দুইজনের পিছনেই সেই একই অজ্ঞেয় পটভূমি, যাহার সম্মুখে জীবনের সকল লীলা আকাশের অন্ধকারের পটভূমিতে নক্ষত্রের মত জ্বলিতে থাকে এবং অবশেষে একদিন অন্ধকারের মধ্যেই ম্লান শীতল হইয়া যায়। প্রাচীন যুগের প্রাচীন মানব যেমন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, আমরা সবাই তো তেমনই একদিন ধরিত্রীর ক্রোড় হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব।

ভোলার সুবিধা

উপকার করি ভুলিবে পত্রপাঠ,
নতুবা নিত্য লেগে রবে ঝঞ্ঝাট।
মানুষ চায় না খাটো হ'তে কারো,
লইবে সে তুমি যত দাও পারো,
ফিরিবার পথে ও তরী দেয় না আঁট।

২

ক্রীতদাস ছিল মুক্তি দিয়েছ যার,
সেও চিনিবে না, তুমিও চিনো না আর
যাহারে যা দিবে দেওয়া শেষ হ'লে
বালিতে লিখিয়া মুছে ফেল জলে,
উসুল না হ'ক, হবে না উসুল ছাঁট।

৩

উপকার করি ভুলিলে তাহার কথা,
দিতে পারিবে না বেদনা কৃতঘ্নতা।
সেটাও একটা কত বড় লাভ
বোঝ নাকো তুমি সরলস্বভাব,
চেনা ঘোড়া হ'লে অধিক বাজিবে চাঁট

৪

যে শর বিঁধিবে না চেনাই সেটা ভাল,
ডাকাতের হাতে রূঢ়তর গৃহ আলো,
শুধাই তোমারে ওহে সুধীবর,
পড়ে যদি হবে সে কি প্রীতিকর,
তোমারি পৃষ্ঠে তোমারি চেলানো কাঠ?

৫

ভুলিয়া যাবার বিশেষ সুবিধা এই,
পাবে না যেটারে আগেই ভাবিবে নেই।
নতুবা হৃদয় করিতে শান্ত
পড়িতে হইবে গোটা বেদান্ত,
ভোলানাথ হ'ল বিশ্বের সম্রাট।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

When the peoples of the earth had decided what gifts they would ask of God, they gathered before His throne and made their requests.

The Latins said : "we want wisdom."
The English said : "we want the sea."
The Turks said : "Allah, give us the fields."
The Russians said : "Give us the mountains and the iron mines."
The Franch said : "Give us gold,"
The Germans said : "Give us weapons."

"National Zeitung," Basel.

The Indians said : "Give us—er—what ?
Give us non-violence."

কেন আমি লেখক নহি

প্রায়ই বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন অথবা পরিচিত মহল হইতে অনুরোধ আসে তাঁহাদের জীবনী হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া গল্প লিখিবার জন্য। হয়তো তাঁহারা নিজেদের সম্বন্ধে সত্য কথা শুনিতে চাহেন না, বা সত্য কথা সহ্য করিবার সাহস তাঁহাদের নাই, তাই গল্পের মধ্য দিয়া আত্মজীবনের খানিকটা মনোরম অংশ ও মনোহর কীর্ত্তি-কাহিনী শুনিবার বাসনা তাঁহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই বলেন, দোষে-গুণে মানুষ। দুষ্কৃতম মানুষের মধ্যেও এমন অনেক সদ্‌গুণ আছে যাহা ঋষি-তুল্য শ্রদ্ধেয়ের মধ্যে বিরল, আবার ঋষি-তুল্য ব্যক্তির অবচেতন মনের মালিন্য অসতর্ক মুহূর্ত্তে প্রকাশ হইয়া পড়িলে জঘন্য চরিত্রের ব্যক্তিকেও লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। মনস্তত্ত্বের অনেক জটিল ও দুরূহ তথ্য ইঁহাদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়; ফ্রয়েড ও হ্যাভেলক এলিসের কোটেশনে ইঁহারা দুরন্ত; কিন্তু হায়, সত্য কথা যে প্রিয় কথা নহে, এই সামান্য প্রবচনটুকু ইঁহারা মনে রাখেন না! অপরের সম্বন্ধে যে নির্ম্মম সত্যের প্রকাশ মনকে পুলক-বিহ্বল করিয়া তুলে, নিজের সম্বন্ধে সেই প্রকাশকেই অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া মনে হয় এবং লেখককে অনুরোধ করিয়া যাহা লিখাইয়া থাকেন, তাহার মধ্যে রূঢ় সত্যের ছায়া কিছু পড়িলে অভিমান বা ক্রোধের সঞ্চার হয়। অভিমান সব ক্ষেত্রে ততটা মারাত্মক নহে; কেন না, তাহা অহিংস। হিংসামূলক ক্রোধ অতি ভয়ানক। ইহা অগ্নির ন্যায় দাহ্য বস্তুকে পুড়াইয়া নিঃশেষ না করা পর্য্যন্ত সমান তেজমান থাকে। আসল কথা, অনুরোধে পড়িয়া বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বা

পরিচিতের চরিত্র চিত্রণ করিতে যাওয়ায় অনেকখানি বিপদ আছে। তাঁহাদের লইয়া স্তবমালা রচনা চলে, সত্যভাষণ চলে না। গল্পের মোড়কে মুড়িলে কি হয়; গল্পকে মিথ্যা ভাবিয়া কৌতুক উপভোগ করিবার মত সবল মন কোথায়? লেখককে জব্দ করিবার জন্য আইনের খড়্গ উচানোই আছে; তাই সাবধানী লেখক ভূমিকায় প্রায়ই লিখিয়া দেন, এই পুস্তকের সমস্ত চরিত্রই কল্পনাপ্রসূত। সাধারণ পাঠক কিন্তু অলীক কল্পনার পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু বাস্তব লইয়া কারবার করার অনেক অসুবিধা। একে তো আমাদের সঙ্কীর্ণতম জীবন, পরিধিতে বৃহত্তর জগতের স্বাদ বড় একটা মিলে না, ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন লইয়া কারবার। পল্লী-বর্ণনায় অতিশয়োক্তি ও শহর-বর্ণনায় প্রশংসা-কুণ্ঠতার দোষ প্রায়ই লেখনী আশ্রয় করে। যে যুদ্ধ-মহিমায় জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের দর্শন মিলে, আমরা সেই রণক্ষেত্রকে বহুযুগ অতীতের কুরুক্ষেত্র বা সমুদ্রতীরবর্ত্তী লঙ্কার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সুললিত পয়ার ছন্দের মধ্যে মাত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারি; হিন্দু-মুসলমান রাজত্বে যে সব যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যেও বহু অর্দ্ধসত্য ও পূর্ণমিথ্যার গৌরব-কাহিনী ছানিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়া পাঠকের মনোরঞ্জনে প্রয়াস পাইতে পারি, কিন্তু অতি-আধুনিক যুগের পাঠককে সেই 'না ঘরের, না ঘাটের' মোদকখণ্ড তুলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ মুখবিকৃতি করিয়া মাটিতেই নামাইয়া রাখিবেন। অথচ সৃষ্টির প্রেরণায় আমাদের হাত প্রতিনিয়ত উসখুস করিতেছে। ঝরণা-কলম কালিতে ভরা, সাদা কাগজ আকণ্ঠ পিপাসায় নিবের সূচ্যগ্রভাগে লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছে, আকাশে বর্ণের বিকাশ, ঋতুতে ঋতুতে সমারোহ এবং মনস্তত্ত্ব-রসায়নে অন্তর মন শক্তিশালী ও সক্রিয়, না লিখিয়া উপায় কি?

কিন্তু লিখিব কি? লেখার বিপদগুলি ভাবিয়া দেখিলে ঝরণা-কলম

দিয়া কালির প্রবাহ বহিতে চাহে না। যাহাদের লইয়া মনস্তত্ত্বের কারবার ফাঁদিবার বাসনা, তাহাদের মন আছে এবং নিঃসন্দেহে তাহা সক্রিয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ জগতে সেই ক্রিয়া-কলাপের নমুনা আমার জীবন-ধারণের সমস্যাকে যদি প্রতিনিয়তই আঘাত করিয়া চলে তো ঝরণা-কলম ঝরণার জলে (কিম্বা পুকুরের জলে) ভাসাইয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি? একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, লেখক নির্ভীক না হইলে তাঁহার লেখনীধারণ অসার্থক। অত্যন্ত খাঁটি কথা এবং সত্য কথা। কাপুরুষতা লেখকের সাজে না। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে সমাজ আত্মীয়-স্বজন এমন কি প্রিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত অপরিহার্য্য। লেখকের জীবন হয়তো সাধকের জীবন, কিন্তু লেখকের সাধনা নির্জ্জন অরণ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলে না। লেখকের মস্তিষ্ক ও হৃদয় দুইই প্রখর হওয়া আবশ্যক: সংসার-আসক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-ক্ষমতার পরিচয় না দিলে, বাস্তব জগতে তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে কেহই যত্নবান হইবেন না। অথচ বাস্তব জগতের বিপদগুলি শুনুন। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে যাঁহাদের সহিত পরিচয়, তাঁহারা চিরকাল দোষগুণের অতীত। তাঁহারা প্রতিপালক; বাক্য, অন্ন, জ্ঞান, বিদ্যা ইত্যাদি যত কিছু পার্থিব দানে মানুষকে শক্তিশালী ও সচেতন করার দরকার, তাহা শৈশব হইতেই স্নেহ ও কর্ত্তব্যের খাতিরে সামর্থ্যানুযায়ী অকাতরে (?) দিয়া আসিতেছেন। সুতরাং, তাঁহাদের ঋণভার মাথায় তুলিয়া তাঁহাদের পায়ের পানে না ঝুঁকিয়া আমাদের গত্যন্তর নাই। বাস্তব ক্ষেত্রে কলম ধরিয়া যদি দুঃসাহসীর মত তাঁহাদের যথাযথ চিত্র অঙ্কন করিতেই হয় তো তাঁহারা বিত্তশালী হইলে আমার ত্যাজ্যপুত্র হওয়া বিধাতাও রোধ করিতে পারিবেন না, মধ্যবিত্ত হইলে দৈহিক উৎপীড়ন কিছু ঘটিবেই এবং নিঃস্ব হইলে অভিশাপের অগ্নি প্রতিনিয়ত বর্ষিত হইতে

থাকিবে। এই সমস্তেও তত ভয়ের কারণ নাই, নির্ব্বাক বেদনার ভাষাকে আমার বড় ভয়। তাই তথাকথিত শ্রদ্ধেয় জনের চরিত্র লইয়া আলোচনা প্রথম হইতেই পরিত্যাগ করিয়াছি। বাবা-মায়ের পরই যাঁহাদের প্রভাব জীবনে অত্যন্ত প্রবল, তাঁহারা বন্ধু। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাদের লইয়াই জীবনের যত কিছু সম্পূর্ণতা। তাঁহাদের বাক্য, হাসি, বুদ্ধি ও হৃদয়ের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বিনিময় চলিতেছে; সুতরাং অনুরুদ্ধ না হইলেও তাঁহাদের জীবন যে উপকরণ হিসাবে আমার লেখার অত্যন্ত লোভের সামগ্রী, এ কথা অস্বীকার করি কি করিয়া! অথচ অন্তরঙ্গতার সুযোগ লইয়া যেই মাত্র অন্তরতম সুহৃদের গোপন কথাটি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তিনি মুখে আষাঢ়ের মেঘ নামাইয়া অন্তর-কপাট নির্ম্মম করেই রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। বন্ধুর ভালবাসায় যেখানে স্বার্থের সন্ধান মিলিয়াছে—সেইখানে আমি কপট, যেখানে ত্যাগের পরিচয় লেখা—সেইখানে আমি শক্তিমান। বুদ্ধি জিনিসটা মোটামুটি শুনিতে কর্ণরোচক, প্রতিভামণ্ডিত হইলে তো কথাই নাই, কিন্তু বিশ্লেষণে মর্য্যাদাহানিকর। চাতুরি, পাটোয়ারি, ধূর্ত্তামি ইত্যাদি নিম্নস্তরের জিনিসে মৌলিকত্ব থাকিলেও সে বর্ণনায় বন্ধুর মন বর্ষাকালের অমাবস্যা রাত্রির মতই হয়তো নিদারুণ হইয়া উঠিবে। স্নেহের ক্ষেত্রে বন্ধুকে যদি নির্ব্বোধ বলা যায়, অত্যন্ত উদারমনা হইলে অখুশি হয়তো তিনি নাও হইতে পারেন, কিন্তু পূর্ব্ববৎ প্রাণখোলা স্নেহ-রস উপভোগ করিতে পাইব কিনা সন্দেহ, অন্তত বুদ্ধিপ্রকাশের খাতিরেও তিনি সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য। বিদ্যার ক্ষেত্রে ইঁহাদের উপরে উঠিবার চেষ্টা করা বুদ্ধির পরিচায়ক নহে; বন্ধুত্বের পল্‌কা সুতার তো কথাই নাই, শক্ত কাছিও পট করিয়া ছিঁড়িয়া যায়। আশ্চর্য্য, ইঁহাদের সঙ্গে যত খুশি মনপ্রাণ বিনিময়ের মুহূর্ত্তে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ কর বা

তাঁহাদের দুর্ব্বলতা লইয়া পরিহাস কর, বুদ্ধিকে ধিক্কার দাও, বিদ্যাকে সঙ্কুচিত কর, স্নেহে স্বার্থের প্রকাশ দেখ, তর্কের খাতিরে হাতাহাতি কর, কিছুই স্থায়ী ফল প্রসব করিবে না; কিন্তু দুর্ব্বলতম মুহূর্ত্তের সামান্যতর পরিচয় যদি কাগজে কালির টানে রেখাপাত করিতে চাও তো বিপদের সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। পরম বন্ধু বিগড়াইলে যে চরম শত্রুকেও হার মানায়, এ কথা তো সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশের প্রবাদবাক্য।

অতঃপর আত্মীয়-স্বজন। যেবার ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়া দ্রুত স্থানত্যাগ করিতে পারি নাই, ফল বক্ষ্য হাতে হাতেই মিলিয়াছিল আত্মীয়-স্বজনকে তেমন হুলবিশিষ্ট ভীমরুলের সঙ্গে তুলনা করিবার সাহস আমার নাই, বরং মৌমাছির সঙ্গে তুলনা করিলে কতকটা মানায়; কিন্তু মধুর লোভ একেবারে ত্যাগ না করিতে পারিলে হুলের ভয় কাটানো দুষ্কর।

উহাদের পাশ কাটাইতে গেলে প্রতিবেশীদের সাক্ষাৎ মেলে। ইহারা আত্মীয়ও বটে, অনাত্মীয়ও বটে। ইহাদের সম্বন্ধে রুশ লেখকের উক্তিটুকু স্বতই মনে পড়ে।—

One can love one's neighbours in the abstract, or even at a distance, but at close quarters it's almost impossible.

কিন্তু আমার মতে প্রতিবেশীরা আসলে ভাল, তাঁহাদের সঙ্গে আয়নার তুলনা চলে। মাজিয়া ঘষিয়া যত্ন করিয়া রাখ, সে তোমার প্রতিমূর্ত্তিকে কোথাও অস্পষ্ট বা আবিল করিয়া তুলিবে না, ছাই দিয়া মলিন করিলে তোমারই ক্ষতি।

তবে ইহাদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া মধুরসম্পর্কীয়দের লইয়া কিছু লিখিতে বাধা নাই। যেমন ঠানদিদি, বউদিদি। একবার জনৈকা

ঠানদিদির হরিনামের ঝুলি ও পরচর্চ্চা-কীর্ত্তন লইয়া কিঞ্চিৎ চর্চ্চা করিয়াছিলাম, ফলে তিনি সম্পর্ক বজায় রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রখর রসনা-চালনার ফলে সাহিত্যের আবর্জ্জনা আমার মস্তিষ্ক হইতে প্রায় দূরীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ভাগ্যে শহরে দুই দশ দিন বাস করিবার স্থান ছিল, তাই রক্ষা।

বউদিদি আমার আধুনিকা নহেন, সাহিত্যের সংবাদ রাখার চেয়ে গৃহস্থালীর শৃঙ্খলা-বিধানকে বহু মূল্যবান জ্ঞান করেন। গল্প-উপন্যাস না পড়িয়াও তিনি যে সব স্থূল রসিকতা করেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিলে অধুনাবিলুপ্ত বাঙালী সমাজের সুন্দর চিত্র পাঠকের পক্ষে হৃদ্য হইবে বলিয়াই একদা ঐরূপ বাক্‌ভঙ্গির অনুকরণে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু হায়, এক মাস যাইতে না যাইতে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম, বউদিদি আমার সাহিত্য-ভক্ত হইয়া উঠিলেন। আমার পাতে সযত্নে রন্ধিত সুভোজ্য আর তেমন সমাদরে পরিবেশিত হয় না। আমাকে দেখিয়া রসিকতা করা দূরে থাকুক, পাশ কাটাইতে ব্যতিব্যস্ত হন। আমি যদি রসিক হইবার চেষ্টা করি, তিনি মুখ ভার করিয়া বলেন, থাক, আর কাজ নেই। আমরা মুখ্যু মানুষ লেখাপড়া জানি না, আমরা কি কথা কইবার যুগ্যি!

অনেক অনুসন্ধানের ফলে বউদিদির আলমারি হইতে কয়েকখানি পুরানো মাসিকপত্র উদ্ধার করিয়া সমস্যার সমাধান করিয়াছিলাম। উনি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিয়াছেন, আমাকে বুঝি বা সে পরিচয় ভুলিয়া যাইতে হয়। এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য জগতে কোথাও ঘটিয়াছে কি?

ভাবিলাম, দূর ছাই, বাড়ির লোক ও পাড়ার লোক ধরিয়া আর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিব না। কর্ম্মক্ষেত্রে সহকর্ম্মীর উপর কটাক্ষপাত

করাটা মন্দ কি? তাহাদের সঙ্গে দশটা পাঁচটার সম্পর্ক। তাহারা ক্ষুব্ধ হইলে জীবন হয়তো দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে না। রাগ করে, ঘরের অন্ন বেশি খাইয়া মুদির দেনা বৃদ্ধি করিবে · বড় জোর কথা কহিবে না, তাহাতে নির্ব্বিবাদে অফিসের কাজটুকু সুসম্পন্ন করিতে পারিব। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। যে দিকেই তাকাই—লেখার মশলার অত্যন্ত অভাব দেখি। ইহাদের জীবন লবণহীন ব্যঞ্জনের মত, পাতে সাজাইয়া রাখ, মন্দ দেখাইবে না, কিন্তু মুখে দিয়াছ কি পরিপূর্ণ এক গ্লাস জলের প্রয়োজন। Merry-go-round খেলার মত একটি সরলরেখাকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্ত রচনা করিয়া ঘুরিতেছে। সেই সাংসারিক অসচ্ছলতা, ছেলের অসুখ, কন্যাদায়, স্ত্রীর খিটখিটে মেজাজ, লটারির টিকেট, আলু-কপির দর-বর্ণনা, হিট্‌লার-মুসোলিনির মুণ্ডপাত ইত্যাদি ইত্যাদি। উহারই মধ্যে একজনের একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া মনে আনন্দ হইল। ইনি বড়বাবু, কেরানিকুলের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ দেবতা। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ইঁহার আচরণের অসামঞ্জস্য—মনস্তত্ত্বের একটি অলিখিত দিক অপূর্ব্ব হইয়া সারা মনের সঙ্গে ঝরণা-কলমটিকে পর্য্যন্ত নাচাইয়া তুলিল। হাঁ, চিত্রণোপযোগী চরিত্র বটে। ইঁহার মূলে মেঘ-রৌদ্রের খেলা তো প্রতিনিয়তই দেখিতেছি,—এই হাসি, এই হুঙ্কার। কাহাকেও সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া সদ্য মোক্ষ দিতেছেন, কাহাকেও নরকস্থ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। বিনা প্রয়োজনে অনেকে আসিয়া প্রত্যক্ষে লম্বা কুর্নিশের সঙ্গে স্তুতি নিবেদন করিতেছে, আবার পরোক্ষে অভিধান-বহির্ভূত ভাষায় অভিনন্দিত করিতেও ছাড়িতেছে না। সুন্দর চরিত্র, সুতরাং রঙের পোঁচ দেওয়া গেল। রঙের পোঁচ হয়তো বা গাঢ়তরই হইয়াছিল, সে মুখ অতঃপর sphinx-এর বলিয়াই মনে হইল; এবং সাহিত্যের কন্ঠধারা

এখানেও যে প্রবহমান, সে কথা বুঝিলাম বেতন-বৃদ্ধির সময়। সে যাহা হউক, প্রভুসম্পর্কীয়দের লইয়া খেলা করিবার প্রতিফল হাতে হাতেই মিলিল। চাঁদ সদাগরকে দেবী মনসা ইহার কত গুণ বেশি নাকাল করিয়া সম্মান আদায় করিয়াছিলেন জানি না, আমার তো মনে হয়, সে যুগে খানিকটা নিষ্ঠুরতা ও জিদের সঙ্গে খানিকটা দয়ার নমুনাও ছিল, এ যুগে যাহা বিরল হইয়া উঠিতেছে।

বড়বাবু যে আক্কেল-সেলামি দিয়াছেন, তাহাতে বড়তম কর্ত্তাদের লইয়া নাড়াচাড়া করিতে সাহস হয় না। অন্য দেশ হইলে রাষ্ট্রের সঙ্গে বোঝাপড়া চলিত, এখানে লালপাগড়িকে সভয়ে সম্মান না দিয়া উপায় কি? প্রেমের সঙ্গে রাজনীতির অহি নকুল সম্বন্ধ বলিয়াই শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক হইবার কামনায় শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হইবার অভিলাষ পোষণ করি নাই। সাহিত্যের বাগানে ফুল ফুটাইবার কাজ লইয়াছি; বড় জোর ফলের আস্বাদন লইতে পারি, কিন্তু গাছের গোড়ায় সার দেওয়া, মাটি কোপানো এ সব আমাদের সাজে কি? স্বাধীন দেশের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের উদ্যান-রচনার উদ্যম আছে; শক্তি, সাহস, নির্ভীকতা—কোন্‌টা নাই? তাঁহারা গাছটাকে শুধু জীয়াইয়া রাখিয়া নিরুদ্যম আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ক্ষুদ্র এবং বিবর্ণ ফুলের ফসল দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করেন না। তাঁহাদের সাহিত্য রাষ্ট্রকে নূতন করিয়া গড়িতেছে, আমাদের রাষ্ট্র সাহিত্যকে একটি কোণে কুণ্ডলীকৃত করিতেছে। সেই কুণ্ডলায়িত বৃত্তে নিরঙ্কুশভাবে যে চর্চ্চা সোৎসাহে ও সবেগে চালানো যায়, তাহা প্রেম। ভূমির প্রতি নহে, ভূমার প্রতিও নহে, স্বকীয়া বা পরকীয়া প্রীতি, যাহাতে সমাজকে নিষ্করুণ-ভাবে আঘাত দেওয়া চলে, শক্তিমান প্রাচীনদের মূল্যবান লেখাকে অনায়াসে অবজ্ঞা করা যায়, যত কিছু ভাল তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া প্রগতিবাদের মহিমার ধ্বজা সগর্ব্বে শূন্যে ঠেলিয়া তোলা যায়।

কিন্তু পরকীয়া-প্রীতি ছাড়া আর একটি বিষয় যেন আছে বলিয়া মনে হইতেছে। যাহাদের ক্ষোভে আমার হয়তো কোন ক্ষতিই হইবে না, সেই পতিতাদের লইয়া যদি কিছু লেখা যায়? মন্দ কি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার পূর্ব্বগামী বহু সাহিত্যরথী আলোকপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আলোকপাত করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, সে আলোক যেমন অস্পষ্ট, তাহার তলায় বা চারিদিকে তেমনই গাঢ় দুর্ভেদ্য অন্ধকার। তাঁহারা কলমের খোঁচায় পঙ্কিল পরিবেশটিকে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে, হাবভাবে ও কথাবার্ত্তায় যথেষ্ট পরিমাণে কৃত্রিমতা আনিয়াছেন। স্থান-বর্ণনা বা বৃত্তি-বর্ণনা ছাড়া সেই ম্লান ক্ষুধিত পতিত আত্মাগুলিকে যদি আমাদের সংসারের মধ্যে বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া সাজাইয়া রাখা যায় তো, এগুলিকে আত্মীয়া বলিতে এতটুকু দ্বিধা আমাদের জাগিবে না। ইহাদের ক্ষুধার পরিমাণটা জানাইয়াছেন, হেতু নির্দ্দেশ করেন নাই। ফলে, সত্যকারের গোলাপে ও কাগজের গোলাপে যে তফাৎ, তাহাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণটুকুর মাত্র হুবহু নকল হইয়াছে, আর কিছুই হয় নাই। এই বিষয়ে আর একজন বিখ্যাত রুশ লেখকের কথা মনে পড়িতেছে।—

One must grow accustomed to this life, without being cunningly wise, without any ulterior thoughts of writing. Then a terrific book will result.

সুতরাং এ পথও আমার পক্ষে চিররুদ্ধ। এবং এই কারণেই চাষা ও শ্রমিক আন্দোলনকে পাশ কাটাইয়াছি।

কি করা যায়? ঘরের চেয়ে বাহিরের বিবাদ অধিক বুঝিয়া পুনরায় ঘরেই দৃষ্টিপাত করিলাম। আছে, আছে, লিখিবার বিষয় আছে। ঐ যে গৃহকোণে আবদ্ধ একটি প্রাণী নিঃশব্দে ছায়ার মত দুঃখ-দৈন্যের বোঝা হাসিমুখে মাথায় তুলিয়া শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনা সহিয়া উদয়াস্ত

খাটিয়া মরিতেছে ; বাহিরে অপমানিত হইয়া যাহার উপর তর্জ্জন করিয়া প্রভুত্ব ফলাইতেছি ; যাহাকে ভাল জিনিস কিনিয়া দিবার অক্ষমতায় ত্যাগধর্ম্ম শিখাইতেছি ; সন্তানের বোঝা মাথায় তুলিয়া দিয়া মাতৃত্ব-মহিমায় মণ্ডিত করিয়া দেবী বানাইয়া পরম দুঃখেও চরম সুখ উপভোগ করিতেছি, সেই সর্ব্ব কর্ম্ম ও ধর্ম্মের অংশভাগিনী যে বিদ্যমান। ছাই ফেলিতে এমন ভগ্ন কুলা আর কোথায় মিলিবে ?

দুঃখে না পড়িলে সে কি হইতে পারিত, স্ত্রী না হইলে তাহার মধ্যে পরকীয়া-রস কিরূপে উদ্বেল হইয়া উঠিতে পারিত, এক কথায় কল্পনার পুষ্পকরথে চাঁপাইয়া তাহাকে আমার মানস-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিলাম। ছবি যা আঁকিলাম, নিজেরই বয়স অন্তত কুড়ি বৎসর কমাইয়া আনিলাম। কলেজ, ককটেল, সিগ্রেট, রেস্তোরাঁ, সিনেমা, নুডিজিম, কম্প্যানিয়নেট ম্যারেজ, লেক, বান্ধবী, বেবি অস্টিন, বালিগঞ্জ ইত্যাদি আধুনিক ও তরুণ হইবার যত কিছু উপকরণ হাতের কাছে পাইলাম, সযত্নে আঁকড়াইয়া ধরিলাম। কিন্তু একচক্ষু হরিণের মত দিক্‌নির্ণয়ে আমার ভুল হইল। গৃহকোণের নিরীহ প্রাণীটি অসহযোগ করিয়া বসিলেন। তিনিও কি সাহিত্য-রসিকা হইয়া উঠিলেন ? সর্ব্বনাশ ! পাড়া-প্রতিবেশীরা কি ভয়ানক বস্তু এতদিনে বুঝিলাম। আমার কল্পনার পক্ষচ্ছেদে তাহারা সাংঘাতিকভাবে পরামর্শ দিয়াছে। স্ত্রীকে বুঝাইয়াছে, এতদিনে তাহার কপাল ভাঙিয়াছে। একান্ত অনুগত ও পরম বিশ্বাসী জন বুঝি বা এমন বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হইয়া গেল, যাহার তুলনায় ইতিহাসের সব কয়টি পূর্ব্বসূরির নাম ম্লান হইয়া যাইবে। হতাশ হইয়া চারিদিকে চাহিলাম। তবে কি মজ্জমান ব্যক্তির কোন অবলম্বনই নাই ? ঝরণা-কলম কি ঝরণার (অভাবে পুকুরের) জলেই ভাসাইয়া দিব ?

করজোড়ে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া মনে মনে আকুল কণ্ঠে আবৃত্তি করিলাম, হে ঈশ্বর, তবে কি কোন উপায় নাই ?

সহসা গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, আছে।

স্পন্দিত বক্ষে ও কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, কি উপায় ?

গম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনি উঠিল, উপায়—আমি।

মূঢ়ের মত ফাঁকা আকাশের পানে চাহিয়াই রহিলাম, অর্থ বুঝিলাম না।

গম্ভীর মৃদু কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, উপায়—আমি। আমাকে লইয়া যে তর্ক অনাদিকাল হইতে চলিতেছে, সেই অমীমাংসিত তর্ক-সভায় যোগদান কর। ধর্ম্মকে লইয়া (অবশ্য পরধর্ম্ম নহে, তাহাতে জীবন-হানির সুযোগ যথেষ্ট) যাহা খুশি লেখ, প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই।

গ্রীক দার্শনিকের মত উলঙ্গ হইয়া 'ইউরেকা' শব্দে আর্ত্তনাদ তুলিয়া রাজপথে না ছুটিলেও কলমটি দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিতেছিলাম, কিন্তু ধর্ম্মকে পরমুহূর্ত্তে ততখানি বে-ওয়ারিস ভাবিতে পারিলাম না। ধর্ম্ম—যাহা ধারণ করেন, তাহা হয়তো নিরাপদ, কিন্তু ধর্ম্মকে যাহারা বহন করিয়া ফিরিতেছেন, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপের অহিংসত্ব সম্বন্ধে আমার সন্দেহ যথেষ্টই আছে।

ভাল খরিদ্দার পাইলে ঝরণা-কলমটি বিক্রয় করিয়া দিব, স্থির করিয়াছি।

শ্রীঝটকেশ্বর শর্ম্মা

The reasonable man adapts himself to the world ; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.

G. Bernard Shaw

রিক্‌শ

আজকাল কলিকাতার তো কথাই নাই, ছোট ছোট শহরেও রিক্‌শ দেখিতে পাওয়া যায়। এক কলিকাতাতেই ৪৫৬৭খানি রিক্‌শ ও ৮৯৫৬ জন রিক্‌শ-টানা কুলী আছে। যদি বলেন, মহাশয়, রিক্‌শ তো একজন লোকেই টানে, তবে ৪৫৬৭খানি রিক্‌শর জন্য ৮৯৫৬ জন কুলী হইল কি করিয়া? তবে আমরা উত্তরে বলিব যে, আপনি রিক্‌শ টানাই দেখিয়াছেন, বড় জোর চড়িয়াছেন দুই এক বার, কিন্তু আসল ব্যাপার কিছুই জানেন না। নূতন রিক্‌শ কিনিতে ৪০০।৪৫০ টাকা লাগে; তার পুলিস লাইসেন্স, মিউনিসিপ্যাল লাইসেন্স ইত্যাদিতে বছরে বছরে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। আর রিক্‌শ মেরামতি, রঙ ইত্যাদি ব্যাপারেও বছরে কিছু যায়। ৬।৭ বৎসরে রিক্‌শ একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া যায়। সুতরাং যে সে লোকে রিক্‌শ কিনিতে পারে না, ধনী রিক্‌শওয়ালা রিক্‌শ কিনিয়া কুলীকে ভাড়া দেয়। সকাল হইতে বেলা ২টা।৩টা পর্য্যন্ত একজন কুলী, আর ২টা।৩টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত আর একজন কুলী রিক্‌শ টানে। প্রত্যেক রিক্‌শতেই যে ২ জন করিয়া রিক্‌শ-কুলী আছে তাহা নহে। ২।৪ জন রিক্‌শ-কুলী টাকা জমাইয়া নিজেরাই রিক্‌শ কিনিয়াছে।

দেখি, তাহা

শেষভাগে

ৎসরের মোট

নে ১৯১৮

ন লক্ষে

কলিকাতায় আলোকসজ্জা হয়। সেই সময় আমরা সর্ব্বপ্রথম রিকৃশ চড়ি ও রিকৃশতে করিয়া আলোকসজ্জা দেখিয়া বেড়াই। রিকৃশ চড়া কিছুদিন ফ্যাশন ছিল। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান —বাবু, ওরফে ধববাবু, মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড পরিদর্শন উপলক্ষে মিউনিসিপ্যাল-রিকৃশ চড়িয়া যাতায়াত করিতেন। ক্রমে রিকৃশর মান কমিতে লাগিল। ইংরেজী ১৯২৫।১৯২৬ সালে যখন থার্ড ব্যাটল অব গ্যাঁড়াতলায় গুণ্ডারা হারিয়া গেল, রিকৃশ মধ্যমশ্রেণীতে নামিল, আর এখন (অর্থাৎ ইং ১৯২৮।১৯২৯ সালে) ইহা নিম্নশ্রেণীতে নামিয়াছে। শিয়ালদহের মাছের গাড়ি হইতে জেলেরা পাইকারি দরে মাছ খরিদ করিয়া রিকৃশতে মাছের ঝাঁকা বসাইয়া বরাহনগর কাশীপুর প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করেন। ধোপায় কাপড়ের গাঁট লইয়া তাহার উপর বসিয়া যায়। মা সরস্বতীকে রিকৃশ চড়িয়া ১০।১২ মাইল দূর স্থানেও যাইতে দেখিয়াছি। সময়ে সময়ে রিকৃশ কেবলমাত্র মাল-টানা রিকৃশতে পরিণত হইয়াছে, ইহাও আমরা দেখিয়াছি।

রিকৃশ বড় নিরীহ যান। ইহাতে চাপিলে অ্যাক্‌সিডেণ্ট বা দুর্ঘটনা হইবার সম্ভাবনা খুব কম। এয়ারোপ্লেনের তো কথাই নাই, এই সেদিন মাঝেরহাটের এয়ার ডিস্‌প্লেতে একখানি এয়ারোপ্লেন উল্টাইয়া ৩॥ জন আরোহীর 'চড়াই উল্টাইয়া দিল'। আজকাল রেলে যাওয়া আদৌ নিরাপদ নহে। একমাত্র পূর্ব্ব-ভারতীয় রেলপথে এক বৎসর এক মাসের মধ্যে বার বার পাঁচ বাব রেল উল্টাইয়া ৫৫৫ জন হত বা আহত হইল। মোটরের তো কথাই নাই, শতকরা ১॥টি করিয়া অ্যাকসিডেণ্ট হইবেই হইবে। কলিকাতার গাড়োয়ানেরা যেরূপ নির্ভয়ে ঘর্ঘর ঝরঝর রবে দিক্‌মণ্ডল নিনাদিত করিতে করিতে গাড়ি চালায়, তাহাতে এই অধম লেখকের একবার প্রাণসংশয় হইয়াছিল, তিনি সেই

অবধি ঐ গাড়ি চড়া সভয়ে ছাড়িয়া দিয়াছেন। লেখক কিন্তু হিন্দুসভায় বছরে সওয়া পাঁচ আনা চাঁদা দেন বলিয়া—প্রেসের আঞ্জুমানিয়া ইস্‌লামিয়ার সম্পাদক বাবর মিঞা উহা কম্যুনালিজ্‌ম বলিয়া অভিহিত করেন।

আর জলযানের তো কথাই নাই। সামান্য নৌকায় চড়িয়া গঙ্গা পার হইবার সময় সম্রাট শাজাহানের পুত্র শাহস্‌জা—'এক ইঞ্চি তক্তার নীচে অগাধ জল' বলিয়া নদী পার হন নাই, ফলে আক্‌মহলের যুদ্ধে মুর্শিদকুলীখাঁর নিকটে পরাজিত হন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ বিষয়ে বৈদিক যুগের গাওয়া গাড়ি অর্থাৎ বাংলার গরুর গাড়ি বড় নিরাপদ যান। কিন্তু তাহা নহে। গরুর গাড়ি চাপা পড়িয়া মানুষ আহত হইলে তাহাকে ১৮৬১ খ্রীঃ অঃ-এর ৫ আইনের ৩৪ ধারামতে ৫ টাকা জরিমানা দিতে হইবে।

কিন্তু এ যাবৎ বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র পড়িয়া রিক্‌শ চাপা পড়িয়া মানুষ মরার কথা জানিতে পারি নাই।

এইবার আমরা রিক্‌শর ইতিহাস লইয়া কিছু বলিব। রিক্‌শ চীনাদের আবিষ্কৃত যান নহে। চীনারা রিক্‌শ আবিষ্কার করিয়াছে এক হাজার বৎসর, এ কথা সত্য। কিন্তু চীনারা ইহা পাইল কোথা হইতে? আর ইহার নাম রিক্‌শই বা হইল কেন? আসলে ইহা ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট নহুষের আবিষ্কৃত; আর সে কতদিন আগে তা আমরা সঠিক বলিতে পারিব না। তবে 'পুরাণ-প্রবেশ'কার গিরীন্দ্রশেখরবাবুকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি নহুষের সময় খ্রীঃ পূঃ ১৫,০০০ বৎসর হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। Statistical Laboratory-তে এই সম্বন্ধে গবেষণা হইয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, নহুষের সময় ১৫,০০০ ($১+'০০০০২\sqrt{-১} \times S_0 — S_5$ ' অর্থাৎ

৯৮৭,৬৫৪,৩২১,০০০,০০০,০০০ দণ্ড পূর্ব্বে। নহুষ যখন স্বর্গের ইন্দ্রত্ব-পদ পাইলেন, তখন তিনি মুনিঋষিদের দ্বারা বাহিত যানে চাপিয়া স্বর্গের এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাইতেন। ইহাতে আজানুলম্বিতদাড়ি (কাহারাও আবার আপালম্বিতদাড়ি) ঋষিদের বড়ই কষ্ট হইত। এই ঋষি-বাহিত যানই কালক্রমে রিক্‌শতে পরিণত হইয়াছে (ইহাই ভাষাতত্ত্ববিৎ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত; আর এ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কাশ্যপের মুখেও তিনি এইরূপই শুনিয়াছেন।) স্বর্গের রিক্‌শ। কিন্তু একজন ঋষিতে টানিতেন না।

মহাভারত পুরাণাদি পাঠে আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, সাধারণত চারজন ঋষিতে রিক্‌শ টানিতেন, তবে সময়ে সময়ে ইহার অধিক ঋষিতেও টানিতেন। রিক্‌শ যে একজনের বেশি লোকে টানে, ইহা আমরা স্বচক্ষে, ভারতের ভাগ্যবিধাতারা যেখানে গ্রীষ্মকালে বিচরণ করেন, সেই সিমলা-শৈলে দেখিয়াছি। সেখানে সাধারণত দুইজনে রিক্‌শ টানে। আবার সময়ে সময়ে পাহাড় চড়াই-উৎরাইতে চারজনে রিক্‌শ টানে বা রিক্‌শ ঠেলে। চারজনের বেশি লোককে রিক্‌শ টানিতে বা রিক্‌শ ঠেলিতে আমরা দেখি নাই। যদি সমুদ্রতল হইতে ৬,৫০০ ফুট উচ্চ সিমলাশহরে চারজনে রিক্‌শ টানে, তাহা হইলে স্বর্গে যে সময়ে সময়ে ইহার বেশি লোকে রিক্‌শ ঠেলিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

মোট কথা, রিক্‌শ আমাদের ভারতের নিজস্ব জিনিস। ভারতেরই একজন রাজা, যিনি মধ্যে স্বর্গের ইন্দ্রত্ব-পদ পাইয়াছিলেন, তাঁহার স্বর্গরাজ্য ইন্‌স্পেক্‌শন করিবার জন্যই ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

"যমদত্ত"

তুবড়ি ও ঝরণা

তুবড়ি বলিছে, আমি আলোকের ঝর্ণা,
অরূপের আমি রূপরঙ্গ,
রঙ্গিন মোর গতি রামধনু-বর্ণা,
উৎসব যাচে মোর সঙ্গ।

২

আলোকের হাসি আমি, আলোকের নৃত্য,
করি শত তারকার সৃষ্টি,
করি রূপ-রসিকের বিমোহন চিত্ত,
চলি তার চঞ্চলি দৃষ্টি।

৩

উজ্জ্বল জীবনের ধারা আমি তুবড়ি,
নাই তমঃ মোর জ্যোতি-বর্ম্মে,
উর্ব্বশী রূপসীর প্রসাধন-চুবড়ি—
তুলনা আমার নাই মর্ত্ত্যে।

৪

রূপ কোথা ঝর্ণার, কোথা বৈচিত্র্য,
শুধু জলো জলসার ছন্দ,

শক্তি সে কোথা পাবে ? বল দেখি মিত্র,
পলে পলে উপলে যে বন্ধ !

৫

কবি বলে, তুমি শুধু আলোকের তুড়ি ত—
দেখিতে দেখিতে লীলা অস্ত ;
তার দান দিকে দিকে হয় বিচ্ছুরিত,
তার ভাণ্ডার অফুরন্ত ।

৬

সহজেই ফেটে তুমি মর মেটে গর্ব্বে,
বারুদের ফিন্‌কুটি বন্দী ;
মহাকাল জেনো তারে, মাথা পেতে ধরবে,—
ধারা চির-সুধানিস্যন্দী ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

There are few subjects, outside sex, religion, and politics, on which such nauseating nonsense is talked as folk-music. Let us beware of assuming that the traditional airs bawled out by the village idiot in his cups are going to change the whole theory of melody.

Stephen Williams

তরুণায়ন

আমার সব-চাইতে ইণ্টারেস্টিং কেস ঘটেছিল, ডাক্তার অর্দ্ধেন্দু বোস বললেন, এই কলকাতাতেই।

বড় ছেলে অনুপমের দশম জন্মতিথি। রাত দশটার পরে নিমন্ত্রিতেরা সবাই চ'লে গেলেন, বাকি রইলেন যাঁরা, তাঁরা আজ যাবেন না। বাড়ির সামনেকার লনে ঈজিচেয়ার বার ক'রে আড্ডা বসল; অর্দ্ধেন্দু, তাঁর স্ত্রী সুনীতি, সুনীতির বোন সুরুচি, সুরুচির স্বামী প্রভাত— পাটনার ব্যারিস্টার, আর বোনেদের ভাই তপেন—মেডিক্যালে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র।

সুরুচি বললেন, অর্দ্ধেন্দুবাবু, একটা গল্প বলুন। শুনেছি, আপনি খুব ভাল গল্প বলেন।

অর্দ্ধেন্দু বললেন, বলি না। তোমাকে যে বলেছে, সে লোক ভাল নয়।

সুরুচি বললেন, দিদি বলেছে।

অর্দ্ধেন্দু খাড়া হয়ে উঠে বসলেন। চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, বিশ্বাস ক'র না।

সুনীতি বললেন, তার মানে? তুমি আমাকে মিথ্যেবাদী বলছ?

অর্দ্ধেন্দু। না, অত্যুক্তিকারিণী বলছি।

সুরুচি। ছি ছি।

অর্দ্ধেন্দু। ছি-ছির কিছুই নয়। পতিব্রতা নারীমাত্রেই স্বামীর গুণপনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অত্যুক্তি ক'রে থাকেন। সেটা সদ্গুণ। কিন্তু তার সবটা বিশ্বাস করলে ঠকতে হয়।

প্রভাত। আপনি তা হ'লে স্বীকার করছেন যে, গল্প ওঁকে আপনি বলেন। শুধু সেগুলো উনি যতটা ভাল বলছেন, আপনার মতে ততটা ভাল হয় না। এই তো?

অর্দ্ধেন্দু। রাইট। গল্প বলি—বলি বললে ঠিক বলা হ'ল না, বলতাম। তবে সেগুলো ভাল হয় না।

সুরুচি। তা হোক, ভালমন্দ আমরা বুঝব। আপনি বলুন।

অর্দ্ধেন্দু। ঐ যে বললাম, গল্প আর আজকাল বলি না।

সুরুচি। আচ্ছা, সেই পুরোনো গল্পই বলুন।

অর্দ্ধেন্দু। বলব না। কারণ, প্রথমত, সুনীতিকে যে সব গল্প তখনকার দিনে শোনাতুম, সে তোমাকে শোনাতে গেলে প্রভাতের চটবার কথা। দ্বিতীয়ত, যে বয়সে সে গল্প বলা যায় ও শোনা চলে, সে বয়স আমার আর নেই, তোমারও সে বয়সটা বোধ করি পেরিয়ে—

প্রভাত। ফোর নাইন্টিনাইন।

অর্দ্ধেন্দু। যাওয়া বারণ। তৃতীয়ত, সে সব এখন ভুলেও গেছি। রুগী আর মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে, কাব্যকলা ওগায়রহ যত রকমের রসের ছিটেফোঁটা প্রাণে এককালে ছিল, তার সবটুকু নিঃশেষে উবে গেছে। এখন শয়নে স্বপনে একমাত্র চিন্তা—কেস। তার বাইরে আর কিছু ভাবতেই সময় পাই না তো গল্প বলা। চতুর্থত, সংসারে যে সব বস্তু নিয়ে গল্প বলা যেতে পারে, ভূত অ্যাড্‌ভেঞ্চার বা প্রেম, এর কোনটারই স্টক আমার নেই। ভূত দেখি নি, অ্যাড্‌ভেঞ্চারের মধ্যে হয়েছিল বিলেত যাবার সময় সী-সিকনেস, আর প্রেমের কথা বইয়েই পড়েছি।

সুরুচি। দিদি, সত্যি?

অর্দ্ধেন্দু। দিদি? কিন্তু সে নিয়ে গল্প হয় না। ওটা রিজার্ভ্‌ড সাবজেক্ট, অপরের অশ্রাব্য ও অপরের সাক্ষাতে অকথ্য অনুচ্চার্য্য।

সুরুচি। সে শুনতেও চাই না। বেশ তো, কেসের গল্পই বলুন না হয়।

অর্দ্ধেন্দু। কেসের গল্প বলতে নেই। ডাক্তারের ডায়েরি গোপনীয় বস্তু। ব্যারিস্টারের নোট-বইয়ের মত প্রকাশ্য আদালতে ও খবরের কাগজে সালঙ্কারে প্রচারণীয় নয়।

সুরুচি। বাজে কথা। বলা যায় না এমন কিছু নেই—এ হতেই পারে না।

অর্দ্ধেন্দু। ডাক্তারের গল্পের মজাই তো ওই। যেটা বলা যায়, সেটা শোনবার মত হয় না। আর যেটা শোনবার মত হয়, সেটা বললে প্রফেশনাল সিক্রেসি ভাঙা হয়।

সুরুচি। ধুত্তোর সিক্রেসি। এত বছর পরে এলাম আমরা কত দূর থেকে, আর উনি খালি সিক্রেসি করছেন!

প্রভাত। ব'লে যান না, কেসে পড়েন আমি সামলাব'। আর আইনে বলে, নিকট-আত্মীয়দের বললে সিক্রেসি-ভাঙার অপরাধ হয় না

অর্দ্ধেন্দু। বিশেষত যখন সেই আত্মীয়দের মধ্যে একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি থাকেন এবং যখন সেই সিক্রেসি-ভাঙার দিকে বড় উৎসাহ থাকে তাঁরই স্ত্রীর এবং যখন সেই স্ত্রী আবার হন নিজের স্ত্রীর আদুরে বোন এবং যখন মনুর আইন অনুসারে নিজের স্ত্রী নিজেরই অঙ্গের সামিল—দেহে আত্মায় ও ডায়েরির অন্তরঙ্গতায়—

সুনীতি চোখ তুলে চাইলেন, কবে আমি তোমার ডায়েরি পড়েছি, শুনি?

অর্দ্ধেন্দু। পড়েছ বলি নি, জান বলেছি। লেখবার আগে শুনলেও জানা হয়।

প্রভাত। May I remind my learned friend that he is digressing from our original issue ?

অর্দ্ধেন্দু। এই সেরেছে। একটু ডাইগ্রেসও করতে পাব না, তাও আবার নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কথা কইতে ?

সুরুচি। না, অতিথিকে অনাদর ক'রে নিজের স্ত্রীকে সম্ভাষণ করতে ব্যস্ত থাকাটা রুচিবহির্ভূত।

সুনীতি। এবং অতিথির অনুরোধ রক্ষা না করাটা গার্হস্থ্যাশ্রমের নীতিবহির্ভূত। গল্প বলাই তোমার উচিত।

অর্দ্ধেন্দু। বাপ, কে বলে প্রপার-নেম্‌রা নন্‌কনোটেটিভ! কিন্তু তা হ'লে তো দেখা যাচ্ছে, গল্প বলতেই হয়।

সুরুচি। এবং কেসের গল্প, খুব ইণ্টারেষ্টিং দেখে।

তপেন। এবং খুব ইন্‌স্ট্রাক্‌টিভ দেখে, যেন শুনে আমার লাভ হয়।

প্রভাত। এবং আইন বাঁচাবার খাতিরে গল্পের রসভঙ্গ না ক'রে।

অর্দ্ধেন্দু। মাভৈঃ, আমার গল্পে রস থাকবেই না, সে ভঙ্গ আর হবে কি ক'রে!

সুরুচি তপেন প্রভাত। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি সুরু করুন তো এবার।

শোন তবে।—অর্দ্ধেন্দু কেসে গলা সাফ করলেন, চুরুটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে ঈজিচেয়ারে চিৎ হয়ে এলিয়ে প'ড়ে মিনিটখানেক চোখ বুজে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলতে সুরু করলেন।—

আমার সব চাইতে ইণ্টারেষ্টিং কেস ঘটেছিল এই কলকাতাতেই। ইউরোপ থেকে ফিরেছি বছর দুই হবে, প্র্যাক্‌টিস তখনও বেশি নয়, মেডিক্যালের চাকরিটি ভরসা। বকুলবাগানে ভাড়াটে বাড়িতে

তখন থাকি, কলেজে ক্লাস নিই, কাটাছেঁড়া করি আর বাকি দিনটার বেশির ভাগই শুয়ে শুয়ে চুরুট টেনে কাটাই। সংসারের দায়িত্ব তখন কম ছিল। পুত্রকন্যারা তখনও আসতে সুরু করেন নি, শুধু অনু আসবে ব'লে নোটিস দিয়েছে। সুনীতি সারাদিন ব'সে ব'সে লাল উলের জামা বুনতে ব্যস্ত। আর আমি ব্যস্ত সাংসারিক চিন্তায়।

প্রভাত। May I be permitted to point out যে, আপনি এইমাত্র বলেছেন, দায়িত্ব কম ছিল। তবে আবার চিন্তা এল কিসের?

অর্দ্ধেন্দু। জোর ক'রে গল্প বলাবে তার ওপর আবার জেরা? আমাকে পুলিসকোর্টের সাক্ষী পেয়েছ নাকি? গল্প শুনবে তো চুপ ক'রে ব'সে যা বলি শোন এবং মেনে নিতে থাক। মনে রেখো, বিশ্বাসে মিলয়ে গল্প, তর্কে বহুদূর। আর কথায় কথায় জেরা করবে তো আমিও এই চুপ করলাম। স্কেপ্‌টিকদের আমি গল্প বলি না।

সুরুচি। না না, আপনি বলুন। তুমি চুপ কর তো। যত ব্যারিস্টারি বিদ্যে এইখেনে! আর সেবার যখন সেই ইয়ে ঘোল খাইয়ে দিয়েছিল—

অর্দ্ধেন্দু। সিভিল কলহেও নালম্‌। প্রভাতের কথার জবাব আমি দিচ্ছি। দায়িত্ব তখনই ছিল না বটে, কিন্তু দায়িত্ব আসন্ন ছিল। অনু নোটিস দিয়েছে, তখনও এসে পৌঁছতে ছ মাস দেরি। অ্যারাইভ করবার আগে তিনি অনুপম হবেন কি অনুপমা হবেন, জানা ছিল না। সেই এক চিন্তা—হাঁ ক'রে এলেই হয় কন্যাদায়। তারপর ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, দুধ-পেরাম্বুলেটারের দাম আছে। ওদিকে চুরুটের দাম চ'ড়ে গেছে, শুয়ে শুয়ে চুরুট টানতে টানতে যে চিন্তা করব, সেই বা আর কদিন করা চলবে কে জানে! মাস অন্তে কুড়িয়ে বাড়িয়ে জোর শ পাঁচেক টাকা তো আয়। এও চিন্তা। কাজেই প্রভাত, দেখতে

পাচ্ছ, দায়িত্ব না থাকলেও চিন্তা থাকবার পক্ষে কোন বিঘ্ন ঘটে নি। আর একটা কথা তোমরা—ইয়ংম্যানরা—প্রায়ই ভুল কর, সেটাও এই সঙ্গেই ব'লে দিই। তোমরা মনে কর, দায়িত্ব না থাকলে লোকের চিন্তা থাকতে পারে না, কিন্তু কথাটা ভুল। বরং দায়িত্ব আসবার আগেই লোকের চিন্তা থাকে, মানে চিন্তা করবার মত ফুরসৎ থাকে। চিন্তা করাটা অবসর সময়ের ব্যাপার, এক রকমের লাক্সারি। দায়িত্ব যখন সত্যি এসে ঘাড়ে পড়ে, তখন আর লোক চিন্তা করবার সময় পায় না, উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কাজেই দায়িত্ব ছিল না, কিন্তু চিন্তা ছিল বললে ভুল বলা তো হয়ই না, বরং দায়িত্ব ছিল না ব'লেই চিন্তা ছিল বললে আরও সায়ান্টিফিকালি সত্যি কথা বলা হয়।

এই সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ জ্ঞানগর্ভ কথা তোমাদের শোনাতে পারতুম, তোমাদের জীবনে কাজে লাগত। কিন্তু সুরুচি এরই মধ্যে ভ্রূকুটি করছে এবং তপেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অতএব গল্প বলাই চলুক।

সেদিনটা রবিবার এবং আমার তখন প্রায় রোজই রবিবার। স্টেট্‌স্‌ম্যানের বিজ্ঞাপনটা পরের উইক থেকে তুলে দোব ভাবছি। রাত তখন নটা হবে, হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরতে ওদিক থেকে আওয়াজ এল, হ্যালো, ডক্টর বোস আছেন?

বললাম, কে আপনি?

আমি xyz-এর রাজা বাহাদুরের বাড়ি থেকে বলছি।

রাজা বাহাদুরের নামটা শোনা ছিল না। বললাম, কি দরকার?

একটা কেসের জন্যে। আপনি যদি কাল সকালে ফ্রী থাকেন—

ফ্রী আমি সারাক্ষণই। কিন্তু সে কথা স্বীকার ক'রে নিজকে খেলো

করতে নেই। অতএব স্টাইলসে বললাম, সকালে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে।

ওদিক থেকে জবাব এল, তাই হবে। আমরা ওর ভেতরেই আপনার ওখানে যাব।

সেই রাত্তিরেই স্থির হয়ে গেল, কম ক'রেও অন্তত এক ছড়া চন্দ্রহার আর একটা হীরে বসানো নথের অর্ডার কালই দিয়ে দিতে হবে, নইলে গৃহের শান্তি আর থাকবে না। পরদিন সকালবেলা চান ক'রে সবে বেরিয়েছি, বেয়ারা এসে কার্ড দিয়ে বললে, বাবু ব্যয়ঠে হেঁয়। কার্ডে দেখলাম, নাম লেখা—Mr P. C. Gosh, Private Secretary to the Raja Bahadur of xyz.

ধীরে-সুস্থে ড্রেস ক'রে নিয়ে ড্রইংরুমে এসে গুডমর্নিঙের অর্দ্ধেকটা ব'লে থেমে গিয়ে দেখলাম, পি. সি. আমাদের প্রফুল্ল। আমাদের সঙ্গেই বি. এস. সি. পাস ক'রে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছিল, থার্ড ইয়ারের মাঝামাঝি হঠাৎ দেশে চ'লে যায়। তারপর আর দেখা হয় নি; যদিও কলেজে সে আমার ভয়ানক বন্ধু ছিল। এবং আরও একটি দরকারী কথা হচ্ছে, তার নাম আদপেই প্রফুল্ল নয়। বুঝতেই পারছ, প্রফেশনাল সিক্রেসির খাতিরে আমি সমস্ত নামটাম বদলে বলব। প্রফুল্ল আমাকে দেখে প্রফুল্লতর হয়ে উঠল। বোঝা গেল, আমার সঙ্গে দেখা হবে বা ডক্টর এ. এস. বোস যে তাদেরই দলের অর্দ্ধেন্দু এটা সে কল্পনা করে নি। তারপর ব'সে দুজনে খুব খানিক আড্ডা দেওয়া গেল, চা সার্ভ করবার অজুহাতে সুনীতিও যোগ দিলে। তার কেসও শুনলাম। রাজা বাহাদুর কোনখানের রাজা নন, নর্থ বেঙ্গলের এক জমিদার মাত্র। রাজা খেতাবটা লব্ধ। বাহাদুর বৃদ্ধবয়সে কেঁচে বিয়ে করেছেন, অতএব যৌবন ফিরে পাবার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। মেডিক্যাল কলেজে

খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, আমি ইউরোপ থেকে ভরোনফ্‌স অপারেশনের স্পেশালিস্ট হয়ে এসেছি। অথ প্রফুল্লর আগমন। সংবাদের শেষে প্রফুল্ল একটু প্রাইভেট হিণ্টও দিলে, বুড়োর·ঢের টাকা এবং ছেলেপুলে নেই, অতএব বুড়ো জোয়ান হবার জন্যে বেজায় ক্ষেপে গেছে। অপারেশনটা যদি ঠিক ক'রে দিতে পারি হাতে বেশ মোটা টাকা মিলবে। এই থেকে বুড়োর সার্কলেও রেকমেণ্ডেড হয়ে যেতে পারি, পারলে পয়সা আছে।

নগদ টাকা আয়ের ফাঁক পেলে ছাড়ব এমন সাত্ত্বিক অবস্থা তখন আমার নয়। প্রফুল্লর সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম। পথে যেতে যেতে প্রফুল্লর ইতিহাস শুনলাম। সেই যে সে বাড়ি চ'লে গিয়েছিল তার বাবার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে, তারপর তিনি মারা গেলেন, ওরং আর পড়া-শোনা করবার মত সংস্থান রইল না। কিছু দিন এদিক সেদিক ঘুরে শেষে এই চাকরিটি পেয়ে গেছে। এখন ভালই আছে। রাজা বাহাদুরের বাড়ি পৌছতে বেশি দেরি লাগলো না। প্রফুল্লই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল। প্রথমেই একটি জিনিস দেখে আশ্বস্ত হলাম, রাজা বাহাদুর নামে রাজা হ'লেও আসলে বেশ ভদ্রলোক। মোটাসোটা নধর চেহারা, টুকটুকে রঙ, এক সময়ে সুপুরুষ ছিলেন তার পরিচয় এখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায় নি। ঈজিচেয়ারে বিরাট দেহভার রেখে চোখ বুজে প'ড়ে ছিলেন, যেতেই শশব্যস্তে উঠে অভ্যর্থনা করলেন। একটু দূরে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি ছোকরা, অবিশ্যি তখনকার হিসেবে, ব'সে ছিল। সেও এগিয়ে এসে কাছে বসল। কথাবার্ত্তা বেশির ভাগই হ'ল আমাতে আর রাজা বাহাদুরে, প্রফুল্ল দরকার মত যোগ দিচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে সে ব্যক্তিটি ফোড়ন দিচ্ছিল। লোকটাকে প্রথমে তত লক্ষ্য করি নি, কিন্তু দুচারবার

অযাচিত ও অহেতুক ফোড়ন দেবার পর তাকে চেয়ে দেখতেই হ'ল। ছিপছিপে চেহারা, এক সময়ে সুন্দর ছিল, কিন্তু অকালে কাঠ হয়ে গিয়ে সবশুদ্ধ এমন একটা আকৃতি দাঁড়িয়েছে যা দেখলেই অশ্রদ্ধা হয়। সাজ-সজ্জায় বাহারের অভাব নেই, কিন্তু তার চেষ্টা এত খারাপ যে চারপাশের স্মার্ট সারাউণ্ডিংয়ের সঙ্গে মোটেই মানাচ্ছে না। আর সব চাইতে বিশ্রী হচ্ছে তার কথাবার্ত্তা, যেমন অমার্জ্জিত তেমনই ইম্‌পুডেণ্ট।

রাজা বাহাদুরকে বললাম, আপনার শরীরটা একবার আমি এগ্‌জামিন করব।

তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, এখানে যদি সুবিধে না হয় বরং ও ঘরটাতে চলুন।

বললাম, ব্যস্ত হবেন না, এখানেই হতে পারবে। তবে তার সঙ্গে সঙ্গে আমি কিছু কিছু কোশ্চেনও আপনাকে করব। একা হ'লেই ভাল হ'ত।

কোশ্চেন করব তো ছাই, আসলে আমার মতলব হচ্ছে, সে লোকটাকে সরিয়ে দেওয়া। সে কিন্তু তার ধার দিয়েও গেল না, বেশ নিশ্চিন্তি হয়ে ব'সে রইল। প্রফুল্ল বেরিয়ে গেল। আমি বললাম, আপনিও একটু কাইণ্ড্‌লি—

সে বেশ অমায়িকভাবে বললে, আমি থাকলে কিছু ক্ষতি হবে না।

আমার গা জ্ব'লে গেল। রাজা বাহাদুর সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, ও থাকলে আমার কোন অসুবিধে হবে না।

আমার রাগ চ'ড়ে গেল। বললাম, আমার হবে। এসব ব্যাপারে আমাদের কতকগুলো প্রফেশনাল কন্‌ভেন্‌শন থাকে।

রাজা বাহাদুর তার দিকে চেয়ে বললেন, তা হ'লে তুমি না হয়—

বলতে তিনি যেন ভারী সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন মনে হ'ল। ছোকরা

উঠে গটগট ক'রে বেরিয়ে গেল। এবং তারপরই শুনলাম, পাশের ঘরে সে প্রফুল্লকে বলছে, এসব হাম্‌বাগ জুটিয়ে আনেন কোথা থেকে? ওঃ, আমরা যেন আর কখনও বড় ডাক্তার দেখি নি।

রাজা বাহাদুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দেখলাম, ভদ্রলোক বিব্রত হচ্ছেন। তাই কথাটা যেন আমি শুনতে পাই নি—এমনই ভাব দেখিয়ে তাঁকে এগ্‌জামিন করতে লাগলাম। শেষ হ'লে দুচারটে প্রশ্ন ক'রে বললাম, আপাতত আর কিছু আমার দরকার নেই। রাজা বাহাদুর ডেকে বললেন, প্রফুল্ল, এঁর হাতটা ধুইয়ে দাও। চাকর জল সাবান আর গামলা নিয়ে এল। ডাক্তারের প্রফেশনাল কন্‌ভেন্‌শন রুগীকে ফোন ক'রে কথা বললেও হাত ধুতে হয়। হাত ধুয়ে বসলে রাজা বাহাদুর বললেন, বলুন এবারে আপনার মতামত।

বললাম, দেখুন, আমার অনেস্ট ওপিনিয়ন যদি চান, আপনার বিয়ে করা উচিত হয় নি।

রাজা বাহাদুরের মুখটা কেমন একটু মলিন হয়ে গেল। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, দেখুন, আপনি সব জানেন না, নেহাৎ দায়ে প'ড়েই আমাকে এই বয়সে আবার বিয়ে করতে হয়েছে। এ কথা সব বুড়োই বলে। আমি চুপ ক'রে রইলাম। রাজা বাহাদুর আবার একটু চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, শুনতে চান তো আপনাকে বলতে আমার বাধা নেই। আমার প্রথম স্ত্রী ছিলেন প্যারালিটিক। ছেলেপুলে তাঁর হবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু তিনি বেঁচে থাকতে আবার বিয়ে করতেও আমি পারি নি। কাজেই এই বয়সে আমাকে বিয়ে করতে হয়েছে।

বুঝলাম, লোকটা নেহাৎ অপদার্থ নয়। একটু লজ্জাও পেলাম। বললাম, মাপ করবেন রাজা বাহাদুর, আমার কথাটা হয়তো একটু রূঢ়

হয়ে পড়েছে। কিন্তু কথাটা সত্যি। আপনার শরীর বাইরে সুস্থ হ'লেও তার কাঠামো শক্ত নয়।

রাজা বাহাদুর বললেন, অপারেশন তা হ'লে করা যাবে না?

বললাম, অপারেশনের কথা ব'লেই নয়। অপারেশন মেজর কেস হ'লেও খুব রিস্কি নয়, তার ধাক্কা সামলাতে হয়তো পারবেন, তাতে ফলও হবার কথা। কিন্তু আপনার জেনারেল হেল্‌থ যা, তাকে শুধু অপারেশন ক'রে সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়। সেইজন্যই বলেছিলাম, আপনার এই বয়সে আবার বিয়ে করা উচিত হয় নি। অবশ্য অন্য কারণ যা আছে আপনি বললেন, সে আলাদা কথা।

রাজা বাহাদুর কিছু বলবার আগেই দোরের কাছ থেকে সেই ছেলেটা ব'লে উঠল, অচ্ছা, আপনার কাজ তো আপনি ক'রে যান, বিয়ের ঔচিত্য অনুচিত্য সম্বন্ধে আপনার ওপিনিয়ন যখন চাওয়া হবে—

আমি বললাম, মাপ করবেন রাজা বাহাদুর, এর পরে আর আমি এখানে থাকতে পারি না।—ব'লে ঘর থেকে সোজা বেরিয়ে এলাম। প্রফুল্লও সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল। বাইরে গাড়ি তখনও দাঁড়িয়ে। আমাদের সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখেই সোফার গাড়ি স্টার্ট দিলে, কিন্তু আমি গাড়িতে না উঠে পাশ কাটিয়ে চ'লে আসতেই প্রফুল্ল আমার হাত ধ'রে বললে, ছি অর্দ্ধেন্দু, সে হয় না। গাড়ি ক'রে না গেলে রাজা বাহাদুর ভয়ানক দুঃখ পাবেন।

আমি বললাম, let him। তোমার তিনি মনিব হ'তে পারেন, কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর এমন কোনও অব্‌লিগেশনের সম্পর্ক নেই, যার জন্যে এর পরেও আমার তাঁকে খুশি করবার জন্যে তাঁর গাড়িতে চড়তে হবে।

প্রফুল্ল বললে, সে কথা নয়। ও যাই বলুক, তুমিও বেশ জান,

কথাটা রাজা বাহাদুরের নয়। তিনি নিজে অতি ভদ্রলোক, সে তুমি নিজেই দেখেছ। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হবেন ব'লেই বলছি, তাঁকে খুশি করবার কথা আমি বলি নি। তা ছাড়া এমনই ক'রে তুমি হেঁটে বেরিয়ে গেলে সোফার দরোয়ান পর্য্যন্ত একটা স্ক্যাণ্ডালের গন্ধ পাবে: আমার নিজের অনুরোধ রাখ, চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ভেবে দেখলাম, তার কথাটা মিথ্যে নয়। অগত্যা গাড়িতে উঠলাম। গাড়িতে দুজনেই চুপ ক'রে ব'সে রইলাম, সারাটা পথ আমাদের একটা কথাও হ'ল না। বাড়ির সামনে এসে নামতে প্রফুল্ল আমার পেছন পেছন নেমে পড়ল। বললে, অর্দ্ধেন্দু, কিছু মনে ক'র না, ভাই, আমি জানতুম না এমন হবে। তোমাকে আমিই টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম, তার জন্যে তোমার কাছে মাফ চাইছি।

আমারও তখন রাগের ঝোঁকটা ক'মে এসেছে, তার কথায় লজ্জা পেলাম। বললাম, চল, একটু ব'সে যাবে। ঘরে এসে বললাম, ছেলেটা কে হে?

প্রফুল্ল বললে, আর ব'ল না ভাই। উনি হচ্ছেন রাজা বাহাদুরের এ পক্ষের শালা, রাণীজীর দাদা। গরিবের ছেলে হঠাৎ বড়লোকের বাড়িতে এসে জেঁকে বসেছে। ঝাঁজে আমরা অস্থির।

দেখলাম, প্রফুল্ল তার ওপর মোটেই প্রসন্ন নয়। বললে, বাড়িতে এক ঝাঁক পোষ্য, আর রাজা বাহাদুরের নিজের স্বভাবটি অতি চমৎকার। চাকর ব'লে কখনও মনে করেন না, নিজের খুড়ো-জ্যাঠার কাছে এর চাইতে বেশি স্নেহ পেতাম না। তাই স'য়ে যায়।

শুনলাম, শালাটি সব দিকেতেই চৌকস। বিদ্যে ম্যাট্রিকের এধারে পৌঁছয় নি, যত রাজ্যের বখামি ইয়ার্কি ক'রেই কাটত। এখন হঠাৎ বোনের কল্যাণে জবরদস্ত হয়ে বসেছে, তার তাড়ায় আর বেয়াড়ামিতে

বাড়িসুদ্ধ লোক অস্থির। কিছুদিন আগে এরই একটা কথায় অপমানিত হয়ে রাজা বাহাদুরের বহুকালের বিশ্বাসী ম্যানেজার পর্য্যন্ত চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চ'লে গেছেন।

বললাম, রাজা বাহাদুর বরদাস্ত করেন কেন?

প্রফুল্ল বললে, বোঝ না, তাঁর হয়েছে সাপের ছুঁচো ধরা, গিলতেও পারেন না, ওগরাতেও পারেন না।

বৃদ্ধস্য তরুণীর সোদর ভাই, তাকে কিছু বললে ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি রাণীর কণ্ঠে উঠতে কতক্ষণ।

বললাম, তা হ'লে তো ভদ্রলোকের চটপট ম'রে যাওয়াই উচিত। আবার অপারেশন ক'রে কেঁচে তাজা হবার সখ কেন? দু ভাই-বোনে মিলে তাঁর দশা নিশ্চয়ই যা ক'রে তুলেছে, বাঁদরের থাইরয়েড কেন কচ্ছপের হার্ট জুড়ে দিলেও ও জান টিকবার নয়।

প্রফুল্ল বললে, এবার ভুল করলে। রাণীজির ভাইয়ের ওপর টান খুবই সত্যি, কিন্তু এমনিতে তাঁর মত মিষ্টি স্বভাব দেখা যায় না। ভাইয়ের দরুন তিনি যে কি লজ্জায় থাকেন, সে না দেখলে বুঝবে না।

বললাম, কি হে, কাব্য করছ যে!

প্রফুল্ল বললে, কাব্য নয়। ম্যানেজারবাবু যেদিন চ'লে যান, রাণীজি নিজে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে বললেন, তার হয়ে আমি আপনার পায়ে ধ'রে মাপ চাইছি, আপনি যাবেন না। আমি যদি আপনার নিজের মেয়ে হয়ে জন্মাতুম, আপনি কক্ষনো এমন ক'রে পরের অপরাধে আমাকে শাস্তি দিতে পারতেন না। ম্যানেজারবাবু যাবার সময় কাঁদতে লাগলেন, বললেন, এর পরে আমার যাওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু আমি তিন সত্যি ক'রে ফেলেছি। তাঁকে কাঁদিয়ে গেলাম, এ দুঃখ আমি মরলেও ভুলতে পারব না। তোমরা আমার হয়ে তাঁকে বলো, আমি মনে কোন

ক্ষোভ নিয়ে যাচ্ছি না, বুড়ো হয়েছি, এখন আমার কাশীবাসের সময়, তাই যাচ্ছি। সত্যি, তার দিন দুই পরেই তিনি কাশী চ'লে গেলেন।

প্রফুল্লর চোখ ছলছল ক'রে উঠল। বুঝলাম এই ম্যানেজারবাবুকে সে সত্যিই ভালবাসে। রাণীজি নেহাৎ পরবশা, নইলে তাঁর ওপরেও এর যা টান, ওকে ভাল ক'রে না জানলে তার একটা সহজিয়া মতের ব্যাখ্যাও দিতে পারতাম, শুনতে মন্দ হ'ত না।

সুরুচি। আচ্ছা, আপনার কি চোখে পড়তো ব'লে কিছু নেই, এমন সুন্দর সিচুয়েশনটার অমন ব্যাখ্যা করতে একটু বাধল না?

অর্দ্ধেন্দু। উঁহু, বাবরে রসের সঙ্গে প্রথমতঃ ডাক্তারদের চক্ষুলজ্জা আর সেন্টিমেন্ট দু'টোরই দারুণ অভাব। দ্বিতী—

সুরুচি। চুপ, আপনার বক্তৃতা আমরা শুনতে চাই না গল্প বলুন।

অর্দ্ধেন্দু। আচ্ছা, গল্পই হোক। কিন্তু ব্যারিস্টার, দেখে রাখ, আমাকে ন্যায্য ডিফেন্স নিতে দিলে না।

প্রভাত। নেভার মাইণ্ড। ওর পাওয়ার অব অ্যাটর্নি মঞ্জুর অ্যাক্ট অব হিন্দু ম্যারেজ অনুসারে আমার ওপর ন্যস্ত আছে। তার জোরে আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি, আপনার বিরুদ্ধে এই অ্যালিগেশন নিয়ে আর বেশি নাড়াচাড়া করা হবে না, যদি আপনি আর তর্ক না ক'রে গল্পটা কন্টিনিউ করেন।

অর্দ্ধেন্দু। অগত্যা। প্রফুল্লকে বললাম, এতই যদি সবাই তাকে নিয়ে অস্থির, তাকে দেশে পাঠিয়ে দিলেই হয়।

প্রফুল্ল বললে, হয় না। হ'লে পাঠানো হ'ত। কিন্তু এর তো রাজামজি তাকে চ'লে যেতে বললে একটা যা চেঁচামেচি কোলাহলের সৃষ্টি হবে, সে দস্তুরমতো স্ক্যাণ্ডাল। রাজা বাহাদুরের ওপরেও বাড়িতে ঘুঘুরা রয়েছেন না, যাঁদের নাম জ্ঞাতি শরিক। তাঁদের ভয়

করতে হয়। আমাদের এমন রাণীজি, যাঁকে মা ছাড়া আর কিছু ব'লে ডাকতে কারও ইচ্ছেই হয় না, তাঁরও উইক স্পট আছে, তিনি ছোট ঘরের মানে এদের তুলনায় গরিবের ঘরের মেয়ে। এর ওপর একটা স্ক্যাণ্ডাল হ'লে ঘরে বাইরে বহু জিভ চঞ্চল হয়ে উঠবে। কাজেই বুঝতে পারছ, ছুঁচোটাকে রাজা বাহাদুর আর রাণীজি দুজনে মিলেই গিলেছেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, শ্রীযুত এখানে তবু সবার চোখের ওপর যা আছেন আছেন, এক রকম মানিয়ে যাচ্ছে। দেশের বাড়িতে তিনি হবেন একেশ্বর, এবং যা কেলেঙ্কারি ক'রে বেড়াবেন সে অনির্ব্বচনীয়।

বললাম, তার মানে?

প্রফুল্ল বললে, মানে সরল। তিনি নিজেকে বলেন নবযুগের তরুণ, এবং তারুণ্যের লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর মতামত অতি আপ-টু-ডেট। কাজেই তাঁর পরকীয়ায় অরুচি নেই এবং কার্য্যক্ষেত্রে জাত-অজাতের সঙ্কীর্ণতাও তিনি মানেন না। জ্ঞাতিরা তাঁর খোঁজ রাখছিলেন ব'লেই একে এখানে এনে রাখা হয়েছে, এক কথায় নজরবন্দী।

বললাম, তা হ'লে সেই বন্দীটা আরও ভাল ক'রে রাখা উচিত, শেকল দিয়ে।

প্রফুল্ল বললে, আমাদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু সেখানেও ওই ভূতের ভয়—স্ক্যাণ্ডাল। জ্ঞাতিদের কান তো ধামার মত পাতাই রয়েছে কিনা। যাক এবারে উঠে পড়ি, অনেক ঘরোয়া কথা ফাঁস ক'রে গেলাম। কিন্তু ঐ কথাটি মনে রেখো ভাই, আমাদের ওপর রাগ ক'র না। আর যদি কিছু মনে না কর, আজকের ভিজিটের টাকাটা—

বললাম, বাড়াবাড়ি করেছ কি ঘুষি মেরে দোব। আমি গরিব মানি, কিন্তু আজকের টাকা আমি নোব না।

প্রফুল্ল সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, জোর করবার মত মুখ নেই, কিন্তু তাঁরা শুনে কতটা দুঃখ পাবেন, তুমি জান না।

বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে শুনল..., প্রফুল্ল দুতিনবার ফোনে আমার খোঁজ করেছে। এবং ব'লে রেখেছে, আমি ফিরলেই যেন তাকে খবর ...ওয়া হয়, খুব জরুরি দরকার। জরুরি এ.. কি থাকতে পারে ভেবে ...লাম না। ফোনে তাকে ডাকতেই সে সাড়া দিলে, সেই দুপুর থেকে তোমার ডাকের ভরসায় ব'সে আছি ভাই। তুমি এখন আবার বেরুচ্ছ না তো?

বললাম, অন্তত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নয়। কেন?

সে বললে, খানিক পরে বলছি, ধর মিনিট পনরো।

ব্যাপারটা বুঝলাম না। কিন্তু বুঝতে দেরিও হ'ল না, যখন মিনিট দশ-বারোর মধ্যেই প্রফুল্ল সশরীরে এসে আমার ড্রইংরুমের দোরে হাজির হ'ল এবং আমি কোন কথা বলবার আগেই ব'লে বসল, একটু রাস্তার ওপর আসতে হচ্ছে ভাই, ওঁরা গাড়িতে ব'সে।

ওঁরা কারা?

রাজা বাহাদুর আর রাণীজি।

সেকি! তাড়াতাড়ি নেমে গাড়ির কাছে এগিয়ে যেতেই, রাজা বাহাদুর রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছিলেন, দুহাত জোড় ক'রে বললেন, সকালবেলার ব্যাপারের জন্যে আমরা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে রয়েছি, তার জন্যে আপনার কাছে মাপ চাইতে এলাম।

বললাম, ছি ছি, ওকি করছেন, আপনি আমার গুরুজনের সমান!

রাজা বাহাদুর বললেন, তা হোক, তখন আপনি আমার বাড়িতে অভ্যাগত ছিলেন। বলুন, মাপ করলেন?

বললাম, মাপ করা-করির কি আছে এতে? তবু বিশ্বাস করুন,

আমার কোন নালিশ আর নেই। সকালবেলাই প্রফুল্লর কাছে আমি সব শুনেছি।

রাজা বাহাদুর বললেন, প্রফুল্লর! আপনাদের আগেকার জানা-শোনা ছিল নাকি?

প্রফুল্ল বললে, আমরা কলেজে একসঙ্গে পড়েছি।

রাজা বাহাদুর বললেন, আর সে কথা তুমি এই সারাদিনের ভেতর আমাকে বল নি! যাক, ডাক্তার যখন প্রফুল্লর বন্ধু, তখন তো—

বললাম, স্বচ্ছন্দে নাম ধ'রে ডাকতে পারেন, আমি একটুও রাগ করব না। তবে আমারও কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে, কষ্ট স'য়ে এতদূর যখন এসেছেন, তখন একবার গরিবের দোরে—

রাজা বাহাদুর বললেন, হাতীর পা? নিশ্চয় পড়বে, চার পা এক-সঙ্গেই পড়বে, চিন্তা ক'র না। তা হ'লে হস্তিনীটিকেও তো ডেকে নিতে হয়।—ব'লে তিনি গাড়ির দিকে একটু এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির দোর খুলে রাণীজি নেমে পড়লেন। বছর একুশ-বাইশ হবে বয়স, পাতলা ছিপছিপে চেহারা। সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় আমি দক্ষ নই, কিন্তু এঁর চেহারাটা কবির ভাষায় বর্ণনা করবার মত। সুনীতি তাঁকে দেখেছে; প্রভাত, তাঁকে দেখে যদি অনেস্টলি বর্ণনা করতে, তা হ'লে সুরুচির চ'টে যাবার কথা হ'ত। সুন্দর শান্ত মুখে ভাসা ভাসা বড় দুটি চোখ, কপালের ওপর একটুখানি ঘোমটা টানা। গাড়ি থেকে নামতে নামতে চকিতে রাজা বাহাদুরের দিকে চেয়ে, অতি সুন্দর একটু ভ্রূভঙ্গি ক'রে ফিসফিস ক'রে বললেন, আঃ, যত বুড়ো হচ্ছ—। তারপর কোনও সঙ্কোচ না ক'রে সামনে এসে নমস্কার ক'রে বললেন, আমাকেও মাপ করলেন তো?

আমি ঠিক কি জবাব দিলাম বলতে পারব না, এ কথাটা সত্যের

খাতিরে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ সেই মুহূর্ত্তটির জন্যে আমার কথা বলবার শক্তি যেন হারিয়ে গেল। আমার সমস্ত অন্তর ভ'রে তখন যার সাড়া পাচ্ছিলাম, সে হচ্ছে একটি অতি অকৃত্রিম ও বিপুল দীর্ঘশ্বাস। মনে মনে বললাম, হায় রে, সুনীতি যদি আমাকে অমন ক'রে ভুরু কুঁচকে বুড়ো বলতে জানত!

সুনীতি। তুমি বুড়ো হও, তখন দেখো বলতে জানব।

অর্দ্ধেন্দু। তেমন ক'রে বলতে পারবে না। এই তো আধ-বুড়ো হয়েছি, ও বেয়াল্লিশও-যা পঞ্চান্নও তাই। কই বল তো তার অর্দ্ধেকও মিষ্টি ক'রে, কেমন পার একটা টেস্ট হয়ে যাক।

প্রভাত। আঃ, digressing again।

অর্দ্ধেন্দু। অস্থির হয়ো না হে আইনজ্ঞ। শুকনো রেলের ওপর কলের গাড়ি চলতে পারে, গল্প চলে না। রস জমাতে হ'লে তার জন্যে অবসরের ইণ্টারস্পেস চাই। তুমি কোর্টে স্পীচ দিতে দিতে বারবার চশমা মোছ না?

সুরুচি। আঃ, একটু ফুরসৎ মিলেছে কি অমনই—

অর্দ্ধেন্দু। মেয়েদের মত খচখচি বাধিয়ে দিয়েছে। যাক, শোন। গরিবের দোরে হাতীর পা বেশ গভীর ক'রেই পড়ল। রাণীজি সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে গিয়ে সুনীতিকে আক্রমণ ও দখল করলেন। এদিকে রাজা বাহাদুর অনেক বার অনেক রকম ক'রে প্রশ্ন ক'রে আমি যে তাঁদের ওপর রাগ ক'রে নেই, তার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে নিলেন; এবং তারপর আর একবার ধ'রে পড়লেন, তাঁর অপারেশন আমাকেই করতে হবে, নইলে তাঁর বিশ্বাস হবে না যে, আমার রাগ সত্যিই ভেঙেছে। শেষ পর্য্যন্ত আমাকেও স্বীকার করতেই হ'ল।

তাঁরা চ'লে যাবার পর সুনীতি মতপ্রকাশ করলে, তার বিবেচনায়

প্রফুল্ল বললে, চল, তোমাকে এগিয়ে দিই।

রাজা বাহাদুর বললেন, বঙ্কু ফিরেছে? তাকে ডাক।

বঙ্কু আসতেই রাজা বাহাদুর বললেন, এঁর কাছে মাপ চাও।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না না, সেকি!

রাজা বাহাদুর বললেন, সেকি নয়। চাইতেই হবে। চাও বলছি মাপ।

বঙ্কু ঘাড় গোঁজ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। মাপ সে মুখ ফুটে চাইবে না, জানা কথা। অথচ তখন না চাইবার মানে আমার মাথাটা আরও ভাল ক'রে কাটা যাওয়া। কাজেই খুব সাত্ত্বিকভাবে সার্মন দিয়ে বললাম, আপনি মিথ্যে একটা সীন ক্রিয়েট করছেন রাজা বাহাদুর। আমি রাগ ক'রে নেই, আপনাকে বলেছি। তার ওপর, উনি বয়সে আমার চাইতে ঢের ছোট। যদিই কিছু অন্যায় ক'রে ফেলে থাকেন, সে যা হবার হয়ে চুকে-বুকে গেছে, তাকে খুঁচিয়ে তোলবার দরকার নেই।—ব'লে চট ক'রে বেরিয়ে এলাম।

বাড়ি ফিরে দেখি—অগ্নিকাণ্ড। সুনীতি রেগে ফুলে যা হয়ে রয়েছে একেবারে পাকা টম্যাটো। কি বার্ত্তা? নিশ্চয়ই সেই নথের অর্ডার দিতে ভুলে গেছি ব'লে। নিজে থেকেই ঘাট স্বীকার ক'রে বললাম, দেবি, প্রসীদ। এক্ষুনি অক্ষয় নন্দীকে ফোন করছি। সুনীতি বললে, নথটথ নয়, আরও গুরুতর ব্যাপার। বললাম, তবে নিশ্চয়ই চন্দ্রহার। কিন্তু তার অর্ডার তো দেওয়া হয়েই যাচ্ছিল, শুধু যদি না—। সুনীতি চ'টে বললে, চুলোয় যাক চন্দ্রহার। এদিকে মানসম্ভ্রম নিয়ে টানাটানি, আর তুমি করছ ইয়ার্কি।—ব'লে চোখে আঁচল দিলে।

অর্দ্ধেন্দু নিবে যাওয়া চুরুটটা ফের ধরিয়ে নিয়ে চিৎ হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে খুব দমভরে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

সুরুচি বললেন, তারপরে ?

অর্দ্ধেন্দু চুরুটে আর একটা জোর টান দিয়ে বললেন, দাঁড়াও, আগে মন ঠাণ্ডা হোক।

প্রভাত বললেন, হয়েছে, বলুন।

অর্দ্ধেন্দু। বাপ রে বাপ, বউয়ের সঙ্গে কথা কইতে দেবে না, চুরুট খেতে দেবে না, এ তো আচ্ছা মাস্টার-মাস্টারণীর পাল্লায় পড়লাম দেখছি ; এমন জানলে আমি গল্প বলতেই বসতাম না।

প্রভাত। If যদি be হয়—থাক। এখন বাকিটা না বললে ব্রীচ অব কণ্ট্রাক্ট।

অর্দ্ধেন্দু। আর এদিকে ব্রীচ অব কণ্ট্যাক্ট হয়ে যাচ্ছিল। শালীর চাইতে চুরুটের সঙ্গে খাতির বজায় রাখবার তাড়া তুমি কম মনে কর ? বিশেষত যখন সেই শালীর বয়স পঁচিশ পেরিয়ে—

সুরুচি। ফের !

অর্দ্ধেন্দু। আইজ্ঞা না। যাক, কান্নাটান্না থামতে সুনীতিকে জিজ্ঞেস করলাম—

সুনীতি। হ্যাঁ, কেঁদেছিল বই কি !

অর্দ্ধেন্দু। আচ্ছা, না কেঁদে থাক, নেই নেই। তারপর কান্না না থামতে সুনীতিকে—। দেখলে গো, সেরে নিয়েছি কিন্তু। হ্যাঁ, সুনীতিকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে। সুনীতি বললে, সেই কে একটা লোক এসেছিল, মানে বন্ধু, তাকে ভয়ানক অপমান ক'রে গেছে। তার যদি অবিলম্বে তীব্র প্রতিকার না করি, তবে তার সঙ্গে আমার এই জন্মের মত বিচ্ছেদ, জীবনে আর কক্ষনো সে আমার রুমালে ফুল তুলে দেবে না। কি ব্যাপার ? না, বন্ধু যখন আসে, সুনীতি তখন ড্রইংরুমে ব'সে খুব নিবিষ্টচিত্তে ক্যাটালগ খুলে পেরাম্বুলেটারের মডেল পছন্দ

করছে—না না, চ'টো না, আই মীন, লাল উলের ছোট্ট সোয়েটার বোনবার জন্যে উলের ডিজাইন পছন্দ করছে। বন্ধু বোধ হয় বাইরে দরোয়ান বরকন্দাজ কারুর সাড়া পায় নি, সে এসে সোজা ঘরে ঢুকেছে এবং তারপর হাঁ ক'রে স্থনীতির দিকে কি রকম ক'রে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কি রকম ক'রে সে তাকিয়েছিল, অবিশ্যি খুব ভাল বুঝলাম না, কারণ আমার দিকে কেউ কখনও কি রকম ক'রে তাকিয়েছে ব'লে মনে পড়ে না। তবে স্থনীতির কথা থেকে বোঝা গেল, সে তাকানোর রকমটা ভাল নয়, মানে স্থনীতির পছন্দ হয় নি। তারপর যখন স্থনীতি পেছন ফিরে তাকে দেখতে পেয়েছে, তখনও সে একটুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নি; যতক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলেছে, সারাক্ষণই তার মুখের ওপর, গলার ওপর এট্সেট্রা চোখ ফিক্স ক'রে বলেছে। স্থনীতির মতে সেটা তার আত্মার ভালত্বের পরিচায়ক নয়। অতএব অবিলম্বে সেই দুরাত্মার শাস্তিবিধান করা চাই।

জ্বালিয়ে তুললে। এদিকে আমার পয়সার অভাব, ওদিকে টাকা আয়ের পথে এসে এই হতভাগাটা বারবার ক'রে জঞ্জাল সৃষ্টি করছে; ওদিকে আবার শাস্ত্রের বিধান, সময়বিশেষে স্ত্রীর সব খেয়াল পূরণ করতে হয়, নইলে ভবিষ্যৎ দেশবাসীর স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা। স্থনীতি তো যা কান্না স্থরু ক'রে দিয়েছে, ঘরে প্লাবন হয় আর কি! প্রভাত সেই যে গেল বারে সঙ্গে টাকা নেই ব'লে বড় হীরে বসানো ব্রোচটা নিতে পারলে না, একটু ছোট সাইজের একটা ব্রোচ কিনে নিয়ে গেলে তখনও স্থরুচি, অত কাঁদতে পার নি।

স্থরুচি বললে, কবে আবার আমি—

অর্দ্ধেন্দু অন্যমনস্কভাবে বাঁ হাতটা একটু তুলে বললেন, আঃ, তর্ক ক'রে রসভঙ্গ ক'র না, আমি এখন ক্রমেই উত্তেজিত হচ্ছি। হতে হতে

শেষে একসময় আমি দস্তুরমত চ'টে গিয়ে স্থির ক'রে ফেললাম, এর একটা হেস্তনেস্ত করবই। তাতে যদি ক্লায়েন্ট হাতছাড়া হয়ে গিয়ে নথটা এ যাত্রা কেনা নাও হয়, সোভি আচ্ছা আমি গরম হয়ে উঠতেই তার আঁচে সুনীতির চোখের জল চট ক'রে বাষ্প হয়ে উবে গেল। বর্ষণশ্রান্ত আষাঢ় রাত্রির অবসানে সদ্য-ধোওয়া কচি ঘাসের ওপরে প্রথম রোদের ঝলকানির মত তার সমস্ত মুখ খুশিতে এমনই ঝকমক ক'রে উঠল যে, আমার তখনকার মত মনেই রইল না নাক থাঁদা ব'লে তার দু-দুবার বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল।

সুনীতি। আঃ।

অর্দ্ধেন্দু। গোল ক'র না। আমি ইদানীং পরিশ্রান্ত, এক নিশ্বাসে অনেকখানি কাব্য ক'রে ফেলেছি। তারপর চ'টে গিয়ে দুম ক'রে ফোন তুলে নিলাম। লালবাজার নয়, প্রফুল্ল। তাকে বললাম, শিগশির এস।

প্রফুল্ল এলে তাকে বন্ধুর কীর্ত্তি বললাম। সে বলবে, আর ব'ল না ভাই। বুঝলে তো কি চীজ। আমরা চব্বিশ ঘণ্টা দেখছি। রাণীজি নিজে তার সামনে গায়ের চাদর খোলেন না।

বললাম, কিন্তু আমি এ স'য়ে যাচ্ছি না, ওর বাঁদরামো আমি ঘোচাব।

প্রফুল্ল বললে, সে যদি পার ভাই, তো আমরাও বেঁচে যাই—রাজা বাহাদুর রাণীজি সুদ্ধ। কিন্তু একটি কথা, মামলা করলে তাঁরা বড় লজ্জায় পড়বেন।

আমি বললাম, সে ইচ্ছে আমারও নেই, থাকলে তোমাকে ডাকতাম না। ঘরের কেচ্ছা নিয়ে কোর্টে যাওয়া আমার পক্ষেও প্যালেটেব্‌ল নয়। দাঁড়াও, সুনীতিকে ডাকি।

তারপর তিনজনে মিলে আমাদের ঘোরতর ওয়ার-কাউন্সিল বসল. প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে অত্যন্ত গোপন পরামর্শের পরে স্থির হ'ল, বন্ধুকে কেসে ফেলা চলবে না, রাজা বাহাদুরকেও বলা হবে না। গুণ্ডা লাগানো চলে কি না, তার আলোচনা শেষ হয়ে ভোটে 'না' খাড়া হতে হতে সাড়ে দশটা বেজে গেল। তার পরের প্রস্তাব ছিল, তাকে নিজেই চাবকে দেওয়া। কিন্তু এগারোটায় আমার একটা এক্সপেরিমেণ্টের ফল জানতে যাবার কথা। প্রফুল্লকে বললাম, আপাতত তা হ'লে ও আলোচনাটা মুলতুবি থাক, বেলা হয়ে গেল। সোফারকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, প্রফুল্লই আমাকে ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে নামিয়ে দিয়ে গেল।

সেদিনটা ছিল বুধবার। বিষ্যুৎ গেল, শুক্কুর গেল, শনিও যায়, চাবুক আর কেনা হয় না। স্থনীতি ঝনঝন ক'রে হাতের চুড়িগুলো খুলে দিয়ে বললে, এই নাও, বিক্রি ক'রে যাও চাবুক নিয়ে এস। আমি বললাম, একটু র'স, আর একবার ভেবে দেখি, চাবুক আর্মস-অ্যাক্টে পড়ে কি না। স্থনীতি রেগে বললে, আর্ম তো এমনিই দুটো দুপাশে ঝুলছে, ওগুলোকেও তা হ'লে কেটে ফেলে দিলেই তো হয়, জামা করতে কাপড়ও কম লাগত। যতই বুঝিয়ে বলি কথাটা নেহাৎই মেয়েমানুষের মত বলা হ'ল, আর্ম কাটা গেলে তখন জানা যাবে তার সঙ্গে আরও কত কি গেল, এবং সে অভাব শুধু আমিই নয়, তিনিও আমার চাইতে কম ফীল করবেন না। কে সে কথা কানে তোলে! সে বলে, হাতে চাবুক না থাকলে পুরুষমানুষের হাত থাকবার কোন মানেই হয় না, ঠিক যেমন সোনার চুড়ি হাতে না থাকলে মেয়েদের হাত থাকা না-থাকারই সামিল। এর পরে বুঝতেই পার, আমার তরফ থেকে একমাত্র লজিকাল উত্তর হচ্ছে যে, তাই যদি তার ধারণ হয়, তবে স্থনীতি খুব ভাল দেখে একটি গাড়োয়ানকে বিয়ে করা

উচিত ছিল। কিন্তু ততদূর এগোবার আগেই একটা ব্যাপার ঘ'টে গেল, যা আশ্চর্য্য এবং অভিনব।

অর্দ্ধেন্দু আর একটা চুরুট ধরালেন, ধীরে ধীরে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, সোমবার খুব ভোরবেলা প্রফুল্ল এসে হাজির হ'ল। শেষ রাত্তির থেকে বন্ধুর হঠাৎ গলাটা ফুলে ব্যথা হয়ে উঠেছে, ভয়ানক পেন, আমাকে এক্ষুনি একবার যেতে হবে। পুনশ্চ সংবাদ, বন্ধু নিজে বারবার ক'রে ব'লে দিয়েছে, আমাকে যেতেই হবে, আমাকে না দেখতে পেলে সে আর কিছুতেই বাঁচবে না স্থির করেছে। তার কোনও অপরাধ যেন আমি মনে না রাখি।

চটপট ওভারকোট চড়িয়ে গাড়িতে চেপে বসলাম। শোবার ঘরে টেবিলে দেশলাই ছিল, স্থনীতি তার ওপরকার কালির ছবিটার দিকে খুব ভক্তিভরে খানিক চেয়ে থেকে, তারপর আশেপাশে কেউ কোথাও নেই দেখে নিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম জানিয়ে মনে মনে বললে, ভগবান, তুমি নিশ্চয় আছ।

স্থনীতি বললেন, হুঁ। তুমি জানলে কি ক'রে?

অর্দ্ধেন্দু বললেন, মনে নেই, শালগ্রাম মুড়ি সামনে রেখে বলেছিলে, যদেতৎ মে হৃদয়ং?

স্থনীতি রেগে বললেন, কক্ষনো বলি নি। আমার ব'লে তখন ঘুমে দুচোখ ভেঙে আসছে—

অর্দ্ধেন্দু। আরে চুপ চুপ, রাগের মাথায় বেফাঁস কথা ব'লে ফেলতে নেই। ব্যারিস্টারকে জিজ্ঞেস কর, এক্ষুনি ব'লে দেবে, চাটিং কেস বড় শক্ত মোকদ্দমা।

প্রভাত। আঃ, কি সুরু করলেন দুজনে! ডক্টর, continue please, মানে ঝগড়া নয়—গল্পটা।

অর্দ্ধেন্দু। বলি। রাজবাড়িতে গিয়ে দেখি বন্ধু শয়ান, গলায় কম্ফর্টার জড়ানো। কণ্ঠার দু পাশ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। ব্যথা আছে, একটু জ্বরও হয়েছে। ব্যথাটা তখন পর্য্যন্ত খুব বেশি ব'লে মনে হ'ল না; কিন্তু যতটুকু হয়েছে এবং আরও যতখানি হবে ব'লে তার ধারণা হয়েছে, এই দুইয়ে মিলে বন্ধুকে একেবারে জেণ্টলম্যান বানিয়ে দিয়েছে। হাউ-মাউ ক'রে বললে, ডাক্তারবাবু, আমি ম'রে গেলাম।

ধমক দিয়ে বললাম, সে যখন মরবেন তখনকার কথা। এখন চুপ করুন, দেখতে দিন।

দেখা শেষ হ'লে রাজা বাহাদুর বললেন, কি দেখলেন?

বললাম, অ্যাকিউট টাইপের টিউমার হয়েছে। কাটাতে হবে।

রাজা বাহাদুর বললেন, টাইপটা কি রকম?

বললাম, খুব মাইল্ড হবার তো কথা নয়, এক রাত্রের মধ্যে যখন এতটা হয়েছে। কাল কিছু টের পান নি?

বন্ধু কেঁদে উঠল, কিচ্ছু না। আমাকে বাঁচান।

বললাম, এক্ষুনি মরবার আপনার কিছু হয় নি। উঠে রেডি হয়ে নিন। অপারেশন আজই করতে হবে, আরও বাড়বার আগে। প্রফুল্লকে বললাম, দেরি না ক'রে মেডিক্যাল কলেজে পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও। আমি তাদের ফোন করছি। বন্ধু আবার হাউমাউ ক'রে উঠল। ওরে বাবা রে, গলা কাটলে আমি ম'রে যাব। আমি ওখান থেকেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলাম।

এগারোটার মধ্যে অপারেশন হয়ে গেল। প্রফুল্লকে তার কাছে রেখে নার্স টার্সের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে বারোটা আন্দাজ বাড়ি ফিরলাম। সুনীতিকে বললাম, বেচারী যা কান্নাকাটি করছিল, তার

ওপর কেমন মায়া প'ড়ে গেল। তায় ডাক্তারের প্রফেশনাল কন্‌ভেন্‌শন আছে, রুগীর ওপর রাগ রাখতে নেই। তাকে একেবারে মাপ ক'রে ফেলেছি। স্থনীতির মুখটা ঠিক পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া গোছের দেখতে হ'ল না।

বিকেলে গিয়ে দেখলাম, বন্ধু ভালই আছে। রাজা বাহাদুর, রাণীজি তাকে তখন দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁরা খুব একচোট ধন্তবাদ জানালেন। আমি বললাম, আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে ভালই হ'ল। খবর আছে।

রাজা বাহাদুর বললেন, কি, জবাব পেয়েছেন ?

বললাম, শুধু জবাব নয়, একেবারে জিনিসই পেয়ে গেছি এখানে একজনের কাছে ; সকালবেলা তাড়াতাড়িতে আপনাকে বলা হয় নি। আর এক ভদ্রলোক নিজের দরকারে আনিয়েছিলেন, তাঁর কাজে লাগবে না। তাঁরও স্থরাহা হয়ে গেল, আমারও।

রাজা বাহাদুর বললেন, তা হ'লে অপারেশনটা কবে করতে চান ?

বললাম, কালই। দেরি ক'রে লাভ নেই।

রাণীজির মুখ মলিন হয়ে গেল। বললেন, একসঙ্গে দুজনই ?

তাঁকে সাহস দিয়ে বললাম, তাতে আর কি হয়েছে ? ওরা শিগগিরই সেরে উঠবেন তো। আপনি যখন খুশি এসে দেখে যাবেন. আমি বন্দোবস্ত ক'রে দোব।

তাই হ'ল, পরদিন রাজা বাহাদুরের অপারেশন করলাম। দিন দুশেকের ভেতর দুজনেই সেরে উঠে বাড়ি চ'লে গেলেন।

অর্দ্ধেন্দু পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে চুরুট টানতে লাগলেন।

স্থরুচি বললেন, তারপর ?

অর্দ্ধেন্দু বললেন, তারপর আর নেই। বছর দুই পরে স্থনীতিকে

সঙ্গে ক'রে গিয়ে অন্নপ্রাশনের নেমতন্ন খেয়ে এসেছি। And they have been blessed with the brightest boy I have ever seen, মানে আমার ছেলেপিলে ছাড়া।

তপেন বললে, আর সেই বন্ধু?

অর্দ্ধেন্দু বললেন, বর্ত্তমান খবর জানি না, অন্নপ্রাশনের সময় শেষ দেখেছি। দারুণ মোটা হয়েছে আর স্বভাবটা একদম বদলে গেছে। এখন সে অত্যন্ত শান্তশিষ্ট লোক। আমাকে যে ভক্তিশ্রদ্ধাটা দেখালে, সুনীতি পর্য্যন্ত ঈর্ষান্বিতা। প্রফুল্লকে বললাম, ভারী বাধ্য হয়ে পড়ছে তো হে, কত লোকেরই তো হাত পা গলা কাটি, এমন ভক্ত রুগী আর কখনও পাই নি।

প্রফুল্ল বললে, শুধু তুমি ব'লে নয়, ওর স্বভাবটাই এখন অমনই হয়ে গেছে। আগের আর কিছু বাকি নেই। রাণীজি কালীঘাটে জোড়া মোষ দিয়েছেন।

অর্দ্ধেন্দু উঠে দাঁড়ালেন, আর নয় রাত ঢের হ'ল।

সুরুচি বললেন, এটা একটা গল্প হ'ল? মিথ্যে খানিক বাজে বকুনি শোনালেন।

অর্দ্ধেন্দু বললেন, কি করব, আমি তো ব'লেইছিলাম, গল্প বলতে পারি না। আমার কাজ ছুরি ছোরা নিয়ে, আমি কি ব্যারিস্টার যে, অনর্গল সুসজ্জিত রোমাঞ্চকর মিথ্যে ব'লে যাব!

সুরুচি ঠোঁট ফুলিয়ে বললেন, যান যান, আর ইয়াকি করতে হবে না, যত সব বাজে কথা ব'লে রাত জাগালেন।

অর্দ্ধেন্দু নিঃশব্দে চাদরটা তুলে গলায় ফেললেন।

সুরুচি আপীল করলেন, দেখ তো দিদি, এতে রাগ হয় না?

সুনীতি স্মিতমুখে বললেন, হয়, কিন্তু হওয়া উচিত নয়।

প্রভাত বললেন, আপনি তো ওঁর হয়ে বলবেনই। কেন উচিত নয়, শুনতে পাই ?

সুনীতি বললেন, পান। গল্পটার সবটা আপনারা শোনেন নি। একটুখানি বাকি আছে।

তপেন সুরুচি প্রভাত কোরাসে বললেন, কি ? কি ?

সুনীতি বললেন অ্যান্থ্রোপয়েড গ্ল্যাণ্ড পাওয়া যায় নি। রাজা বাহাদুরের অপারেশন হয়েছিল বঙ্কুর থাইরয়েড নিয়ে।

সুরুচি প্রভাত তপেন। তার মানে

অর্দ্ধেন্দু। সুনীতি, তুমি ডায়েরি পড় না বলেছ।

সুনীতি। পড়ি না, তুমিই বলেছ। কিন্তু এও বলেছ যে, শুনি এবং কাজেই ইচ্ছে করলে বলতেও পারি, কারণ আমার প্রফেশনাল ভাউ নেই।

তপেন সুরুচি। দিদি, বল।

প্রভাত। বলুন।

সুনীতি। ওঁর প্ল্যানমত প্রফুল্লবাবু বঙ্কুকে একটা ব্যাকটিরিয়া অ্যাড্মিনিস্টার ক'রে দেন। তাই তার থাইরয়েড ফুলে উঠেছিল। উনি অপারেশন ক'রে তার থাইরয়েড বার ক'রে নেন এবং সেটাকেই পরিষ্কার ক'রে নিয়ে রাজা বাহাদুরের শরীরে বসিয়ে দেন।

সুরুচি উত্তেজিতভাবে বললেন, অর্দ্ধেন্দুবাবু, সত্যি ?

অর্দ্ধেন্দু উদারভাবে বললেন, নিজের মুখে কিছু স্বীকার করা প্রফেশনাল কন্ভেন্শনের বহির্ভূত। স্ত্রী যা খুশি বলুক, সেটা আদালতে গ্রাহ্য নয়, কারণ বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, মেয়েরা স্বামীর কীর্ত্তিকাহিনী বাড়িয়ে বলতে গিয়ে এমন অনেক কিছু বলে, যা তাদের বোনরা বা ভগ্নীপতিরা বিশ্বাস করলেও অন্য লোকে করবে না।

সুরুচি। হেঁয়ালি নয়, সত্যি বলুন।

অর্দ্ধেন্দু। ভদ্রে, ভ্রূকুটি করলেই অমনই ভড়কে গিয়ে একটা যা তা খারাপ কথা স্বীকার ক'রে ফেলব, সে বয়স আমার আর নেই।

প্রভাত। আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?

অর্দ্ধেন্দু। Provided it will be nothing to incriminate me।

প্রভাত। না, অতি অ্যাকাডেমিক প্রশ্ন। মানুষের গ্ল্যাণ্ড নিয়ে অপারেশন হয় ?

অর্দ্ধেন্দু। অ্যাকাডেমিকালি বলতে পারি, না হবার কোন কারণ নেই। বরং মানুষের গ্ল্যাণ্ডই মানুষের পক্ষে সব-চাইতে সুটেড। মানুষের পাওয়া যায় না ব'লেই বাঁদরের গ্ল্যাণ্ড নিতে হয়। আর সে বাঁদর জাতে মানুষের যত কাছাকাছি হয় ততই ভাল।

তপেন। আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি ?

অর্দ্ধেন্দু। Oh yes, you are a student।

তপেন। কি ব্যাক্‌টিরিয়া ব্যবহার করেছিলেন ?

সুনীতি। আমি বলছি। Strepto-Staphylococcus।

তপেন। কিন্তু তাকে না জানিয়ে ইন্‌জেক্ট করলেন কি করে ?

অর্দ্ধেন্দু। তুমি কলেজ ছেড়ে দাও। এইটুকু জ্ঞান নেই যে ডিজীজ্‌ড গ্ল্যাণ্ড নিয়ে অপারেশন হয় না, তোমার কিছু হবে না।

তপেন। তবে ?

অর্দ্ধেন্দু। ইয়ংম্যান, আরও বয়েস হোক, তখন জানবে, স্ত্রীকে প্রসন্ন করবার জন্যে মানুষ গণ্ডার মারে, তাজমহল বানায়, উপস্থিতমত দুচারটে রুচিকর কথা ব'লে দেওয়া তো সামান্য কথা।

সুনীতি। তার মানে ? তুমি আমাকে তখন ঠকিয়েছিলে ?

অর্দ্ধেন্দু। আহা, ছেলেমানুষকে শান্ত করতে কি বললাম, তুমি তাতে কান দিচ্ছ কেন ? তোমায় আমায় কি সেই সম্পর্ক ?

প্রভাত। উহুঁ, ব্যাপারটা বুঝে নিতে হচ্ছে। Where are we standing exactly ?

অর্দ্ধেন্দু। এই লনের ওপর।

প্রভাত। Hang it, এতক্ষণ ধ'রে আমরাই বোকা বনলাম, না উনিই এতদিন ধ'রে বোকা ব'নে ছিলেন?

অর্দ্ধেন্দু। (ঈষৎ হেসে) ওহে, জগৎটা গোলমেলে জায়গা, এর কোথায় কে কখন কি ভাবে বোকা বনে, তার মীমাংসা করা কি সহজ কথা! রাত অনেক হয়েছে, সব শুতে যাও। সম্বুদ্ধ

আলোকচিত্রে প্রগতি (১)

দি রাইট মোমেণ্ট

চিনাবাদাম

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া কম্প্যাস ছাড়াই দিকনির্ণয় করিতে গেলে যে অবস্থা হয়, পিনাকীলালের অনেকটা সেই অবস্থাই হইল। সে চুপচাপ আসিয়া মনুমেণ্টের তলায় বসিয়া পড়িয়া একটা সিগারেট ধরাইল। না ধরাইলেও হইত, তবু ধরাইল। "নেই কাজ তো খই ভাজ" কথাটাকে বদলাইয়া পিনাকীলাল করিয়া লইয়াছে, "নেই কাজ তো ধরা সিগারেট"। কেন না, খই ভাজা অপেক্ষা সিগারেট ধরানোর হাঙ্গামা অনেক কম।

আজ পিনাকী যেন হঠাৎ দার্শনিক হইয়া গিয়াছে। সব কিছুই সে দর্শন করিতেছে চর্ম্মচক্ষু দিয়া নহে—দর্শনের চক্ষু দিয়া। উপরের দিকে চাহিয়া সে দেখিল, ঠিক যেন মনুমেণ্টেরই মাথার উপর দিয়া কয়েক খণ্ড নির্জ্জলা স্বচ্ছ সাদা মেঘ উড়িয়া যাইতেছে। পিনাকীর মনে হইল, মনুমেণ্ট সিগারেট বুঝি সাদা ধোঁয়া ছাড়িতেছে।

মালবিকা তাহাকে ইডিয়ট বলিয়াছে, জানোয়ার বলিয়াছে, বলিয়াছে আরো অনেক কিছু। তা বেশ করিয়াছে। আর কয়টা দিন যাক না। তারপর আবার ঠিক ঐ কথাগুলিরই উল্টা কথা অভিধান দেখিয়া দেখিয়াই হয়তো বলিবে। কয়টা দিন কি আর সহ্য করিয়া থাকা যাইবে না? কেন যাইবে না? চেষ্টা করিলে পৃথিবীতে কি না সহ্য যায়? পিনাকী মনুমেণ্ট দেখিতে লাগিল।

পিনাকী ইতিহাস জানিত। মনুমেণ্ট দেখিয়া তাহার মনে পড়িল সাহেব অক্‌টার্লোনির কথা। পড়িয়াই তাহার মনটা করুণ রসে ভরিয়া উঠিল, দুঃখ হইল সাহেবের জন্য। মনুমেণ্ট আছে, অক্‌টার্লোনি

নাই। স্মৃতিস্তম্ভ আছে, স্মৃতি নাই। লক্ষ লক্ষ লোক মনুমেণ্ট দেখে, তাহাদের মধ্যে ইতিহাস কয়জন জানে? যাহারা জানে, তাহাদের মধ্যেই বা কয়জন মনে করে? বুদ্বুদের মত স্মৃতি মিলাইয়া গিয়াছে, খাড়া আছে স্মৃতিস্তম্ভ। স্মৃতির চেয়ে স্মৃতিস্তম্ভই কি বড়? পিনাকী ভাবিতে লাগিল।

ক্রমে অকটার্লোনি হইতে সিপাহী-বিদ্রোহের কথা মনে হইল। হায়! সে সব দিন এখন কোথায়? তখনকার দিনে কোনও রাত্রে আজিকার রাত্রের মত এই জায়গায় এমন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবার কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত কি? তখন এই সবুজ মাঠই হয়তো নররক্তে ও অশ্বরক্তে লাল হইত। এখন ঐ ওখানে কয়েকটা ফাজিল ছোকরা প্রেমের গল্প করিতে করিতে হো হো করিয়া হাসিতেছে তখনকার দিনে কত লোক ঠিক ঐখানেই হয়তো ওহো হো করিয়া কাঁদিয়া আর্তনাদ করিয়াছে। সময়ের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! সময়-বহুরূপীর অদ্ভুতরূপ পরিবর্ত্তনের কথা ভাবিতে ভাবিতে পিনাকীলাল নিজের কথা ভুলিয়া গেল।

এভাবে কতক্ষণ সে নিজেকে ভুলিয়া থাকিত বলা শক্ত, কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ "চিনাবাদাম চাই বাবু, গরমাগরম" কথাটা কানে যাইতেই সে আবার নিজের কথা ভাবিতে লাগিল। কারণ, সে-ই চিনাবাদামওয়ালার লক্ষ্য। তাহার যে চিনাবাদাম দরকার, সে কথা লোকটা যেন কি করিয়া আন্দাজ করিয়াছিল।

লোকটা বাঙালী নহে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, তাহার বাড়ি মুঙ্গের জিলায়। শুনিয়া পিনাকীর মন সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সুদূর মুঙ্গের হইতে আসিয়া বাঙালী বাবুদের জন্য সে চিনাবাদাম ভাজিয়া ফিরি করিতেছে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সবাইকে হয়তো সে

দেশেই ফেলিয়া আসিয়া এই বিদেশে তাহাদের বিরহ-ব্যথা মুখ বুজিয়া সহ্য করিতেছে। হয়তো বা কখনও কখনও ব্যথা এত গভীর হইয়া উঠে যে, সে তাহার ঐ ময়লা কাপড়ের আঁচল দিয়াই চোখের জল মুছিয়া ফেলে। হয়তো কত রজনীতে বিরহিণী প্রিয়ার কথা ভাবিয়া অশ্রুজলে বালিশ ভিজাইতে ভিজাইতে সে জাগিয়া থাকে। নির্ম্মম বিধাতার এই নির্ম্মম বিধানের রহস্য বহু চেষ্টাতেও হয়তো সে ভেদ করিতে পারে না। আর ওদিকে হয়তো সুদূর মুঙ্গেরে জনৈক মুঙ্গেরী নারী কাতরপ্রাণে সুদূর বাংলা হইতে তাহার স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় দিন গুনিতেছে। হয়তো সেও বিধাতার এই হৃদয়হীন বিধানের নিন্দা করিতেছে। হয়তো স্বামী বাংলার টাকা মাঝে মাঝে মনি-অর্ডার করিয়া পাঠায় এবং সেই টাকাই স্বামীর স্পর্শমাখানো বলিয়া কত আদরে সে বক্ষে চাপিয়া ধরে। বিধাতা কর্ত্তৃক বাংলায় নির্ব্বাসিত পিতার জন্য তাহার কচি কচি ছেলেমেয়েগুলি হয়তো কত কাঁদে, কিন্তু সে কান্না হয়তো বা নির্ব্বাসিত পিতার প্রাণে গিয়া আঘাত করে, তবু বিধাতার পাষাণ প্রাণে আঘাত করে না।

এই রকম কত শত মুঙ্গেরী দীর্ঘশ্বাসে বাংলার আকাশ-বাতাস ভরিয়া আছে, কে তাহার হিসাব রাখে? শুধু মুঙ্গেরই বা কেন? ভারতের বহু প্রদেশের বহু জিলার এইরূপ কাতর আর্ত্তনাদে বাংলার আকাশ ছাইয়া গেল, বাতাস ভারী হইয়া গেল। হে বাঙালী! তাহা কি শুনিতে পাও নাই? সে আর্ত্তনাদ শুনিয়া কোনদিন এক ফোঁটা অশ্রু ঝরাইয়াছ কি? এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়াছ কি?

মনুমেণ্টের তলায় বসিয়া বসিয়া এভাবে চিন্তা করিতে করিতে পিনাকী আকুল হইয়া উঠিল। মনুমেণ্টের উপর দিয়া তখনও দুই এক খণ্ড সাদা মেঘ উড়িতেছে।

চিনাবাদামওয়ালা কহিল, "গরমাগরম চিনাবাদাম, বাবু।" তাহার কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত রকমের আকুতিপূর্ণ করুণ ছলছল ভাব। শুনিয়া পিনাকীলালের দুইটি নয়ন-শতদলে অশ্রু-শিশির টলমল করিয়া উঠিল।

পকেট হাতড়াইয়া পিনাকী দেখিল, একটি মাত্র পয়সা রহিয়াছে।

তাহাই বাহির করিয়া সে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে কহিল, "দে যাও এক পইসাকা।"

চিনাবাদাম দিয়া চিনাবাদামওয়ালা চলিয়া গেল। গরমাগরম চিনাবাদাম মুহূর্ত্তে কিরূপে ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে পারে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে মনুমেণ্টের তলায় বসিয়া পিনাকী ঠাণ্ডা চিনাবাদাম খাইতে লাগিল।

শ্রীঅক্রুব

আলোকচিত্রে প্রগতি (২)

দি রাইট অ্যাঙ্গেল

'আনন্দমঠে' অনৈতিহাসিকতা

(আলোচনা)

পৌষ মাসের (১৩৪৪) 'শনিবারের চিঠি'তে "সোনার বাংলা'র পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত আমার "'আনন্দমঠে' অনৈতিহাসিকতা" শীর্ষক প্রবন্ধটির একটি "সমালোচনা" পড়িলাম। ইহাকে ঠিক সমালোচনা বলিতে পারি না। কারণ, ইহা গালাগালিতে ভরা; এবং এই গালাগালি মনে হইতেছে যেন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-প্রসূত। তাহা না হইলে সমালোচক মহাশয় মূল বিষয়টি ছাড়িয়া দিয়া একটি সামান্য অবান্তর কথা লইয়া মিছামিছি এতটা ঘাঁটাঘাঁটি করিতেন না এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ব্যতিরেকে এতটা গাত্রদাহের অন্য কোন কারণও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গালিবর্ষণ ও অভিসন্ধি আরোপের সুলভ সুযোগ পাইয়া তিনি তাহার পূর্ণ "সদ্ব্যবহার" করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বুঝা উচিত ছিল যে, কটূক্তি যুক্তি নহে। বোধ হয়, ইহা ভদ্রতাও নহে; এবং এই প্রকার সমালোচনা শিষ্টজনানুমোদিতও নহে।

যদিও একশ্রেণীর লোকের মত সমালোচক মহাশয় অনেক আবোলতাবোল বকিয়াছেন, তথাপি তিনি আমার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি এক প্রকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে তিনি "বিজ্ঞের" মত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে "মীরজাফরের মত ব্যক্তিকে দশ বিশ বৎসর আগে পরে কবর দিলে উপন্যাস তো দূরের কথা ইতিহাসেরও কিছু আসে যায় না।" এই প্রকার মনোবৃত্তি লইয়া ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে—যতই তাঁহারা নিন্দনীয় হউক না কেন—কিছু বলিতে যাওয়া, সমালোচক মহাশয়ের নিজের কথায় বলিতে গেলে, নিতান্ত "ধৃষ্টতা" ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি যাহাই বলুন না কেন, আমি এখনও মনে করি যে "যেখানে উপন্যাস রচনা করিতে যাইয়া ঔপন্যাসিক ইতিহাসের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানে প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা বা তথ্যগুলি সম্বন্ধে তাঁহার পাঠকগণের মনে তাঁহারও ভুল ধারণা উৎপাদন করিবার কোন অধিকার নাই"। বঙ্কিমবাবু নিজেও এই মত পোষণ করিতেন। তাহার প্রমাণ, তাঁহার 'আনন্দমঠের' "তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন" ও "পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন" পড়িলেই পাওয়া

যাইবে। এ সম্বন্ধে আমি আমার প্রবন্ধে পূর্ব্বেই সবিস্তারে লিখিয়াছি। সুতরাং এখানে আর বেশি কিছু বলিব না। তবে মাত্র এইটুকু বলিতে চাই যে, ইতিহাসের সহিত উপন্যাসের সমন্বয় রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পরবর্ত্তী প্রয়াস দেখিয়া আমি এই দাবি করিতে পারি যে, আমি আমার আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁহার প্রিয় কার্য্যই করিয়াছি।

"ছিয়াত্তরের' মন্বন্তরের জন্য কে বা কাহারা দায়ী, বা কেনই বা ঐ মন্বন্তর হইয়াছিল, ঐ সব বিষয়ে আমি কোনও মত আমার প্রবন্ধে প্রকাশ করি নাই। কারণ তাহা আমার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল না। আমার মূল কথাটি বলিতে যাইয়া প্রসঙ্গত আমি কেবলমাত্র বলিয়াছি যে 'বাংলা ১১৭৬ সালে (ইংরাজি ১৭৬৯-৭০ সালে) মীরজাফর জীবিত ছিলেন না। ঐ সময়ের অনেক পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, এবং ঐ সময়কার ঘটনাবলীর জন্য তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা যায় না'। এই মত আমি এখনও পোষণ করি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ সম্বন্ধে সমসাময়িক অনেক দলিলপত্র (records) Imperial Record Office এ (New Delhi) আছে। জানি না, সমালোচক মহাশয়ের সেই সব দলিল দেখিবার সুযোগ হইয়াছে কি না। বোধ হয়, না। কারণ তাহা হইলে এ সম্বন্ধে যে সব মত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তিনি অত সহজে করিতেন না। অজ্ঞতার একটা মস্ত সুবিধা আছে। সেটা এই যে কোন একটা বিষয়ে অতি সহজে মতামত প্রকাশ করা যায়। কিন্তু একটা জিনিসের সব দিক জানা থাকিলে সহজে কোনও মতামত প্রকাশ করা যায় না। আমি Imperial Record Office এ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্বন্ধে সমস্ত সমসাময়িক কাগজপত্র পড়িয়াছি, এবং জানি, কেন এ মন্বন্তর হইয়াছিল। কিন্তু সে কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। সেইজন্য সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব না। তবে মাত্র এইটুকু বলিতে চাই যে, দুই একখানা স্কুলপাঠ্য পুস্তক পড়িয়া বা দুই একখানা উপন্যাস পড়িয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা ঠিক নহে।

দ্বিতীয়ত, সমালোচক মহাশয় একটি ফুটনোটে বলিয়াছেন—

"দেবব্রতবাবু Forrest, Malcolm এবং Mill এর ভুল দেখাইয়া বাহবা লইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন বহির কোন পৃষ্ঠায় ভুল আছে কিছু লিখেন নাই। অন্তত Forrest সাহেব মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে ভুল করেন নাই। 'He (*Meer Jafar*) fell seriously ill...died at this (his হওয়া উচিত ছিল)

capital on February 6, 1765. (See Forrest, *Life of Lord Clive*, Vol. ii, p. 256, line 6 from top) সুতরাং প্রমাণ হইতেছে, দেবেন্দ্রবাবু এই সর্ব্বজনপরিচিত বহিখানা না পড়িয়াই Forrest সম্বন্ধে এই মন্তব্য করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন "রাজনীতি"র অধ্যাপকের পক্ষে ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা"।

এই মন্তব্যে সমালোচক মহাশয়ের মাত্রাজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। James Mill, Sir John Malcolm বা Sir George Forrest-এর মতের ভুল দেখানো আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল না। কাজেই সে সম্বন্ধে সবিস্তারে লিখিবারও কোন আবশ্যকতা ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে আমি তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমি লিখিয়াছিলাম—

"এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শুধু বঙ্কিমবাবু কেন, James Mill, Sir John Malcolm, Sir George Forrest প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা ঐতিহাসিকও মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে ভুল সংবাদ দিয়াছেন। এমন কি, পার্লামেন্টের একটি রিপোর্টেও এই বিষয়ে ভুল সংবাদ রহিয়াছে"।

সমালোচক মহাশয়ের এতটুকু "সাধারণ বুদ্ধি" থাকা উচিত ছিল যে, যখন আমি এই গ্রন্থকারদের সম্বন্ধে একটি উক্তি করিয়াছি, তখন তাঁহাদের লিখিত পুস্তকগুলি না দেখিয়া ঐ প্রকার উক্তি করি নাই। প্রকারান্তরে তিনি আমাকে তাঁহাদের ভুল দেখাইতে বলিয়াছেন। আমি আনন্দের সহিত তাঁহার এই "চ্যালেঞ্জ" গ্রহণ করিতেছি। যাহা ঠিক নহে, তাহাই ভুল। আশা করি, ভুলের এই সংজ্ঞা তিনি গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন না। সরকারী দপ্তরখানায় রক্ষিত সমসাময়িক দলিলের সাহায্যে আমি আমার আলোচ্য প্রবন্ধে নিঃসংশয়ভাবে দেখাইয়াছি যে, মীরজাফরের মৃত্যুর ঠিক তারিখ হইতেছে ১৭৬৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী। Forrest সাহেব বলিয়াছেন (*The Life of Lord Clive*, Vol. ii, 1918, p. 256), "He (Mier Jaffier বা Mir Jafar) ...died at his capital on February 6, 1765." Sir John Malcolmও বলিয়াছেন (see his *Life of Robert, Lord Clive*, 1836, Vol. ii, p. 291 & the footnote on the same page) যে, মীরজাফর ১৭৬৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী মারা গিয়াছিলেন। James Mill বলিয়াছেন, (see his *History of British India*, 4th Edition, by H. H. Wilson, Vol. 3, 1848, p. 356) যে, মীরজাফর "died

in January, 1765." সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, Forrest, Malcolm বা Mill মীরজাফরের মৃত্যুর ঠিক তারিখ দেন নাই। এবং আমি যে Parliamentary Report-র উল্লেখ করিয়াছি, তাহার নাম হচ্ছে: 'The Third Report of the Select Committee (House of Commons) on the Nature, State, and Condition of the East India Company', dated 8th April, 1773। এই Report-এর এক স্থানে লেখা আছে: "That at the death of Myr Jaffier, which happened in the month of January in the year 1765,..."। আশা করি, সমালোচক মহাশয় এখন স্বীকার করিবেন যে, তাঁর "ইষ্ট দেবতারা" মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ ভুল দিয়াছেন। তবে যদি তিনি বলেন যে, তাঁহারা ভুল করিতে পারেন না, যেহেতু তাঁহাদের গায়ের রং কটা, তাহা হইলে অবশ্য আমার কিছু বলিবার নাই। Forrest সাহেব এক সময় ছিলেন ভারত গভর্ণমেণ্টের Director of Records। সুতরাং তাঁর পক্ষে ভুল তারিখ দেওয়া কোনও মতেই সমর্থন করা যায় না। যাক।

Forrest সাহেবের বইগুলি আমাকে অনেক সময়ই নাড়াচাড়া করিতে হয়। তার একটি প্রমাণ ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত আমার *Early Land Revenue System in Bengal and Bihar*, Vol. I. 1765-1772, Longmans, p. 213 দেখিলেই সমালোচক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন। আরও প্রমাণ আমার আর একখানি বহিতে শীঘ্রই পাইবেন; আরও প্রমাণ দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা দিব না। কারণ, সেটা নিতান্ত ছেলেমানুষি হইয়া যায়। সমালোচক মহাশয় Forrest সাহেবের যে বইখানির নাম ফুটনোটে উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানি না পড়িয়া আমি তাঁর সম্বন্ধে মত প্রকাশ করি নাই। সুতরাং আমার "লজ্জিত" হইবার কোনও কারণ নাই। বরং যে উদ্‌ভ্রান্ত সমালোচক মহাশয় পরের লেখার সমালোচনায় নিজের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার এবং ভদ্রতা ও মাত্রাজ্ঞানের অভাবই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাঁহারই লজ্জিত হওয়া উচিত। তিনি এতটা উদ্‌ভ্রান্ত না হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, Forrest সাহেবের গ্রন্থখানি আমি দেখিয়াছি কি না। বোধ হয় তিনি দেখিয়াও দেখেন নাই।

আমি আমার আলোচ্য প্রবন্ধের কোনও স্থানেই বলি নাই যে, আমিই সর্ব্বপ্রথম মীরজাফরের মৃত্যুর ঠিক তারিখ দিয়াছি। সুতরাং তিনি এইরূপ মনে করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না।

এখন কথা উঠিতে পারে যে, আমি কেন সরকারী দপ্তরখানায় রক্ষিত সমসাময়িক দলিলের সাহায্য লইলাম। তাহার একমাত্র কারণ যে, মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়ভাবে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দিতে চাহিয়াছিলাম। যখন দেখিলাম যে, Parliamentary Report, James Mill, Sir John Malcolm, Sir George Forrest, Peter Auber (*Rise and Progress of the British Power in India*, Vol. 1, 1837, p. 98), William Bolts (*Considerations on India Affairs*, 1772, p. 43, এ বইখানা বোধ হয় সমালোচক মহাশয়ের দেখিবার সুযোগ হয় নাই), Edward Thornton (*The History of the British Empire in India*, 1841, Vol. 1, p. 467), *The Cambridge Shorter History of India* (edited by Prof. H. H. Dodwell), Part III, 1934 প্রভৃতির মধ্যে মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ * রহিয়াছে, তখন এই সম্বন্ধে সরকারী দপ্তরখানায় রক্ষিত সমসাময়িক দলিলগুলিকেই চূড়ান্ত প্রমাণস্বরূপ দেওয়াটা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলাম। ইহাতে ঐতিহাসিক এবং রসজ্ঞ সমালোচকগণের কোনও আপত্তি হইবার কারণও দেখি না। ইংরাজ আমলে ভারতের বা বাংলার যথার্থ ইতিহাস জানিতে হইলে কয়েকখানি সাহেবের বা এদেশী লোকের লেখা পুস্তকই চূড়ান্ত গ্রন্থ নহে। সমসাময়িক হস্তলিখিত দলিলগুলিই (records) এ বিষয়ে চরম প্রমাণ। সমালোচক মহাশয়ের বোধ হয় এই সব records দেখিবার কোনও সুযোগ হয় নাই। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তিনি কয়েকখানা স্কুল বা কলেজ পাঠ্য পুস্তককে প্রামাণিক গ্রন্থস্বরূপ লইতে উপদেশ দিতেন না। এখানে ইহাও বলিতে পারি যে, তিনি যে সমস্ত "প্রামাণিক" গ্রন্থগুলির নাম করিয়াছেন, সেগুলি সব নির্ভুল নহে। তবে সে কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

তৃতীয়ত, সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন যে, "নাজিমুদ্দৌলা" "নামের কোন ব্যক্তি মুরশিদাবাদের নবাব-বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।" ইহাকেই বলে 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী';

---

* Peter Auber, William Bolts, ও *Cambridge Shorter History of India*-র Part III-র গ্রন্থকার মহাশয় ঠিক তারিখই দিয়াছেন—১৭৬৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী। Thornton সাহেব কেবল February (১৭৬৫) মাসের কথা বলিয়াছেন; কোনও নির্দিষ্ট তারিখ দেন নাই। Mill, Malcolm ও Forrest সাহেবের কথা তো আগেই বলিয়াছি।

Aitchison-র *Treaties, Engagements and Sanads*, etc, (শুধু *Treaties and Sanads* নহে), 1909, পুস্তকে (Volume I) যাঁহাকে Nudjum-ul-Dowlah ও Nudjum ul Dowla বলা হইয়াছে, সমসাময়িক সরকারী দলিলে (records) তাঁহাকেই কখনও Nazim-O-Dowla, Najim-O-Dowla, Nayym al Dowlah, Nadjum ul Dowla, এমন কি Nezemal Dowlah বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। ইনিই মীরজাফরের পরবর্তী বাংলার নবাব। আমার যুক্তির ভিত্তি যখন সমসাময়িক দলিলপত্র, তখন দলিলে প্রদত্ত বানান অনুসারে বাংলায় নাড্জুম্-উল-দৌলা বা নাজমুদ্দৌলাকে নাজিমুদ্দৌলা লিখিলে কোনও দোষ হতে পারে না। আর কেনই বা আমরা বাংলায় পারসী বা আরবী নামের উচ্চারণ পারসী বা আরবীর মত করে করিব? সেটা পাণ্ডিত্য হবে না, তবে pedantry হবে বটে। ইংরাজির বেলাও আমরা সে রকম করি না। Calcuttaকে কলিকাতা বলি; Delhiকে দিল্লী বলি; Bombayকে বোম্বাই বলি; এবং অনেক খ্যাতনামা গ্রন্থকারও সেক্সপীয়ারকে সেক্ষপীয়র বলিয়া অভিহিত করেন। অনেক জার্মান ও ফরাসী নাম ইংরেজরা ইংরাজির মতন করিয়াই লেখেন ও উচ্চারণ করেন। সমালোচক মহাশয়কে আরও জানাইতে পারি যে, তাঁর Forrest সাহেব পর্যান্ত "Nudjum-ul-Dowlah" বা Najmu-d-daulah"কে তাঁহার পূর্ব্বে উল্লিখিত বইয়ের textএ (See his *Life of Lord Clive* Vol. II, p. 261) Najim-ud-Dowla (নাজিমুদ্দৌলা বা নাজিম্-উদ-দৌলা) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁকে আরও জানাইতে পারি যে, তাঁর Peter Auber সাহেবও (See his *Rise and Progress of the British Power in India*, 1837, Vol. I.) এই নবাবের নাম দিয়াছেন একবার (p. 163) "Nujeem-ool-Dowla" ও আর একবার (p. 98) "Nazim-ood-Dowla"; Thornton সাহেব তাঁর নাম দিয়াছেন (See his *History of the British Empire in India*, 1841, Vol. I, p. 467) Noojum-ad-Dowlah; এবং James Mill তাঁর নাম দিয়াছেন (See his *History of British India*, 4th Ed., Vol. III, pp. 357-58) "Nujum-ad-dowla"। কই, সমালোচক মহাশয় তো এঁদের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই? এঁরা সাহেব বলিয়া বুঝি? ইহারই নাম "slave mentality"। Forrest সাহেব যদি ইংরাজিতে Najim-ud-Dowla লিখিতে পারেন, আমরাও বাংলায় নাজিমুদ্দৌলা বলিতে পারি।

উপরে যে সব কথা বলিলাম, Syef-ul-Dowlaর (Nudjum-ul-Dowlahর পরবর্ত্তী নবাব) বেলায়ও সে রকম যুক্তি দিতে পারিতাম। এই উত্তরের কলেবর ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

তবে আশা করি, এস্থলে একথা বলিলে বিশেষ দোষ হইবে না যে, আমার প্রবন্ধে যাহা "বঙ্গানুবাদ" ভাবে দেওয়া হইয়াছে, তাহার জন্য আমি আইনত দায়ী হইলেও—কারণ আমার নামে যখন বাহির হইয়াছে—প্রকৃতপক্ষে আমি তাহার জন্য দায়ী নহি। কারণ, ঐ বঙ্গানুবাদ সমগ্রভাবে আমি নিজে করি নাই। আমি করিলে হয়তো কিছু কিছু তফাৎ হইত। আমার প্রবন্ধে আমি ইংরাজি extractগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। তাহাদের বঙ্গানুবাদ কে করিয়াছিলেন, আমি জানি না। 'সোনার বাংলা'র সম্পাদক মহাশয় তাহা জানেন। কিন্তু এইটুকু আমি এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, আমার প্রতিপাদ্য বিষয়টি ছাড়িয়া আমাকে শুধু গালাগালি করিবার জন্য নানা প্রকার অবান্তর প্রসঙ্গ তুলিয়া সমালোচক মহাশয় নিজেই "মক্ষিকাবৃত্তি"র চূড়ান্ত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষাতেই তাঁকে উত্তর দিলাম। নতুবা এই প্রকার ভাষা আমাদের অব্যবহার্য্য।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, মীরজাফরের কলঙ্ক ক্ষালন করা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল না। এবং তাহা আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ও ছিল না। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তির সহিত ইতিহাসের অনৈক্য দেখানই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্কিমবাবু সমালোচক মহাশয়ের যেমন পূজনীয়, সেইরূপ তিনি আমারও পূজনীয়। সাহিত্যসৃষ্টির কথা ছাড়িয়া দিলেও, যতদিন পৃথিবীতে অকৃত্রিম দেশভক্তির আদর থাকিবে, ততদিন তিনি আমাদের পূজ্য হইয়া থাকিবেন। বাংলা সাহিত্যের ও বর্ত্তমান বাংলার ইতিহাসে তাঁহার স্থান এত উচ্চে যে, যদি কেহ বলেন যে, তাঁহার লেখার মধ্যে এখানে ওখানে একটু আধটু অনৈতিহাসিকতার দোষ আছে, তাহাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না। কিন্তু আমার সমালোচক মহাশয় তাঁহার সমালোচনায় যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অন্ধ ও নির্ব্বুদ্ধিতাসূচক "গোঁড়ামি"র পরিচায়ক, তাঁহার প্রতি প্রকৃত ভক্তির পরিচায়ক নহে। এবং এই প্রকার সমালোচনাও কেবল পরছিদ্রানুসন্ধানের দূষিত মনোবৃত্তির নিদর্শন। বস্তুত আমি বঙ্কিমবাবুর প্রিয় কার্য্যই করিয়াছি। ইহারই যথার্থ নাম ভক্তি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের পক্ষে জবাব

আমাদের পূর্ব্বপ্রকাশিত সমালোচনার উত্তরে শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমেই, আমাদের ভয়-ভক্তি উদ্রেক করিবার জন্য, তিনি যে কেউ-কেটা নহেন, তাহা ভাল করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন, নামের সঙ্গে উপাধি, পদবী ও উপ-পদবীর প্রদর্শনী সাজাইয়াছেন। আরও এক কাজ করিয়াছেন—এবার তিনি 'শনিবারের চিঠি'র খরচায় বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, ১৯৩৬ সালে তাঁহার *Early Land Revenue System in Bengal*, Vol. I, 1765-1772, Longman, p. [?] 213 প্রকাশিত হইয়াছে। অতঃপর আসিতেছে তাঁহারই আর একখানি বহি—ইহার এখনও নামকরণ হয় নাই। 'সোনার বাংলা'য় তাঁহার মৌলিক গবেষণা পড়িয়া আমাদের যে সন্দেহ হইয়াছিল, এবার তিনি স্বয়ং তাহার হাঁড়ি হাটে ভাঙিয়াছেন। প্রবন্ধে দলিলগুলিই যাহা কিছু সারবস্তু; অবশিষ্ট অংশটুকুতে বঙ্কিমচন্দ্রকে ও ফরেষ্টপ্রমুখ ঐতিহাসিকগণকে "হম্ মারা হ্যায়"-বাহবা লইবার চেষ্টা ভিন্ন আর কেহ কিছু পাইয়াছেন কিনা জানি না।

দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমাদের তর্কের বিষয় ছিল, বঙ্কিমকর্তৃক ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় মীরজাফরকে বাঁচাইয়া রাখার কারণ কি?—দেবেন্দ্রবাবু তাহা খুঁজিয়া না পাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র" ইহা জানিতেন না; শুধু তিনি কেন, Mill, Forrest পর্য্যন্ত মীরজাফরের মৃত্যুর ঠিক তারিখ জানিতেন না। 'আনন্দমঠ' ও ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের বালকপাঠ্য ইতিহাস পড়িয়া যদি সপ্তম কি অষ্টম মানের কোন ছাত্র আমাদিগকে একই প্যারায় বঙ্কিমচন্দ্রের তিন তিনটি মারাত্মক ভুল দেখাইয়া দিত,—আমরা তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিতাম, সে বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছে; তাহার ইতিহাস পাঠ সার্থক হইয়াছে; কেন না, উপন্যাসকে ইতিহাস বলিয়া ভুল করা বালকের পক্ষে দোষাবহ নহে। 'রাজসিংহে' বঙ্কিমচন্দ্র আওরঙ্গজেব ও উদিপুরী বেগমের প্রতি ঘঃঐতিহাসিক অবিচার করিয়াছেন, এতদিন কোন ইতিহাসবেত্তা সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই; কেন না, বাংলা দেশে দেবেন্দ্রবাবু ছাড়া চক্ষুষ্মান আর কেহ নাই। ঢাকায় চাকরি করিলেও দেবেন্দ্রবাবু ভদ্রলোক; সুতরাং তাঁহার এক কথা—বঙ্কিমচন্দ্র ভুল করিয়াছেন; জানিতেন না বলিয়াই তাঁহার এ ভুল। মূল প্রবন্ধে দেবেন্দ্রবাবু এমন ভাব দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বে মীরজাফরের মৃত্যুর সঠিক

তারিখ এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাংলায় নবাব কে ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র দূরের কথা, কয়েট্ট প্রমুখ ঐতিহাসিকেরাও অন্তত মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ ঠিক ঠিক জানিতেন না। এটা "সাধারণ জ্ঞানে"র অভাববশত আমাদের কাছে কেমন কেমন ঠেকিয়াছিল বলিয়া আমরা লিখিয়াছিলাম, ঐ সমস্ত ঐতিহাসিকগণের কোন্ পুস্তকে কোন্ পৃষ্ঠায় ভুল আছে, তাহা দেখানো হয় নাই। দেবেন্দ্রবাবুর গবেষণা যে "বে-নজীর", তাহা আমরা জানিতাম না। তাঁহার কাছে প্রমাণ-সূচী (reference) চাহিয়া আমরা যেন সতী-সাধ্বী বিধবার কাছে অনবধানতাবশত চূণ চাহিবার মত গুরুতর অপরাধ করিয়া বসিয়াছি। দেবেন্দ্রবাবু এক কাল্পনিক "চ্যালেঞ্জ" গ্রহণ করিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত বহি তিনি ভাল রকম পড়িয়াছেন; যাহা কোন-মূর্খও কোন দিন সন্দেহ করিবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভুলের কারণ দেবেন্দ্রবাবু বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া আমরা দেখাইয়াছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস পড়িতেন এবং তাঁহার জন্মের এক বৎসর পূর্ব্বে পিটার অবারের বহিতে দেবেন্দ্রবাবুর বহু গবেষণার ফল সাধের সেই ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৭৬৫ খ্রীঃ লেখা আছে। পিটার অবারের বহি বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সুলভ না হইলেও মিলের বহিখানা তখন ভারতে অপ্রাপ্য ছিল না। মিল সাহেব ভুল করিয়াছেন; রিপোর্ট ভুল করিয়াছে—কিন্তু ভুলটি ফেব্রুয়ারির স্থলে জানুয়ারি অর্থাৎ ৩০ দিনের তফাৎ। মিল সাহেবের বহিতে যদি ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৭৬৫ খ্রীঃ মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ লেখা থাকিত, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভুল করিয়াছেন উহা হইতে কি তিনি নিবৃত্ত হইতেন? সুতরাং দেখা যাইতেছে, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফর মরিয়াছে জানিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছা করিয়া তাহাকে ১৭৭০ সাল পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন; ইহাই ছিল আমাদের কথা। কেন বঙ্কিমচন্দ্র ইহা করিয়াছিলেন, আমরা সাহিত্যের দিক দিয়া তাহারই সংক্ষেপ আলোচনা করিয়াছি। কাব্য নাটক ও উপন্যাস সাহিত্যে শিল্পকলার প্রয়োজনে আখ্যানবস্তুর একটা ঐতিহাসিক আবেষ্টনী সাহিত্যিকেরা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এ আবেষ্টনী ইতিহাসের দিক দিয়া শুধু ভাবত সত্য হওয়া চাই; সন তারিখ নাম হিসাবে সত্য হওয়া শুধু অপ্রয়োজনীয় নহে, রসসৃষ্টির পক্ষে ক্ষতিকর, দেবেন্দ্রবাবু কিছুতেই তাহা স্বীকার করিবেন না. কারণ তাহা হইলে তাঁহার এই 'মৌলিক' গবেষণা মাঠে মারা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র কেন ভুল করিয়াছেন, এইজন্য মাথা না ঘামাইয়া ঐতিহাসিকেরা কেন

এ ভুল করিয়াছেন এটা বিচার করিলেও বুঝিতাম তাঁহার বুদ্ধির অভাব নাই। কথাটা যখন উঠিয়াছে, আলোচনা করাই ভাল। বিলাতে যে সমস্ত রিপোর্ট গিয়াছে, যথা দেবেন্দ্র-বাবু-কথিত Third Report, 1773—তাহাই দেখিয়া মিল সাহেব তাঁহার বহিতে ভুল লিখিয়াছেন। Third Reportএর ভুলটা লেখার দোষেই ঘটিয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য। দেবেন্দ্রবাবু ৮ই ফেব্রুয়ারির (১৭৬৫ খ্রীঃ) দলিল পাইয়াছেন—১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কে কি ভুল করিল এই চীৎকার ছাড়ার অর্থ জগৎকে জানাইয়া দেওয়া, তিনি একটা মারাত্মক রকম ভুল সংশোধন করিয়াছেন। ফরেষ্ট ও মাল্‌কমের বহি হইতে দেবেন্দ্রবাবু যে অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার গবেষণার পাহাড় অবশেষে মূষিক প্রসব করিয়াছে। এখন এই দাঁড়াইতেছে, মীরজাফর কি ৫ই ফেব্রুয়ারি (১৭৬৫) মরিয়াছিলেন, না ৬ই ফেব্রুয়ারি? ভয়ানক কথা, প্রায় ২৪ ঘণ্টার তফাৎ! এমন অঘটনঘটন কি প্রকারে সম্ভব হইল? ৫ই ফেব্রুয়ারির পক্ষে প্রবন্ধ লিখিবার সময় দেবেন্দ্রবাবু নিতান্ত একা ও অসহায় অবস্থায় ছিলেন; আমাদের সমালোচনার প্রসঙ্গে তাঁহার সাথী জুটিয়াছেন—পিটার অবার; দুইজনের মধ্যে ১০১ বৎসরের ব্যবধান। অপর পক্ষে আছেন, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফরেষ্ট ও মাল্‌কম—যাঁহাদিগকে দেবেন্দ্রবাবু 'সোনার বাংলা'র সেরেস্তাদারী প্রবন্ধে নামাইয়া একটা sensation সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কোন্ পক্ষে পাল্লা ভারী বিচার করিবার শক্তি ও বিদ্যা আমাদের নাই; তবে দলিল পড়িতে গিয়া দেবেন্দ্রবাবু যে "বাঁশ বনে ডোম কানা" বনিয়াছেন, তাহার আর একটা প্রমাণ আমরা পাইতেছি। Imperial Record Department হইতে প্রকাশিত 'Calender of Persian Correspondence'গুলির প্রথম খণ্ডটি (vol. I, 1759-1767) পড়িয়া লওয়া তিনি আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই; কারণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে দেবেন্দ্রবাবুর চোখে তাহার কোন মূল্য নাই—তাঁহার চাই খাঁটি কাঁচা মাল। এই কাঁচা মাল উদরস্থ করিয়া এবং হজম করিতে না পারিয়া পূজার হিড়িকে সাহিত্যের আসরে যে কার্যটি করিয়াছেন, আমরা ভদ্রসমাজের পক্ষ হইতে তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, যেদিন দুপুরবেলার পর মীরজাফর মারা যান, সেদিন তিনি কলিকাতায় একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন এবং সকালবেলা মহারাজা নন্দকুমারের কোলে মাথা রাখিয়া রাজ্য-সংক্রান্ত শেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছিলেন। সেদিন ছিল মঙ্গলবার, মুসলমানী শাবান মাসের ১৩ তারিখ। ঐ চিঠি এবং মাহারাজা নন্দকুমার ও নজমউদ্দৌলা লিখিত

মীরজাফরের মৃত্যু-সংবাদ একই দিনে অর্থাৎ ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল (vol. I. পৃ. ৩৭৭-৩৭৮)। সার্ ই. ডেনিসন রস পাদটীকায় (পৃ. ৩৭৭) লিখিয়াছেন, "This is the last letter from the Nawab Mir Jafar, as he died on the 6th Feb. 1765"। ফরেষ্ট সাহেব দেবেন্দ্রবাবুর চেয়ে ঢের বেশিদিন দলিল লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছেন। তিনি ১৪ই শাবান মঙ্গলবার, 6th Feb, 1765 ধরিয়া এ তারিখ দিয়াছেন, অথবা অন্য ইংরেজী দলিলে ৬ ফেব্রুয়ারি পাইয়াছেন, আমরা বলিতে পারিব না। তবে আমরা মোটামুটি জানি, new style এবং old styleএর গণনায় প্রায়ই একদিন গোলমাল হয়। বার মিলাইতে গেলে তারিখ মিলে না; তারিখ মিলাইতে গেলে বার মিলে না। দেবেন্দ্রবাবুর মিঃ মিড্‌লটন ব্যতীত জর্জ গ্রে, মিঃ ড্রোজ এবং অন্যান্য সাহেব মীরজাফরের মৃত্যুর সময় মুরশিদাবাদে ছিলেন। ফরেষ্ট, মাল্‌কম, সার্ ডেনিসন রসকে অপ্রতিভ করিতে হইলে আরও কয়েকখানা দলিলের প্রয়োজন, 'শনিবারের চিঠি'তে এ বিষয়ে আর আলোচিত হইবে না, কলিকাতায় এজন্য বহু ঐতিহাসিক পত্রিকা আছে। এক দিনের ভুল হইলেও ভুল তো বটেই—ইহাই দেবেন্দ্রবাবু "উত্তরে" উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, কারণ এইরূপ ভুল দেখাইয়াই তিনি বোধ হয় স্কুলে first prize পাইতেন। দেবেন্দ্রবাবু ঐতিহাসিক না হইয়া দৈবজ্ঞ হইলে অধিক সুনাম অর্জ্জন করিতেন। তাঁহার ধারণা, ইতিহাস একটা দিন-পঞ্জিকা। আমাদের "মনোবৃত্তি"কে দেবেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "ধৃষ্টতা"; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকীর বৎসরে নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য সেই মহাপুরুষের বিদ্যা ও বুদ্ধির ছিদ্র অন্বেষণ করাকে আমরা কি নাম দিব ?

দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার উত্তরে "আমি জানি" "অপ্রাসঙ্গিক" "বলিব না" ইত্যাদি মুরব্বিয়ানার কথা বলিয়াছেন। ভাবখানা অনেকটা সেই "হেলায় লঙ্ঘিতে পারি শতেক যোজন"-এর মত; কিন্তু কেহ কোন দিন লম্ফটা দিতে দেখিল না। আমরা এটা পড়ি নাই, সেটা পড়ি নাই বলিয়াছেন। উইলিয়ম বোল্টসের পুস্তকখানা পড়ি নাই, নামও শুনি নাই, ইহা আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিতেছি। কিন্তু যেখানে ১৭৬৫ খ্রীঃ ৫ কি ৬ই ফেব্রুয়ারি—ইহাই নির্ণয় করিবার বিষয়, সেক্ষেত্রে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের কোনও দলিল আদৌ প্রয়োজনীয় হইতে পারে,—এমন সন্দেহ দেবেন্দ্রবাবুর মত পণ্ডিত ব্যতীত আর কে করিবে? ঠিকমত জার বোঝাই না হইলে দেবেন্দ্রবাবুর মত পণ্ডিতেরা বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করেন।

ইহার পর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা। এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রবাবু আক্ষেপ করিয়াছেন, আমাদের অজ্ঞতার একটা মস্ত সুবিধা আছে—যাহা তিনি "সমসাময়িক" অনেক দলিল-পত্র পড়িয়া হারাইয়াছেন। পাছে সে সমুদয় পড়িবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদের হয়, সেজন্ত ইহাও জানাইয়াছেন যে, ঐগুলি নূতন দিল্লীতে চলিয়া গিয়াছে। খবরটাও কি মারাত্মক রকম নূতন! ইহাকেই বলে, "খবরদার"! মীরজাফর সম্বন্ধে তিনি জোর গলায় বলিয়াছেন "ঐ সময়ের ঘটনাবলীর জন্ত তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা যায় না"; কেন না, তিনি প্রমাণ করিয়াছেন পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মীরজাফরের মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাহা বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন না। অতি সত্য কথা। মীরজাফর দেশের যে দুর্দ্দশা চোখে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, সেজন্ত কেমন করিয়া তাঁহাকে "প্রত্যক্ষ" দায়ী করা যায়? "প্রত্যক্ষ" শব্দের অর্থ দেবেন্দ্রবাবু 'চলন্তিকা' দেখিয়া ঠিক করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার ভুল হইতে পারে না। মন্বন্তরের জন্ত "প্রত্যক্ষ" শব্দের এ অর্থ দায়ী মীরজাফর কিম্বা ক্লাইভ নহে; দোষী হইতেছেন পর্জ্জন্যদেব। বৃষ্টি না হইলে দুর্ভিক্ষ হয়, মানুষ মরে—এ কথা সকলেই জানে। অতএব দেখা যাইতেছে, দেবেন্দ্রবাবু যেমন মনে করিয়াছেন তাঁহার প্রতি আমাদের "ব্যক্তিগত বিদ্বেষ" আছে, সে রকম বঙ্কিমচন্দ্রেরও মীরজাফরের প্রতি নিশ্চয়ই একটা "ব্যক্তিগত বিদ্বেষ" ছিল; নতুবা হাতের কাছে মিল সাহেবের বহিখানা থাকা সত্ত্বেও তিনি মীরজাফর-চরিত্রকে মন্বন্তরের কলঙ্ককালিমায় বিকৃত করিলেন কেন? দেবেন্দ্রবাবুর মতে মীরজাফর 'আনন্দমঠে'র একজন প্রধান (?) ঐতিহাসিক ব্যক্তি! তাঁহার সম্বন্ধে "ভুল ধারণা" জন্মাইবার অধিকার বঙ্কিমচন্দ্রের নাই—আমরা বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের এ অধিকার ছিল; তিনি উহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

বড়ই আক্ষেপের বিষয়, আমাদের "অজ্ঞতা" দেখিয়া দেবেন্দ্রবাবুর দারুণ অভিমান হইয়াছে। তিনি আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা-কাটাকাটি করিবেন না; কেন না, ইতিপূর্ব্বেই তিনি একখণ্ড মোটা বহি ছাপাইয়াছেন, আর একখানি লেখা শেষ করিয়াছেন; অতএব মন্বন্তর সম্বন্ধে তাঁহার সব-কিছুই জানা আছে। কিন্তু এই মন্বন্তর-পারদর্শী অধ্যাপক মহাশয়ের সেই সর্ব্বজ্ঞতা তাঁহার বহিতে কোথায়ও চোখে পড়িল না, শুধু একটা দিক তিনি দেখিয়াছেন—সেটা হইল ভারত গভমেণ্টের দপ্তরখানার দলিল, যাহা এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক চক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে মনে করিয়া তিনি আত্মপ্রতারিত

হইয়াছেন। এহেন দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমরা কেমন করিয়া "মন্বন্তর" সম্বন্ধে তর্ক করিব? স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই বলিয়াছেন—আমাদের সম্বল "খোলা আর সিটে"; তবুও আমাদের দুরাশা 'তিতীর্ষুঃ দুস্তরং মোহাৎ উড়ুপেনস্মি সাগরম্।" কিন্তু দেবেন্দ্রবাবুই যে মন্বন্তর সম্বন্ধে মন্ত্রদ্রষ্টা হইয়াছেন, ইহার "নিঃসংশয়" প্রমাণ তিনি কোথায় দিয়াছেন? তাঁহার সম্বলের মধ্যে তো দেখিতেছি, ইংরেজের সরকারী দপ্তরে রক্ষিত দলিল এবং ইংরেজের লেখা কেতাব। সুধীবর্গ বিবেচনা করিবেন, ইংরেজ রাজত্বের ঘোরতর কলঙ্ক ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য কে দায়ী—ইংরেজের দপ্তরে গরু খোঁজা করিয়া কি কোন ঐতিহাসিক তাহার সন্ধান পাইবে? এক-তৃতীয়াংশ মরিলেও মন্বন্তরের সময় এ দেশে লোক কিছু কিছু ছিল। বাদী ও বিবাদী দু-পক্ষের সাক্ষ্যবিচার না করিয়া একতরফা ডিক্রী দিলে কাজির বিচার হয় বটে; কিন্তু ইতিহাস হয় না।

এ সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে দেবেন্দ্রবাবু স্বপ্রণীত *Early Land Revenue System in Bengal and Bihar*, vol I. 1765-1772 পুস্তকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; যেহেতু তিনি যে ফরেষ্ট সাহেবকে ঝাঁকুনি দিয়া কাবু করিয়াছেন, উহাতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। ইহা ছাড়া আরও প্রমাণ তাঁহার কাছে আছে; "ছেলেমানুষি হইয়া যায় বলিয়া ওইগুলি দিব না"—ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু তাঁহার পুস্তক পড়িয়া মনে হইল না, তিনি ফরেষ্ট সাহেবকে কোথাও 'হাঁটুর নীচে ছাড়া' উপরে বিদ্ধ করিতে পারিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অবশ্য আমাদের মতামতের কোন স্থায়ী মূল্য নাই। ঐতিহাসিকেরা উহা বিবেচনা করিবেন। বহিখানিতে আছে কেবল "সঞ্জয় উবাচ", "বৈশম্পায়ন উবাচ" ইত্যাদি, কিন্তু গ্রন্থকার 'কিমুবাচ' বুঝিয়া লওয়া দুষ্কর। শুনিয়াছিলাম স্বর্গীয় গৌরাঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শোচনীয় মৃত্যুর পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অমূল্য আঠার শিশি ও ধারালো কাঁচিখানার কোন হদিস মিলে নাই। দেবেন্দ্রবাবু সগোত্রাধিকারসূত্রে ৺গৌরাঙ্গবাবুর জিনিসগুলি পাইয়াছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উহার নোটিস দেওয়া উচিত ছিল।

দেবেন্দ্রবাবু টিপ্পনী কাটিয়াছেন, আমাদের ইষ্টদেবতারা ভুল করিয়াছেন; ইহা আমরা স্বীকার করিব। আমাদের ইষ্টদেবতা পিটার অবার ও ডড্‌ওয়েল যে দেবেন্দ্রবাবুর বহু পূর্ব্বেই এই সত্যটুকুরও সন্ধান পাইয়াছিলেন, একথা গলা টিপিয়া ধরার পূর্ব্বে ভদ্রলোকের মত তাঁহার মূল প্রবন্ধে স্বীকার করিলে তাঁহাকে এতটা নাকাল হইতে হইত

না, ইহা বোধ হয় তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, রাজনীতিক্ষেত্রে ইংরেজের সহিত আমাদের বিরোধ থাকিলেও ইংরেজ তথা সমগ্র ইউরোপীয় মনীষিগণকে আমরা ইষ্টদেবতা জ্ঞানে চিরকাল শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আসিতেছি। এজন্য বৎসর বৎসর আমাদের ছেলেরা তাঁহাদের কাছে বিদ্যাশিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা করে। না হয় এবার হইতে ঢাকাতেই যাইবে!

আমরা দেবেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধেরই সমালোচনা করিয়াছিলাম; কোন সাহেব তো পাল্লার ভিতর আসেন নাই। আমরা যে সমস্ত "প্রামাণিক" গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করিয়াছি, দেবেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, সেগুলি সব নির্ভুল নহে। দেবেন্দ্রবাবুর বিদ্যার মাপে নিশ্চয়ই কোনটা নির্ভুল নহে—প্রামাণিক হওয়া তো দূরের কথা। তাঁহার প্রবন্ধ ও "উত্তর" পড়িয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন "ভুল" অর্থে দেবেন্দ্রবাবু কি বুঝেন—বড় জোর ৫ই কি ৬ই ফেব্রুয়ারি। বঙ্কিমচন্দ্র বৎসরটা হয়তো জানিতেন, কিন্তু ৫ই কি ৬ই তাহা তো জানিতেন না। এতদিন পরে শ্রীদেবেন্দ্র সেই স্বর্গত আত্মার প্রীত্যর্থে এই ভুলটি বাহির করিয়াছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রও নিশ্চয় গলদশ্রুলোচনে ও গদগদভাবে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন। আমাদের পাদটীকায় *this* (his হওয়া উচিত ছিল) এবং অন্যত্র Aitchison-র Treaties, Engagements and Sanads, etc. (শুধু Treaties and Sanads নহে) ইত্যাদি ভুল দেবেন্দ্রবাবুর চোখে বড় লাগিয়াছে—কাজেই "নির্ভুল" অর্থে দেবেন্দ্রবাবু কি বুঝেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের দেশে এ রকম Proof-readerএর নিতান্ত অভাব। কি করিব? আমাদের তো Longman নাই! দেবেন্দ্রবাবু ইতিহাসের লোক নহেন বলিয়াই "Treaties and Sanads" লিখিয়াছিলাম; কোন ঐতিহাসিককে লিখিতে হইলে শুধু "Treaties" লিখিতাম—ইহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না—মাছি আর কাহাকে বলে?

তবু, ভুল না হয় হইয়াছে, মূর্খ লোকের ভুল হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু, ১৭৬৫ সালে মীরজাফরের মৃত্যু, ইহা কেহ তাঁহার পূর্ব্বে আবিষ্কার করে নাই, তাঁহার প্রবন্ধের সেই প্রতিপাদ্যটি কোন্ জাতীয় মূর্খতা? আমরা মূর্খ হইলেও হস্তিমূর্খ নই।

দেবেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "আমার যুক্তির ভিত্তি যখন সমসাময়িক দলিলপত্র, তখন দলিলে প্রদত্ত বানান অনুসারে বাংলায় নাড্‌জুন্-উল-দৌলা বা নাজ্‌মুদ্দৌলাকে নাজিমুদ্দৌলা লিখিলে কোনও দোষ হইতে পারে না।" যুক্তিটি যেমন মৌলিক তেমনই

অদ্ভুত। দেবেন্দ্রবাবু ভুলিয়া গিয়াছেন, দলিল His Master's Voice নহে যে, চোঙ্গার ভিতরে মুখ ঢুকাইয়া দিলে উচ্চারণ শুনিতে পাইবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ৫ কি ৬ই লইয়া যিনি আকাশ-পাতাল তোলপাড় করিতে পারেন, একটা নাম শুদ্ধ করিবার বেলায় তাঁহার গবেষণা এমন হোঁচট খায় কেন? Calender-এর vol. I—যেখানে স্বয়ং ডেনিসন রস মীরজাফরের চিঠি হইতে তাঁহার পুত্রের নামের শুদ্ধ উচ্চারণ ইংরেজী করিয়া দিয়াছেন, সেখানে দপ্তরী-বিদ্যা পৌঁছিতে পারিল না কেন? তাঁহার দাবি—"অনেক জার্মান ও ফরাসী নাম ইংরেজরা ইংরাজির মত করিয়াই লেখেন ও উচ্চারণ করেন"; সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া "কেনই বা বাংলায় পারসী বা আরবী নামের উচ্চারণ পারসী বা আরবীর মত করে" করিবেন? ইংরেজের সহিত ফরাসী কিম্বা জার্মানদের যে সম্বন্ধ, মুসলমানের সহিত হিন্দুদের কি সেই সম্বন্ধ? ইহাকেই বলে, ঐতিহাসিক উপমা এবং ইতিহাসবেত্তার কাণ্ডজ্ঞান! সুতরাং আশা করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাঁ বাহাদুর নাজির্ উদ্দীন্ সাহেবকে দেবেন্দ্রবাবু এখন হইতে নজীর্ উড্ডান্ সম্বোধন করিয়া জাত্যাভিমানের পরিচয় দিবেন। দেবেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, "ইংরাজির বেলাও আমরা সে রকম করি না। Calcuttaকে কলিকাতা বলি; Delhiকে দিল্লী বলি; Bombayকে বোম্বাই বলি"। এ যুক্তি কোন্ পক্ষে? "উত্তর" দিতে হইবে বলিয়া এমনই দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইতে হয়! যে ফরেষ্টের উপর, ৫কে ৬ করার দরুন, দেবেন্দ্রবাবু দারুণ খাপ্পা হইয়াছেন, তিনিই textএ নাজিম-উদ্দৌলা লিখিয়া নীচে পাদটীকায় ঐ নাম শুদ্ধ করিয়া নজ্মুদ্দৌলা লিখিয়াছেন। দোহাই দেবেন্দ্রবাবু! ইহার উত্তর আর আমরা চাহি না।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, হস্তলিখিত দলিল ভিন্ন আর কিছুতেই যখন দেবেন্দ্রবাবুর আস্থা নাই; তখন তাঁহার বহি লেখার পূর্ব্বে যে সমস্ত দলিল ছাপা হইয়া গিয়াছে, ঐগুলি সবই নিশ্চয় বাতিল হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে ভয়ের কথা এই যে, তাঁহার সমধর্ম্মী ভবিষ্যৎ গবেষকগণও তাঁহার এই ছাপা দলিলগুলির প্রতি হয়তো সেই রকমই আস্থাহীন হইবে। তাহারাও হস্তলিখিত দলিল ভিন্ন আর কিছুই মানিবে না, এবং যেহেতু ঐরূপ দলিল নকল করাই গবেষণার পরাকাষ্ঠা, অতএব স্বয়ং Longmanও তাহাদের ভক্তি উদ্রেক করিতে পারিবেন না—সেই কথা ভাবিয়া আমরা দেবেন্দ্রবাবুর প্রতি আমাদের "ব্যক্তিগত বিদ্বেষ" সম্বরণ করিলাম।

নেতার উক্তি

(ড্রয়িং-রুমে)

মূল্য আমার আছে কি না আছে, কে করিবে বল নির্দ্ধারণ ?
মর-মানুষের মূল্য লইয়া কেনই বা এত শিরঃপীড়া !
জনতার মন করেছি হরণ, মুগ্ধ জনতা মোর চারণ—
বাহাদুরি নাই ? শুষ্ক কথায় ভিজাই কেমন শক্ত চিঁড়া !
মূল্য আমার থাক্ না থাক,
চিরকাল ধ'রে রেডিও কাগজে বাজিছে, বাজিবে আমারি ঢাক।

২

যাহা বলি, তার গভীর অর্থ এখনও বন্ধু বোঝ নি নাকি ?
আপেল আঙুরে নিন্দা করিয়া চুম্বন করি কুমড়ো কদু,
বুলবুল শ্যামা তাড়াইয়া দিয়া পুষিয়াছিলাম ছাতারে পাখী,
তাহাও তাড়াব, মশা ছারপোকা চাহে আধুনিক রামা ও যদু।
আসল অর্থ কথার নয়,
আসল অর্থ ব্যাঙ্কেতে থাকে, দুনিয়া জুড়িয়া যাহার জয়।

৩

সেকেলে-মার্কা বিবেকের সখা, কি ব'লে এখনও দোহাই দাও ?
নতুন রকম নানান বিবেক ছেয়েছে বাজার, ভরেছে গোলা,
নাৎসি, জাপানী, খদরি, ফ্যাসিস্ত, লাঙল, কাস্তে—যা খুশি চাও,
তোমার বিবেক, আমার বিবেক ? শিকায় সেগুলি থাকুক তোলা
এবার বন্ধু কুম্ভীপাক,
কাকের পালক চুরি ক'রে ক'রে ময়ূরেরা সব সাজিছে কাক।

"বনফুল"

মীরজাফরীয় বিভ্রাট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং Corresponding Member, India Historical Records শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধের সমালোচনা আমরা 'শনিবারের চিঠি'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "প্রসঙ্গ কথা"র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য ঐ সমালোচনা আমাদের অনুমোদিত ছিল বটে, কিন্তু ঐ সমালোচনা আমাদের কৃত নয়; কারণ আমরা পণ্ডিত নহি, কোনও বিদ্যার বিশেষজ্ঞ বলিয়া আমাদের কোনও দাবি নাই। এক্ষণে ঐ সমালোচনার উত্তর এবং তাহারও প্রত্যুত্তর প্রকাশিত করিয়া আমরা যুযুধান পণ্ডিতযুগলের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করিলাম; ফলাফল মীমাংসার ভার অবশ্যই 'চিঠি'র পাঠকগণের উপরেই রহিল। কি উদ্দেশ্যে আমরা এইরূপ বাদ-প্রতিবাদকে এতখানি স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলাম, তাহারই প্রসঙ্গে দুই চারি কথা নিম্নে লিখিতেছি।

* * * *

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে যে, "কেঁচো খুঁড়িতে গেলে অনেক সময়ে সাপ বাহির হইয়া পড়ে"। আমরাও আশ্চর্য্য হইতেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া মূল প্রবন্ধলেখক কিরূপ সাপের মুখে পড়িয়াছেন! 'শনিবারের চিঠি'র সমালোচনা যে একটু

তীব্র হইয়াছিল, তাহা আমরাও জানি; কিন্তু ইহাও স্বীকার করি যে, সমালোচকের এইরূপ মনোভাবের হেতু ছিল; কারণ কোনও পণ্ডিতম্মন্য বিদ্যাভিমানী ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ তুচ্ছ বিষয়কে এরূপ উচ্চ করিয়া তোলা নিতান্তই বিরক্তিকর। এবার দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার সেই তুচ্ছ প্রবন্ধটিকে গুরুত্ব দিবার জন্য, আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তিনি অর্থাৎ সেই প্রবন্ধলেখক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান অধ্যাপক, এবং Corresponding Member ইত্যাদি। শেষোক্ত পদবীটির গুরুত্ব বুঝিবার মত জ্ঞান আমাদের নাই। কিন্তু সেই প্রবন্ধ ও তাহার সমালোচনার উত্তরে এই পণ্ডিত-মানুষটির যে পাণ্ডিত্য ও যুক্তিশীলতার পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রধান অধ্যাপক হইতে হইলে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন কি থাকা চাই, তাহাই ভাবিয়া পাইতেছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বপণ্ডিতগণের গবেষণার নমুনা আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেক পাইয়াছি, এবং 'চিঠি'র পাঠকবর্গকে তাহার পরিচয়ও দিয়াছি। এবার ঢাকাই গবেষণার ও তথা গবেষকের বিচারবুদ্ধির একটি মনোরম নমুনা দৈবক্রমে লাভ করিয়া 'চিঠি'র সৌভাগ্য সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। কলিকাতার সহিত ঢাকার প্রভেদ এই যে, এখানে বিশ্বপণ্ডিতগণ ছোট কথায় কান দেন না—এরূপ সমালোচনার উত্তরে কিছুই না বলিয়া অতি গম্ভীরভাবে মৌন অবলম্বন করিয়া চাণক্য পণ্ডিতের উপদেশ পালন করেন। কিন্তু ঢাকা একটি storm-centre, সেখানকার বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ কিছু বেশি, তাই সেখানকার বিশ্বপণ্ডিতগণের কচ্ছ সহজেই মুক্ত হইয়া পড়ে। দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ দিন দিন কোথায় নামিতেছে! প্রধান অধ্যাপকের মতিগতি ও বিদ্যাবুদ্ধি

যদি এই দরের হয়, তবে সেই অনুপাতে অপ্রধানদের চিত্তপ্রকর্ষ কিরূপ হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি।

লেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা জানিতাম না, সেটা আমাদেরই দুর্ভাগ্য; তিনি যে এত বড় একজন পদস্থ ব্যক্তি, এবং শুধু তাহাই নয়, বিলাতী লংম্যান কোম্পানি তাঁহার পুস্তক ছাপাইয়াছে, তাহা না জানিয়া আমরা কি ভুলই করিয়াছি! 'গবর্মেণ্ট রেজিস্ট্রিকৃত' বলিয়া অনেক বস্তু বাজারে বিজ্ঞাপিত হয়, সেগুলিও নিশ্চয় ঐ লংম্যান কোম্পানির প্রকাশিত পুস্তকের মতই মহামূল্যবান! লেখকের বক্তব্য বস্তু যাহা, তাহা তো এক আঁচড়েই সাফ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তবুও এই অতি তুচ্ছ বিষয়টিকে অবলম্বন করিয়া স্বমহিমা প্রচারের কি প্রাণান্ত প্রয়াস! আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক, আমি corresponding clerk, আমি মোটা মোটা বহি লিখিয়াছি! অথচ আসল কথাটা যে কোথায় গিয়া ঠেকিল, তাহার আর উদ্দেশ নাই! বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'আনন্দমঠে' ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সম্পর্কে মীরজাফরের নাম করিয়াছেন, ঐ মন্বন্তরের জন্য তাঁহাকেও দায়ী করিয়াছেন, ইহা তাঁহার ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাববশতই ঘটিয়াছে, কারণ মীরজাফর ঐ ঘটনার প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছিলেন। ইহাই ছিল দেবেন্দ্রবাবুর যুগান্তকারী গবেষণার ফল। ইহার উত্তরে আমাদের সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র মীরজাফরের মৃত্যু-তারিখ যে জানিতেন না, তাহা মনে করিবার কারণ নাই; কারণ ঐ তারিখ দেবেন্দ্রবাবুর আবিষ্কার নহে, বঙ্কিমবাবুর বহু পূর্ব্বে ও সমসময়ে নানা ঐতিহাসিক আলোচনায় তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এবং আজ যাহা দেবেন্দ্রবাবু নিজ আবিষ্কার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা শুধুই বড়

বড় ইতিহাস-গ্রন্থে নয়, স্কুলপাঠ্য পুস্তকেও স্থান লাভ করিয়াছে। এই কথাটা আমাদের সমালোচক বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কারণ, দেবেন্দ্রবাবুর লেখাটি পড়িলে কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'কে অবলম্বন করিয়া ঐ তারিখটির সঠিক সংবাদ নিজ আবিষ্কার বলিয়া ঘোষণা করাই এবং তজ্জন্য বাহাদুরি লওয়াই ছিল লেখকের আসল অভিপ্রায়। আমাদের সমালোচক একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, ঐতিহাসিক হিসাবেই তাঁহার কিছু প্রতিষ্ঠা আছে এবং সে প্রতিষ্ঠা যে অমূলক নহে, তাহা এই বাদানুবাদ যাঁহারা পড়িবেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন। দেবেন্দ্রবাবু সম্পূর্ণ পরাস্ত হইলেও হাল ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি এক্ষণে পাঁচ বৎসরের ব্যাপারটাকে ২৪ ঘণ্টার সূক্ষ্মতায় টানিয়া ধরিয়া মল্লভূমি কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র কথা যাহাই হউক, তাঁহার বিদ্যা তো নিষ্ফল হয় নাই। ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার পক্ষে ৫ বৎসরও যাহা ৫ ঘণ্টাও তাহাই, ইহা যে না মানে এবং সেই সঙ্গে দেবেন্দ্রবাবুর আবিষ্কারের মাহাত্ম্য যে না স্বীকার করে, তাহার মত দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির ঐতিহাসিক বিচারে অবতীর্ণ হওয়া ধৃষ্টতা নহে কি? আমাদের ইতিহাস-নিষ্ঠা যে এতখানি নাই তাহা স্বীকার করি; কিন্তু বঙ্কিমবাবুকে লইয়া টানাটানি কেন? উত্তরে দেবেন্দ্রবাবু সে সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন নাই। কেবল ইহাই বলিয়াছেন যে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য মীরজাফর দায়ী হইতে পারেন না। কেন, তাহা তিনি অন্যত্র বিশদভাবে বুঝাইয়া দিবেন।

ইহাকেই বলে 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী'; স্পর্দ্ধারও একটা মাত্রা আছে আমরা স্বীকার করি, তথ্য এক হইলেও তত্ত্ববিচারে পণ্ডিতগণের মত ভেদ হইয়া থাকে এবং হওয়াও অসঙ্গত নহে। বঙ্কিমবাবু যে বুদ্ধি, যে বিদ্যা, যে দৃষ্টিশক্তির বলে, তথ্যবিচার করিয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য মীরজাফরকেও দায়ী করিয়াছেন, আমাদের এই নবদপ্তরবিদ্যা-বিশারদের মতে তাহা ঠিক নহে; অর্থাৎ যেহেতু ৫ই ও ৬ই-এর গুরুতর প্রভেদ সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর ঐতিহাসিক সূক্ষ্মজ্ঞান ছিল না এবং যেহেতু

এই দপ্তর-মুদ্রারাক্ষসের সেইরূপ তথ্যঘটিত জ্ঞান পরিমাণে অত্যধিক হইয়া উঠিয়াছে, অতএব তাঁহার বিচার বঙ্কিমবাবুর অপেক্ষা নির্ভুল হইতে বাধ্য। অর্থাৎ মাছিমারা কেরানির বিদ্যাই একজন মহামনীষী লেখকের চেয়ে বেশি। দেবেন্দ্রবাবুর এই প্রতিবাদটিব মধ্যেই যে যুক্তি-জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে মীরজাফরের কলঙ্কস্খালনে তিনি যে বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিবেন, সে সম্বন্ধেও আমাদের কোনও কৌতূহল নাই। দেবেন্দ্রবাবুর প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই; বরং যথেষ্ট হিতৈষণা আছে, সেই কারণেই তাঁহাকে আমরা এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, অতঃপর এইরূপ গবেষণার ফল প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বে তিনি যেন কেবলই দলিল-সাহায্যে তৃপ্ত না হন এবং দলিলের টুকরা উদ্ধৃত করিয়াই যে পণ্ডিত হওয়া যায় না, ইহা মনে করিয়া প্রধান অধ্যক্ষ প্রভৃতির অভিমান ত্যাগ করেন; কারণ তাহাতে বাংলা দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গৌরবহানিই হয়, আমাদিগেরও লজ্জা হয়। প্রতিবাদ লিখিবার কালে তিনি এতই অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছেন যে, প্রতিপক্ষকে ইংরেজ পণ্ডিতের অন্ধ স্তাবক বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, দেন্দ্রেবাবুর বিদ্যা কোথা হইতে? ইংরেজ পণ্ডিতের আরাধনা না করিলে তাঁহার মত পণ্ডিত আমাদের দেশে এত সস্তা হইতে পারিত? তিনি কোন্ দেশীয় বিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছেন? ভারতীয় বিদ্যার কোন্ বিভাগে তিনি কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন? বাংলাও তো ভাল লিখিতে পারেন না। বরং সেই ইংরেজ পণ্ডিতদের নিকটেই আরও ভাল করিয়া পাঠগ্রহণ করিলে তিনি সমধিক উপকৃত হইবেন। তাঁহাদেরই এক পণ্ডিত তাঁহাকে এই উপদেশ দিবেন যে—

He who possesses a sense of values cannot be a Philistine; he will value art and thought and knowledge for their own sakes, not for their possible utility...Knowledge is not a direct means to good: its action is remote. An exact knowledge of the dates of the Kings and Queens of England will put no one into a flutter. Knowledge is a food of infinite potential value which must be assimilated by the intellect and imaginatian before it can become positively valuable.

১৮

যুগলবাবু লোকটিকে আগে অবশ্য চিনিতাম, অল্প দিন হইতে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে ভদ্রলোক সুগন্ধি কেশ-তৈলের ব্যবসায় করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এখনও সে প্রসিদ্ধি আছে; কিন্তু অধুনা গোপনে গোপনে (কেন যে গোপন করিতেছেন, জানি না।) তিনি কেরোসিন তৈলের ব্যবসাতেও লিপ্ত হইয়াছেন শুনিতেছি। চোরাবাজারেও যাতায়াত আছে। রাই কুড়াইয়া একটি নয়, কয়েকটি বেলই তিনি বানাইয়াছেন—এইরূপ জনশ্রুতি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অর্থবান বলিয়া ভদ্রলোকের এতটুকু অহমিকা নাই, তাঁহার গর্ব্ব হৃদয় লইয়া। তাঁহার নিজের হৃদয় তো সর্ব্বদাই গলগল করিতেছে, তাঁহার সংস্রবে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাও নিস্তার পান নাই, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।

আসিয়াই বলিলেন, একটা সিগারেট দিন।

দিলাম। সিগারেট ধরাইয়া ভদ্রলোক পকেট হইতে একতাড়া নানা রঙের খামের চিঠি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, পঁচিশ জনের চিঠি; বাড়িতে আরও অনেক আছে।

উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সহসা বক্তৃতা দিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। এই বাই আমার আছে এবং একবার চাগিলে রোধ করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং সোৎসাহে বলিলাম, একটি বক্তৃতা দিব। শুনিবেন কি?

সিগারেটে টান মারিয়া যুগলবাবু বলিলেন, নিশ্চয়। বলুন বলুন, আপনার কথা শুনিতে আমার বেশ লাগে।

হাঁটু দোলাইতে লাগিলেন। আমিও গলা-খাঁকারি দিয়া সুরু করিলাম, দেখুন, পুরাকালে ফুলবাগানের সখ ছিল। সখ ছিল, কিন্তু সুবিধা ছিল না। যে বস্তু থাকিলে মানবের অধিকাংশ আধিভৌতিক অসুবিধাই বিদূরিত হয়, সেই বস্তুটিরই অভাব ছিল,—টাকা ছিল না। অল্প মাহিনায় সর্ব্বদিক রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে যে সকল কলা-কৌশল ক্ষুদ্রত্ব-মহত্ত্ব-সরলতা-কপটতার চর্চ্চা করিতে হয়, আমাকেও সে সকল করিতে হইয়াছিল। দারুণ দুর্য্যোগের মধ্যে ফুটা সংসার-তরণীটিকে ময়ূরপঙ্খীর মত সাজাইয়া সগৌরবে যে বিদ্যার জোরে সেটি তীরস্থ করিয়াছি, তাহাকে ভোজবিদ্যা আখ্যা দিলে অসঙ্গত হইবে না। বাক্‌চতুর বাজিকর অন্যমনস্ক দর্শকের মূঢ়তার সুযোগ লইয়া যে ভাবে অসম্ভবকে সম্ভবপর করিয়া দেখায়, অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত আমিও সম্ভবত ভোজবিদ্যাবলে বলীয়ান হইয়াই সেই ভাবে বাহিরের ভড়ং বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এই জাতীয় কোন একটা অঘটনঘটনপটিয়সী নিপুণতা না থাকিলে আমার স্বল্প আয় সত্ত্বেও শোভনতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ কোন নিমন্ত্রণ-বাড়িতে অথবা থিয়েটার-সিনেমায় গৃহিণীকে বেশবাস-অলঙ্কার-দৈন্যে কখনও বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইতে হয় নাই, বাড়ির ভোজ-কাজে শাকভাজা চচ্চড়ি হইতে সুরু করিয়া লুচি, পোলাও, দইমাছ, মাছের কালিয়া, চিংড়িমাছের মালাইকারি, মাংসের কোর্ম্মা, কাট্‌লেট্, চপ, দ্বিবিধ ডাল ও চাটনি, দই, পায়েস, রসগোল্লা, সন্দেশ, বুঁদিয়া, জিলাপি, পুডিং, কাস্টার্ড প্রভৃতি শালপাতার উপর থরে থরে সাজাইয়া হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান তিনটি সভ্যতারই মান রক্ষা করিয়াছি, নিজের দরিদ্র আত্মীয় অথবা আত্মীয়াকে অকারণে কখনও কিছু কিনিয়া দিবার সামর্থ্য হয় নাই বটে, কিন্তু লৌকিকতা-ব্যাপারে ছোট নজরের

পরিচয় দিয়াছি, অতি বড় শত্রুও এ কথা বলিতে দ্বিধা করিবে। সংক্ষেপে চিঠির ভাষা ও ভাব যেমনই হউক না কেন (তাহা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না), চিঠির কাগজ, বিশেষত চিঠির লেফাপা দ্বারা সকলকে সম্মোহিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি। এই অসাধ্যসাধনের ইতিহাস একাধিক কুসীদজীবী মহাজনের খাতায় কড়ায় ক্রান্তিতে বিধিবদ্ধ হইয়া আছে।

অভিভূত যুগলবাবুর হাঁটু-নাচানো বহুক্ষণ পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এইবার সুযোগ পাইয়া তিনি কণ্ঠাগত প্রশ্নটিকে বাঙ্ময় করিলেন, সবই বুঝিলাম, কিন্তু যাহা বলিলেন, তাহার সহিত আমার এই চিঠিগুলির সম্পর্ক কি? সম্পর্ক কিছুমাত্র নাই। বক্তৃতা দিতে হইলে অবান্তর কথা দুই-চারিটা অনিবার্য্য ভাবেই আসিবে, উহাতে কিছু মনে করিবেন না। আসল কথা, ফুলবাগানের সখ ছিল। কিন্তু তখন সমাজের যে স্তরে বিরাজ করিতাম, সে স্তরে এ সখের মূল্য কেহ দিত না, সুতরাং ইহার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে সঙ্কুচিত হইতাম। দামী জুতা, শাল, গহনা অথবা শাড়ির জন্য অর্থ জুটাইতে হইত, কারণ সেগুলি প্রতিবেশীগণের অন্তরে শ্রদ্ধা সম্ভ্রম এবং হিংসার উদ্রেক করিয়া বিচিত্র পদ্ধতিতে আমাদের সুখোৎপাদন করিত। সংক্ষেপে ফুলবাগানের জন্য উদ্বৃত্ত বিশেষ কিছু থাকিত না, এবং ফলে উঠানের এক কোণে অপরের নিকট হইতে চাহিয়া আনা কয়েকটি ফুলগাছ পুঁতিয়া সসঙ্কোচে মনের সখ মিটাইতাম। আমার সেই নগণ্য বাগান কোন লোকের প্রশংসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই বটে, কিন্তু সে যুগের আমার লেফাপা-লাঞ্ছিত জীবনে উঠানের সেই ছোট বাগানটুকুই আমার প্রাণের সত্যকার আশ্রয় ছিল। ওইটুকুর মধ্যেই কোন লেফাপা ছিল না। বস্তুত সেই ছোট বাগানটিকে আজও আমি ভুলি নাই। সর্ব্বসমেত বোধ হয় গুটি

দশেক গাছ ছিল, কিন্তু প্রত্যেক গাছের প্রত্যেক পাতাটি আমি চিনিতাম। প্রতি গাছের প্রতি ফুলটির উন্মেষ হইতে অবসান পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতাম। কোন্ গাছে কখন কুঁড়ি হইল, কুড়িটি কতদিনে ফুটিয়া ফুল হইল এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে কেমন করিয়া ঝরিয়া পড়িল—কিছুই আমার দৃষ্টি এড়াইত না। প্রত্যেক গাছের প্রতিটি আচরণ সাগ্রহে দেখিতাম। মনে হইত, উহাদের ভাষা যেন আমি বুঝি। প্রথম যেদিন গোলাপ গাছটায় কুঁড়ি হইল, সেদিনের কথা এখনও আমার বেশ মনে আছে। মনে হইয়াছিল, গোলাপ গাছটার ডালে ডালে পাতায় পাতায় বেশ যেন একটু অহঙ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া যেন বলিতেছে, কেমন কুঁড়ি হইয়াছে, দেখিতেছ তো!

সেই ফুল ফুটিয়া যখন ঝরিয়া গেল, তখন তাহার নীরব শোকও আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। তাহার পর দ্বিতীয় ফুলটি যখন ফুটিল, তখন তাহারও মুখে আবার হাসি ফুটিল বটে, কিন্তু তাহা বিষণ্ণ সশঙ্ক। ফুল ফোটে, ফুল ঝরে। প্রতিদিন দুই একটি ফুল ফুটিত, দুই একটি ঝরিত। প্রতি গাছটির হাসিকান্না আমি শুনিতে পাইতাম। আমার বাগান নগণ্য ছিল বটে, কিন্তু তাহাতেই আমি তন্ময় হইয়া থাকিতাম।

যুগলবাবু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া একবার আমার প্রতি চাহিলেন। একটু থামিয়া আমি পুনরায় সুরু করিলাম, তাহার পর অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। আমার প্রথম জীবনের অর্থকৃচ্ছ্রতা আর নাই বাগান বড় করিবার মত আর্থিক সঙ্গতি হইয়াছে এবং সত্য সত্যই বাগানকে বিস্তৃত করিয়াছি। এখন আমার বাগানখানা ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে অন্ততপক্ষে একবেলা কাটিয়া যায়। অনেকখানি জমি, অনেক রকম সার, অনেক রকম যন্ত্র, অনেক রকম গাছ, অনেকগুলি মালী জুটাইয়া বাগানের খ্যাতি বাড়াইয়াছি। আভিজাত্যগর্ব্বিত বহু

দুর্লভ ফুল আমার বাগান আলো করিতেছে, কিন্তু আমার সেকালের সেই ছোট বাগানের শীর্ণ গাঁদা, কীটদষ্ট গোলাপ, অপরিপুষ্ট মল্লিকা, আলোক-বঞ্চিত রজনীগন্ধাকে আজও ভুলি নাই। তাহাদের যত ভালবাসিতাম, ইহাদের তত ভালবাসি না। ইহাদের আমি চিনিই না। এই ভিড়ের সহিত আমার প্রাণের পরিচয় নাই। সহস্র সহস্র ফুল রোজ ফুটিতেছে ও ঝরিতেছে, খবর রাখা আর সম্ভবপর নহে। ইহাদের সকলের কুল, গোত্র, বংশপরিচয়, বৈশিষ্ট্য অবশ্য অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি। আপনিও পারিবেন, কারণ যে কোন ভাল ক্যাটালগে তাহা আছে। শুধু ফুল কেন, বইয়ের কথাই ধরুন না। সেকালে যখন বই কিনিবার ক্ষমতা ছিল না, অপরের বই চাহিয়া অথবা চুরি করিয়া যখন পড়িতে হইত, তখন কি আগ্রহেই না পড়িতাম! প্রত্যেকটি পুস্তকের সহিত, প্রতি পুস্তকের প্রতি পাতাটির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। এখন নিজের লাইব্রেরি প্রকাণ্ড, প্রতি মাসে নানা দেশের বিখ্যাত লেখকদের বই কেনা হইতেছে, কিন্তু সে আগ্রহ তো আর নাই। আলমারিতে সারি সারি বই জমিতেছে, অধিকাংশ পুস্তকেরই বাহিরের সৌষ্ঠব দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছি, হয়তো দুই-একখানা খুলিয়া দুই-চারিপাতা উল্টাইতেছি, উহাদের সম্বন্ধে দুই-চারিটা ধার করা জ্ঞানগর্ভ বুলিও হয়তো আওড়াইতে পারি, কিন্তু সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, ইহাদের কাহাকেও আমি চিনি না। যাহাদের চিনি, বহুপূর্ব্বেই তাহাদের চিনিয়াছি। নূতন করিয়া চিনিবার আগ্রহ আর নাই। এখন যাহা আছে, তাহা সংগ্রহ করিবার আগ্রহ।

মুগেলবাবু অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। বলিলেন, এ চিঠিগুলোর সম্বন্ধে বলিতে চান?

বলিতে চাই, আপনার বাগান অথবা লাইব্রেরিটি মন্দ নয়।

ইংরেজী ভাষায় যাহাকে বলে, এ গুড কালেকশন! শত বাধাসত্ত্বেও কখনও লুকাইয়া কাহাকেও যদি ভালবাসিয়া থাকেন (বাসিয়াছেন কি না জানি না), তাহা হইলে সেই একমাত্র ভালবাসা যাহা সত্য, এবং তাহাকে যদি আপনি সত্য-মর্য্যাদা না দিয়া থাকেন ঠকিয়া গিয়াছেন।

বাকিগুলি ?

বাকিগুলি আপনার অর্থ, খ্যাতি অথবা রূপের টানে স্বতই জুটিয়াছে অথবা আপনি জুটাইয়াছেন। বলিলাম তো, গুড কালেকশন। কিন্তু উহারা আমার বর্ত্তমান বাগানের ফুলের মত। আয়ত্তের মধ্যে থাকিয়াও অনায়ত্ত।

কেন ?

আসল কথা কি জানেন, আমরা যতই বড়াই করি না কেন, আমাদের প্রাণ সত্যই এত বড় অথবা মজবুত নহে যে, একাধিক নিবিড় পরিচয়ের ধাক্কা সামলাইতে পারে। সত্যকার প্রেম বড় সঙ্গীন বস্তু। অধিকাংশ লোকের জীবনে তাহা আসেই না। কিন্তু মজা এই যে, অধিকাংশ লোকই একাধিক রমণীর সংস্পর্শে আসিয়া মনে করেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই আদিঅন্ত তিনি নখদর্পণে দেখিতে পাইয়াছেন। আসলে আমরা প্রায় সকলেই দরিদ্র দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, পিটুলিগোলা পান করিয়া উদ্বাহু হইয়া নৃত্য করিতেছি।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সহসা অত্যন্ত দমিয়া গেলাম। সহসা মনে পড়িয়া গেল, প্রাণকান্তের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সন্ধ্যাবেলায় এক গ্লাস সিদ্ধি পান করিয়াছি। বিবেকের ধমকে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। বার দুই ঢোঁক গিলিলাম। যুগলবাবু বলিলেন, দিন মশাই, আর একটা সিগারেট

দিলাম।

যুগলবাবু সিগারেটটি ধরাইয়া সন্দিগ্ধভাবে আমার প্রতি চাহিতে লাগিলেন। আমার মনে হইতে লাগিল, আহা, লোকটি মানুষ না হইয়া যদি গাছ হইত, বাগানে পুঁতিয়া রাখিতাম।

"বনফুল"

"কবিতা একরকমের ব্যাধি, জীবাণু তার অগ্রদূত

—'জীবাণু' মাসিক পত্রিকার শিরোনামা, পৌষ ১৩৪৫

অর্থাৎ 'কবিতা' যদি ম্যালেরিয়া-জাতীয় ব্যাধি হয়, 'জীবাণু' তাহার অ্যানোফিলিস-মশক-বাহন; 'কবিতা' তিন মাসে একবার প্রকাশ পায়, 'জীবাণু'র সাক্ষাৎ পাই মাসে মাসে; 'জীবাণু' কামড়ায়, কিন্তু 'কবিতা' ভোগায়।

এমন অর্থপরিপূর্ণ অত্যুক্তিহীন "মটো" কদাচিৎ দেখা যায়।

* * *

গত পৌষে দুইটিরই প্রকাশ দেখা গিয়াছে, সুতরাং দৃষ্টান্ত দিতে পারিব।

ম্যালেরিয়া:— সেখানে এখন
পদসঞ্চরণ
বন-ভোজন
কাঁপন
শিহরণ
গোধূলি-রক্তিম আঁচে
সভ্যতার ছাঁচে
স্বভাবের তাড়নায় নাচে
শতাব্দীর
কৃষ্টির
দৃষ্টির
সোল্লাস মিলন।

—'কবিতা', পৌষ, পৃ. ২৫-২৬

ম্যালেরিয়ার কাঁপুনির সহিত তাল রাখিয়া ইহা রচিত। বিকারের ঘোরে প্রলাপেরও অভাব নাই। যথা—

১। মৈনাক, সৈনিক হও
ওঠো কথা কও।
দূর কর মন্থর মন্থরা—
এ সুদীর্ঘ দিন-রাত্রি প্রেত পদক্ষেপে
স্মৃতিরে করেছে পিরামিড।
আর সব উর্মিময় আরক্ত প্রহর
মিশরের মাম. হায়, শিশিরে ধূসর।
মৈনাক, সৈনিক হও
ওঠো কথা কও।

—ঐ, পৃ. ২২

২। সন্ধ্যায় ভিড়াক্রান্ত মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা
দেবতারো চোখে অনিদ্রা আনে ;
পুজোর পচা ফলে ফুলে পিচ্ছিল পথে
রক্তচক্ষু পুরোহিত হাঁকে,
হাঁকে জগদ্দল বৃষভ।

—ঐ, পৃ. ৫৫

*

মশক-গুঞ্জনও কম চিত্তাকর্ষক নয়! যথা—

১। হে পুরানো পাণ্ডুর সুদূর!
তোমার বেহায়াপণা ; সুন্দর ছেনালী—

—'জীবাণু', পৌষ, পৃ. ৮

২। নিরালা ঘরেতে নিরাপদ মোর আক্রমণ,
মালতী, তোমার দুই ঠোঁট ভরো নীল বিষে,—
মালতী, তোমার দু'চোখে বাড়াও আজ বোমা

—ঐ, পৃ. ১৭

অমিতার ওষ্ঠপ্রান্তে দ্রাবিকার রবে না তিমিত
পৃথিবী মরুভূ হলে ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিবে বায়স?

—ঐ, পৃ. ২৩

৪। আর এই পৃথিবীর কঠিন নীল ছাদে
জোনাকি যোনির আলোর বিচরণ।

—ঐ, পৃ. ৩১

কুইনিন-তিক্ত ও মশারি-কঠোর হইয়া উঠিয়া যে এই কম্পন ও গুঞ্জন রোধ করিব, তাহারও দেখিতেছি উপায় নাই—মশা ও ম্যালেরিয়া ক্রমশই চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

—

বাংলা দেশের মন্ত্রীমণ্ডলী যে কত অসহায়, তাহা তাঁহাদের রক্ষা-কবচের বহর দেখিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। চারিদিকেই শত্রু, সুতরাং দ্বারবান্ ও গুপ্তচরের প্রয়োগবাহুল্য স্বাভাবিক বিশেষত তাহাদিগকে বশে রাখিবার যাবতীয় উপকরণ যখন অপরে যোগাইতেছে, তখন তাহাদের সাহায্য না লওয়াটাই অসমীচীন। মন্ত্রীদের আক্ষেপ ছিল, তাঁহাদের গুণগ্রামের কথা কেহ প্রচার করে না, মিথ্যা দোষকীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে হেয় করা হয়; সুতরাং সপ্তাহে সপ্তাহে প্রচুর অর্থ-ব্যয় করিয়া 'বাংলার কথা' ও 'দি বেঙ্গল উইকলি' বাহির করা হইল, কিন্তু তাহাতেই কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? 'দি স্টার অব ইণ্ডিয়া' ও 'আজাদ' এই শত্রুব্যূহমধ্যে দ্বাদশ (১৬ই পর্য্যন্ত) অভিমন্যু সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার যে সৎসাহস এতাবৎকাল দেখাইয়া আসিতেছিলেন, নিন্দুকে সে সম্বন্ধে নানা নিন্দা রটাইতেছিল। কিন্তু যাঁহারা দেশপ্রাণ মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবকে চেনেন, তাঁহারা জানেন, কি নিদারুণ নির্যাতনের মধ্য দিয়া তিনি ভারতের স্বাধীনতাযজ্ঞে এই 'আজাদ'রূপী দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন। আজ যাঁহারা কৌরবরাজসভায় এই একবস্ত্রা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণলাঞ্ছনা দেখিয়া লজ্জায় ও সহানুভূতিরত অধোবদন হইয়া আছেন, তাঁহারা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন, ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেটে বিপদবারণ মধুসূদন দ্রৌপদীর জন্য ত্রিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন, ঈশ্বরানুগ্রহের এমন প্রত্যক্ষ, এমন চমকপ্রদ নিদর্শন দেখিলে অতি বড় নাস্তিকও বিশ্বাসী হইয়া উঠিবে।

'আজাদে'র প্রসঙ্গ অবান্তর, আমাদের কথা লাঞ্ছিত মন্ত্রীমণ্ডলীকে লইয়া। তাঁহাদের অত্যধিক ঔদার্য্যই তাঁহাদের কাল হইয়াছে। যেখানে অতি সহজে তাঁহারা চোর ধরিয়া কয়েদে দিতে পারিতেন (জেলখানার অভাব বাংলা দেশে এখনও হয় নাই), সেখানে সহজলভ্য সুলভ পয়সার বিনিময়ে আরও কতকগুলা চোর নিযুক্ত করিয়া চোর ঠেকাইবার এই পন্থা আমাদের ভাল ঠেকিতেছে না। আশা করি, পরবর্ত্তী বাজেটে আমাদের এই কথা বিবেচিত হইবে।

—

ফাল্গুনের 'ভারতবর্ষে' "শুক্রাচার্য্যের স্বপ্ন" চিত্রটি কোন্ স্টুডিয়োয় গৃহীত তাহা লিখিতে ভুল হইয়াছে। ভূমিকায় কাহারা অভিনয় করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে আমরা অধিক উৎসাহিত হইতাম। শুক্র কবে মঙ্গল হইবে ?

—

'**ম**ন্দিরা'য় (ফাল্গুন, ১৩৪৫) শ্রী (মতী ?) পরিমল দাসের "ভাঙনের গান" বাক্-অর্থ সকল দিক দিয়াই সার্থক হইয়াছে। এরূপ হরগৌরী-সম্মিলন এযুগে ক্বচিৎ দেখা যায়।

[হে ধনিক]

মানুষেরে তুমি যন্ত্র করেছ, অন্তরে তুমি করনি স্বীকার,
তাই যত আজ বিদ্রোহী আত্মা করে দাবী অধিকার।

[শোষিত-মানব,]

ধরিতে হইবে রুদ্রের বেশ, পুরাতন জরাজীর্ণ
লাথি মারি তোমা প্রবল আঘাতে করিতে হইবে দীর্ণ।

ভাঙনের গানও বাঁধা ছন্দে লিখিলে ভাল শোনায়, এইটাই আশ্চর্য্য।

—

মাঘের 'ভারতবর্ষে' একটি "শিকার-কাহিনী" বাহির হইয়াছে। আলিপুর দুয়ারের প্রবীণ শিকারী শ্রীপুলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

জানাইয়াছেন, লেখাটির কাহিনী-অংশ সম্ভবত ঠিক আছে, কিন্তু শিকার-অংশ নির্ভুল বলিয়া তিনি স্বীকার করিতে পারেন না।

লেখাটি পড়িয়া দেখিলাম। কাহিনী-অংশও সমর্থনযোগ্য নয়। এমন পঙ্গু ভাষায় লেখা রচনা 'ভারতবর্ষে' যে স্থান পাইতেছে, তাহার কারণ সম্ভবত সম্পাদকীয় শৈথিল্য; রবিবাসরের ভোজবাহুল্যে শ্রবণ এবং দৃষ্টি দুইই গিয়াছে, ঘ্রাণের সাহায্যে রচনা নির্ব্বাচিত হইতেছে।

* * *

শিকার সম্বন্ধে যাঁহাদের সখ আছে, অথচ যাঁহাদের বিদ্যা এই জাতীয় প্রবন্ধ হইতে আহৃত, তাঁহারা হাতে-বন্দুকে শিকার করিতে গিয়া পাছে বিপন্ন হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় পুলিনবাবু প্রতিবাদ করিয়াছেন। হাতুড়ে ডাক্তারের শাস্তির ব্যবস্থা আছে, হাতুড়ে শিকারীর শাস্তি হওয়া উচিত কি না, আইনকর্ত্তারা বিবেচনা করিবেন। গাঁজাখুরির একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি।

জঙ্গলে দুটা বাঘের বাচ্চা খেলা করছিল। বাচ্চা দুটি ছোট—বেশ সুন্দর—খুব পুষ্ট। মেঘু নামে আমাদের এক সঙ্গী গিয়ে একটা বাচ্চা ধরে কোলে তুলে নিল এবং গায়ের মোটা চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে ফেলল।

ছমকু চীৎকার করে উঠল—মেঘা, ও মেঘা, ও পাজী, সর্ব্বনাশ হবে রে—এখনই এটার চেঁচা-মেচিতে বাঘিনী এসে উপস্থিত হবে। উপায় থাকবে না রে পাজী, শীগ্‌গির ছাড়—ছাড়—এ গহিন জঙ্গল—ছাড়—

মেঘা বলে বসল—হঃ, হাতে দোনালা বন্দুক, উঠব গিয়ে ঐ তেঁতুল গাছে—বাঘের বড় ভয় লাগছে।

হারামজাদা পাজী, সবাইর জীবন শেষ করবি নাকি। বাঘিনীর কোপে আজ আর রক্ষা থাকবে না।

অদূরে বাঘিনীর ভীষণ গর্জ্জন শোনা গেল। মেঘার কোলে বাচ্চাটাও চীৎকার করেছিল। অনন্তোপায় হয়ে আমরা গাছে উঠে পড়লাম। আমাদের দলের 'চাঁদ ঠাকুর'

গাছে উঠতে পারেন না জানালেন। তাঁকে যে ভাবে উপরে তোলা হ'ল—তা বলবার নয়। ছমকুর মত শক্তিমান লোক ছিল বলেই আমরা চাঁদকে বুকে চাদর বেঁধে গাছে ওঠাতে পেরেছিলাম।

ততক্ষণ বাঘিনীর গর্জ্জনে বন তোলপাড়। রক্তচক্ষু বাঘিনী গাছের দিকে চেয়ে যে রকম ঘোঁ ঘোঁ করেছিল, তাতেই আমাদের আত্মাপুরুষ তুলারাম খেলারাম করতে লেগে গেল। মেঘা বলল—গুলি লাগাও, একবারে পাঁচটা সাতটা।

ছমকু বলল—সাবধান, যদি কখনও সময় হয় গুলি ছোঁড়বার—আমিই বলব।

ক্রমে তিনটা বাঘ সেই গাছতলায় এসে চীৎকার আরম্ভ করল। চাঁদ-ঠাকুরকে কাপড় দিয়া গাছে বেঁধে না রাখলে যে কি দশা হ'ত, তা বলাই বাহুল্য। আমি শীকার দুর্ব্বল যুবক, কোন মতে গাছ ধরে বেঁচে আছি মাত্র।

বেলা পশ্চিমে হেলে পড়ল। ছমকু বলল—শীঘ্র জঙ্গল থেকে বার হতে না পারলে আজ এখানেই রাত্রিযাপন করতে হবে।

আমি প্রস্তাব দিলাম—বাঘের বাচ্চাটা ফেলে দাও—গোলমাল চুকে যাক।

ছমকু বলল,—তবু বাঘ এখান থেকে সরবে না। এখন মনে হয়, কাছে আর বাঘ নেই—যারা ছিল, এসেছে; এখন ঠিক নিশান-সই করে গুলি ছোঁড়। ঐ যে একটা খাল দেখা যায়—ওটা পার হয়ে না গেলে বাঘকে বিশ্বাস নাই।

পরামর্শমত দুজনে বাঘিনীটাকে, দুজনে বাঘটাকে 'রাম, এক, দো' বলে গুলি ছুঁড়লাম। বাঘিনী ঠায় পড়ে গিয়ে লম্বা দিল—বাঘা মাথা ঝাঁকতে ঝাঁকতে গোঁ গোঁ করে ছুটতে লাগল। অপর বাঘ পালিয়ে গেল। ছমকু গুলী-লাগা বাঘটাকে তাক্ ক'রে আর একটা গুলি ছুঁড়ল—বাঘা লম্ফ দিয়ে খালের জলে গিয়ে পড়ল—তারপর চুপ।

(১) বাঘের বাচ্চা মায়ের কাছ হইতে দূরে খেলা করে এবং বিড়ালের ছানার মত অবলীলাক্রমে তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাওয়া যায়; (২) বাচ্চাবতী বাঘিনীর আশেপাশে ছলো-মেনি অন্যান্য বাঘেরা এমন ভাবে অবস্থান করে যে এক ডাকেই কাছে আসিয়া পড়ে; (৩) ধৃতবাচ্চা বাঘিনীর গর্জ্জন শোনার পরেও বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল শিকারীরা

সদলবলে তেঁতুলগাছে চড়িয়া বসিবার এবং একজনকে বুকে চাদর বাঁধিয়া টানিয়া তুলিবার অবকাশ পায়—এগুলি মারাত্মক সংবাদ।

'ভারতবর্ষ' যাহা শিকার করিতেছেন, তাহাই করিতে থাকুন বাঘীয় 'পরিস্থিতি'র মধ্যে তাঁহারা নাই গেলেন।

বন্ধুত্ব নানা প্রকারের হইতে পারে; প্রণয়াত্মক, প্রেমাত্মক, ঋণাত্মক, ধনাত্মক, অবসর-বিনোদনাত্মক ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সহিত শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দের যে বন্ধুত্ব সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, তাহা উপরোক্ত কোন পর্য্যায়েই পড়ে না; ইহা সম্পূর্ণ অভিনব বন্ধুত্ব—ধ্বন্যাত্মক বন্ধুত্ব। ফাল্গুনের 'পরিচয়ে'র ১৬৮ পৃষ্ঠায় শ্রীবিষ্ণু দের দুই নম্বর প্রার্থনা দেখুন—

বৃষস্কন্ধে সূর্য স্থির, বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মের মড়কে
বর্ষভোগ্য রুক্ষ শাপ চৈতালির গণ্ডলচড়কে
আজো দেখি খষ্টি বর্ষে। বৈশাখের অজবন্ধু মেঘে
কর্কটক্রান্তির পাপ ক্লান্তিহীন দুর্বাসার রোষে
তাপমানে আজো জাতিস্মর। বজ্রপাণি উদাসীন,
স্বয়ম্বশ অমরার শীতকক্ষ ফরাসে আসীন!
দয়াহীন ইরম্মদ!

গোপালদা বলিলেন, থাম। সম্মুখেই টেবিলের উপর 'শব্দকল্পদ্রুম' ছিল, তিনি তাহাতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন এবং তুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে মুখে শুধু বলিলেন, অজ বন্ধু মেঘ!

আমরাও বলি, সময় ও সুযোগ পেলে এবং ধীর-স্থির-চিত্তে কাব্যসাধনায় নিয়োজিত থাকলে ডি. এনানৎসিও, রবীন্দ্র-নজরুল তিনি (জসীম-উদ্দীন) না হ'তে পারেন—কালিদাস, ফেরদৌসী বা মাইকেল হ'তে পারেন।"

—মজলুর রহমান, 'মাসিক মোহাম্মদী,' মাঘ ১৩৪৫, পৃ. ২৮৩

গোপালদা এবারে যাহা বলিলেন, তাহা ছাপা যায় না। কিন্তু কটূক্তি তো আর যুক্তি নয়! ডেনানৎসিও-রবীন্দ্র-নজরুলে আমাদের প্রয়োজন নাই, কিন্তু কালিদাস-মাইকেলকে আমরা চাই। তজ্জন্য জসীম-উদ্দিন সাহেবকে সম্পূর্ণ সময় ও সুযোগ দিতে বাঙালীমাত্রেই প্রস্তুত আছে; সদ্যপ্রসূত বাজেটে একটা সংশোধনী প্রস্তাব দিতেও কেহ আপত্তি করিবে না। কিন্তু এমনিতেই ব্যক্তিগত এবং সম্প্রদায়গত নানা কারণে তিনি যেরূপ অধীর এবং অস্থির আছেন, উপরোক্ত মন্তব্যের পর যদি সম্পূর্ণ অধীর-অস্থিব হইয়া উঠেন, তাহার জন্য 'মাসিক মোহাম্মদী'র সম্পাদক মহাশয় কি দায়ী হইবেন? বাঙালী বড় দুর্ভাগ্য জাতি, তাই ভয় হয়।

—

আধুনিক "Last Ride Together"-পড়া চালাক মেয়েদের ট্র্যাজেডি সত্যই ভয়ানক। ললিতার অবস্থা কি করুণ নয়? ফ্ল্যাট-বাড়ির কত তাজা তরুণীর প্রাণ যে এই বেদনায় জীর্ণ হইয়া গেল, সিটি-ফাদাররা তার কি খবর রাখেন?

পাশাপাশি তিনটি ফ্ল্যাট। একটিতে পরেশরা থাকে, সে কলেজে পড়ে, বয়স বাইশ বছর। একটিতে থাকে ললিতারা। তৃতীয়টিতে থাকেন ধীরেনবাবু। তাঁহার বোন লীলা ললিতার কাছে দুপুরে পড়িতে আসে।

উচ্ছ্বসিত যৌবনের ফেনাকে শীতল করা ললিতার সাধ্য নয়। পরেশকে ও ভালবাসে—হ্যাঁ ভালই বাসে বলা যায়। কিন্তু পরেশ ভালবাসার সব ইঙ্গিত বোঝে না। মেয়েদের সঙ্গে মেশে নাই বলিয়াই হয়ত'। খালি ভালবাসার উপর কল্পনায় রঙ চড়াইয়া একটা মাদকতা অনুভব করিতে চায়, ভালবাসার আনুসঙ্গিকগুলো ছাঁটিয়া ফেলিতে পারিলেই যেন ও বাঁচে। পরেশ কি বোঝে না ললিতার প্রায়-ব্যক্ত ইঙ্গিতগুলো?

কিন্তু ধীরেনবাবু বোঝেন। ভগিনী বীণার মারফৎ তিনি চিঠিও পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু ললিতা চায় পরেশকে জাগাইয়া তুলিতে। সেদিন দুপুরে ললিতার দুঃখ খুব গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। পরেশ

আজকের দুপুরটা থাকিলেও পারিত। আজকে তাহ'লে পরেশকে ও জোর করিয়া এ ঘরে আনিতে পারিত। কিংবা নিজেই হয়ত ওদিকে যাইতে পারিত। যাওয়া তো আর কঠিন কিছু নয়—বাথরুমের পাশের ঐ ছোট্ট দরজাটা খুলিয়া ফেলিলেই তো পরেশদের রান্নাঘর। পরেশটা বোকা।

সুতরাং দি আদার ফ্ল্যাট—ধীরেনবাবুর চিঠি—

পরেশের মত ফাঁকা এবং কল্পনাসর্ব্বস্ব নয়—এর পিছনে বাস্তবতার একটা উগ্র, রিমঝিমে [?] গন্ধ আছে। চিঠির শেষে একটা অনুগ্রহ চাহিয়াছেন—তাঁহার সহিত নির্জ্জনে দেখা করিবার সুবিধা ললিতার হইবে কি? দুপুরে তিনি বাড়ীই থাকেন।

তা' হইবে না কেন? দুপুরে তো ললিতাও থাকে; আর যদি নির্জ্জনতার কথা বল, ললিতার বাড়ীর মত পাড়ায় আর একটিও নির্জ্জন বাড়ী আছে কি না সন্দেহ। বুড়ো পিসী কানে শোনেন না—দুপুরে আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়া ঘুমান। বাপ অফিসে যান, ফিরিবেন তো সেই সাতটায়। অফুরন্ত নির্জ্জনতা! ধীরেনবাবু যে কোনওদিন আসিতে পারেন; ইচ্ছা করিলেই কালকেই।

একটি অতি-আধুনিক পত্রিকায় গল্পটি মাঘ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। নমর্থা কন্যাদের লইয়া কলিকাতায় যাঁহাদের ঘর করিতে হয় এবং অর্থাভাবে যাঁহাদিগকে ফ্ল্যাটের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাঁহাদের অবগতির জন্য গল্পের মোদ্দাকথাগুলি উদ্ধৃত করিলাম। পরেশদের ভয় নাই, কিন্তু ধীরেনবাবুরা যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছেন, দৈনিক সংবাদপত্রের আইন-আদালতের পৃষ্ঠায় তাহার প্রমাণ মিলিবে। ধীরেনবাবুদের উগ্র বাস্তবতার রিমঝিমে গন্ধ হইতে দুপুরে বেকার ললিতাদের উদ্ধার করাটা প্রতিদিনই একটা সমস্যার মধ্যে দাঁড়াইতেছে। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান পরেশদের হাতে, তাহাদিগকেই আর একটু বাস্তব করিয়া তুলিবার জন্য অতি-আধুনিক সাহিত্যিকেরা চেষ্টা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে আমরা নূতন বৎসরের সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার এবং ডায়েরি পাইয়া আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বেঙ্গল কেমিক্যাল — ক্যালকাটা বিল্ডার্স স্টোর্স লিমিটেড
ইস্টার্ন টাইপ ফাউণ্ড্রি — বালিকা টাইপ ফাউণ্ড্রি
বেঙ্গল ড্রাগ স্টোর্স — ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স লিমিটেড
হুগলি ইঙ্ক কম্পানি লিমিটেড — মার্টিন এণ্ড কোং
ইসাভি ইণ্ডিয়া ম্যাচ ফ্যাক্টরি ও ইণ্ডিয়ান সিল্ক উইভিং কম্পানি

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জব্দ-প্রতিযোগিতা

নির্ম্মাণকর্ত্তা—একাদশ ধর

কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না, 'শনিবারের চিঠি'তে জব্দ-প্রতিযোগিতা দিবার কারণ ঘটিয়াছে। উত্তুঙ্গ হিমালয় আজ যেখানে মাথা খাড়া করিয়া আছে, একদিন সেখানে উত্তাল সমুদ্র ছিল বিশ্বাস করিতে পারেন? 'ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি' একদিন ক্রস-ওয়ার্ড পাzল ছাড়া বাহির হইত বিশ্বাস হয়? ভবিষ্যতের আশা প্রকাশ করিয়া বলিতে নাই; তবে অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে অদূর-ভবিষ্যতে জলে জাহাজ, স্থলে ট্রেন, আকাশে এরোপ্লেন, হোটেলে মদ, রাষ্ট্রে শাসন, কর্পোরেশনে ঘুষ এবং গোপনে প্রেম যথাবিধি চালাইবার জন্যও যে ক্রস-ওয়ার্ড বা শব্দ-প্রতিযোগিতার সাহায্য লইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাধ্য হইয়া জাত দিবার পূর্ব্বে সাধ করিয়া গলায় কণ্ঠিধারণ বুদ্ধিমানের কাজ। 'প্রবাসী'-দিদি ও 'ভারতবর্ষ'-দাদাকেও বেশি দিন কৌলীন্য-গর্ব্ব বজায় রাখিতে হইবে না—অক্টোপাসের বাহু সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতেছে। ইহাই আমাদের কৈফিয়ৎ। নিয়মাবলী অত্যন্ত সহজ।

১। প্রতিযোগিতায় যাঁহারা যোগদান করিবেন, তাঁহারা আমাদিগকে লজ্জা দিতে পারিবেন না, আমরাও তাঁহাদিগকে লজ্জা দিব না।

২। কুপনে জবাব পাঠাইলে আমাদের লাভ হয়, কিন্তু আমাদের হইলে সকলে খুশি না হইতেও পারেন; সুতরাং কুপন বাদ দিয়াও জবাব দেওয়া চলিবে।

৩। জব্দ-প্রতিযোগিতা জবাবের অপেক্ষা রাখিবে না।

৪। আমাদের জবাবই শিরোধার্য্য করিতে হইবে।

৫। উকিলে মানহানির ভয় দেখাইয়াছে, সুতরাং কোনও সমাধানই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না, বিবিধ পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট গাঙ্গুলী-উপাধিধারীদের মুখে মুখে সমাধান প্রচারিত হইবে। ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় কেহ নির্দ্দেশ করিলে তাহা গৃহীত হইবে।

৬। পুরস্কারের পরিমাণ সমাধানের মধ্যেই দেওয়া থাকিবে—পুরস্কৃত ব্যক্তি যে কোন উপায়ে তাহা লইতে পারিবেন।

৭। আমাদের উদ্দেশ্য বর্ত্তমানে সাধু।

৮। চিঠিপত্র জব্দ-প্রতিযোগিতা সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

১					২		
		৩			৪		
			৫	৬			
	৭	৮		৯			১০
১১							
	১২						
১৩					১৪		
	১৫			১৬			

সঙ্কেত

পাশাপাশি

১। এঁর পরিচয় ইনি দিয়েছেন নিজে।
স্থবির লেখনী চালে চটুল গতি যে॥
সাহিত্য-সীমানা হ'ল জীবনবীমায়।
বিদেশী বাদ্যের সাথে ধ্রুপদ ঝিমায়॥

২ মূল্য এঁর নেই কিছু বিদ্যা ঘোরে পিছু পিছু
ভূষণে জড়িত দেহ নির্ঘোষিত তাই।
কোষ-অগ্রে মহা-মারী ক্ষিপ্ত-জ্ঞান অম্বুবারি
ধারে ভারে কাটে তবু অতৃপ্তি সদাই।

৩। প্রতিভাবান্ কবি।

৪। বিবেকানন্দের শ্বশুর।

৫। প্রথমে রয়েছে দেখ আধশিশি মাল।
প্রথমে দ্বিতীয়ে তার শুভ চিরকাল॥
বিপরীত শব্দ রাশি প্রথমে তৃতীয়ে।
প্রথম চতুর্থে রাঁধ ব্যঞ্জনেতে দিয়ে॥
অর্দ্ধেক দেবতা তার আধখানা নর।
দুইটি পুরুষে জোড় লেগেছে সুন্দর॥

৭। কালিদাস নালিস করেছে।

৯। অনন্ত নজির।

১১। বর্ত্তমান বাংলার অর্থসচিব ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অনর্থসচিব।

১২। এই শব্দসন্ধানের নির্ভুল সমাধান যিনি করতে পারবেন, তিনি পাবেন "—"।

১৩। অ-চতুর্ নিরাকার সাহিত্যিক।
বিরাম লভিয়া মন তাঁহারেই বন্দে—
মোহনে দোহন করি আছেন আনন্দে।

৫ এঁর নামটি শুনলেই মনিব্যাগটির কথা মনে পড়ে।

১৬। আধখানা অনামুখ আদি তৃতীয়ে।
দ্বিতীয়ে চতুর্থে কুড়ি আছে থিতিয়ে ॥
বান ডাকে মাঝে তায় দুকূল ছেপে।
শরতের কালে শুনি গিয়েছে ক্ষেপে ॥
পিছনে সাঁতার কাটে গোপনে খাসা।
ঘোলের ভিতরে ডুবে অনাদি চাষা ॥

উপর থেকে নীচে

১। রবিরে দেখাতে ইনি জ্বালেন লণ্ঠন।
তরুণে করেন কভু প্রগতি বণ্টন ॥
নহে পিকপুচ্ছ—গায়ে ব্রাউনিঙ-জামা।
মরে গেল ভাগিনেয়, বেঁচে গেল মামা ॥

২। জনৈক মহিলা-কবি। ডুমুরের ফুলের মত ইনি। হ'ল,—একটিবার ঔপন্যাসিক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে এর জিজ্ঞাসা করবেন, মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

৬। এঁর নামটি তো আপনাদের কাছে বলাই আছে। তবু সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর এ নামের বিশেষ কোন মূল্য নেই।

৭। জগতের সাহিত্যিকদের সাধনার উপাদান। এবং বা তরুণ সাহিত্যিকদের অন্যতম সাধনক্ষেত্র ছিল।

৮। চুণিপা ধনী হয়ে বেসামাল।

১০। রাণীত্ব ত্যজিলে ইনি নৃপতি বিষয়।
কৃষ্ণনাম জুড়ে নিত্য করে যার স্তব ॥
কলিকালে ভালোবাসা সুলভ তো নয়।
ভাগ্যগুণে হইয়াছে ইহার আশ্রয় ॥

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস

ফাল্গুন ১৩৪৫, February 1939. 4 annas per copy.

ফাল্গুন ১৩৪৫, February 1939. 4 annas per copy

সূচী

ফাল্গুন—১৩৪৫

শনিবারের চিঠির নিয়মাবলী

১। শনিবারের চিঠির বার্ষিক চাঁদা ডাকমাশুলসহ ৩৷৹ ভি-পিতে ৩৷৶৹ ; ষাণ্মাসিক ১৸৹, ভি-পিতে ১৷৵ ব্রহ্মদেশে ৩৸৹, ভি-পিতে ৩৷৶৹ ; ও ভারতের বাহিরে বার্ষিক ৪৶৹। প্রতি সংখ্যা ।৹, ডাকে ।১৹।

২। শনিবারের চিঠির বর্ষ কার্ত্তিক হইতে গণনা করা হয়।

৩। নমুনার জন্য সাড়ে চারি আনার স্ট্যাম্প পাঠাইতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ চিঠি লিখিবার সময় গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ করিবেন।

১১শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৪৫ [৫ম সংখ্যা

বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক

১

আধুনিক যুগ সাহিত্য-রসের যুগ নহে ; কেন নহে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। ইহা লইয়া দুঃখ করিবার কারণ থাকিলেও তাহাতে লাভ নাই। দেহের পক্ষে পথ্যাভাব এবং মনের পক্ষেও নানা কুপথ্যের প্রাচুর্য্যে এ যুগে যে সকল ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাহাতে সাহিত্য মাথায় উঠিয়াছে, বুকের কাছে তাহার আর টিকিয়া থাকিবার জো নাই। যাঁহারা, 'render unto Cæser what is Cæser's due—এই আশ্বাসবাক্যে বাস্তবের সহিত রফা করিয়াই রসের স্বর্গরাজ্যে বাস করিবার আশা রাখেন, তাঁহারা হয়তো এখন সংখ্যায় আরও অল্প ; এবং বোধ হয় সেই কারণেই, যাহারা শিশ্নোদর ছাড়া আর কিছুই মানিবে না, এবং যাহাদের সংখ্যা এ যুগে ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে, তাহারা এই রসব্রহ্মের পূজারীদিগকে কেবলমাত্র ভোটের জোরে

পিষিয়া শেষ করিতে চায়। সত্য কোন্ পক্ষে, ন্যায় কোন্ পক্ষে ধর্ম্ম কোন্ পক্ষে—আজিকার রাষ্ট্রনীতিতেও সে প্রশ্নের মীমাংসা যে ভাবে হইয়া থাকে—অর্থাৎ, একমাত্র দেখিবার বিষয় কোন্ পক্ষ সংখ্যায় বা জড়শক্তিতে প্রবল, তেমনই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রসিকের কথা গ্রাহ্য নয়; যাহারা সংখ্যায় অধিক সেই শিশ্নোদরপরায়ণ জনমণ্ডলী রসের যে নূতন অর্থ করিবে, তাহাই পণ্ডিত-মূর্খ রসিক-বেরসিক নির্ব্বিশেষে সকলকে মানিয়া লইতে হইবে এবং ব্যাস-বাল্মীকি হইতে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত—বেদ-উপনিষদের ঋষি হইতে আধুনিক মন্ত্রদ্রষ্টা পর্য্যন্ত সকলকে বাতিল করিয়া দিয়া, 'প্রগতি' নামক একটি অনার্য্য শব্দকে বিশাল বংশদণ্ডে বাঁধিয়া, ভদ্রবেশী বর্ব্বরগণের অগ্রণী হইয়া, আধুনিক নগর-চত্বরের পণ্যবীথি প্রকম্পিত করিতে হইবে!

যুগধর্ম্ম তাহাই বটে, এবং তজ্জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। জীবনের সহিত রসের যে আত্মিক সম্বন্ধ, তাহা একালে রক্ষা করা বড়ই দুরূহ; এমন কি, রসিকজনের পক্ষে যেখানে-সেখানে সেই রস নিবেদন করিতে যাওয়াও নিরাপদ নহে। কিন্তু একটা বিষয় ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়; রসকে যাহারা স্বীকার করে না, তাহার সেই ধ্বংসাবশেষের ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে শিবির-সন্নিবেশ করিতে তাহারা এতই অনিচ্ছুক কেন? গত দুই আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর রসিক-সমাজ যে বস্তুকে যে নামে ও যে রূপে সাক্ষাৎ করিয়াছে সৃষ্টি করিয়াছে এবং উপভোগ করিয়াছে, তাহা যদি একালে একান্তই অচল হয়, তবে এই নূতন দেশ ও কালের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন নামে একটা নূতন বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিলে তো আর কোনও বাদ-বিসম্বাদের কারণ থাকে না। 'প্রগতি'র মতলব তাহা নয়, সেই সাহিত্যের বুকের উপরে বসিয়া, সেই রসেরই জাত মারিয়া, আপন মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে

হইবে, নতুবা ভুঁইফোঁড় হওয়ার একটা অসুবিধা আছে। অতএব জোর গলায় ঘোষণা করা চাই যে, 'প্রগতি'ও রসেরই প্রগতি, রস এতদিন বদ্ধ অবস্থায় ছিল, আমরা তাহাকে every aspect of life জুড়িয়া—অর্থাৎ নালা-নর্দ্দমা পর্য্যন্ত, মুক্তধারায় বহাইয়া দিয়াছি। যাহারা অতীতকালের অপ্রগতিজনিত মধুদুগ্ধ-পিপাসাকেই রসপিপাসা বলিয়া মনে করে, তাহারা শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করে নাই—চা খাইতে শেখে নাই। আড়াই হাজার বৎসরেও মানুষের যে যৌবনলাভ ঘটে নাই, বিংশ শতাব্দীর একপাদ পূর্ণ না হইতেই সেই যৌবন উপস্থিত হইয়াছে ; এত যুগ এত জাতি ও এত বিভিন্ন ভঙ্গির কাব্য-সাহিত্যে যে রসের শাশ্বত ভিত্তি টলে নাই, আজ সহসা তাহার আয়ু ফুরাইয়াছে! যদি ফুরাইয়াই থাকে, তবে তাহা লইয়া এত লাফালাফি কেন?

পৃথিবী যে ঘুরিতেছে, সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে স্থির হইয়া নাই, এই প্রগতিতত্ত্ব তো বহুপূর্ব্বে আবিষ্কৃত ও ঘোষিত হইয়াছে। স্থির পরিণাম অপেক্ষা গতিই যে শ্রেষ্ঠতর, রূপের জড়-পরিসমাপ্তি অপেক্ষা ভাবের অনিয়ত চিৎ-প্রেরণাই যে মহত্তর, এইরূপ চিন্তা বা দার্শনিক মতবাদ তো বহুকাল প্রচলিত আছে। তথাপি এইরূপ মতবাদ সত্ত্বেও সেই প্রাচীন রসবাদ কাব্যে ও কলাশিল্পে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চিরদিন জড়-নিয়মের উর্দ্ধে আপন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আধুনিক প্রগতিবাদীর দল এমন কি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, এমন কোন্ অজ্ঞাত সত্যের সন্ধান দিয়াছে, যাহার ফলে মানুষের আত্মা একেবারে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইতে বাধ্য হইবে?

আসল কথা, এই 'প্রগতি'র ধ্বজাধারীগণ এতদিন এই ভূমণ্ডলেই অন্য নামে পরিচিত ছিলেন ; বিদগ্ধ রসিক-সমাজও যেমন সকল দেশে

সকল কালেই ছিল ও আছে, এই পণ্ডিতম্মন্য অসভ্য বর্ব্বরেরাও তেমনই সকল যুগে সকল সমাজে বিদ্যমান ছিল। আজ যুগধর্ম্মের সুযোগে মানব-সভ্যতার এই অতিশয় সঙ্কটময় দুর্দ্দিনে, ইহারা, এই রস-অধিকার-বঞ্চিত হরিজনেরা, জাতে উঠিবার জন্য বিষম কোলাহল সুরু করিয়াছে। যাহাদের রসবোধের অভাব জন্মগত, রস কি বস্তু সেই চৈতন্যই যাহাদের নাই, তাহারাই আজ রসের অধিকার দাবি করিয়া সাহিত্যিক হইতে চায়। ইহারাই রস-ব্রহ্মের ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারকে পদাঘাত করিয়া আপনাদের শূদ্রতারই জয়ঘোষণা করিতেছে। কাল তাহাদের অনুকূল, আজ দিকে দিকে মানবাত্মার দুর্গতি, মানবজাতির সুদীর্ঘ সাধনার পরমধনের অপচয়, যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ তাহারই ধূলিধূসর পরিণাম জ্ঞানী ভক্ত ও রসিকের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে—এ হেন সময়ে, যাহারা পৃথিবীর ব্রাহ্মণ-সমাজে কখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেই ইতর মানুষেরা মহা সুযোগ লাভ করিবে, ইহাই তো স্বাভাবিক।

২

'প্রগতি' শব্দটির যাহা অর্থ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইংরেজীতে progress বলিতে যাহা বুঝায়, তাহারই বিশেষ ও ব্যাপক অর্থ বাংলায় প্রকাশ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ এই শব্দটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শব্দের মোহ ও মাহাত্ম্য কম নয়, তাই এই শব্দটিকেই আশ্রয় করিয়া ক্রমশ ইহার অর্থগত বিদেশী ভাব আমাদের ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজের বড় কাজে লাগিয়াছে। সম্প্রতি ইহারা নিখিল-ভারতীয় প্রগতি-কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাঁহাদের এই উপবঙ্গীয় প্রগতিবাদকে বঙ্গবাসীর চক্ষে, প্রীতিপ্রদ না হউক, ভীতিপ্রদ করিবার চেষ্টা

করিয়াছেন, তাঁহারা সাহিত্যে প্রগতিবাদ প্রচার করিয়াছেন। রাষ্ট্রে, সমাজে এবং জাতির জীবনঘটিত নানা সমস্যায় প্রগতিতত্ত্বের অবকাশ আছে; এবং সেই সকল ব্যাপারে তাহার আলোচনা ও প্রচারমূলক গ্রন্থরাজিকে প্রগতিবাদী সাহিত্য বলিতে কাহারও আপত্তি নাই; কারণ, ইংরেজীতেও literature শব্দটি অতিশয় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যসংক্রান্ত বিবরণও literature আখ্যা পাইয়া থাকে। কিন্তু সাহিত্যের নামেই এই যে প্রগতির দাবি, ইহা একপ্রকার সাহিত্যকেই অস্বীকার করা—ইহার মূলে আছে রসের বিরুদ্ধে বেরসিকের আক্রোশ। এই প্রগতিবাদ হইতে সাহিত্যের আদর্শকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য ইদানীন্তনকালে য়ুরোপীয় সাহিত্যাচার্য্যগণ কাব্যরসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। যাহারা এইরূপ প্রগতিবাদী তাহাদের সহিত সাহিত্যের কোনও সম্পর্কই নাই, বরং সম্পর্ক অস্বীকার করাই উভয় পক্ষে মঙ্গলকর। ওদেশে সে চেষ্টা যথেষ্টই হইতেছে; আমাদের দেশে এ কাজ করিবার কেহ নাই, তাই অপর পক্ষের অনাচার এত বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই প্রগতিবাদীর দল সাহিত্যের অর্থান্তর করিতে চায়, কিন্তু নামান্তর করিতে রাজি নহে। জীবনকে ইহারা যন্ত্ররূপেই ভাবনা করে, যন্ত্রের কালোপযোগী পরিবর্ত্তন আছে, নূতন অংশ যোজনা ও পুরাতন অঙ্গসংস্কার অবশ্যম্ভাবী। এবং যেহেতু যন্ত্রের ক্রিয়াও তদনুরূপ হইতে বাধ্য, অতএব সে বিষয়ে আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না। সাহিত্যও সেই জীবন-যন্ত্রেরই একটা ক্রিয়াবিশেষ। মানব-সমাজের গতি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই জীবন-যন্ত্রও জটিলতর হইতেছে, সেই জটিলতাই তাহার গৌরব। অভাব যত বাড়িতেছে, ততই যন্ত্রও চক্রবহুল হইয়া উঠিতেছে; এই সকল চক্রের মিলিত ঘর্ঘরধ্বনি

চক্রবৃদ্ধির হারে কালক্রমে বিশালতর হইতেছে; সাহিত্যও তাই চক্রমুখরতায় পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর ঘোরনাদী হইয়া উঠিতেছে। ইহাই সাহিত্যের প্রগতি, এই নাদের উগ্রতাই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। সাহিত্যও সৃষ্টিধর্ম্মী নয়, যন্ত্রধর্ম্মী; ইহাতে কেবল যুগের গতিধর্ম্মই আছে, কোনও শাশ্বত আদি-অন্তের স্থিতিধর্ম্ম নাই। আমাদের দেশের প্রগতিবাদী যাঁহারা, তাঁহাদের মত এতখানি বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজনও নাই, কারণ সেই মত কোনও মূলতত্ত্বের অপেক্ষা রাখে না। তথাপি যে তত্ত্বকে তাঁহারা অতিশয় সুলভ বিদ্যায় কতকগুলি বাক্যের সাহায্যে আয়ত্ত করিয়া, আপনাদের রিপুবিশেষকে চরিতার্থ করিতেছে, তাহার মূলে এইরূপ ধারণাই আছে। সাহিত্য সৃষ্টিধর্ম্মী অর্থাৎ প্রাণধর্ম্মী, তাহা যে যন্ত্রধর্ম্মী নয়, তাহার প্রমাণ কোনও উৎকৃষ্ট কবিকীর্ত্তি এ পর্য্যন্ত বাতিল হইয়া যায় নাই; বাতিল হওয়া দূরের কথা, সেই কাব্যের অন্তর্নিহিত রসরূপ কালে কালে নবনবোন্মেষিত হইয়া উঠে, সে রসের বিকাশধারার শেষ নাই। এ বিকাশ আর ঐ যান্ত্রিক বিবর্ত্তন এক নয়—যাহা একবার সত্যকার সৃষ্টিপদবী লাভ করিয়াছে, রসের জগতে তাহার আর মৃত্যু নাই, মৃত্যুনির্জ্জিত মানুষও তাহার প্রসাদে অমর হইয়া উঠে। অতএব সাহিত্যের প্রগতি বলিতে যদি ইহাই বুঝিতে হয় যে, এক কালের সাহিত্য অন্য কালে অচল, যাহা অগ্রবর্ত্তী তাহাই পশ্চাৎবর্ত্তী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তবে তাহা প্রগতি হইতে পারে, কিন্তু কদাপি সাহিত্য নহে। যত প্রাচীন হউক, কোন কাব্য যদি উৎকৃষ্ট হয়, তবে তাহার প্রকৃতি কিরূপ, সে সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ কবি-রসিকের এই উক্তি রসিকসমাজকে আশ্বস্ত করিবে—

All high poetry is infinite, it is as the first acorn, which contained all oaks potentially. Veil after veil may be withdrawn, and the inmost naked beauty of the meaning never exposed. A great poem is

a fountain for ever overflowing with the waters of wisdom and delight; and after one person and one age has exhausted its divine effluence which their peculiar relations enable them to share, another and yet another succeeds, and new relations are ever developed, the source of an unforeseen and an unconceived delight.

—কিন্তু প্রগতিবাদীরা, বিশেষত আমাদের দেশের ইহারা, এ কথা স্বীকার করিবেন না; তার কারণ, তাঁহাদের যা সাহিত্য তাহাতে poetry-র বালাই নাই—high poetry আবার কি? ও দেশের নব্য সম্প্রদায় এ সকল কথা নিত্য শুনিতেছে, এবং শুনিয়া তাঁহার পাল্টা জবাব দিতে নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করিতেছে। কারণ তাহারা আমাদের এই ধনুর্দ্ধরদের মত এতটা নিরঙ্কুশ নহে। তাই যখন তাহারা শোনে—

I quite freely admit, that to a man hesitating between socialism and anarchy, or between polygamy and eugenics, or between overhead and underground connexions for tramways, *The Tempest* or *Macbeth* would have very little to say of any profit.

তখন তাহারা বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্যও চুপ করিয়া থাকে।

৩

আমাদের প্রগতিওয়ালারা সেদিন সভা করিয়া, যে ভাষায় ও যে অর্থে, সাহিত্যের সদ্‌গতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা শুনিলে ওদেশের গুরুভাইয়েরা লজ্জা পাইত, সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের দিন যে গত হইয়াছে, এবং এক্ষণে তাঁহাদের দিন আসিয়াছে, ইহা কি আর কাহাকেও ডাকিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে? সেই জন্যই তো দেশে যে কয়জন ভদ্র সাধু-সজ্জন অবশিষ্ট আছে, তাহারা ঘটি-বাটি সামলাইতে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রীয় পরিষদে যেমন ক্রমাগতই মন্ত্রীমণ্ডলের পদত্যাগ

এবং অধিকতর দুঃসাহসী বিপ্লববাদী ব্যক্তিসংঘের মন্ত্রীপদলাভ রাজনৈতিক প্রগতির লক্ষণ, তেমনই রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্য-নায়কগণের পরাজয় ও এইরূপ যষ্টিধারীদের অভ্যুদয় সাহিত্যিক প্রগতির অকাট্য প্রমাণ। তুলনাটা আদৌ অসঙ্গত নয়; এই সকল বহ্বাস্ফোট-সম্বল বীরগণ, আর কোনও ক্ষেত্রে তাদৃশ প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, অগত্যা বাংলা দেশের নির্ব্বিকার ও নির্জ্জীব সাহিত্য-সমাজে প্রতিপত্তি লাভের জন্য হাঁকডাক করিতেছেন। উপরি-উদ্ধৃত উক্তির সেই profit-ই ইঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, সাহিত্যের দোহাই দিয়া কিছু profit করিয়া লইবার জন্যই ইঁহারা এই অপেক্ষাকৃত নরম মাটিতে কুস্তির আখড়া স্থাপন করিয়াছেন; সাহিত্য-হিসাবেই সাহিত্যের ভাবনা করিতে ইঁহারা অক্ষম; কিন্তু সাহিত্য যাঁহাদের ধর্ম্ম ও সাধনার ধন, তাঁহাদের একজন এই ম্লেচ্ছদের সম্বন্ধে বড় দুঃখে বলিয়াছেন—

It is an awful truth, that there neither is, nor can be, any genuine enjoyment of poetry among nineteen out of twenty of those persons who live or wish to live, in the broad light of the world—among those who either are, or are striving to make themselves, people of consideration in society. This is a truth, and an awful one, because to be incapable of a feeling of poetry, in my sense of the word, is to be without love of human nature and reverence of God.

—ইহাই উদ্ধৃত করিয়া একজন অপর মনীষী বলিতেছেন—'That is an emphatic answer'।

কিন্তু শুনিবে কে? Love of human nature এবং reverence of God—মানব-প্রীতি ও ভগবদ্ভক্তিকে যে কাব্যরস-রসিকতার ভিত্তি-বলিয়া একজন কবি-ঋষি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আধুনিক প্রগতির ধাপ্পাবাজি যাহাদের রসিকতার চরম পরিণাম, তাহাদের অভিধানে সেই প্রেমভক্তির বিন্দুবিসর্গও নাই। Human nature বা humanity

বলিতে ইহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব চরিত্র, আত্মগত অভিমান বা অহংচর্চ্চা, এবং শিশ্নোদরসাধন বুদ্ধিবৃত্তিই বোঝে। যত বড় বড় কথা তাহারা বলুক, এবং যত বড় পাণ্ডিত্য ও পৌরুষই তাহাতে থাকুক, মূল বক্তব্য সেই একই, অর্থাৎ আমরা যাহা খুশি বলিব, যাহা খুশি করিব, এবং যাহা খুশি খাইব ; এই 'যাহা-খুশি'কে 'আহা-মরি' করাইতে না পারিয়াই তাহারা রাগিয়া কাঁদিয়া অনর্থ করিতেছে। নিজের নিদারুণ অক্ষমতা ও অন্তঃসারশূন্যতাকেই গৌরবান্বিত করিতে হইবে ; তাই, রবীন্দ্রনাথের যুগ আর নাই—ইহাই চীৎকার করিয়া বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের মত আক্ষেপ করিতেছে, আমাদের লেখা কেহ পড়িতেছে না। ইহাতে যেমন অকালপক্কের মর্কটকাঠিন্য আছে, তেমনই এক প্রকার করুণরসের নাকিকান্নাও আছে। কিন্তু বিকাল-পক্ক প্রবীন যিনি, যাঁহার পাণ্ডিত্য-দম্ভের সীমা নাই, তাঁহার আস্ফালন কৃত্তিবাসী অঙ্গদ-রায়দরবারকেও লজ্জা দিয়াছে। তাঁহার বাণীতে সত্যকার বীরত্ব আছে—

Croakers are not wanting to tell you—with sighing glances fixed on the past these men would tell you...

—এই 'tell you' যে কি, তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না, কারণ এই প্রবন্ধই তো তাহাই—কত বড় croakers আমরা ! কিন্তু—

To these gloomy judgments I take the liberty respectfully to demur, and I claim that despite the wailings of those defeatists...the literature produced by lesser personalities today, is neither lacking in art, nor in any way, of the qualities that make high class literature. This literature, I claim, can, as pure works of art, hold its own against any literature in the rest of India, and perhaps of the world outside.

সেই দামু আর চামু ! বাংলা সাহিত্যে ইহারা আর মরিল না, অমর হইয়াই রহিল ! কি ওজস্বিনী ভাষা, রসনার কি দিগন্তবিসর্পী লেলিহতা ! "I claim"—অবশ্যই ! সেইটাই যে আসল কথা ;

কারণ, বাংলার এই প্রগতি-সাহিত্যের অনেকখানিই তিনি যে নিজের অংশে দাবি করেন! "High class literature" "pure works of art"—এ সব যে তাঁহার নিজেরই কীর্ত্তির জয়গান! এইরূপ মনোবৃত্তি যাহাদের তাহাদেরই সম্বন্ধে ঋষি-কবির সেই উক্তি স্মরণ করিতে হইবে—"those who either are, or are striving to make themselves, people of consideration in society"। ইহারা যে কস্মিনকালে কোন জন্মে সাহিত্যরসের ধার ধারে না, ইহাদের রচিত সাহিত্য পড়িলে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে? পণ্ডিত হইয়াও এমন অপণ্ডিতের মত কথা বলে, ইহার কারণ কি? কারণ, যে দেশ ও যে সমাজ হইতে ইহারা সাহিত্যিক অভিযানে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, সে সমাজে রসবোধের বালাই, উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা কোনও কালেই ছিল না; কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সেই উক্তি যে বিদ্বেষবিজৃম্ভিত নয়, তাহা যে অতিশয় সত্য, আজ এই প্রগতিসম্প্রদায়ের মনোভাব ও সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকে না।

বাংলা দেশের প্রগতি-সাহিত্যের নেতা সাহিত্যের উপর প্রগতির শাসন প্রচার করিয়াছেন এই বলিয়া যে—

No writing deserves the name of literature unless it marks some progress beyond the literature of the past.

The name of literature! ইংরেজীর জোর কম নয়! Name of literature-এর সংজ্ঞা দিন দিন যেরূপ ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আমরা তো ইহাই বুঝি যে, যে কোনও writing—এমন কি কবিরাজী মোদকগুলির বিজ্ঞাপনও literature-নামের দাবি করিতে পারে। তাহাই যদি না হইবে, তবে এই সিনিয়র

প্রগতি-মহাশয় সাহিত্যের বিধানদাতা হইলেন কেমন করিয়া? সে কোন্ সাহিত্য? সেকালের কথা ছাড়িয়া দিই একালে পৃথিবীর সাহিত্যিক-সমাজে যাঁহারা সাহিত্যরস ও তাহার তত্ত্ব-আলোচনায় নিখিল রসিক-সমাজকে বিস্মিত ও পুলকিত করিতেছেন, তাঁহাদেরও কেহ সাহিত্যের এমন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হন নাই; সেই জন্যই কি ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, মর্ম্মাহত ও পরিশেষে ক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের এই বাঙালী সাহিত্য-বীর সাহিত্য-সম্বন্ধে এত বড় একটা সত্য 'একাং লজ্জাং পরিত্যজ্য' এমন ভাবে ঘোষণা করিয়া ফেলিলেন? রসজ্ঞান না হয় নাই থাকিল—সকলের তাহা থাকে না; কিন্তু এমন বুদ্ধিনাশ হইবার কারণ কি? সাহিত্য পড়িতে পড়িতে বুড়া হইয়া গেলাম; এত কবি, এত ক্রিটিক, এত মনীষী—প্রাচীন ও আধুনিক এত পণ্ডিতের এত কথাই শুনিলাম, কিন্তু এমন মগজভেদী উক্তি আর কোথায়ও শুনি নাই! হোমার-শেক্সপীয়রকে লইয়া এখনও যাহারা খাঁটি সাহিত্যসৃষ্টির গবেষণা করে, ব্যাস-বাল্মীকির মধ্যে এখনও যাহারা কাব্যরসের অন্ত পাইল না—তাহারা তো এই "Some progress beyond the literature of the past"-এর কথা কখনও ভাবিল না! সাহিত্যের রসটাই বড় কথা নয়—বড় কথা ওই progress? প্রগতি—প্রগতি—প্রগতি!—Progressive literature বাক্যটি একটি tautology! 'কোনও সাহিত্যই সাহিত্যপদবাচ্য নয়, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই'; অস্যার্থ—সাহিত্য ক্রমাগতই সাবালক হইতেছে, তারিখ যতই আগাইয়া যাইতেছে, ততই তাহা শেয়ানা হইয়া উঠিতেছে। অতএব যত আধুনিক হইতেছে, ততই তাহার দাবি বাড়িতেছে, পূর্ব্বের বইগুলিকে পিঁজরাপোলে অর্থাৎ মিউজিয়মে রাখিয়া দিতে হইবে। এই নব-অভিনবগুপ্তের মাপ-লাঠিতে আজিকার

সাহিত্য কালিকার সাহিত্যের কাছে হাত-পা ভাঙিয়া পড়িয়া থাকিবে—কেন না, progress চাই; সাহিত্যরস, ও রামা-শ্যামার দল বাঁধিয়া 'হাম্-বড়া'মির হুল্লোড়—এ দুইই যে একই পদার্থ! 'প্রগতি',—অর্থাৎ আপনাদের কীর্ত্তির কৃতিত্ব ঘোষণার জন্য পূর্ব্বযুগের সকল কবি-মহাকবিকে হঠাইয়া দিতে হইবে, যাহারা কবিকুলপুঙ্গব তাহারা এই মূষিকের দলকে প্রণাম করিবে! তার কারণ—

By a long course of evolution we have reached an ampler synthesis which embraces equal freedom for all and freedom in every aspect of life; and social organisations till yesterday were striving to achieve this freedom in as full measure as possible.

—অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য অপেক্ষা আধুনিক সাহিত্য শ্রেষ্ঠ না হইবে কেন? এ যে কোন্ রসের সাহিত্য, তাহা ওই 'every aspect of life' এবং 'social organisations' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এ আর কিছুই নয়—সেই শিশ্নোদরসমস্যারই কথা; সেই জন্য আর সকল সাহিত্য বাতিল হইয়া গিয়াছে। 'Freedom in every aspect of life'—ইহাই যে আধুনিক সাহিত্যের মূলমন্ত্র! আমরাও তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি, কেবল ইহাই বুঝিতে পারিতেছি না যে, এই মন্ত্রটির সাধনার জন্য একটা নূতন পঞ্চবটীর প্রতিষ্ঠা করিলেই তো ভাল হইত—পূর্ব্ববর্ত্তীদের সেই আসনটির উপরেই এত লোভ কেন? ঐ সাহিত্য নামটাকেও বর্জ্জন করিয়া একটা নূতন নামে এই 'brave new world'-এর পত্তন করিলে তো আর কোনও হাঙ্গাম হইত না। কিন্তু তাহা যে ইহাদের মনঃপূত নয়, তার কারণ, 'সাহিত্য' নামটার একটা বনিয়াদী প্রতিপত্তি আছে, অসাহিত্যিক হইয়াও সেই প্রতিপত্তি-টুকু চাই। শূদ্রের ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষের কারণও তাহাই—যাহাকে বলে দারুণ inferiority complex; ব্রাহ্মণত্বের প্রতি সভয় শ্রদ্ধা আছে,

লোভও কম নয়; কিন্তু তাহা যে হইবার উপায় নাই, জন্মক্ষণেই বিধাতা বাদ সাধিয়াছেন—তাই এত আক্রোশ, এত চীৎকার।

এই আক্রোশের বশেই ছোট প্রগতি-মহাশয় এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইতে চান যে, রবীন্দ্রনাথের দিন গিয়াছে, এবং রবীন্দ্রোত্তর কবি-সাহিত্যিকগণ গড্ডলিকাবৃত্তি করিয়া সেই মৃতযুগের মৃতভার বহন করিতেছেন। এ আশ্বাস যে চাই-ই, নতুবা বাঁচে কেমন করিয়া? কিন্তু ইহাতেও একটু গোল রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথকে যাহারা কেবলমাত্র অনুকরণ করিয়াই বাঁচিতে চায়, তাহাদের কথা বলি না; কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যে রসের যে আদর্শ রহিয়াছে, তাহা যে সর্ব্বযুগের আদর্শ—রবীন্দ্রনাথও যে গড্ডলিকাবৃত্তি করিয়াছেন! তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথও কখনও বাঁচিয়া থাকেন নাই—খাঁটি-প্রগতিতত্ত্ব অনুসারে রবীন্দ্রযুগও একটা পৃথক যুগ নয়, যেহেতু তাহাও পূর্ব্বতন যুগের মূল রসপ্রেরণাকে বাতিল করিয়া দিতে পারে নাই, সেও মৃতযুগের মৃতভার বহন করিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত এই দাঁড়ায় যে, ইহারা সাহিত্যকেই চায় না, চায়—যাহা খুশি বলিব, যাহা খুশি করিব, এবং যাহা খুশি খাইব; এবং যে সমাজ তাহাতে আপত্তি করিবে, তাহাকে decadent, vicious ও putrescent বলিয়া গালি দিব।

৪

বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক দলের মতি-গতি ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম; ইহাদের কথার জবাব দিবার চেষ্টা অনর্থক, তার কারণ—প্রথমত, যাহারা সাহিত্য বোঝে না এবং

বিশ্বাসও করে না, আত্মপ্রতিষ্ঠাই যাহাদের একমাত্র অভিপ্রায়, তাহারা কোনও জবাব মানিবে না। দ্বিতীয়ত, যে দেশ হইতে এইরূপ সাহিত্য-তত্ত্বের আমদানি হইয়াছে এবং এখানকার জল-মাটির গুণে তাহার এমন বৈজ্ঞানিক ভাষ্য প্রস্তুত হইয়াছে—সেই দেশেই বিষলতাও যেমন জন্মিয়াছে, তেমনই বিষঘ্ন ভেষজের অভাব ঘটে নাই। সেখানে আচার্য্যকল্প সাহিত্যিকের মুখে সাহিত্যবস্তুর যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ শোনা যাইতেছে, ইংরেজী-অভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকের পক্ষে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই অ যে কয়টি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটি বিভিন্ন ব্যক্তির ; পরে আরও কিছু উদ্ধৃত করিব, তাহা হইতে অন্তত এইটুকু সপ্রমাণ হইবে যে—প্রকৃত সাহিত্য-জ্ঞান এখনও পৃথিবী হইতে লুপ্ত হয় নাই। একালেও সভ্যতম সমাজের শিক্ষিততম ব্যক্তিরাই সাহিত্যের প্রসঙ্গে অসাহিত্যিক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতেছেন না। সমাজে যেমন চোর আপনা হইতেই চোরের দলে আকৃষ্ট হয়—সাধু সাধুর দলে, তেমনই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রসিক রসিকের দলে, এবং বেরসিক বেরসিকের দলে মিশিয়া থাকে। অতএব দল গড়িলেই কোন-কিছুর প্রাধান্য প্রমাণিত হয় না ; বরং, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নানা স্থানে শাখা স্থাপন করিয়া একটা 'নিখিল'-রকমের বড় দল গড়িয়া তুলিলেই বুঝিতে হইবে, উদ্দেশ্যটা সাহিত্যের দিক দিয়া সৎ বা সত্য নহে। এই সকল প্রগতিপন্থী সাহিত্যিক-বীরকে আকাশে তুলিয়া সংবাদপত্রে পত্রপ্রেরকদিগের যে হুড়াহুড়ি লাগিয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, আমাদের দেশে শিক্ষাবিস্তারের অনুপাতে কাল্‌চার কত কমিয়া গিয়াছে—সাহিত্য-রসবোধ দুর্লভ হইয়াছে বলিয়াই যশ এত সুলভ হইয়াছে।

বাংলার প্রগতি-সাহিত্য যে প্রগতির পরিচয় কিছুকাল যাবৎ দিয়া

আসিতেছে, এতদিনে তাহা কোনও সুস্থ ও সহৃদয় ব্যক্তির অবিদিত নাই। এই সাহিত্য অতিশয় আধুনিক হইলেও ইহার লক্ষণ নূতন নহে, এবং ইহার সম্ভাবনা কোনও কালেরই অগোচর ছিল না; তাহার প্রমাণ, ১৩১৩ সালে, প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

আমাদের প্রবৃত্তি উগ্র হইয়া উঠিলে বিধাতার জগতের বিরুদ্ধে নিজে যেন সৃষ্টি করিতে থাকে। তখন চারিদিকের সঙ্গে তাহার আর মিল খায় না। আমাদের ক্রোধ, আমাদের লোভ নিজের চারিদিকে এমন সকল বিকা[illegible]পাদন করে, যাহাতে ছোটই বড় হইয়া উঠে, বড়ই ছোট হইয়া যায়; যাহা ক্ষণকালের তাহাই চিরকালের বলিয়া মনে হয়, যাহা চিরকালের তাহা চোখেই পড়ে না। যাহার প্রতি আমাদের লোভ জন্মে তাহাকে আমরা এমনি অসত্য করিয়া গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড় বড় সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়, চন্দ্রসূর্য্যতারাকে সে ম্লান করিয়া দেয়। ইহাতে আমাদের সৃষ্টি বিধাতার সঙ্গে বিরোধ করিতে থাকে।

—পড়িয়া মনে হয় নাকি যে, এ যেন এই প্রগতি-সাহিত্যের সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের একটি অতি-আধুনিক উক্তি? ঐ যে 'freedom'-এর অভিযান—সাহিত্যে তাহার এই দলবদ্ধ আস্ফালনই 'বিধাতার জগতের বিরুদ্ধে' আধুনিক মানুষের চীৎকার। আমি এই সাহিত্যকে শিশ্নোদর-সর্ব্বস্ব বলিয়াছি—বাক্যটি অশ্লীল হইলেও, অর্থটি সত্য অতএব সাধু। সেকালের সত্যদর্শী ঋষিগণ আধুনিক প্রগতিবাদের অর্থ বুঝিতেন—পৃথিবীময় আজ যে মানুষের দল "freedom in every aspect of life" বলিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের সেই ব্যাধির নিদান এক কথায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য তাঁহারা ঐ অতিশয় সাধুবাক্যটি সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অতএব আমাদেরও লজ্জিত হইবার কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ ঋষি নহেন, তিনি কবি; তাই তিনি অতখানি নগ্নতার পক্ষপাতী হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার বক্তব্য সেই একই, অতিশয়

ভদ্রভাবে তিনি বলিয়াছেন, "যাহার প্রতি আমাদের লোভ তাহাকে এমনি অসত্য করিয়া গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড় বড় সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়।" প্রগতি-সাহিত্য হইতেই ইহার উদাহরণ দিব। বাংলা কাব্যে প্রেমের কবিতা প্রায় নাই বলিলেই হয়—'অত বড় ইংরেজী সাহিত্যেও তেমন প্রেমের কবিতা ঝুড়ি ঝুড়ি নাই'—ইহাই বুঝাইবার জন্য মহাপণ্ডিত ও মহাসাহিত্যিক ছোট প্রগতি-মহাশয় এক স্থানে লিখিয়াছেন—

যৌন অভিজ্ঞতা জীবনে বেশির ভাগ মানুষেরই হয় কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা কবিদের মধ্যেই বা ক'জন বর্ণনা করতে পেরেছেন?...ব্যাপারটা যদি এতই সহজ হ'ত তা'হলে যে-কোনো মানুষই কি অল্প 'নৈপুণ্যের' দ্বারা তার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে পারতো না?

এই জন্যই প্রেমের কবিতা বাংলায়, এমন কি ইংরেজীতেও, এত দুর্লভ! যৌন অভিজ্ঞতাই যে-প্রেমের গভীরতম উপলব্ধির মূল, এবং তাহার "যে শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া" উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতায় নিখুঁত ভাবে অঙ্কিত হওয়া চাই, তাহা পশুর মতই মানুষের পক্ষেও অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া—তেমন কবিতা লেখা বড়ই দুরূহ। সে যে কত দুরূহ, তাহা বুঝে না বলিয়াই সাধারণ মানুষেরা এইরূপ কবিতার কবিকে ন্যায্য সম্মান দান করিতে চাহে না। এইরূপ সার্থক রচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক এই লাইন কয়টি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, এ রকম পংক্তি জগতে খুব বেশি লেখা হয় না"—

The moment of desire! the moment of desire! the virgin that pines for the man shall awaken her womb to enormous joys in the secret shadows of her chamber.

হায় বাল্মীকি, হায় কালিদাস! হায় শেক্সপীয়র, হায় রবীন্দ্রনাথ! বাংলার বৈষ্ণবপদাবলী তো গোল্লায় গিয়াছে। কারণ, এমন রজকিনী

পাইয়াও দ্বিজ-কবি 'শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া'র মশলাগুলি কবিতার রসে মিশাইতে পারেন নাই। আমার 'শিশ্নোদরপরায়ণ' কথাটা কি মিথ্যা? না, রবীন্দ্রনাথ ভুল বলিয়াছেন?—'যাহার প্রতি আমাদের লোভ তাহাকে এমনি অসত্য করিয়া গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড় বড় সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়, চন্দ্রসূর্য্যতারাকেও সে ম্লান করিয়া দেয়।'

এইরূপ মনোবৃত্তি যাহাদের, তাহারাই যদি সাহিত্যিক হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের আদর্শ কি হইবে, তাহা তো জানাই আছে। একজন ইংরেজ সমালোচক আধুনিক সাহিত্যিকদিগকে একটি নাম দিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন, সে নাম অবশ্য ইহারা গৌরবের সহিত গ্রহণ করিবে; কারণ, কিছুতেই তাহাদের গৌরবহানি হয় না। এই লেখক বলিতেছেন—

If we fasten then, one label on these books, on which is one word materialists, we mean by it that they write of unimportant things; that they spend immense skill and immense industry making the trivial and the transitory appear the true and the enduring.

শেষের বাক্যটি যেন হুবহু রবীন্দ্রনাথেরই অনুবাদ! লেখক ইহাদিগকে নাম দিয়াছেন—materialists, অর্থাৎ জড়বাদী; এবং কি অর্থে, তাহাও বুঝাইয়া বলিয়াছেন। সে দেশের আধুনিকদের সম্বন্ধে ইহাই হয়তো যথার্থ; কিন্তু আমাদের এই প্রগতির দল জড়বাদীও নহে, জড়েরও যে ধর্ম্ম আছে, ইহাদের তাহা নাই; কারণ জড়েরও প্রকৃতি-গুণ আছে, ইহারা সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। ইহাদের এই যে অনাচার, এই যে অসত্যের আরাধনা, ইহাতে immense skill and immehse industryর প্রয়োজন হয় না; কারণ, তাহার সাড়ে পনরো আনাই অনুকরণ, ইহাদের জীবধর্ম্মই স্তিমিত, জড়ধর্ম্ম বরং ভাল ছিল।

উপরি-উক্ত সমালোচকের আর একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। আমাদের এই 'শিশুবিদ্যা-গরীয়সী' প্রগতি-প্রতিভার যাঁহারা গুরু, সেই ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের বিখ্যাত কয়েকজনের নাম করিয়া, তাঁহাদের তথাকথিত বাস্তবতার অজুহাত সম্বন্ধে, এই লেখকই বলিতেছেন—

Let us hazard the opinion that for us at the moment the form of fiction most in vogue more often misses than secures the thing we seek. Whether we call it life or spirit, truth or reality, this, the essential thing has moved off......we suspect a momentary doubt, a spasm of rebellion, as the pages fill themselves in the customary way. Is life like this? Must novels be like this?

পরিশেষে আর এক আধুনিক মনীষীর একটিমাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। যাহারা অন্তরে ধর্ম্মহীন, আধুনিক যুগের অহং-মদমত্ততায় যাহারা প্রাণের স্থৈর্য্য হারাইয়াছে, যাহারা মৃত্যুকেই মোক্ষ জানিয়া চিরকালের উপর ক্ষণকালকে আসন দিয়াছে, এবং সর্ব্বশেষে যাহারা বিকৃত দেহ-মনের স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যকেই প্রজ্ঞা ও প্রতিভার নিদান বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহারাই প্রগতির ধূয়া তুলিয়া সাহিত্যকে বিকারগ্রস্ত করিতেছে। যে ধরণের প্রগতিবাদের দম্ভ ইহারা করিয়া থাকে তাহাতে তত্ত্বগত প্রগতিও নাই—কালের প্রবহমানতাকেই ইহারা কার্য্যত অস্বীকার করে। নিজের আত্মাভিমানের অনুকূল করিয়া ইহারা কালকে বিচ্ছিন্ন বর্ষসমষ্টিরূপে ধারণা করে, এক একটি বর্ষসমষ্টি আপনাতেই সমাপ্ত। যেন কালের কোনও সুনিয়ত প্রবাহ নাই, তাহার প্রত্যেক অংশই এক একটি স্বতন্ত্র ঘূর্ণি। অতীত নাই, ভবিষ্যৎও ভাবনার বহির্ভূত; প্রেম নাই, বিশ্বাস নাই—আছে কেবল স্বাধিকার, স্বাতন্ত্র্য, ও পাশব স্বার্থের অসৎ উত্তেজনা। ইহাদের মনস্তত্ত্বে রসতত্ত্বের স্থান নাই—থাকিতে পারে না; তাই ইহারা কাব্যরসের চিরনির্ঝরকে বিদ্রূপ করে, মানুষের জীবনে যে বস্তুর প্রয়োজন সবচেয়ে

বেশি, যাহার অভাবে মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না, তাহাকে ইহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পায়। তাই যাঁহারা যুগে যুগে মানুষের অধ্যাত্মজীবন পুষ্ট করিয়া, সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া মানুষকে অশেষ ঋণে ঋণী করিয়াছেন, সেই অমৃত-সমাজ কবিগণের চিরনবীনতাময়ী বাণীকে ইহারা অতীতের আবর্জ্জনাস্তূপ বলিয়া মনে করে। তাহার কারণ, ইহারা জড়বাদী নাস্তিক, প্রেমহীন ও ধর্ম্মহীন। কিন্তু যাঁহাদের আত্মা এখনও সুস্থ আছে, যাঁহারা জ্ঞানে ও প্রেমে সমান বলীয়ান, কবিত্বের অমৃত-হ্রদে অবগাহন করিয়া যাঁহাদের কান্তি উজ্জ্বল ও শান্তিসুস্নিগ্ধ হইয়া উঠে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। এমনই একজন জগতের মহাকবিদিগের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

To men such as these the debt of humanity is inestimable. They, above all others, keep the souls of men alive; they do not *tell* us of spiritual felicity; they *create* it in us from the substance of our coarser elements....Not that Shakespeare was a Christian, any more than the poet is a mystic. But he was religious, as all great poets must be. For high poetry and high religion are at.one in the essential that they demand that a man shall not merely think thoughts, but feel them—that this highest mental act be done with all his heart and with all his mind and with all his soul.

আমাদের যুগন্ধর সাহিত্যিকদিগের যে সকল উক্তি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সহিত এই উক্তি তুলনা করিলে, যাহারা মানুষ, পশু নয়, তাহারা কি বুঝিতে পারে না, কোন্ উক্তিটির মধ্যে, কাহার কণ্ঠস্বরে, মানুষের সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্ব মহত্তর ও বৃহত্তর ছন্দে স্পন্দিত হইতেছে? মনে হয়, জাতিতে জাতিতে যেমন, মানুষে মানুষেও তেমনই কত তফাৎ! নহিলে আমাদের দেশে, এই অতি-আধুনিক সাহিত্যিক সমাজে, এমন কথা এ পর্য্যন্ত কাহারও মুখে শুনিতে পাইলাম না কেন? প্রগতি তো সে দেশেও আছে।

ধাত্রী দেবতা

উনিশ

শ্রাবণের শেষ, আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া মেঘের সমারোহ জমিয়া উঠিয়াছে। কলেজের মেসের বারান্দায় রেলিঙের উপর কনুইয়ের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া হাত দুইটির উপরে মুখ রাখিয়া শিবনাথ মেঘের দিকে চাহিয়া ছিল। মাঝে মাঝে বর্ষার বাতাসের এক একটা দুরন্ত প্রবাহের সঙ্গে রিমিঝিমি বৃষ্টি নামিয়া আসিতেছে, বৃষ্টির মৃদু ধারায় তাহার মাথার চুল সিক্ত, মুখের উপরেও বিন্দু বিন্দু জল জমিয়া আছে। পাতলা ধোঁয়ার মত ছোট ছোট জলীয় বাষ্পের কুণ্ডলী সনসন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, একের পর এক মেঘগুলি যেন এদিকের বড় বড় বাড়িগুলির ছাদের আড়াল হইতে উঠিয়া ওদিকের বাড়িগুলির ছাদের আড়ালে মিলাইয়া যাইতেছে। নীচে জলসিক্ত শীতল কঠিন রাজপথ—হ্যারিসন রোড। পাথরের ইটে বাঁধানো পরিধির মধ্যেও ট্রাম-লাইনগুলি চকচক করিতেছে। একতলার উপরে ট্রামের তারগুলি স্থানে স্থানে আড়াআড়ি বাঁধনে আবদ্ধ হইয়া বরাবর চলিয়া গিয়াছে। তারের গায়ে অসংখ্য জলবিন্দু জমিয়া জমিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। এই দুর্যোগেও ট্রামগাড়ি মোটর মানুষ চলার বিরাম নাই। বিচিত্র কঠিন শব্দে রাজপথ মুখরিত।

কলিকাতাকে দেখিয়া শিবনাথের বিস্ময়ের এখনও শেষ হয় নাই। অদ্ভুত বিচিত্র ঐশ্বর্যময়ী মহানগরীকে দেখিয়া শিবনাথ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। সে বিস্ময়ের ঘোর আজও সম্পূর্ণ কাটে নাই। তাহার বিপুল বিশাল বিস্তার পথের জনতা যানবাহনের উদ্ধত

ক্ষিপ্র গতি দেখিয়া শিবনাথ এখনও শঙ্কিত না হইয়া পারে না। আলোর উজ্জ্বলতা, দোকানে দোকানে পণ্যসম্ভারের বর্ণবৈচিত্র্যে বিচ্ছুরিত হইয়া আজও তাহার মনে মোহ জাগাইয়া তোলে; স্থান কাল সব সে ভুলিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে ভাবে, এত আছে, এত সম্পদ আছে পৃথিবীতে—এত ধন, এত ঐশ্বর্য্য!

সেদিন সে সুশীলকে বলিল, কলকাতা দেখে মধ্যে মধ্যে আমার মনে হয় কি জানেন, মনে হয় দেশের যেন হৃৎপিণ্ড এটা; সমস্ত রক্ত-স্রোতের কেন্দ্রস্থল।

সুশীল প্রায়ই শিবনাথের কাছে আসে, শিবনাথও সুশীলদের বাড়ি যায়। সুশীল শিবনাথের কথা শুনিয়া হাসিয়া উত্তর দিল, উপমাটা ভুল হ'ল ভাই শিবনাথ। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে, হৃৎপিণ্ড অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত সঞ্চালন করে, সঞ্চার করে, শোষণ করে না। কলকাতার কাজ ঠিক উল্টো, কলকাতা করে দেশকে শোষণ। গঙ্গার ধারে ডকে গেছ কখনও? সেই শোষণ-করা রক্ত ভাগীরথীর টিউবে টিউবে ব'য়ে চ'লে যাচ্ছে দেশান্তরে, জাহাজে জাহাজে—ঝলকে ঝলকে। এই বিরাট শহরটা হ'ল একটা শোষণযন্ত্র।

এ কথার উত্তর শিবনাথ দিতে পারে নাই। নীরবে কথাটা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সুশীল আবার বলিল, মনে করুন তো আপনার দেশের কথা, ভাঙা বাড়ি, কঙ্কালসার মানুষ, জলহীন পুকুর, সব শুকিয়ে যাচ্ছে এই শোষণে।

তারপর ধীরে ধীরে দৃঢ় আবেগময় কণ্ঠে কত কথাই সে বলিল, দেশের কত লক্ষ লোক অনাহারে মরে, কত লক্ষ থাকে অর্দ্ধাশনে, কত লক্ষ লোক গৃহহীন, কত লক্ষ লোক বস্ত্রহীন, কত লক্ষ লোক মরে কুকুর-বেড়ালের মত বিনা চিকিৎসায়। দেশের দারিদ্র্যের দুর্দ্দশার

ইতিহাস আরও বলিল, একদিন নাকি এই দেশের ছেলেরা সোনার ভাঁটা লইয়া খেলা করিত, দেশে বিদেশে অন্ন বিতরণ করিয়া দেশজননী নাম পাইয়াছিলেন অন্নপূর্ণা। অফুরন্ত অন্নের ভাণ্ডার, অপর্য্যাপ্ত মণিমাণিক্য-স্বর্ণের স্তূপ। শুনিতে শুনিতে শিবনাথের চোখে জল আসিয়া গেল।

সুশীল নীরব হইলে সে প্রশ্ন করিল, এর প্রতিকার ?

হাসিয়া সুশীল বলিয়াছিল, কে করবে ?

আমরা।

বহুবচন ছেড়ে কথা কও ভাই, এবং সেটা পরস্মৈপদী হ'লে চলবে না।

সে একটা চরম উত্তেজনাময় আত্মহারা মুহূর্ত্ত। শিবনাথ বলিল, আমি—আমি করব।

সুশীল প্রশ্ন করিল, তোমার পণ কি ?

মুহূর্ত্তে শিবনাথের মনে হইল, হাজার হাজার আকাশস্পর্শী অট্টালিকা প্রশস্ত রাজপথ কোলাহল-কলরবমুখরিত মহানগরী বিশাল অরণ্যে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার অরণ্যতলে দূর হইতে যেন অজানিত গম্ভীর কণ্ঠে কে তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে, তোমার পণ কি ? সর্ব্বাঙ্গে তাহার শিহরণ বহিয়া গেল, উষ্ণ রক্তস্রোত দ্রুতবেগে বহিয়া চলিয়াছিল ; সে মুহূর্ত্তে উত্তর করিল, ভক্তি।

তাহার মনে হইল, চোখের সম্মুখে এক রহস্যময় আবরণীর অন্তরালে মহিমমণ্ডিত সার্থকতা জ্যোতির্ম্ময় রূপ লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। তাহার মুখ-চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে সে সুশীলের মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল।

সুশীলও নীরব হইয়া একদৃষ্টে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, শিবনাথ অধীর আগ্রহে বলিল, বলুন সুশীলদা, উপায় বলুন।

বিচিত্র মিষ্ট হাসি হাসিয়া সুশীল বলিল, ওই ভক্তি নিয়ে দেশের সেবা কর ভাই, মা পরিতুষ্ট হয়ে উঠবেন।

শিবনাথ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, আপনি আমায় বললেন না!

বলব, আর একদিন।—বলিয়াই সুশীল উঠিয়া পড়িল। সিঁড়ির মুখ হইতে ফিরিয়া আবার সে বলিল, আজ আমাদের ওখানে যেও। মা বার বার ক'রে ব'লে দিয়েছেন; দীপা তো আমাকে খেয়ে ফেললে

দীপা সুশীলের আট বছরের বোন, ফুটফুটে মেয়েটি, তাহার সম্মুখে কখনও ফ্রক পরিয়া বাহির হইবে না। সুশীল তাহাকে বলিয়াছে, শিবনাথের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে; সে শাড়িখানি পরিয়া সলজ্জ ভঙ্গিতে তাহার সম্মুখেই দূরে দূরে ঘুরিবে ফিরিবে, কিছুতেই কাছে আসিবে না; ডাকিলেই পলাইয়া যাইবে।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া মৃদু বর্ষাধারায় ভিজিতে ভিজিতে শিবনাথ সেদিনের কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে দীপার প্রসঙ্গে আসিয়াই মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; এমন একটি অনাবিল কৌতুকের আনন্দে কেহ কি না হাসিয়া পারে!

কি রকম? আকাশের সজল মেঘের দিকে চেয়ে বিরহী যক্ষের মত রয়েছেন যে? মাথার চুল গায়ের জামাটা পর্য্যন্ত ভিজে গেছে, ব্যাপারটা কি?—একটি ছেলে আসিয়া শিবনাথের পাশে দাঁড়াইল।

তাহার সাড়ায় আত্মস্থ হইয়া শিবনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল, বেশ লাগছে ভিজতে। দেশে থাকতে কত ভিজতাম বর্ষায়!

ছেলেটি হাসিয়া বলিল, আমি ভাবলাম, আপনি বুঝি প্রিয়ার কাছে লিপি পাঠাচ্ছেন মেঘমালার মারফতে। By the by, এই ঘণ্টা দুয়েক

আগে, আড়াইটে হবে তখন—আপনার সম্বন্ধী এসেছিলেন আপনার সন্ধানে—কমলেশ মুখার্জি।

চকিত হইয়া শিবনাথ বলিল, কে ?

কমলেশ মুখার্জি। চেনেন না নাকি ?

শিবনাথ গম্ভীর হইয়া গেল। কমলেশ ! ছেলেটি হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, আমরা সব জেনে ফেলেছি মশায়। বিয়ের কথাটা আপনি স্রেফ চেপে গেছেন আমাদের কাছে। আমাদের feast দিতে হবে কিন্তু।

শিবনাথ গম্ভীর মুখে নীরব হইয়া রহিল।

সামান্যক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকিয়া ছেলেটি বলিল, আপনি কি রকম লোক মশাই, সর্ব্বদাই এমন serious attitude নিয়ে থাকেন কেন, বলুন তো ?

শিবনাথের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কমলেশের নামে, তাহার এখানে আসার সংবাদে তাহার অন্তর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তবুও সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, কি করব বলুন, মানুষ তো আপনার স্বভাবকে অতিক্রম করতে পারে না। এমনিই আমার স্বভাব সঞ্জয়বাবু।

সঞ্জয় বারান্দার রেলিঙের উপর একটা কিল মারিয়া বলিল, You must mend it, আমাদের সঙ্গে বাস করতে হ'লে দশজনের মত হয়ে চলতে হবে।—কথাটা বলিয়াই সদর্প পদক্ষেপে সে চলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে তখন কোন একটা কারণে প্রবল উচ্ছ্বাসের কলরব ধ্বনিত হইতেছিল।

শিবনাথ একটু হাসিল, বেশ লাগে তাহার এই সঞ্জয়কে। তাহারই সমবয়সী সুন্দর সুরূপ তরুণ, উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, যেখানে হৈচৈ সেখানেই সে আছে। কোন রাজার ভাগিনেয় সে ; দিনে পাঁচ ছয় বার বেশ-

পরিবর্ত্তন করে, আর সাগর-তরঙ্গের ফেনার মত সর্ব্বত্র সর্ব্বাগ্রে উচ্ছ্বসিত হইয়া ফেরে। ফুটবল খেলিতে পারে না, তবুও সে forward lineএ left outএ গিয়া দাঁড়াইবে, চীৎকার করিবে, আছাড় খাইবে; অভিনয় করিতে পারে না, তবুও সে কলেজের নাটকাভিনয়ে যে কোন ভূমিকায় নামিবে; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, গতি তাহার অতি স্বচ্ছন্দ, কাহাকেও আঘাত করে না, আর সে ভিন্ন কোন কলরব-কোলাহল যেন সুশোভনও হয় না।

কিন্তু কমলেশ কি জন্য এখানে আসিয়াছিল? যে তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে পর্য্যন্ত লজ্জা করে, সে কি কারণে এখানে আসিল? নূতন কোন আঘাতের অস্ত্র পাইয়াছে নাকি? তাহার গৌরীকে মনে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপরের আকাশের দুর্য্যোগ তাহার অন্তরে ঘনাইয়া উঠিল। একটা দুঃখময় আবেগের পীড়নে বুকখানি ভরিয়া উঠিল।

সিঁড়ি ভাঙিয়া দুপদাপ শব্দে কে উঠিয়া আসিতেছিল, পীড়িত চিত্তে সে সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। উঠিয়া আসিল একটি ছেলে, পরণে নিখুঁত Boys-scoutএর পোষাক, মাথার টুপিটি পর্য্যন্ত ঈষৎ বাঁকানো; মার্চের কায়দায় পা ফেলিয়া বারান্দা অতিক্রম করিতে করিতেই বলিতেছিল, হ্যালো সঞ্জয়, a cup of hot tea my friend, oh, it is very cold।

ছেলেটির গলার সাড়া পাইয়া ঘরের মধ্যে সঞ্জয়ের দল নূতন উচ্ছ্বাসে কলরব করিয়া উঠিল। ছেলেটির নাম নিত্য, শিবনাথের সঙ্গেই পড়ে। চালে চলনে কায়দায় কথায় একেবারে যাহাকে বলে নিখুঁত কলিকাতার ছেলে। আজও পর্য্যন্ত শিবনাথ তাহার পরিচিত দৃষ্টির বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে।

ধীরে ধীরে শিবনাথের উচ্ছ্বসিত আবেগ শান্ত হইয়া আসিতেছিল ; মেঘমেদুর আকাশের দিকে চাহিয়া সে উদাস মনে কল্পনা করিতেছিল, একটা মহিমময় নিপীড়িত ভবিষ্যতের কথা। গৌরী তাহাকে মুক্তি দিয়াছে, সেই মুক্তির মহিমাতেই সে মহামন্ত্র পাইয়াছে, 'বন্দে মাতরম্, ধরণীম্ ভরণীম্ মাতরম্'।

পিছনে অনেকগুলি জুতার শব্দ শুনিয়া শিবনাথ বুঝিল, সঞ্জয়ের দল বাহির হইল।—হয় কোন্ রেস্তোরাঁয় অথবা এই বাদল মাথায় করিয়া ইডেন গার্ডেনে।

Hallo, is it true you are married? নিত্যর কণ্ঠস্বরে শিবনাথ ঘুরিয়া দাঁড়াইল, সম্মুখেই দেখিল একদল ছেলে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে, দলের পুরোভাগে নিত্য, কেবল সঞ্জয় দলের মধ্যে নাই। শিবনাথের পায়ের রক্ত যেন মাথার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

সে অসঙ্কুচিত ভঙ্গিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া অকুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিল, Yes, I am married।

এমন নির্ভীক দর্পিত স্বীকারোক্তি শুনিয়া সমস্ত দলটাই যেন দমিয়া গেল, এমন কি নিত্য পর্য্যন্ত। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই কিন্তু নিত্য মাত্রাতিরিক্ত ব্যঙ্গভরে বলিয়া উঠিল, Shame!

ছেলের দল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দলটার পিছনে আপনার ঘরের দরজায় বাহির হইয়া সঞ্জয় ডাকিল, Well boys, tea is ready। বাঃ, ওকি, শিবনাথবাবুকে নিয়ে আসছ না কেন, he is not an outcaste! একি, শিবনাথবাবুর মুখ এমন কেন? It is you নিত্য, তুমি নিশ্চয় কিছু বলেছ। না না না, শিবনাথবাবু, আপনাকে আসতেই হবে, you must join us।

চায়ের আসরটা জমিয়া উঠিল ভাল। মনের মধ্যে যেটুকু উত্তাপ জমিয়া উঠিয়াছিল, সেটুকু ধুইয়া মুছিয়া দিল ওই সঞ্জয়। ঘরের মধ্যে বসিয়া স্টোভের শব্দে নিত্য এবং অন্যান্য ছেলেদের কথা হাসি সে শুনিতে পায় নাই। চায়ের জলটা নামাইয়া ফুটন্ত জলে চা ফেলিয়া দিয়া নিত্যদের ডাকিতে বাহিরে আসিয়াই শিবনাথের মুখ দেখিয়া ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। সমস্ত শুনিয়া সে শিবনাথের পক্ষ লইয়া সপ্রশংস মুখে বলিল, That's like a hero. বেশ বলেছেন আপনি শিবনাথবাবু! বিয়ে করা সংসারে পাপ নয়। বিয়ে করা পাপ হ'লে scout হওয়াও সংসারে পাপ।

এমন ভঙ্গিতে সে কথাগুলি বলিল যে, দলের সকলেই এমন কি নিত্য পর্য্যন্ত না হাসিয়া পারিল না। সঞ্জয় বলিল, নিত্য, তুমি shame বলেছ যখন, তখন শিবনাথবাবুর কাছে তোমাকে apology চাইতে হবে। You must।

All right! ভুলের সংশোধন করতে আমি বাধ্য, I am a scout, শিবনাথবাবু।

শিবনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, না না না, আমি কিছু মনে করি নি। We are friends।

Certainly।

You must prove it, both of you।—একজন বলিয়া উঠিল।

নিত্য বলিল, How? প্রমাণ করতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

বক্তা বলিল, তুমি দুটাকা দাও, আর শিবনাথবাবু দুটাকা—

সঞ্জয় বলিয়া উঠিল, No, not শিবনাথবাবু, say শিবনাথ। নিত্য দুটাকা, শিবনাথ দুটাকা and my humble self দুটাকা। নিয়ে এস খাবার।

নিত্য বলিল, All right, কিন্তু not a copper in my pocket now ; any friend to stand for me ?

শিবনাথ বলিল, I stand for you my friend। চার টাকা এনে দিচ্ছি আমি।—সে বাহির হইয়া গেল।

সঞ্জয় হাঁকিতে আরম্ভ করিল, গোবিন্দ গোবিন্দ !—গোবিন্দ মেসের চাকর।

শিবনাথ টাকা কয়টি সঞ্জয়ের হাতে দিতেই নিত্য নাটকীয় ভঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমার একটা amendment আছে। We are eight, আটজনে দুটাকা cinema, একটাকা tram and tea there, আর three rupees এখানে খাবার।

অধিকাংশ ছেলেই কলরব করিয়া সায় দিয়া উঠিল। সঞ্জয় বলিল, All right, তা হ'লে এখানে শুধু চা, খাওয়া-দাওয়া সব cinemaয়। কিন্তু চার আনার সীট বড় nasty, আট আনা না হ'লে বসা যায় না ! চাঁদা বাড়াতে হবে শিবনাথ, তুমি তিন, নিত্য তিন, আমি তিন ; ন টাকার পাঁচ টাকা সিনেমা, চার টাকা খাবার।

শিবনাথও অমত করিল না, পরম উৎসাহভরেই সে আবার টাকা আনিতে চলিয়া গেল। এ মেসে আসিয়া অবধি সুশীল ও পূর্ণের আকর্ষণে সে সকলের নিকট হইতে একটু দূরে দূরেই ছিল। সুশীল, পূর্ণ ও তাহাদের দলের আলোচনা, এমন কি হাস্য পরিহাসেরও স্বাদ-গন্ধ সবই যেন স্বতন্ত্র ; তাহার ক্রিয়া পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র। সে রসে জীবন-মন গম্ভীর গুরুত্বে থমথমে হইয়া উঠে। এমন কি, মাটির বুক হইতে আকাশের কোণ পর্য্যন্ত যে অসীম শূন্যতা, তাহার মধ্যেও সে রসপুষ্ট মন কোন এক পরম রহস্যের সন্ধান পাইয়া অনুচ্ছ্বসিত প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে গম্ভীর হইয়া উঠে। আর সঞ্জয়ের দলের আলাপ-আলোচনা মনকে

করে হাল্কা রঙিন, বুদ্বুদের মত একের পর এক ফাটিয়া পড়ে, আলোকচ্ছটার বর্ণবিন্যাস মনে একটু রঙের ছাপ রাখিয়া যায় মাত্র। তাই আজ এই আকস্মিক আলাপের ফলে সঞ্জয়দের সংস্পর্শে আসিয়া শিবনাথ এই অভিনব আস্বাদে উৎফুল্ল না হইয়া পারিল না।

এবারে আপনার ঘরের মধ্যে আসিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল, সুশীল তাহার সীটের উপর বসিয়া আছে। নীরবে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে সে বাহিরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। শিবনাথ তাহার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, সুশীলদা!

হ্যাঁ।

কখন এলেন? আমি এই তো ওঘরে গেলাম!

আমিও এই আসছি। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বলুন।—শিবনাথ একটু বিব্রত হইয়া পড়িল।

দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও।

শিবনাথ দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার কাছে আসিয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, দেরি হবে? তা হ'লে ওদের ব'লে আসি আমি।

না। তোমার কাছে টাকা আছে?

কত টাকা?

পঞ্চাশ।

না।—আমার কাছে দশ-পনরো টাকা আছে মাত্র।

তাই দাও, দুটো টাকা তুমি রেখে দাও। না, এক টাকা রেখে বাকি সব দাও।

শিবনাথ আবার বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার নিজের ও নিত্যর দেয় দুই টাকা যে এখনই লাগিবে!

সুশীল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, তাড়াতাড়ি কর শিবনাথ। আর্জেন্ট, পঞ্চাশ টাকায় দুটো রিভল্ভার। জাহাজের খালাসী তারা, অপেক্ষা করবে না।

শিবনাথ একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বাক্স খুলিয়া বাহির করিল সোনার চেন। চেনছড়াটি সুশীলের হাতে দিয়া বলিল, অন্তত দেড়শো টাকা হওয়া উচিত। বাকি টাকাও কাজে লাগাবেন সুশীলদা।

বিনা দ্বিধায় চেনছড়াটি হাতে লইয়া সুশীল উঠিয়া বলিল, আর একটা কথা, এদের সঙ্গে যেন বেশিরকম মেলা মেশা ক'র না।—বলিতে বলিতেই সে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকাল।

এখনও বাদল সম্পূর্ণ কাটে নাই। শিবনাথ অভ্যাসমত ভোরে উঠিয়া পূর্ব্বদিনের মত বারান্দার রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সিক্ত পিচ্ছিল রাজপথে তখনও ভিড় জমিয়া উঠে নাই। শেয়ালদহ স্টেশন হইতে তরি-তরকারি, মাছ, ডিমের ঝুড়ি মাথায় ছোট ছোট দলে বিক্রেতারা বাজার অভিমুখে চলিয়াছে; দুই-একখানা গরুর গাড়িও চলিয়াছে। এইবার আরম্ভ হইবে ঘোড়ার গাড়ি রিক্স ট্যাক্সির ভিড়। যাত্রীবাহী ট্রেন এতক্ষণ বোধ হয় স্টেশনে আসিয়া গিয়াছে।

শিবনাথের বর্ষার এই ঘনঘটাচ্ছন্ন রূপ বড় ভাল লাগে। সে দেশের কথা ভাবিতেছিল, কালী-মায়ের বাগানখানির রূপ সে কল্পনা করিতেছিল; দূর হইতে প্রগাঢ় সবুজ বর্ণের একটা স্তূপ বলিয়া মনে হয়। মধ্যের সেই বড় গাছটার ডাল বোধ হয় এবার মাটিতে আসিয়া ঠেকিবে। আমলার গাছে নূতন চিরল চিরল ছোট ছোট পাতাগুলির উজ্জ্বল কোমল সবুজবর্ণের সে রূপ অপরূপ! বাগানের কোলে কোলে

কাঁদড়ের নালায় নালায় জল ছুটিয়াছে কলরোল তুলিয়া। মাঠে এখন অবিরাম ঝরঝর শব্দ, এ জমি হইতে ও জমিতে জল নামিতেছে। শ্রীপুকুর এতদিনে জলে থৈথৈ হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে। ঘোড়াটার শরীর এ সময় বেশ ভরিয়া উঠিবে; দফাদারি পুকুরে এখন অফুরন্ত দলদাম। পিসীমা এই মেঘ মাথায় করিয়াও মহাপীঠে এতক্ষণ চলিয়া গিয়াছেন; মা নিশ্চয় বাড়িময় ঘুরিতেছেন, কোথায় কোন্‌খানে ছাদ হইতে জল পড়িতেছে তাহারই সন্ধানে।

সিঁড়িতে সশব্দে কে উঠিয়া আসিতেছিল, শিবনাথের মনের চিন্তা ব্যাহত হইল। সে সিঁড়ির দুয়ারের দিকে চাহিয়া রহিল। একি, সুশীলদা! সুশীল আসিতেছিল যেন একটা বিপুল বেগের উত্তেজনায় অস্থির পদক্ষেপে। মুখ চোখ যেন জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে।

Great news, শিবনাথ!—সে হাতের খবরের কাগজটা মেলিয়া ধরিল।

"ইউরোপের ভাগ্যাকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা। অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ প্রিন্স ফার্ডিনাণ্ড গুলির আঘাতে নিহত। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অষ্ট্রিয়ান গভর্মেণ্টের রুমানিয়ার নিকট কৈফিয়ৎ দাবি। যুদ্ধসজ্জার বিপুল আয়োজন।"

শিবনাথ সুশীলের মুখের দিকে চাহিল। সুশীল যেন অগ্নিশিখার মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শিবনাথ বলিল, রুমানিয়ার মত ছোট একফোঁটা দেশ—

বাধা দিয়া সুশীল বলিল, ক্ষুদ্র শিশিরকণায় সূর্য্য আবদ্ধ হয় শিবনাথ, ক্ষুদ্রতা দেহে নয়, মনে। তা ছাড়া ইউরোপের রাজনীতির খবর তুমি জান না। যুদ্ধ অনিবার্য্য। শুধু অনিবার্য্য নয়, সমগ্র ইউরোপ জুড়ে যুদ্ধ। এই আমাদের সুযোগ।

কিঙ্করকে প্রণাম করিয়া নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। কমলেশও নত-মুখে অকারণে জুতাটা ফুটপাথের উপর ঘষিতেছিল।

রামকিঙ্কর আবার বলিলেন, এস, গাড়িতে এস; আমাদের ওখান হয়ে আসবে।

শিবনাথ বলিল, না। আমি এখন একজন বন্ধুর ওখানে যাচ্ছি।

বেশ তো, চল, গাড়িতেই সেখান হয়ে আমাদের বাসায় যাব। মা এসেছেন কাশী থেকে, ভারী ব্যস্ত তোমাকে দেখবার জন্যে।

মা? নাস্তির দিদিমা? তবে—! শিবনাথের বুকের ভিতরে যেন একটা আলোড়ন উঠিল। নাস্তি, নাস্তি আসিয়াছে—গৌরী!

'ইহার পর কোন ভদ্রকন্যা-ভদ্ররমণীর বাস অসম্ভব' এই কথাটা তাহার মনে পড়িয়া গেল। আরও মনে পড়িয়া গেল তাহার মা-পিসীমার সহিত রামকিঙ্করবাবুর রূঢ় আচরণের কথা। তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহের ঔদ্ধত্যে উদ্ধত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে ঔদ্ধত্যের প্রকাশ হইবার লগ্নক্ষণ আসিবার পূর্ব্বেই তাহার নজরে পড়িল, দূরে একটা চায়ের দোকানে দাঁড়াইয়া সুশীল বার বার তাহাকে পূর্ণর নিকট যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। সে আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিল না, পথে পা বাড়াইয়া বলিল, না, গাড়িতে সেখানে যাবার নয়; আমি চললাম, সেখানে আমার জরুরি দরকার।

মুহূর্ত্তে রামকিঙ্করবাবু উগ্র হইয়া উঠিলেন, কঠোর উগ্র দৃষ্টিতে তিনি শিবনাথের দিকে চাহিলেন, কিন্তু ততক্ষণে শিবনাথ তাঁহাদিগকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া আপন পথে দৃঢ় দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

কমলেশের ঠোঁট দুইটি অপমানে অভিমানে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

কুড়ি

রামকিঙ্করবাবু সামাজিকতা বা আত্মীয়তার ধার কোন দিনই ধারিতেন না। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে নিদ্রাভিভূত হইবার মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত তাঁহার একমাত্র চিন্তা,—বিষয়ের চিন্তা, ব্যবসায়ের চিন্তা, অর্থের আরাধনা। ইহার মধ্যে আত্মীয়তা কুটম্বিতা এমন কি সামাজিক সৌজন্য-প্রকাশের পর্য্যন্ত অবকাশ তাঁহার হইত না। ধনী পিতার সন্তান, শৈশব হইতেই তাঁবেদারের কাঁধে কাঁধে মানুষ হইয়াছেন, যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই তাহাদের মালিক ও প্রতিপালকের আসনে বসিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, ফলে প্রভুত্বের দাবি, মানসিক উগ্রতা তাঁহার অভ্যাসগত স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর একটি বস্তু—সেটি বোধ হয় তাঁহার জন্মগত, কর্ম্মী পিতার সন্তান তিনি, কর্ম্মের নেশা তাঁহার রক্তের ধারায় বর্ত্তমান। এই কর্ম্মের উন্মত্ত নেশায় তিনি সব কিছু ভুলিয়া থাকেন; আত্মীয়তা কুটুম্বিতা সামাজিক সৌজন্য-প্রকাশের অভ্যাস পর্য্যন্ত এমনই করিয়া ভুলিয়া থাকার ফলে অনভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু আসল মানুষটি এমন নয়। এই কৃত্রিম অভ্যাস করা জীবনের মধ্যে সে মানুষের দেখা মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, যে মানুষের আপনার জনের জন্য অফুরন্ত মমতা; অদ্ভুত তাঁহার খেয়াল, যে খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া স্বর্ণমুষ্টিও ধূলায় ফেলিয়া দিতে পারেন। কাশীতে অকস্মাৎ প্লেগ দেখা দিতে কমলেশ তাহার দিদিমা ও গৌরীকে লইয়া কলিকাতায় আসিতেই রামকিঙ্করবাবু গৌরীকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, নাস্তি যে অনেক বড় হয়ে গেলি রে, এ্যাঁ!

গৌরী মামাকে প্রণাম করিয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই দুই মাসের মধ্যেই গৌরীর সর্ব্ব অবয়ব হইতে জীবনের গতির

স্বাচ্ছন্দ্য পর্য্যন্ত ঈষৎ ক্ষুণ্ণ ম্লান হইয়া গিয়াছে। শিবনাথকে যে পত্র সে লিখিয়াছিল, সে পত্রের ভাষা তাহার স্বকীয় অভিব্যক্তি নয়, সে ভাষা অপরের, সে তিরস্কার অন্যের; শিবনাথের প্রতি তাহার নিজের অকথিত সকল কথা ধীরে ধীরে তাহার রূপের মধ্যে এমনই করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। গৌরীর রূপের সেই অভিনব অভিব্যক্তি রামকিঙ্করবাবুর চোখে পড়িল, তিনি পরমুহূর্ত্তেই বলিলেন, কিন্তু এমন শুকনো শুকনো কেন রে তুই ?

নাস্তির দিদিমা—রামকিঙ্করবাবুর মা এতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন আপনার পূজার ঝোলাটির সন্ধানে; ঝোলাটি লইয়া উপরে উঠিতে উঠিতে তিনি রামকিঙ্করের কথাগুলি শুনিয়া সিঁড়ি হইতেই বলিলেন, তুমিই তো তার কারণ বাবা। মেয়েটাকে হাতে পায়ে বেঁধে জলে দিলে তোমরা। আবার বলছ, এমন শুকনো কেন ?

গৌরী দিদিমায়ের কথার ধারা লক্ষ্য করিয়া সেখান হইতে সরিয়া বাড়ির ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। রামকিঙ্করবাবু চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার সব মনে পড়িয়া গেল, শিবনাথের মায়ের কথা, পিসীমায়ের কথা, সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের সেবাকার্য্যের পরম প্রশংসার কথাও মনে পড়িল। আরও মনে পড়িল, শিবনাথের সঙ্গে গৌরীর দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত নাই। তিনি বলিলেন, দাঁড়াও, আজই খোঁজ করছি শিবনাথ কোন্ কলেজে পড়ে, কোথায় থাকে। আজই নিয়ে আসছি তাকে।

কমলেশ বলিয়া উঠিল, না মামা।

কেন ?—রামকিঙ্করবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন।

রামকিঙ্করবাবুর মা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, না, নিয়ে আসতে হবে না তাকে, সে একটা ছোটলোক, ইতর; একটা ডোমেদের মেয়ের মোহে—

বাধা দিয়া রামকিঙ্কর বলিলেন, ছি ছি, কি বলছ মা তুমি? কে, কার কথা বলছ তুমি?

ক্রোধ হইলে নাস্তির দিদিমায়ের আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, তিনি দারুণ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া ডোমবধূর সমুদয় ইতিবৃত্তটি উচ্চকণ্ঠে বিবৃত করিয়া কহিলেন, তুই করেছিস এ সম্বন্ধ; তোকেই এর দায় পুরোতে হবে। কি বিধান তুই করছিস বল আমাকে, তবে আমি জলগ্রহণ করব।

রামকিঙ্কর বলিলেন, কথাটা একেবারে বাজে কথা ব'লেই মনে হচ্ছে মা। আমি আজই আমাদের ম্যানেজারকে লিখছি, সঠিক খবর জেনে সে লিখবে। আমার কিন্তু একেবারেই বিশ্বাস হয় না মা।

চিঠি সেইদিনই লেখা হইল; কয়দিন পরে উত্তরও আসিল। ম্যানেজার লিখিয়াছেন, "খবর আমি যথাসাধ্য ভালরকমই লইয়াছি; এমন কি এখানকার দারোগাবাবুর কাছেও জানিয়াছি, ওটা নিতান্ত গুজবই। দারোগা বলিলেন, ও সব ছেলের নাম পাপের খাতায় থাকে না। ওদের জন্য আলাদা খাতা আছে। কথাটা ভাঙিয়া বলিতে বলায় তিনি বলিলেন, সে ভাঙিয়া বলা যায় না, তবে এইটুকু জানাই যে, ও রটনাটা রটাইয়াছে ওই বউটার শাশুড়ী এবং ভাসুর; মেয়েটা আসলে পলাইয়াছে তাহার বাপের বাড়ির গ্রামের একজন স্বজাতীয়ের সঙ্গে। সে লোকটা কলিকাতায় থাকে, সেখানে মেথর বা ঝাড়ুদারের কাজ করে। এখানে সর্ব্বসাধারণের মধ্যেও কোন ব্যক্তিই কথাটা বিশ্বাস করেন নাই। বরং শিবনাথবাবুর এই সেবাকার্য্যের জন্য এতদঞ্চল তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।"

চিঠিখানা পড়িয়া কমলেশকে ডাকিয়া রামকিঙ্করবাবু হাসিয়া বলিলেন, পড়। ম্যানেজার সেখান থেকে পত্র দিয়েছেন।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে কান্নার আবেগে কমলেশের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। শিবনাথ তাহার বাল্যবন্ধু, তাহার উপর গৌরীর বিবাহের ফলে সে তাহার পরম প্রিয়জন, তাহার প্রতি অবিচার করার অপরাধবোধ অন্তরের মধ্যে এমনই একটা পীড়াদায়ক আবেগের সৃষ্টি করিল। কমলেশ শিবনাথকে খুব ভাল করিয়া জানিত, উলঙ্গ শৈশব হইতে তাহারা দুইজনে খেলার সাথী, বাল্যকাল হইতে তাহাদের মধ্যে প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা জাগিয়াছে, কৈশোরের প্রারম্ভে তাহারা কর্ম্মের সহযোগিতার মধ্যে পরস্পরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যৌবন-জীবনে প্রবেশ করিয়াছে; একের শক্তি দুর্ব্বলতা দোষ গুণ অন্যে যত জানে, সে নিজেও আপনাকে তেমন ভাল করিয়া জানে না। তাই কমলেশের অপরাধবোধ এত তীক্ষ্ণ হইয়া আপনার মর্ম্মকে বিদ্ধ করিল। সে যেন কত ছোট হইয়া গেল শিবনাথের নিকট, গৌরীর নিকট সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া!

রামকিঙ্কর বলিলেন, যাও, মাকে চিঠিখানা প'ড়ে শুনিয়ে এস। আর দেখ, নান্তিকে চিঠিখানা পড়তে দিও।

চিঠিখানা শুনিয়া নান্তির দিদিমা খুব খুশি হইয়া উঠিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাঁকডাক সুরু করিয়া বলিলেন, নান্তি, নান্তি, অ নান্তি।

নান্তি তাহার সমবয়সী মামাতো মাসতুত বোনদের সহিত গল্প করিতেছিল, দিদিমার হাঁকডাক শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, এই নে হারামজাদী, এই পড়। চিলে কান নিয়ে গেল ব'লে সেই কে চিলের পেছনে পেছনে ছুটেছিল, তোর হ'ল সেই বিত্তান্ত। কে কোথা থেকে কি লিখলে, আর তাই তুই বিশ্বেস ক'রে কেঁদে-কেটে—বাবাঃ, এ কালের মেয়েদের চরণে দণ্ডবৎ মা!

গৌরী রুদ্ধশ্বাসে চিঠিখানা হাতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। দিদিমায়ের মনের আবেগ তখনও শেষ হয় নাই, তিনি তাঁহার অপরাধটুকু গৌরীর স্কন্ধে আরোপিত করিয়া কহিলেন, তা একাল অনেক ভাল মা, তাই পরিবার এখন স্বামীর ওপর রাগ করতে পারছে। সেকালে বাবুদের তো ওসব ছিল কুকুর-বেড়াল পোষার সামিল। ওই কি বলে শ্যামাদাসবাবুর ভালবাসার লোক ছিল—কাদম্বিনী; সে বলেছিল, বাবু, তোমার পরিবারের গোবরের ছাঁচ তুলে এনে আমাকে দেখাও, সে কেমন সুন্দরী। তোরা হ'লে তো তা হ'লে গলায় দড়ি দিতিস, না হয় বিষ খেতিস।

গৌরীর চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। চোখের জলের লজ্জা গোপন করিতেই সে চিঠিখানা ফেলিয়া দিয়া দ্রুত সেখান হইতে চলিয়া গিয়া আপনার বিছানায় মুখ লুকাইয়া শুইয়া পড়িল।

কমলেশ নতমুখেই বলিল, দিদিমা!

দিদিমা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, তুই ছোঁড়াই হচ্ছিস ভারী হেপো। একেবারে রেগে আগুন হয়ে লেক্‌চার-মেক্‌চার ঝেড়ে এই কাণ্ড ক'রে ব'সে থাকলি। যা এখন, যা, খোঁজখবর ক'রে নিয়ে আয় তাকে।

সে যদি না আসে?

আসবে না? কান ধ'রে নিয়ে আসবি। গৌরী কি আমার ফেলনা নাকি? সে বিয়ে করেছে কেন আমার গৌরীকে?

তারপর তাঁহার ক্রোধ পড়িল কলিকাতার বাসায় যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের উপর। কেন তাঁহারা এতদিন শিবনাথের সংবাদ লন নাই। তাঁহাদের নিজের জামাই হইলে কি তাঁহারা এমন করিয়া সংবাদ লইতে ভুলিয়া বসিয়া থাকিতেন? শেষ পর্য্যন্ত তিনি মৃতা কন্যা—গৌরীর মায়ের জন্য কাঁদিয়া ফেলিলেন। একি দারুণ বোঝা সে তাঁহার বুকের উপর চাপাইয়া দিয়া গেল!

ইহারই ফলে কমলেশ ও রামকিঙ্করবাবু শিবনাথের নিকট আসিয়াছিলেন সমাদর করিয়া শিবনাথকে লইয়া যাইবার জন্য, কিন্তু শিবনাথ একটা তন্ময় শক্তির আবেগে তাঁহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া মেঘ মাথায়

করিয়া ভিজিতে ভিজিতে আপন পথে চলিয়া গেল, তাঁহারা যেন তাহার নাগাল পর্য্যন্ত ধরিতে পারিলেন না।

নাস্তির দিদিমায়ের নির্ব্বাপিত ক্রোধবহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার ক্রোধ পড়িল শিবনাথের পিসীমা ও মায়ের উপর। শিবনাথ যে তাঁহাদিগকে এমন করিয়া লঙ্ঘন করিয়া গেল, এ শিক্ষা যে তাঁহাদেরই, তাহাতে আর তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি অত্যন্ত দৃঢ় ভঙ্গিতে বার্দ্ধক্যনত দেহখানিকে সোজা করিয়া তুলিয়া বলিলেন, আমি আমার নাস্তিকে রাণী ক'রে দিয়ে যাব। আসতে হয় কি না হয় আমার নাস্তির কাছে, আমি ম'লেও যেখানে থাকি সেইখান থেকে দেখব।

রামকিঙ্করবাবুও মনে মনে অত্যন্ত আহত হইয়াছিলেন, তিনি মায়ের কথার প্রতিবাদ করিলেন না, গম্ভীরভাবে নীচে নামিয়া গেলেন। কমলেশ চুপ করিয়া বারান্দায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গৌরী ঘরের মধ্যে জানালার ধারে বসিয়া উল বুনিতেছিল; জানালাটা দিয়া পথের উপরটা বেশ দেখা যায়, তাহার হাতের আঙুল রচনা করিতেছিল উল দিয়া ছাঁদের পর ছাঁদ, দেখিতেছিল সে পথের জনতা। সমস্ত শুনিয়া তাহার হাতের কাজটি থামিয়া গেল, পথের দিকে চাহিয়া সে শুধু বসিয়াই রহিল।

সেদিন সন্ধ্যায় সমগ্র পরিবারটিকেই রামকিঙ্করবাবু থিয়েটার দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

ঠিক মাসখানেক পর।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গে তরঙ্গে সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল, বৃটেন জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ফ্রান্স রাশিয়া বেলজিয়াম রুমানিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। সমগ্র কলিকাতা যেন চঞ্চল সমুদ্রের মত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। হাজার হাজার মাইল পশ্চিমের মানুষের অন্তরের বিক্ষোভ আকাশ-তরঙ্গে আসিয়া এখানকার মানুষকেও ছোঁয়াচ লাগাইয়া দিল শেয়ার-মার্কেটে সেদিনের সে ভিড়, ব্যবসায়ী-মহলে সেদিনের ছোটাছুটি দেখিয়া কমলেশের মন বিপুল উত্তেজনায়

ভরিয়া উঠিল। প্রত্যেক মানুষটি যেন উত্তেজনার স্পর্শে দৃঢ় দ্রুত পদক্ষেপে সোজা হইয়া চলিয়াছে।

কয়লার বাজার নাকি হু-হু করিয়া চড়িয়া যাইবে, প্রচুর ধন, অতুল ঐশ্বর্য্যে বাড়িঘর ভরিয়া উঠিবে। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা করিতে করিতে অকস্মাৎ তাহার শিবনাথকে মনে পড়িয়া গেল; তাহার মনে হইল, আর একবার খোঁজ করিতে দোষ কি? সেদিন সত্যই হয়তো তাহার কোন কাজ ছিল। আর তাহার সহিত একবার মুখোমুখী সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া লওয়ারও তো প্রয়োজন আছে। মোট কথা, যুক্তি তাহার যাহাই হউক না কেন, যাওয়ার উত্তেজিত প্রবৃত্তিই হইল আসল কথা। তাহাদের ভাবী সৌভাগ্যের সম্ভাবনার কথাটাও শিবনাথকে জানানো হইবে।

শিবনাথ ঘরে বসিয়া আপন মনে কি লিখিতেছিল। কমলেশ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এই যে!

মুখ তুলিয়া শিবনাথ তাহাকে দেখিয়া লেখা কাগজখানা বাক্সের মধ্যে পুরিয়া অতি মৃদু হাসিয়া বলিল, এস।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কমলেশ সবিস্ময়ে বলিল, একি, এমন উস্কোখুস্কো চেহারা কেন তোমার? অসুখ করেছে নাকি? সত্যই শিবনাথের রুক্ষ চুল, মার্জ্জনাহীন শুষ্ক মুখশ্রী, দেহও যেন ঈষৎ শীর্ণ বলিয়া মনে হইতেছিল।

হাসিয়া শিবনাথ বলিল, না, অসুখ কিছু না। আজ নাওয়া-খাওয়াটা হয়ে ওঠে নি।

এই সামান্য বিস্ময়ের হেতুটুকু লইয়া কমলেশ বেশ স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল, সে বলিল, কেন? নাওয়া-খাওয়া হ'ল না কেন?

কাজ ছিল একটু, সকালে বেরিয়ে এই মিনিট পনরো ফিরেছি।

কলেজ যাও নি?

যাক গে সে কথা। তারপর দেশে কবে যাবে বল।

দেশে এখন যাব না, এইখানেই পড়ব ঠিক হয়েছে। কিন্তু তোমার খবর কি বল তো? সেদিন মামা নিজে এলেন, আর তুমি অমন ক'রে-চ'লে গেলে যে?

বলেছিলাম তো, কাজ ছিল।

কি এমন কাজ যে, দুটো কথা বলবার জন্যে তুমি দাঁড়াতে পারলে না?

এবার শিবনাথ হাসিয়া বলিল, যদি বলি কোন নতুন love affair, যার মোহে মানুষ আপনাকে একেবারে হারিয়ে ফেলে!

কমলেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যাক, বুঝলাম, বলতে বাধা আছে।

শিবনাথ এ কথার কোন জবাব না দিয়া একটা পেপার-ওয়েট লুফিতে লুফিতে বলিল, চা খাবে একটু?—বলিতে বলিতেই সে বারান্দায় বাহির হইয়া হাঁকিল, গোবিন্দ, দু পেয়ালা চা!

কমলেশ খবরের কাগজটা টানিয়া লইয়া বলিল, আজকের news একটা great news!

হাসিয়া শিবনাথ বলিল, নতুন ইতিহাসের সন তারিখ বন্ধু,—Ninteen Fourteen—Fourth August!

আজই business market-এ অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে গেল। কয়লার দর তো হু-হু ক'রে বেড়ে যাবে। মামা বলছিলেন, প'ড়ে কি হবে, এবার business-এ ঢুকে পড়। তোমার কথাও বলছিলেন। অবশ্য তোমার যদি পছন্দ হয়।

Business অবশ্য খুবই ভাল জিনিস।

হাসিয়া কমলেশ বলিল, কিন্তু কবিতা লেখা ছাড়তে হবে তা হ'লে। আমাকে দেখে লুকোলে, ওটা কি লিখছিলে? কবিতা নিশ্চয়।

না।

তবে? কি, দেখিই না ওটা কি?

এবার শিবনাথ হাসিয়া বলিল, ওটা নতুন love affair—প্রেমপত্র একখানা; সুতরাং ওটা দেখানো যায় না।

কমলেশ আবার নীরব হইয়া গেল। চাকরটা আসিয়া চা নামাইয়া দিল, কমলেশ নীরবে চায়ের কাপ তুলিয়া লইয়া তাহাতে চুমুক দিল। তাহার নীরবতার মধ্যে শিবনাথও অন্যমনস্ক হইয়া জানালার দিকে নীরবেই চাহিয়া রহিল।

এ অশোভন নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সেই প্রথম বলিল, তোমরা কি কাশীর বাসা তুলে দিয়েছ ?

হ্যাঁ।

অ।

কমলেশ বলিল, দিদিমা, নাস্তি এখানেই চ'লে এসেছে আমার সঙ্গে।

শিবনাথ নীরব হইয়া গেল।

কমলেশ এবার বলিল, আমাদের বাসায় চল একদিন।

হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া শিবনাথ যেন তন্ময় হইয়া গিয়াছে।

কমলেশ বলিল, গৌরী দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। তার মুখ দেখলে আমাদের কান্না আসে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শিবনাথ বলিল, আজও আমার কলঙ্ক-মোচন হয় নি কমলেশ, আমি যেতে পারি না।

কমলেশ যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা। Mischievous লোকের রটনা ওসব—আমরা খবর নিয়ে জেনেছি।

শিবনাথের মুখ চোখ অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ দীপ্তিতে প্রখর হইয়া উঠিল। সে বলিল, কিন্তু আমায় তো বিশ্বাস করতে পার নি। যেদিন নিজেকে তেমনই বিশ্বাসের পাত্র ব'লে প্রমাণ করতে পারব, সেইদিন আমার সত্যকার কলঙ্কমোচন হবে।

কমলেশের মাথাটা আপনা হইতেই লজ্জায় নত হইয়া পড়িল। সে নীরবে ঘরের মেঝের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। শিবনাথ মৃদু হাসিয়া আবার বলিল, 'সময় যেদিন হইবে, আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।'

একটি ছেলে দরজার সম্মুখেই বারান্দায় রেলিঙে ঠেস দিয়া নিতান্ত উদাসীনভাবেই দাঁড়াইয়া ছিল; তাহাকে দেখিয়াই শিবনাথ ঈষৎ চঞ্চল হইয়া বলিল, এখানেই যখন থাকবে, মাঝে মাঝে এস যেন। একদিনে সকল কথা ফুরিয়ে দিলে চলবে কেন ?

উঠিতে বলার এমন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত কমলেশ বুঝিতে ভুল করিল না। সে উঠিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরবেই বাহির হইয়া গেল।

কমলেশ বাহির হইয়া যাইতেই ছেলেটি শিবনাথের ঘরে আসিয়া বলিল, হয়ে গেছে সেটা ?

শিবনাথ বাক্স খুলিয়া সেই কাগজখানা তাহার হাতে দিয়া বলিল, সুশীলদাকে একটু দেখে দিতে বলবেন।

কাগজখানা একটা বৈপ্লবিক ইস্তাহারের খসড়া।

কাগজখানি সযত্নে মুড়িয়া পরনের কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া ছেলেটি বলিল, পূর্ণদার সঙ্গে একবার দেখা করবেন আপনি। জরুরি দরকার।

করব।

ছেলেটি আর কথা কহিল না, বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

পূর্ণ যেমন মৃদুভাষী, কথাবার্ত্তাও তাহার তেমনই সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনের অধিক একটি কথাও সে বলে না। শিবনাথের জন্যই সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। শিবনাথ আসিতেই ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া সে বলিল, আপনাকে এইবার একটা বিপদের সম্মুখীন হতে হবে শিবনাথবাবু।

শিবনাথ প্রশান্তভাবে বলিল, কি বলুন।

পূর্ণ বলিল, অরুণের ওপর পুলিসের বড় বেশি নজর পড়েছে। তার কাছে কিছু আর্ম্‌স আছে আমাদের। সেগুলো এখন সরাবার উপায় পাচ্ছি না। আপনি মেস বদল ক'রে অরুণের মেসে যান। আর্ম্‌সগুলো আপনার কাছে থেকে যাবে, অরুণ অন্য মেসে চ'লে যাক। তা হ'লে অরুণের জিনিসপত্র সার্চ করলে তার আর ধরা পড়বার ভয় থাকবে না। পরে আপনার কাছ থেকে ওগুলো আমরা সরিয়ে ফেলব।

শিবনাথের বুক যেন মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। ওই মুহূর্ত্তটির মধ্যে তাহার মাকে, পিসীমাকে মনে পড়িয়া গেল। ম্লানমুখী গৌরীও একবার উঁকি মারিয়া চলিয়া গেল।

পূর্ণ বলিল, আপনি তা হ'লে দু তিন দিনের মধ্যেই চ'লে যান। সম্ভব হ'লে কালই। এই হ'ল অরুণের মেসের ঠিকানা।

ততক্ষণে শিবনাথ নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। সে এবার বলিল, বেশ।

পূর্ণ তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিল, good luck!

সমস্ত রাত্রিটা শিবনাথের জাগরণের মধ্যেই কাটিয়া গেল।

নানা উত্তেজিত কল্পনার মধ্যেও বার বার তাহার প্রিয়জনদের মনে পড়িতেছিল। সহসা এক সময় তাহার মনে হইল, যদি ধরাই পড়িতে হয়, তবে পূর্ব্বাহ্নে মা-পিসীমার চরণে প্রণাম জানাইয়া বিদায় লইয়া রাখিবে না? গৌরী, আজিকার দিনেও কি গৌরীকে সে বঞ্চনা করিয়া রাখিবে? না, সে কর্ত্তব্য তাহাকে সুশেষ করিতেই হইবে। মাকে ও পিসীমাকে খুলিয়া না লিখিয়াও ইঙ্গিতে সে বিদায় জানাইয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিল। তারপর পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল গৌরীকে। লিখিতে লিখিতে বুকের ভিতরটা একটা উন্মত্ত আবেগে যেন তোলপাড় করিয়া উঠিল। এত নিকটে গৌরী, দশ মিনিটের পথ, একবার তাহার সহিত দেখা করিয়া আসিলে কি হয়, হয়তো জীবনে আর ঘটিবে না! অর্দ্ধসমাপ্ত পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে জামাটা টানিয়া লইয়া গায়ে দিতে দিতেই নীচে নামিয়া গেল।

গেট বন্ধ। রাত্রি এগারোটায় গেট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মেসটি নামে মেস হইলেও কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত; মেস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে চাবি থাকে। রুদ্ধ দুয়ারের সম্মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শিবনাথ উপরে আসিয়া আবার চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠিখানি শেষ করিয়া বিছানায় সে গড়াইয়া পড়িল শ্রান্ত-ক্লান্তের মত। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাহার মনে হইল, সে করিয়াছে কি! ছি, এত দুর্ব্বল সে! এই বিদায় লওয়ার কি কোন প্রয়োজন আছে? কিসের বিদায়, আর কেন এ বিদায় লওয়া? আবার সে উঠিয়া বসিয়া দেশলাই জ্বালিয়া পত্রগুলি নিঃশেষে পুড়াইয়া ফেলিল।

কোথায় কোন্ দূরের টাওয়ার-ক্লকে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। মনকে দৃঢ় করিয়া সে আবার শুইয়া পড়িল। অভ্যাসমত ভোরেই তাহার ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই সে অনুভব করিল, সমস্ত শরীর

যেন অবসাদে ভাঙিয়া পড়িতেছে। তবুও সে আর বিছানায় থাকিল না, মন এই অল্প বিশ্রামেই বেশ স্থির হইয়াছে, সম্মুখের গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া উঠিয়া পড়িল। মনের মধ্যে আর কোন চিন্তা নাই, আছে শুধু ওই কর্ম্মের চিন্তা। কেমন করিয়া কোন্ অজুহাতে কলেজের মেস পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবে ?

একে একে ছেলেরা উঠিতেছিল। সঞ্জয়ও উঠিয়া বাহিরে আসিল; সঞ্জয় তাহার অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে নাই, কিন্তু অতি দূরত্বের ব্যবধানও আর নাই। সঞ্জয় তাহাকে দেখিয়াই বলিল, হ্যালো শিবনাথ, তোমার ব্যাপার কি বল তো? কলেজেও যাচ্ছ না, এখানেও প্রায় থাক না। একি, তোমার চেহারা এমন কেন হে? অসুখ নাকি? ঠাণ্ডা লাগিও না, ঘরে চল, ঘরে চল।

শিবনাথ সঞ্জয়ের সঙ্গে তাহারই ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সম্মুখেই দেওয়ালে একখানা প্রকাণ্ড বড় আয়না। পূর্ব্বদিন হইতে অস্নাত অভুক্ত রাত্রিজাগরণক্লিষ্ট শিবনাথ আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সত্যই তো একি চেহারা হইয়াছে তাহার, কিন্তু সে তো কোন অসুস্থতা অনুভব করে না!

সঞ্জয় বলিল, অনিয়ম ক'রে শরীরটা খারাপ ক'রে ফেললে তুমি শিবনাথ। কি যে কর তুমি, তুমিই জান। সত্যি বলত কি, তুমি রীতিমত একটা mystery হয়ে উঠেছ। প্রত্যেকের notice attracted হয়েছে তোমার ওপর।

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, জান, জীবনে এই আমি প্রথম কলকাতায় এসেছি। কলকাতা যেন একটা নেশার মত পেয়ে বসেছে আমাকে। সোজা কথায়, পাড়াগাঁয়ের ছেলে কলকাত্তাই হয়ে উঠছি আর কি ।

ঘাড় নাড়িয়া সঞ্জয় বলিল, not at all; বিশ্বাস হ'ল না আমার। However আমি তোমার secret জানতে চাই না। কিন্তু আমার একটা কথা তুমি শোন, তুমি বাড়ি চ'লে যাও, you require rest, শরীরটা সুস্থ করা প্রয়োজন হয়েছে।

শিবনাথের মন মুহূর্ত্তে উল্লসিত হইয়া উঠিল, শরীর-অসুস্থতার অজুহাতে বাড়ি চলিয়া যাওয়ার ছলেই তো মেস ত্যাগ করা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্প তাহার স্থির হইয়া গেল। সে হাতের আঙুল দিয়া মাথার রুক্ষ চুলগুলি পিছনের দিকে ঠেলিয়া দিতে দিতে বলিল, তাই ঠিক করেছি ভাই, শরীর যেন খুব দুর্বল হয়ে গেছে; আজই আমি বাড়ি চ'লে যাব। দেখি, আবার সুপারমশায় কিঁ বলেন!

বলবে? কি বলবে? চল, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। আমাদের দেশটাই এমনই, healthএর দাম এখানে কিছু নয়, degree is everything here; nonsense! জান, আমি এই জন্যে ঠিক ক'রে ফেলেছি and it is certain, এই I.A. examinationএর পরেই আমি বিলেত যাব। মামা warএর জন্যে আপত্তি করছিলেন, কিন্তু time is money, পড়ার বয়স চ'লে গেলে বিলেত গিয়ে কি হবে?

শিবনাথ সঞ্জয়কে শত ধন্যবাদ দিল তাহার সুপরামর্শের জন্য, তাহার সাহায্যের জন্য। সঞ্জয় নিজেই তাহার জিনিসপত্র গুছাইয়া দিল, বিদায়ের সময় বলিল, বেশিদিন বাড়িতে থেকো না যেন। percentage কোন রকমে দু বছরে কুলিয়ে যাবে।

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, যত শিগগির পারি ফিরব।

হাসিয়া সঞ্জয় বলিল, তোমার better halfকে আমার নমস্কার জানিও।

জানাব।

এদিকে অরুণের মেসে সকল বন্দোবস্ত হইয়াই ছিল। অরুণ তাহার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই মেস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মারাত্মক অস্ত্রের ছোট স্যুট্‌কেস একটি ঘরের কোণে কাগজের মধ্যে চাপা ছিল।

শিবনাথ সেটিকে তাহার নিজের ট্রাঙ্কের মধ্যে বন্ধ করিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আপনার জিনিসপত্র গুছাইতে মনোনিবেশ করিল।

জিনিসপত্র গুছাইয়া সে চাকরকে ডাকিয়া বলিল, ঘর-দোরটা একবার পরিষ্কার ক'রে দাও দেখি। বড্ড নোংরা হয়ে রয়েছে।

চাকর বলিল, অরুণবাবু—ওই যে বাবুটি এ ঘরে ছিলেন, তাঁর মশাই ওই এক ধরণ ছিল। কিছুতেই ঘর ভাল ক'রে পরিষ্কার করতে দিতেন না। তা দিচ্ছি পরিষ্কার ক'রে।

কিছুক্ষণ পর সে মেসের ঝাড়ুদারণীকে সঙ্গে করিয়া ঘরে আসিয়া তাহাকে বলিল, এক টুকরো কাগজ যেন না প'ড়ে থাকে। ভাল ক'রে পরিষ্কার ক'রে দাও।

শিবনাথ স্তম্ভিত বিস্ময়ে মেয়েটির দিকে চাহিয়া ছিল। এ কে? এ যে সেই নিরুদ্দিষ্টা ডোমবউ! শরীর তাহার সুস্থ সবল, শহরের জল-হাওয়ায় বর্ণশ্রী উজ্জ্বল, কলিকাতার জমাদারণীদের মত তাহার গায়ে পরিষ্কার জামা, সৌষ্ঠবযুক্ত শাড়িখানি ফের দিয়া আঁটসাট করিয়া পরা, তাহাকে আর সেই ডোমবধূ বলিয়া চেনা যায় না, তবুও শিবনাথের ভুল হইল না, প্রথম দৃষ্টিতেই তাহাকে চিনিয়া ফেলিল।

মেয়েটিও তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রথমটা বিস্ময়ে যেন হতবাক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য, পরমুহূর্ত্তেই তাহার মুখখানি যেন দীপালোকের মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, মুখ ভরিয়া হাসিয়া সে পরম ব্যগ্রতাভরে সম্ভাষণ করিল, বাবু! জামাইবাবু! সঙ্গে সঙ্গে হাতের ঝাঁটাটা সেইখানে ফেলিয়া দিয়া সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

ক্রমশ

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ'

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সে যাহা হউক, আমরা এই স্থলে উভয় কবির নির্লজ্জতার কিঞ্চিৎ২ তুলনা করি, যথা।

সুন্দরের উক্তি।

"সুন্দরীর করে ধরি, সুন্দর বিনয় করি,
কহে শুন শুন প্রাণেশ্বরি।
আজি দিনে দুপ্রহরে, দেখিলাম সরোবরে,
কমলিনী বাঁধিয়াছে করী॥
[২৬] গিরি অধোমুখে কাঁদে, এ কথা কহিতে চাঁদে,
কুমুদিনী উঠিল আকাশে।
সে রস দেখিতে শশী, ভূতলে পড়িল খসি,
খঞ্জন চকোর মিলে হাসে॥"

অস্য মর্ম্ম।

"রায় বলে আমি করী, তুমি কমলিনীশ্বরী,
বাঁধহ মৃণাল ভুজপাশে।
আমি চাঁদ পড়ি ভুমি, ফুল্ল কুমুদিনী তুমি,
উঠ মোর হৃদয় আকাশে॥
নয়ন খঞ্জন মোর, নয়ন চকোর তোর,
দুহে মিলে হাসিবে এখনি।
ঘাম হলে কুচগিরি, কাঁদিবেক ধীরি ধীরি,
করি দেখ বুঝিবে তখনি॥

বীনসের উক্তি।

[২৭]

"Fondling," she saith, "since I have hemm'd thee here
Within the circuit of this ivory pale,
I'll be a park, and thou shalt be my deer;
Feed where thou wilt, on mountain or in dale:
Graze on my lips; and if those hills be dry,
Stray lower, where the pleasant fountains lie.

"Within this limit is relief enough,
Sweet bottom-grass, and high delightful plain,
Round rising hillocks, brakes obscure and rough,
To shelter thee from tempest and from rain:
Then be my deer, since I am such a park;
No dog shall rouse the, though a thousand bark."

[২৮]

অন্বার্থ।

গজদন্ত সম, ভাতি অনুপম, দুই বাহু বেড়া প্রায়।
আদরে তোমারে, চারু মৃগাগারে, বদ্ধ করিয়াছি তায়॥
আমি মৃগালয়, তুমি রসময়, কুরঙ্গ স্বরূপ ধর।
শেখরে গহ্বরে, যথা ইচ্ছা করে, ওষ্ঠ গিরিপরে চর॥
যদি ওষ্ঠাধর, যুগ্ম গিরিবর, রসশূন্য হয় তায়।
তবে অনুরাগে, গেলে নিম্নভাগে, পাবে সুখ ফুহারায়॥
এই সীমা মাত্র, ওহে রসরাজ, বিশ্রামের দ্রব্য ভান।
আছয়ে প্রচুর, তৃণ সুমধুর, সুখপ্রদ উচ্চ স্থান॥
উন্নত বর্ত্তুল, গিরি স্থূল স্থূল, জঙ্গল তিমিরাবৃত।
ধারা বরিষণে, ঝড় প্রবহনে, রবে তথা লুক্কায়িত॥
প্রিয় বাক্য ধর, হও মৃগবর, আমা সম মৃগাগারে।
সহস্র কুকুরে, যদি বা ফুকুরে, তব কি করিতে পারে॥

রসতৃষ্ণাতুর মত্ত মাতঙ্গবৎ সুন্দরের আকর্ষণে অবিকচ পঙ্কজিনী বিদ্যা কহিয়াছিলেন,

"ক্ষম হে পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে।
[২৯] নব যৌবন বিক্রম * যোগ্য নহে॥
রস লাভ হবে রহিয়া ফুটিলে।
বল কি হইবে কলিকা দলিলে॥
রস না হইবে করিলে রগড়া।
অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া॥

ইউরোপীয়দিগের কাম দেবতার জননী প্রফুল্ল চির যৌবনবতী লীলারসবিহ্বলা বীনসের দ্বারা অজ্ঞাত-যৌবন এডোনিস্ আলিঙ্গিত হইয়া কহিতেছেন, যথা।

"Who wears a garment shapeless and unfinish'd?
Who plucks the bud before one leaf put forth?
If springing things be any jot diminish'd,
[৩০] They wither in their prime, prove nothing worth:
The colt that's back'd and burden'd being young
Loseth his pride, and never waxeth strong."

And again,—

"No fisher but the ungrown fry forbears:
The mellow plum doth fall, the green sticks fast,
Or being early pluck'd is sour to the taste."

অস্যার্থ।

অঙ্গহীন অপ্রস্তুত বস্ত্র কেবা পরে
অস্ফুট কুসুম কলী কে চয়ন করে॥

---

* মূল গ্রন্থে "জোরের" ইতি শব্দ আছে, কিন্তু তাহাতে ছন্দপতন দোষ হয় এই জন্য আমি "বিক্রম" শব্দ প্রয়োগ করিলাম।

কোন দ্রব্য পায় যদি অঙ্কুরে আঘাত।
শুখায় কোমল কালে, আশায় ব্যাঘাত॥
শিশুকালে অশ্ব যদি বহে গুরু ভার।
বল বীর্য্যবান্ কভু নাহি হয় আর॥

[৩১] অন্যচ্চ।

শিশু মীন ধরে নাকো ধীবর সকলে।
পাক! কুল আপনি খসিয়া পড়ে তলে॥
দৃঢ়রূপে লগ্ন ডালে অপক্ক বদরী।
আস্বাদনে অম্ল লাগে যদি ছিন্ন করি॥

আমারদিগের অসভ্য কবি ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন।

ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে।
রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে॥
বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে॥
রসিয়া পশিল ভ্রমরা কমলে॥

ইংরাজদিগের সুসভ্য কবি শেক্সপিয়র কহিতেছেন।

What wax so frozen but dissolves with tempering,
And yields at last to every light impression ?
Things out of hope are compass'd oft with venturing,
[৩২] Chiefly in love, whose leave exceeds commission :

অস্যার্থ।

কঠিন জমাট মোম গলালে গলিবে।
ছোঁবামাত্র তাই হবে যেরূপ গঠিবে॥
অসাধ্য সাধন হয় করিলে সাহস।
বিশেষতঃ প্রেমে, যার বিদায়েতে রস॥

এই ক্ষণে ভারতচন্দ্রের একটি প্রভাতী এবং শেক্সপিয়রের একটি সাঁজাই গাইয়া এই নির্লজ্জতার প্রস্তাব সাঙ্গ করি, যথা।

বিদ্যাসুন্দরের প্রভাতী।

আসি বলি বাসায় বিদায় হৈল রায়
কুমুদ মুদিল আঁখি চন্দ্র অস্ত যায়।
বিদ্যা বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ।
পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান
ও নয়ন চকোর ও মুখ সুধাকর।
না দেখে কেমনে রব এ চারি প্রহর।
[৩৩] বিরহদহনদাহে যদি রহে প্রাণ।
রজনীতে করিব ও মুখ সুধাপান।

বীনস্ এবং এডোনিসের সাঁজাই।

এডোনিসের উক্তি।

"Look, the world's comforter, with weary gait,
His day's hot task hath ended in the west;
The owl, night's herald, shrieks, 't is very late;
The sheep are gone to fold, birds to their nest;
The coal-black clouds that shadow heaven's light
Do summon us to part, and bid good night."

অস্যার্থ।

দেখ, জগতের সুখদাতা দিনপতি।
শ্রান্ত হয়ে পশ্চিমেতে করিতেছে গতি।
নিশাচর নিশাচর ডাকে, দিবা শেষ।
বিহঙ্গ বাসায় যায়, গোষ্ঠ ভেজে মেষ।

আকাশের আলো ঢাকে ঘনাসিত ঘন।
বিদায় হইতে তারা কহিছে বচন।

বীনসের উক্তি।

"Sweet boy," she says, "this night I 'll waste in sorrow,
For my sick heart commands mine eyes to watch.
Tell me, Love's master, shall we meet to-morrow ?
Say, shall we ? shall we ? wilt thou make the match ?

অস্যার্থ।

প্রিয় কিশোর, এ যামিনী মোর, যাতনায় গত হবে।
রোগী মম মন, প্রহরী নয়ন, কাযেই জাগিয়ে রবে।
বল প্রাণনাথ, হইলে প্রভাত, দেখা হবে পুনরায়।
হবে সন্দর্শন, সুখদ মিলন, কিম্বা যাবে বৃথায়।

এই ক্ষণে আমি আপনারদিগের সম্মুখে এক বাক্স [৩৫] রিয়েল লণ্ডন বেকেড্ সুইট্‌মীট্ এবং এক খুঞ্চে আসল কৃষ্ণনগুরে সরভাজা উপস্থিত করিলাম, আপনারদিগের অভিরুচি, যাঁহার যাহাতে ইচ্ছা, তিনি তাহাই গ্রহণ করুন, কিন্তু এই কথা যেন মনে থাকে, বিলাতী মেঠাই হজম করিতে ভাল কাষ্টিলিয়ন লাল জলের আবশ্যক, সরভাজা পাকে নির্ম্মল খড়িয়া নদীর এক পাত্র জলই যথেষ্ট হইবেক।

প্রিয় প্রতিযোগী যদ্যপি কহেন, ইংলণ্ডীয় কবিতা বৃদ্ধাকালে তপস্বিনী অর্থাৎ সদাচারশালিনী হইয়াছেন, কিন্তু এ কথা সপ্রমাণ হইবার নহে; আমরা যেমন ব্যাস বাল্মীকির পর কালিদাসকে মহাকবি বলিয়া মানি, ইংরাজেরাও সেইরূপ শেক্সপিয়র মিল্টনের পর লার্ড বাইরণকে মান্য করিয়া থাকেন, কিন্তু লার্ড বাহাদুরের লিখিত ডন্ জুয়ান্ কাব্যের

কিয়দংশ পাঠ করিলেই ইংরাজী কবিতার বিলক্ষণ সাধ্বীত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—কৈলাস বাবু কহিতে পারেন, ইংরাজী কবিতায় যেমন অধমতা আছে, তেমন উত্তমতাও সমধিক আছে, সত্য কথা, এ কথা লঙ্ঘন [৩৬] করিতে কে পারে? ফলে বাঙ্গালা কবিতায় অপকৃষ্টতা ব্যতীত উৎকৃষ্টতার অভাব বলিয়াই কি তাহা কোন কালে উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হইবেক না? যদি বালুকানির্ম্মিত সেতু দ্বারা স্রোতস্বতীর স্রোতঃ রুদ্ধ হয়, যদি নবীন নিবিড় নীরদ কর্তৃক দিনকরের খরতর কর প্রচ্ছন্ন হয়, যদি মণিময় পেটিকায় বদ্ধ বিধায় মৃগনাভীর মনোহর সৌরভ স্থগিত হয়; তবেই জানিব এবং মানিব, দৈবানুগ্রহরূপ কবিতাশক্তি পরাধীনতাশৃঙ্খলে জড়িতা হইয়া স্বীয় প্রভা প্রকাশে অক্ষম হইবেক।

বসু বাবু বিদ্যার রূপ বর্ণনের কিয়দংশ পাঠ ও তদনুবাদ করিয়া গত সভায় অতীব রহস্য রসোদ্দীপন করিয়াছিলেন, অতএব এই স্থলে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিদুল্লেখ করা কর্ত্তব্য; প্রতিযোগী অঙ্গহীনা বঙ্গভাষার যথার্থ ভঙ্গী অবগত আছেন কি না, সন্দেহস্থল; কিন্তু অনায়াসে বীর-সিংহবালা বিদ্যা বিনোদিনীর রূপ বর্ণনা পাঠ করিয়া তাঁহাকে ভয়ঙ্করী নিশাচরী ভাবিয়া থর থর কম্পিত কলেবর হইয়াছিলেন,—এই [৩৭] ক্ষণে উক্ত নিন্দিত বর্ণনার আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, যথা "নব নাগরী নাগর মোহিনী। রূপ নিরুপম সোহিনী॥ শারদ পার্ব্বণ, শীধু ধরানন, পঙ্কজ কানন মোদিনী। কুঞ্জরগামিনী, কুঞ্জবিলাসিনী, লোচন খঞ্জনগঞ্জিনী॥ কোকিলনাদিনী, গীঃপরিবাদিনী, স্ত্রীপরিবাদবিধায়িনী। ভারতমানস, মানস সারস, রাসবিনোদবিনোদিনী॥"—কৈলাস বাবু এই কতিপয় পংক্তির দোষ ধরিবেন, যদি ধরিতে পারেন, তবে আমি তদপেক্ষা ইংরাজ কবিদিগের অধিক দোষ দেখাইয়া দিব। অপিচ

'বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥" বিপক্ষ মহাশয় কহিয়াছিলেন, কেশের সহিত সর্পের তুলনা অতি ভয়ানক, তবেই বলিতে হইল, তিনি বেণী শব্দের অর্থাবগত নহেন, হিন্দু কামিনীগণ কালসর্পাকারে বিনোদ বেণী বিনাইয়া থাকেন, প্রিয় সখা কি তাহা দেখেন্ নাই. অহো দেখিয়াছেন বই কি? তবে বুঝি ইংরাজী [৩৮] বিদ্যাপ্রভাবে তেঁহ খাট খাট রাঙ্গা চুলের প্রিয় হইয়া থাকিবেন। "কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥" কৈলাস বাবু এই অত্যুক্তি ধরিয়া বিস্তর উপহাস করিয়াছিলেন, এবং শেক্সপিয়রের রোমীয় নায়কের জুলিয়েট্ নায়িকার রূপ বর্ণনায় অত্যুক্তি বিধানকল্পে কহিয়াছিলেন, প্রেমিকের মুখে প্রিয়তমার রূপ বর্ণনায় অত্যুক্তিপ্রয়োগ দোষাবহ না হইয়া গুণভাজন হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উক্ত মহাকবি স্বীয় উক্তিতে লুক্রিশিয়ার পয়োধরের সহিত দন্তিদন্তনির্ম্মিত যুগল ভূগোলের তুলনা করিয়া যদ্যপি নিস্তার পান, তবে অভাগা ভারতচন্দ্র কি জন্য এত গালাগালি খান? প্রেমিকের মুখে অত্যুক্তি রসদায়িকা বটে, কিন্তু নায়ক নায়িকাদিগের সহায়স্থলীস্বরূপা দূতীর মুখে তদুভয়ের রূপ গুণ বর্ণনায় অত্যুক্তি প্রয়োগ কোন মতেই অসঙ্গত নহে। সে যাহা হউক, ধরাস্থিত বিবিধ জাতির রূপানুভাবকতা শক্তি বিভিন্ন প্রকার, ভারতবর্ষে কটা চক্ষু, কটা কেশ এবং বরফের ন্যায় শ্বেতবর্ণ নিন্দনীয়, কিন্তু [৩৯] ইউরোপীয়দিগের নিকট তত্তাবৎ আদরণীয়, চীনদেশীয় লোকেরা অঙ্গুলের ন্যায় পদ এবং কুঁচের ন্যায় চক্ষু সুদৃশ্য জ্ঞান করে বলিয়া তাহারদিগের সৌন্দর্য্যানুভাবকতা শক্তি অপকৃষ্টতর বলা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বায়বেলের কবিত্ব অতি সুন্দর অলঙ্কার এবং যথার্থ মানসিক ভাবসমন্বিত বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু তদ্‌গ্রন্থের উপমা সকল অধিকাংশই

আমারদিগের নিকটে অতি জঘন্যতর বোধ হয়; সলোমন অর্থাৎ যাহাকে মুসলমানেরা স্থলেমান কহে, সেই মহাপুরুষের টপ্পা গীতাবলী যাহাকে খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর পরস্পর প্রেম প্রকাশ বলিয়া উল্লেখ করেন, ফলে চোর কবি-রচিত পঞ্চাশৎ শ্লোকের মধ্যে যেরূপ দ্ব্যর্থ অর্থাৎ একার্থ কালী পক্ষে, অন্যার্থ বিদ্যা পক্ষে হয়, স্থলেমানের টপ্পাতে তদ্রূপ দ্ব্যর্থ অন্বেষণ করা ব্যর্থ, এবং যদিও কোন২ স্থলে তাহা ঘটাইতে পারা যায়, তাহা কষ্টকল্পনা মাত্র; ইংরাজী উদ্ধৃত করা বাহুল্য হয়, এজন্য আমি বাঙ্গালা অনুবাদ কিঞ্চিৎ গ্রহণ [৪০] করিলাম, শ্রোতৃবর্গ বিবেচনা করুন, খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মপুস্তকে কিরূপ কবিতাশক্তি মূর্ত্তিমতী আছেন, যথা।—

"হে আমার প্রিয়ে, তুমি সুন্দরী ও তুমি পরম সুন্দরী; ঘোমটার মধ্যে তোমার চক্ষু কপোতের চক্ষুর ন্যায়, এবং গিলিয়দের পার্শ্বে চরে এমত ছাগপালের ন্যায় তোমার কেশ। এবং যে২ মেষী পুষ্করিণী হইতে ধৌতা হইয়া আগতা ও যমজবৎসবিশিষ্টা হয় এবং যাহাদের মধ্যে একও বন্ধ্যা নাই, এমত ছিন্নলোম মেষপালের ন্যায় তোমার দন্ত। এবং সিন্দূরবর্ণ সূত্রের ন্যায় তোমার ওষ্ঠাধর, ও তোমার বাক্য অতি মনোহর, ও তোমার ঘোমটার মধ্যস্থিত গণ্ডদেশ দাড়িম্বখণ্ডের ন্যায়। এবং অস্ত্রাগারের নিমিত্তে নির্ম্মিত এক সহস্র বলবানের ঢালবিশিষ্ট দায়ূদের দুর্গের ন্যায় তোমার গলদেশ। এবং শোশন্ পুষ্পের মধ্যে ভক্ষণকারী মৃগের দুই যমজ বৎসের ন্যায় তোমার দুই স্তন। * * * *

"হে রাজকন্যে, তোমার চরণপাদুকাদ্বারা কিবা শোভা [৪১] পাইতেছে! তোমার কটিমণ্ডল নিপুণ কর্ম্মকারদ্বারা নির্ম্মিত মণিময় হারস্বরূপ। এবং তোমার নাভিদেশ মিশ্রিত দ্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ এক গোল পাত্রের ন্যায়, এবং তোমার উদর শোশন্পুষ্পবেষ্টিত গোধূমরাশির

ন্যায়। এবং তোমার স্তনদ্বয় যুগলহরিণবৎসের ন্যায়। এবং তোমার গলদেশ হস্তিদন্তময় উচ্চগৃহের ন্যায়। এবং তোমার চক্ষু বৈৎরব্বীমের দ্বারের নিকটস্থ হিশ্‌বোণের সরোবরের ন্যায়, এবং তোমার নাসিকা দম্মেষকের সম্মুখস্থ লিবানোনের উচ্চগৃহের ন্যায়। এবং তোমার মস্তক কর্ম্মিল্‌ পর্ব্বতের ন্যায়, ও তোমার মস্তকের বেণী বাগুণীয়া রঙ্গের কেশবন্ধনীর ন্যায়। তোমার কেশবেশেতে রাজা বদ্ধ আছে।"

"হে প্রিয়ে, তুমি প্রেমদ্বারা সন্তোষ দিবার জন্যে কেমন সুন্দরী ও মনোহারিণী! তোমার দীর্ঘতা তালবৃক্ষের ন্যায়, ও তোমার স্তন তাহার ফলস্বরূপ। আমি কহিলাম, আমি তালবৃক্ষে আরোহণ করিব ও তাহার বাগুড়া ধরিব; এখন তোমার স্তন দ্রাক্ষাফলের গুচ্ছস্বরূপ ও তোমার নাসিকার গন্ধ তপুহ [৪২] ফলের ন্যায়। যে উত্তম দ্রাক্ষারস পান করা প্রিয়ের সুখদায়ক হয় ও তন্দ্রাযুক্ত লোককে কথা কহায়, তাহার ন্যায় তোমার কথা"—এই পর্য্যন্তই ভাল, আর কায নাই।

অনেকে কহেন, রায় গুণাকর অনেক স্থানে ভাব চুরি করিয়াছেন, কিন্তু ভিন্ন২ জাতীয় আদি কবিগণ ব্যতীত এই দোষ কোন কবিতে দৃশ্যমান না হয়, মহাকবি বারজিলের এবং মিণ্টনের কি এই দোষ নাই? ভারতচন্দ্র রায় মূর্খ কবি ছিলেন না, তিনি আপনিই স্থানে২ পরিচয় দিয়াছেন, সংস্কৃত এবং পারস্য শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, ফলতঃ সামান্য ধনচোরদিগের ন্যায় ভাবচোরদিগেরও সতর্কতা এবং কৌশলের আবশ্যকতা আছে, অপিচ এমত সকল প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে, মুল অপেক্ষা অনুবাদে অধিকতর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের প্রাবল্য হইয়াছে, অন্যে পরে কা কথা, ভারতচন্দ্র রায় কাশীদাসের মহাভারত হইতেও অনেক ললিত পদাবলী অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, আমি ভারত[৪৩]চন্দ্রের দোষের কথাই কহিয়া যাইতেছি, কিন্তু তিনি

যে প্রকৃত দৈবশক্তিমান্ কবি ছিলেন, তৎপ্রমাণে আমরা কিছুই কহিলাম না ; অতএব তদ্বিষয়ে কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে, যথার্থ কবির চিহ্ন যথার্থ বর্ণন অর্থাৎ কবি যে বিষয়ে বর্ণনা করিবেন, সে বিষয় পাঠ করিতে২ বোধ হইবেক, যেন তাহা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হইতেছে, "Thoughts that breathe and words that burn" ভারতচন্দ্র রায়ের গাথায় শ্বাস প্রবহন এবং ভাবজালে অনল প্রভবন হইয়াছে কি না, তাহা রতিবিলাপ এবং বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ প্রথম মিলনের পূর্ব্বাবস্থা পাঠ করিলেই প্রমাণীকৃত হইবেক, আমারদিগের ইয়ং বেঙ্গাল বাবুরা যদি বিলাতীয় বিজাতীয় কুসংস্কার এবং দ্বেষ মৎসরতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত বর্ণনা সকল পাঠ করেন, তবে তত্তাবতে লার্ড বাইরণের ন্যায় প্রখর ভাবসমূহ দেখিতে পাইবেন। কবিকঙ্কণের ন্যায় ভারতচন্দ্র রায় যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময়ের প্রচলিত দেশাচার প্রভৃতি যথার্থ-রূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার [৪৪] কাব্য সকলের বয়ঃক্রম অদ্য একশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তথাচ এই শতাব্দের মধ্যে অস্মদ্দেশের আচার ব্যবহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা মনে করিলে নয়ন-পথে অশ্রুধারার শেষ হয় না ! ভারতের শব্দসৌন্দর্য্য ভাবের মাধুর্য্য এবং রসের প্রাচুর্য্য ও প্রাখর্য্যের কথা অধিক কি বর্ণনা করিব, বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ সুমিষ্ট রচনা অদ্যাবধি আর দ্বিতীয় হয় নাই, ভারতের পদ্য পংক্তি পাঠকালীন বোধ হয়, যেন মধুকরনিকরের ঝঙ্কার হইতেছে, রায় গুণাকর বাঙ্গালা ছন্দে সন্তুষ্ট না হইয়া স্থানে২ ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূনক, তোটক প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ ঋণ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু অপার্য্যমানে স্থানে২ ছন্দপতন দোষ হইয়াছে, সংস্কৃত ছন্দাবলীর যতি অর্থাৎ বর্ণের লঘুত্ব গুরুত্ব রাখিয়া অন্য ভাষায় কবিতা রচনা করা অতি কঠিন কর্ম্ম,— ভারতচন্দ্রের বিষয়ে এতাবন্মাত্র উক্তি করিয়া অন্যান্য কবিদিগের প্রতি কিয়দুক্তি করিয়া প্রস্তাব সাঙ্গ করি।

উল্লেখিত প্রসিদ্ধ২ বাঙ্গালি কবি ব্যতীত বাঙ্গালা [৪৫] দেশে শতাবধি ব্যক্তি কবিত্বপ্রকাশে চেষ্টা করিয়াছেন, এতাবন্মধ্যে রামপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ, রামচন্দ্র, রামেশ্বর, এবং দেওয়ান রঘুনাথ রায়, রাজা রামমোহন রায়, নিধুবাবু, রামবসু ও রাধামোহন সেন, তথা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনুরাগ পাইয়াছেন, রামপ্রসাদ প্রকৃত কবির অনেক চিহ্ন দর্শাইয়াছেন, তৎকৃত গীতাবলীতে পৌত্তুলিক তান্ত্রিক কল্পনা সকল কল্পিত হইয়াছে, তথাপি তাহা কবিত্বশূন্য নহে, যেহেতু কল্পনাই কবিতার জীবনস্বরূপ হইয়াছে, তন্ত্রের কোন২ কল্পনা সুচারুতর রূপক ব্যতীত আর কিছুই নহে, বিশেষতঃ রামপ্রসাদী পদের স্থানে২ এরূপ বলবতী ভাষায় মনের কথা সকল কথিত হইয়াছে, কোথায় এপ্রকার সদুপদেশ সকল প্রদত্ত হইয়াছে যে, তদ্দারা তাঁহার দৈবশক্তির প্রতি কোন সন্দেহই থাকে না, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর যদিও ভারতের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় সুন্দরতর না হউক, ফলতঃ পঠনীয় বটে, তদ্ব্যতীত কালীকীর্ত্তনে তিনি বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্গাপ্রসাদের গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী কবিতারসের তরঙ্গিণী বটেন, কিন্তু সে [৪৬] তরঙ্গিণী সুরতরঙ্গিণীর ন্যায় প্রবলা না হইয়া ক্ষুদ্র এক নির্ঝরপ্রভূতা সুনির্ম্মলজলধারিণী কুলু২ শব্দকারিণী তটিনীর ন্যায় প্রবাহিত আছে; রামচন্দ্র এবং রামেশ্বরের কবিতা তেজস্বী জাঙ্গল লতার ন্যায়। দেওয়ান রঘুনাথ রায় অর্থাৎ যিনি অকিঞ্চন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহার গীতাবলীর মধ্যে কোন২ গীত এরূপ অনুতাপ ভাবোদ্দীপক এবং ঔদাস্য-জনক যে, কালী এবং তারা শব্দের পরিবর্ত্তে খ্রীষ্ট কিম্বা খোদা শব্দ প্রয়োগ করিয়া খ্রীষ্টানেরা ও মুসলমানেরা স্বচ্ছন্দে গান করিতে পারেন, দেওয়ান মহাশয় স্বয়ং গায়ক এবং গীতশাস্ত্রে পরিপক্ব ছিলেন, সুতরাং স্বরানুমেলকতাগুণে সুনিপুণ ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের কৃত

কতিপয় পরমার্থসংগীতে কবিত্বলক্ষণ ঈক্ষণ করা যায়, রাজা মহাত্মা কবিতার প্রতি মনোযোগ করিলে বাঙ্গালা ভাষার অনেক গণ্য কবি হইতেন, কিন্তু তিনি পদ্যলেখক হইলে আমরা তাঁহার নিকটে যে উপকার প্রাপ্ত হইতাম, তিনি গৌড়ীয় ভাষার আদি গদ্যলেখক এবং স্বদেশীয় লোকের চরিত্রসংশোধক হওয়াতে আমরা তদপেক্ষা সহস্রগুণ উপকার প্রাপ্ত [৪৭] হইয়াছি। রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধুবাবুর প্রেমরসের সংগীত সকল অধিকাংশই অপহৃতভাবে সংকলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ ব্যাকরণ-দোষও আছে, কিন্তু কোন২ টপ্পা এরূপ স্বভাবপূর্ণ যে, তাহাতে বিশেষ কবিত্ব প্রকাশও পাইয়াছে, নিধুবাবুর ভাষা সহজ প্রকার হওয়াতে তিনি অধিকাংশ লোকের প্রিয় হইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যা দেবী প্রকীর্ণ প্রভায় উদিতা হইলে তাঁহার আদর সমভাবে থাকা কঠিন হইয়া উঠিবেক; রামবসুর বিরহ কবিতায় এরূপ সুরস আছে যে, অনবরত শ্রবণপথে তাহা পান করিলেও তৃষা কৃশা হয় না। রাধা-মোহন সেন সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার কবিতা অথবা গীতে ছন্দ অলংকার অথবা ব্যাকরণের দোষ দৃষ্ট হয় না, তাহার সঙ্গীত সকল অধিকাংশই সংস্কৃত শ্লোক বা কবিতার অনুবাদ মাত্র। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কুকবি নহেন, সুকবিও নহেন, তদ্বিরচিত বাবুবিলাস বিবিবিলাস দূতীবিলাস গ্রন্থে ইয়ং বেঙ্গাল ওল্ড বেঙ্গালের যথার্থ চিত্র বিচিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার লেখাও প্রাচীন হইয়া পড়িল, [৪৮] যেহেতু তাঁহার জীবদ্দশাতেই কলিকাতার ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে, ধর্ম্মসভার গয়া গঙ্গা লাভ হইয়াছে, সভ্যতা এবং স্বাধীনতার পথ পরিমুক্ত হইয়া আসিতেছে, এই ক্ষণে আর গোবর ভক্ষণ, হুঁকা বারণ, বিষ্ণু স্মরণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের প্রথা প্রসিদ্ধ নহে, হিন্দু সন্তানগণ এবং স্বধর্ম্মত্যাগী খ্রীষ্টানেরা একাসনে উপবেশনপূর্ব্বক

দেশের মঙ্গলামঙ্গল বিষয় বিবেচনা করিতেছেন; অতএব কি আহ্লাদ! কি আহ্লাদ! এরূপ কাহার মনে ছিল যে, কলিকাতার স্বদেশীয় বিদেশীয় বিদ্বান্ লোকেরা একত্রে বসিয়া বাঙ্গালা কবিতার বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন? অতএব হে সভাস্থ মহোদয়গণ, হে দেশীয় ভ্রাতৃবর্গ, হে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা কবিতার বন্ধুবর্গ, আপনারা আর কালবিলম্ব করিবেন না, বাঙ্গালা কবিতা-হার যাহাতে সভাকণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হয়েন, এমত উদ্যোগ করুন, উর্ব্বরা ভূমি আছে, বীজ আছে, উপায় আছে, কেবল কৃষকের আবশ্যক, অতএব গাত্রোত্থান করুন, উৎসাহসলিল সেচন করুন, পরিশ্রমরূপ হল চালনা করুন, [৪৯] দ্বেষ প্রভৃতি জাঙ্গল কণ্টকবৃক্ষ উৎপাটন করুন, তবে ত্বরায় সুশস্যলাভ হইবেক, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! আপনারদিগের মধ্যে অনেকে অনায়াসে প্রাপ্য স্বদেশীয় শস্যকে ঘৃণা করিয়া বিলাতী ফসল ফলাইতে যান, অথচ বিবেচনা করেন না, যেরূপ বকুলবৃক্ষে আম্রমুকুল উদয় হয় না, সেইরূপ বাঙ্গালি কর্ত্তৃক ইংরাজী কবিতা অথবা ইংরাজ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা কবিতা রচনা অসম্ভব হয়, যদি বলেন—বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত এবং রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি বাবুরা যে সকল ইংরাজী কবিতা রচনা করিয়াছেন, সে সকল কবিতা কি কবিতা হয় নাই? উত্তর—হইয়াছে, হইবেক না কেন, অশ্বতর শব্দের অগ্রে কি অশ্ব শব্দ যোজিত নাই? উক্ত বাবুরা ইংরাজী কবিতা রচনা কল্পে যেরূপ আয়াস, যেরূপ পরিশ্রম এবং যেরূপ আকুঞ্চনের দাসত্ব করিয়াছেন, বাঙ্গালা কবিতা রচনায় যদ্যপি সেইরূপ আয়াস, সেরূপ পরিশ্রম এবং সেইরূপ আকুঞ্চন অথবা তাহার কিয়দংশের অনুবর্ত্তী হইতেন, তবে তাঁহারা গণ্যমান্য বাঙ্গালি কবি হইতে পারি-[৫০]তেন, এবং তাহা হইলে কত বড় আস্পর্দ্ধার বিষয় হইত? অদ্যতনী সভায় আমার এই এক পরম ক্ষোভের বিষয়

যে, প্রতিযোগীদিগের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে প্রস্তাববাহুল্য হইল, অতএব বাঙ্গালা কবিতার স্বরূপ বর্ণনা এবং ছন্দ প্রভৃতি বিষয়ে কোন উক্তি করিতে পারিলাম না, পুস্তকান্তরে এই ক্ষোভ নিবারণ করণের ইচ্ছা আছে। বাবু নবীনচন্দ্র পালিত গত সভায় বর্ত্তমান বাঙ্গালি কবিদিগের বিষয়ে যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আমার অধিক বক্তব্য নাই, যেহেতু যথার্থ কথা কহিলে বন্ধুবিচ্ছেদ হওনের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু একথা অবশ্যই বলিব, মনুষ্য বড় বিদ্বান্ হইলেই যদ্যপি বড় কবি হইতেন, তবে শেক্সপিয়র অপেক্ষা বেন্ জন্সন এবং কালিদাস অপেক্ষা বররুচি শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেন; পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার কাব্যশাস্ত্রের পয়োধিবিশেষ এবং প্রকৃত কবিত্ব অনেক লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু অস্মদ্ ক্ষুদ্র বিবেচনায় বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তদপেক্ষা অধিকতর কবিতাশক্তি ধারণ করেন, [৫১] বোধ করি ঈশ্বর বাবু বিদ্যা বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হইলে নবীন বাবু তাঁহাকেই অগ্রগণ্য করিতেন। অক্ষয় বাবুর কাব্যগ্রন্থ আমি দেখি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি, তেঁহ উক্ত কাব্যের জনকত্ব স্বীকারে অধুনা লজ্জিত হয়েন।

আমরা অদ্য যে মহাত্মার নামে প্রতিষ্ঠিত সভায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, সেই মহাত্মা বাঙ্গালা কবিতার একজন বিশেষ বান্ধব ছিলেন, তিনি মৃত্যুর কিয়ৎ মাস পূর্ব্বে এ অকিঞ্চনের প্রতি এবং অন্য এক বন্ধুকে এই বিষয় সম্পাদনার্থ স্বতন্ত্র২ রূপে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এই ক্ষণে কে আমারদিগকে উৎসাহ দিবেক? অতএব যে মহাশয় বাঙ্গালা দেশের, বাঙ্গালা ভাষার এবং বাঙ্গালা কবিতার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন, সেই মহাত্মা জন, এলিয়েট, ড্রিঙ্কওয়াটর বীটন ঈশ্বরসমীপে অনন্ত নির্ম্মলানন্দ সম্ভোগ করুন, এবং তাঁহার নাম ঘোষক, তাহার মত পোষক, সজ্জনমনস্তোষক এই বীটন সমাজ চন্দ্রাদিত্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকুক, ইহাই আমারদিগের ঐকান্তিকী প্রার্থনা।

সমাপ্ত।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে

হে বন্ধু, কল্পনা করি, শিশুকৃষ্ণ যশোদার কোলে,
বিগলিত স্নেহরস মার বুকে স্বতঃ উথলায় ;
দুয়ারে প্রতীক্ষা করে ক্রীড়াসঙ্গী গোপবালকেরা,
প্রাঙ্গণেতে ব্রজধেনু হানে ক্ষুর অধীর আগ্রহে,
গোঠের সময় হ'ল—প্রভাতেই গোধূলি-বিভ্রম !

বিমুগ্ধা জননী হেরে অকস্মাৎ শঙ্কিত বিস্ময়ে—
কোলের সন্তান তাঁর সঞ্জীবিত নিখিলের প্রেমে,
লক্ষ বাহু তার পানে স্নেহভরে নিত্যপ্রসারিত ।
হর্ষে মুদে আসে আঁখি, আনন্দাশ্রু ঝরে অবিরাম,
জননী কৃতার্থা—তাঁর একান্তই বুকের দুলাল—
তার মুখ চেয়ে আছে চরাচর পরম আগ্রহে ।

তোমারে বক্ষেতে পেয়ে ভাগ্যবতী মাতা বীরভূমি
নিভৃতে লালন করি সুগভীর সন্তান-সোহাগে—
অরণ্য কান্তার আর শস্যক্ষেত দিগন্তপ্রসারী
গুল্ম-নুড়ি-কঙ্করের লালমাটি ডাঙায় ডাঙায়
খোয়াই রচিয়া চলে ঝিরিঝিরি গিরি-নির্ঝরিণী,
উঠানে মরাই বাঁধা, লাউমাচা পালঙের ক্ষেত,
খড়ো কুটিরের গ্রাম—পুরাতন ইষ্টক-পঞ্জর,
ডোবায় বিস্মৃত-স্মৃতি অতীতের দীর্ঘিকা বিশাল,

শিবের দেউল কোথা, শ্মশানের দিগম্বরী দেবী,
শৃগালদেবতা আসে সুনির্দিষ্ট পূজার প্রহরে,
গ্রামশেষে হরিধ্বনি জেগে রহে চব্বিশ প্রহর,
বৈষ্ণবের আখড়ায় গ্রামান্তের বাউলেরা আসে।

পারে নি রাখিতে মাতা এরই মাঝে তোমারে ভুলায়ে,
দূরের ইসারা জাগে চোখে চোখে [illegible],
টানিল অজানা পথ—ঘণ্টাধ্বনি বল্লমের শিরে
গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ছুটে চলে ডাকহরকরা,
নিশীথে পেচক ডাকে, হাঁকে [illegible] টহলদারের।
এদেরই ইঙ্গিতে বন্ধু, তোমারে টানিয়া নিল দূরে,
মুছে গেল রসকলি, [illegible] জলসা-আসরে
ঘনায় জীবনরস নাইজীর নূপুর নিক্কণে
সারেঙ্গীর সুরে সুরে টলমল কাচের গেলাসে।

মাধবী-যামিনী শেষ, ভেঙে গেল সুখের আসর,
চৈতালীর ধ্বনি জাগে অট্টহাসি কালবৈশাখীর,
ভাঙিল পাষাণপুরী—হে বন্ধু, সে ঝঞ্ঝার প্রহারে
তুমি বাহিরিলে পথে, পথ ও পথিক চিরন্তন,
আজ আছে কাল নাই, অপরূপ বেদের ছাউনি,
গৈরিক সরণি শেষ সাপুড়ের বাঁশী বাজে দূরে।
হে বন্ধু, দেখেছ তুমি আগুন লেগেছে লোকালয়ে,
জ্বলিতেছে দাউ দাউ—দেবতা হাসিছে শান্ত হাসি,
নিরুদ্দেশ যাত্রা তব, মাতৃভূমি প্রতীক্ষা-ব্যাকুল।

পরিব্রাজকের ডায়েরি

কোলেদের দেশ

সিংহভূম জেলার একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। নিকটে একটি পার্ব্বত্য নদী, তাহারই কূলে নাকি এক অতি প্রাচীন কালে মানব বাস করিত। তখনও ধাতুর আবিষ্কার হয় নাই, পাথরের অস্ত্রশস্ত্র দিয়াই মানুষ নিজের সব কাজ চালাইত। সেই যুগের কিছু অস্ত্র এ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে শুনিয়া এখানে অনুসন্ধানের জন্য আসিয়াছি। সকাল হইতে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া দুইখানি চমৎকার কুঠার খুঁজিয়া পাইয়াছি, নীল কঠিন পাথরে তৈয়ারি, কি তাহার ধার, কি সুন্দর গড়ন!

সেই যুগের মানুষের কথা ভাবিতেছি। শুধু কুঠার কেন? ইহারা কি কেবল যুদ্ধই করিত? পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ইহাদের ছিল না? না, তাহা হয় না। হয়তো চাষবাসের যন্ত্রগুলি তাহারা কাঠের দ্বারা নির্ম্মাণ করিত, এখনও পৃথিবীর কোন কোন জাতি তাহা করিয়া থাকে। হয়তো পাথরের কুঠারগুলি অন্য কোনও উপায়ে ব্যবহার হইত, যাহা আমাদের এখন জানা নাই। যাক, বৃথা কল্পনা করিয়া লাভ নাই। এই রকম পাথরের অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে কত পরিশ্রম লাগে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।

নিকটে নদীর জল কলকলস্রোতে বহিয়া যাইতেছিল। দূরে অনাবৃত দেহে কয়েকজন কোল-রমণী স্নান করিতেছিল, কেহ বা পিতলের কলস মাটি দিয়া মাজিতে বসিয়াছিল। যাহারা স্নান করিতেছিল, তাহারা অনাবৃত দেহের আনন্দে হাসিতেছিল। আর দুইজন পরণের কাপড় পাথরের উপরে শুকাইতে দিয়াছিল। তাহাদের গায়ে শুধু ক্ষুদ্র কটিবস্ত্র ছিল বলিয়া পিছন ফিরিয়া কতক্ষণে কাপড় শুকায়, তাহারই

অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। জলে নামিয়া দুইখানি ভাল পাথর কুড়াইয়া ভাঙিতে বসিলাম। ঠক ঠক শব্দে ঠুকিয়া ঠুকিয়া যাহা গড়ি, তাহাকে কল্পনার সাহায্যেই বলিতে হয়, ইহা কুঠার, ইহা কোদাল। দেখিয়া বলে কাহার সাধ্য? তবু ছাড়িলাম না, ঠুকিতে ঠুকিতে মোটামুটি যখন একখানি অস্ত্রের মত পদার্থ গড়িয়া আনিয়াছি, তখন হঠাৎ শেষের আঘাতে তাহার অগ্রভাগ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। দুঃখ হইল বটে, কিন্তু প্রাচীন মানবের প্রতি আমার ভক্তি সহসা বাড়িয়া গেল। তাহাদের পরিপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর কুঠার তো আমার পাশেই রহিয়াছে! কতখানি পরিশ্রম, কত কৌশল এবং অভিজ্ঞতাই না ইহার পিছনে লুকাইয়া আছে! পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করিত বলিয়াই কি তাহারা অসভ্য? ধাতু ব্যবহার তখনও মানুষে শিখে নাই। কিন্তু যাহা জানিত, তাহার জন্য তো কম বুদ্ধি, কম অধ্যবসায় ব্যয় করে নাই!

অলস মধ্যাহ্নে এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম। দূরে মাঠ ধূ ধূ করিতেছিল। মাঘ মাসের শেষ, মাঠে আর ধান নাই, সব কাটা হইয়া গিয়াছে। কেবল নদীর পরপারে ক্ষুদ্র ক্ষেতে খেসারি ও ছোলার গাছ হইয়াছিল, সেখানে খড়ের সামান্য নীড় বাঁধিয়া একজন লোক পাহারা দিতেছিল। রাখাল-বালকেরা গরু-মহিষের পাল লইয়া জলের ধারে নামিয়া আসিতেছিল। তাহার মধ্যে একজন বাঁশের বাঁশীতে অতি সাধারণ একটি সুর বার বার সাধিতেছিল, সুরটির মিষ্টতার যেন আর শেষ নাই। নদীর ধারে কোথাও বা এক-আধটি কুলগাছ। কোল-রমণীগণ ইতস্তত জ্বালানি-কাঠ সংগ্রহ করিতে আসিয়া কুল পাড়িতে লাগিয়াছিল। একজন গাছ ধরিয়া নাড়া দেয়, পাঁচজনে তাহা কুড়াইয়া খায়। ইহারা বনের মধ্যে একা চলে না, দুই চারি জন একসঙ্গে যায়। বোধ হয়, একা যাইতে ভয় করে।

ওপারে যে ক্ষুদ্র গ্রামখানি দেখা যাইতেছিল, তাহার প্রান্তে গভর্মেণ্টের পাকা সড়ক চলিয়া গিয়াছে। একদল কোল-রমণী সেই পথে মজুরি করিয়া ফিরিতেছিল। রৌদ্রতপ্ত অপরাহ্নে তাহারা এক বৃক্ষের ছায়ায় বসিল। আমি পাথরের উপর বসিয়াই তাহাদের দেখিতে পাইতেছিলাম। 'সিংহভূমের অধিকাংশ অধিবাসী কোল হইলেও অনেক সময়ে বাংলা গান গাহিয়া থাকে। রমণীগণ ছায়ায় বসিয়া গান ধরিল। কি গান, ভাল বুঝিতে পারিলাম না; তবে দুই তিনটি পরিচিত শব্দ কানে ভাসিয়া আসিল—পিরীতি, কালা, রমণী। এই খোলা মাঠের দেশে, যেখানে দূরে বনে ভরা শ্যামল পাহাড়ের মালা দিগন্ত ঘিরিয়া আছে, সুরটি যেন সেখানে চারিপাশের সঙ্গে মিশিয়া যায়। অনেকক্ষণ তাহাদের টানিয়া টানিয়া গান গাওয়া শুনিলাম। পথ দিয়া একখানি মোটর-লরি যাত্রীর দল লইয়া ধূলা উড়াইয়া ছুটিয়া গেল। বোধ হয় কেহ রসিকতা করিয়া থাকিবে, রমণীগণের কলহাস্যে চকিত হইয়া উঠিলাম। তাহারা হাসিয়া উঠিয়া পড়িল এবং আবার পথ বাহিয়া চলিয়া গেল।

অলস দিবস পার হইয়া সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। জলের প্রান্তে নামিয়া আসিলাম। কত বিচিত্র রঙের পাথরের উপর দিয়া স্বচ্ছ জলধারা বহিয়া যাইতেছিল, তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। কোনটি লাল, কোনটির গায়ে সমান্তরাল কৃষ্ণরেখার মালা, জলের তরঙ্গে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। কোনটি বা নীলাভ, চতুষ্কোণ, তরঙ্গের আঘাতে তাহার নীল আভা যেন নৃত্য করিতেছে। পাথরগুলিকে কুড়াইয়া লইলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, হাতে লইতেই তাহাদের শোভা নিমেষে অন্তর্হিত হইল। তাহারা প্রাচীন স্থাণু পাথরের খণ্ডে পরিণত হইয়া গেল। কোথায় বা তাহাদের রূপ, কোথায় বা সেই রঙ!

কোলেদের জীবননাট্যের কথা ভাবিতে লাগিলাম। তাহারা আমাদের দেশের লোকের মতই পরিশ্রম করে, লজ্জা পায়, ভয় করে, গান গায়, বাঁশী বাজায়। সবই করে, কিন্তু জীবনের কলরবে তাহাদের সবই যেন সুন্দর দেখায়। সেই একই মানুষের মন, এখানেও যেমন, আমাদের দেশেও তেমনই, প্রভেদ কেবল প্রকাশের রীতিতে। আমরা লজ্জা পাই, ভয় শ্রম সকলই করি, কিন্তু স্পষ্টভাবে যেন সব কথা প্রকাশ করিতে পারি না। কোলেরা প্রকাশ করিতে ভয় পায় না। আনন্দ হইলে সে গান গায়, খেলার ইচ্ছা হইলে খেলে। আবার স্ত্রীর নাচগান পছন্দ না হইলে চেলা-কাঠ লইয়া তাহাকে তাড়া করে, স্ত্রী ভয়ে পলাইয়া যায়। কিন্তু তাহার প্রতি স্বামীর অনুরাগের আভাস পাইয়া পুলকিত মনে হাসে, ইহাও দেখিয়াছি। এই স্বচ্ছ প্রকাশেই ইহাদের জীবনকে আমাদের অপেক্ষা লীলায়িত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের জীবনের উপর দিয়া যেন স্বল্পতোয়া পার্ব্বত্য নদী মুখর শব্দে বহিয়া চলিয়াছে, আমাদের জীবনের অন্তস্তল যেন সভ্যতার গভীর জলে ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। তাহার না আছে গতি, না আছে স্বচ্ছতা। আবরণের ভারে আমরা নিষ্পেষিত হইয়া আছি, জীবনের অন্তরে যাহা ঘটিতেছে, তাহা ঋজু সরল ভাবে ভাবিতে বা করিতে আমাদের হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনের কথা ভাবিতে আর ভাল লাগিল না। নদী পার হইয়া মাঠ ভাঙিয়া প্রবাসের ঘরের দিকে ফিরিতে লাগিলাম। ওপারে গ্রামের প্রান্তে, নদীর কূলে দেখিলাম, কাহার একখানি নূতন সমাধি রচিত হইয়াছে। বোধ হয় কোনও নারী হইবে, তাহাকে উত্তর শিয়রে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। মাটি একান্ত কাঁচা রহিয়াছে, সমাধির উপরে কতকগুলি পাথর চাপানো, যেন শেয়াল-কুকুরে শবদেহ

লইয়া না যায়। আর তাহার উপরে একখানি দড়ির খাটিয়া পায়া ভাঙিয়া রাখা হইয়াছে। এই খাটেই নারীর দেহ শেষ প্রবাসের যাত্রায় আসিয়াছিল। কাছে একখানি কুলার উপরে লালপাড় শাড়ির ছিন্ন অংশ এবং কয়েকখানি হরিদ্বর্ণ পত্র সযত্নে সজ্জিত ছিল। আত্মীয়েরা হয়তো স্মৃতির উদ্দেশে বসন ও ভূষণের এই সামান্য আয়োজন নিবেদন করিয়া গিয়াছে।

মনটা ভারী হইয়া গেল। পথের উপর দিয়া ধীরে ধীরে ফিরিতে লাগিলাম। দূরে পাঁচ'ছয় জন লোক একটি বাঁশে এক মৃত গাভীর চারি পা একত্র বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছিল। আশ্চর্য্য হইবার কিছুই ছিল না। গাভীর মাথাটি নেতাইয়া পড়িয়াছিল এবং বাহকগণের অসমান গতির জন্য দুলিতেছিল। হয়তো অল্পক্ষণ আগেই ইহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু কাছে আসিতে হঠাৎ চমক লাগিল। গাভীটির পশ্চাদ্‌ভাগে অর্দ্ধপ্রসূত বৎসের দেহার্দ্ধ প্রলম্বিত হইয়া ছিল, তাহার মাথা ও একটি পা যেন বাহির হইবার বিপুল চেষ্টায় টান হইয়া হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম, এই অনাগত বৎসই মাতার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। বাহকগণের পশ্চাতে এক ব্যক্তি আসিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মর গয়া? সে আমার দিকে না চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিল, হাঁ বাবু, মর গয়া।

হায় রে! জন্ম এবং মৃত্যুর এই দুর্জ্ঞেয় পটভূমির সম্মুখে আমরাই বা কি, আর এই অবোধ জীবই বা কোথায়? দুইজনের মধ্যে প্রভেদ তো কোথাও নাই, ব্যথা তো দুইজনেই সমান পায়। মানুষে মানুষেই বা প্রভেদ কোথায়? কেহ বা ক্ষণেকের আনন্দে কলরব করিয়া উঠে, কেহ বা করে না। কিন্তু দুইজনের পিছনেই সেই একই অজ্ঞেয় পটভূমি, যাহার সম্মুখে জীবনের সকল লীলা আকাশের অন্ধকারের পটভূমিতে নক্ষত্রের মত জ্বলিতে থাকে এবং অবশেষে একদিন অন্ধকারের মধ্যেই ম্লান শীতল হইয়া যায়। প্রাচীন যুগের প্রাচীন মানব যেমন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, আমরা সবাই তো তেমনই একদিন ধরিত্রীর ক্রোড় হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব।

ভোলার সুবিধা

উপকার করি ভুলিবে পত্রপাঠ,
নতুবা নিত্য লেগে রবে ঝঞ্ঝাট।
মানুষ চায় না খাটো হতে কারো,
লইবে সে তুমি যত দাও পারো,
ফিরিবার পথে ও তরী দেয় না আঁট।

২

ক্রীতদাস ছিল মুক্তি দিয়েছ যার,
সেও চিনিবে না, তুমিও চিনো না আর
যাহারে যা দিবে দেওয়া শেষ হ'লে
বালিতে লিখিয়া মুছে ফেল জলে,
উসুল না হ'ক, হবে না উসুল ছাঁট।

৩

উপকার করি ভুলিলে তাহার কথা,
দিতে পারিবে না বেদনা কৃতঘ্নতা।
সেটাও একটা কত বড় লাভ
বোঝ নাকো তুমি সরলস্বভাব,
চেনা ঘোড়া হ'লে অধিক বাজিবে চাঁট

৪

যে শর বিঁধিবে না চেনাই সেটা ভাল,
ডাকাতের হাতে রূঢ়তর গৃহ আলো,
শুধাই তোমারে ওহে সুধীবর,
পড়ে যদি হবে সে কি প্রীতিকর,
তোমারি পৃষ্ঠে তোমারি চেলানো কাঠ?

৫

ভুলিয়া থাবার বিশেষ সুবিধা এই,
পাবে না যেটারে আগেই ভাবিবে নেই।
নতুবা হৃদয় করিতে শান্ত
পড়িতে হইবে গোটা বেদান্ত,
ভোলানাথ হ'ল বিশ্বের সম্রাট।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

When the peoples of the earth had decided what gifts they would ask of God, they gathered before His throne and made their requests.

The Latins said : "we want wisdom."
The English said : "we want the sea."
The Turks said : "Allah, give us the fields."
The Russians said : "Give us the mountains and the iron mines."
The Franch said : "Give us gold,"
The Germans said : "Give us weapons."

"National Zeitung," Basel.

The Indians said : "Give us—er—what ?
Give us non-violence."

কেন আমি লেখক নহি

প্রায়ই বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন অথবা পরিচিত মহল হইতে অনুরোধ আসে তাঁহাদের জীবনী হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া গল্প লিখিবার জন্য। হয়তো তাঁহারা নিজেদের সম্বন্ধে সত্য কথা শুনিতে চাহেন না, বা সত্য কথা সহ্য করিবার সাহস তাঁহাদের নাই, তাই গল্পের মধ্য দিয়া আত্মজীবনের খানিকটা মনোরম অংশ ও মনোহর কীর্ত্তি-কাহিনী শুনিবার বাসনা তাঁহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই বলেন, দোষে-গুণে মানুষ। দুর্বৃত্ততম মানুষের মধ্যেও এমন অনেক সদ্‌গুণ আছে যাহা ঋষি-তুল্য শ্রদ্ধেয়ের মধ্যে বিরল, আবার ঋষি-তুল্য ব্যক্তির অবচেতন মনের মালিন্য অসতর্ক মুহূর্ত্তে প্রকাশ হইয়া পড়িলে জঘন্য চরিত্রের ব্যক্তিকেও লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। মনস্তত্ত্বের অনেক জটিল ও দুরূহ তথ্য ইহাদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়; ফ্রয়েড ও হ্যাভেলক এলিসের কোটেশনে ইহারা দুরন্ত; কিন্তু হায়, সত্য কথা যে প্রিয় কথা নহে, এই সামান্য প্রবচনটুকু ইহারা মনে রাখেন না! অপরের সম্বন্ধে যে নির্ম্মম সত্যের প্রকাশ মনকে পুলক-বিহ্বল করিয়া তুলে, নিজের সম্বন্ধে সেই প্রকাশকেই অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া মনে হয় এবং লেখককে অনুরোধ করিয়া যাহা লিখাইয়া থাকেন, তাহার মধ্যে রূঢ় সত্যের ছায়া কিছু পড়িলে অভিমান বা ক্রোধের সঞ্চার হয়। অভিমান সব ক্ষেত্রে ততটা মারাত্মক নহে; কেন না, তাহা অহিংস। হিংসামূলক ক্রোধ অতি ভয়ানক। ইহা অগ্নির ন্যায় দাহ্য বস্তুকে পুড়াইয়া নিঃশেষ না করা পর্য্যন্ত সমান তেজমান থাকে। আসল কথা, অনুরোধে পড়িয়া বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বা

পরিচিতের চরিত্র চিত্রণ করিতে যাওয়ায় অনেকখানি বিপদ আছে। তাঁহাদের লইয়া স্তবমালা রচনা চলে, সত্যভাষণ চলে না। গল্পের মোড়কে মুড়িলে কি হয়; গল্পকে মিথ্যা ভাবিয়া কৌতুক উপভোগ করিবার মত সবল মন কোথায়? লেখককে জব্দ করিবার জন্য আইনের খড়্গ উচানোই আছে; তাই সাবধানী লেখক ভূমিকায় প্রায়ই লিখিয়া দেন, এই পুস্তকের সমস্ত চরিত্রই কল্পনাপ্রসূত। সাধারণ পাঠক কিন্তু অলীক কল্পনার পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু বাস্তব লইয়া বারবার করার অনেক অসুবিধা। একে তো আমাদের সঙ্কীর্ণতম জীবন, পরিধিতে বৃহত্তর জগতের স্বাদ বড় একটা মিলে না, ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন লইয়া কারবার। পল্লী-বর্ণনায় অতিশয়োক্তি ও শহর-বর্ণনায় প্রশংসা-কুণ্ঠতার দোষ প্রায়ই লেখনী আশ্রয় করে। যে যুদ্ধ-মহিমায় জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের দর্শন মিলে, আমরা সেই রণক্ষেত্রকে বহুযুগ অতীতের কুরুক্ষেত্র বা সমুদ্রতীরবর্ত্তী লঙ্কার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সুললিত পয়ার ছন্দের মধ্যে মাত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারি; হিন্দু-মুসলমান রাজত্বে যে সব যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যেও বহু অর্দ্ধসত্য ও পূর্ণমিথ্যার গৌরব-কাহিনী ছানিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়া পাঠকের মনোরঞ্জনে প্রয়াস পাইতে পারি, কিন্তু অতি-আধুনিক যুগের পাঠককে সেই 'না ঘরের, না ঘাটের' মোদকখণ্ড তুলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ মুখবিকৃতি করিয়া মাটিতেই নামাইয়া রাখিবেন। অথচ সৃষ্টির প্রেরণায় আমাদের হাত প্রতিনিয়ত উসখুস করিতেছে। ঝরণা-কলম কালিতে ভরা, সাদা কাগজ আকণ্ঠ পিপাসায় নিবের সূচ্যগ্রভাগে লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছে, আকাশে বর্ণের বিকাশ, ঋতুতে ঋতুতে সমারোহ এবং মনস্তত্ত্ব-রসায়নে অন্তর মন শক্তিশালী ও সক্রিয়, না লিখিয়া উপায় কি?

কিন্তু লিখিব কি? লেখার বিপদগুলি ভাবিয়া দেখিলে ঝরণা-কলম

দিয়া কালির প্রবাহ বহিতে চাহে না। যাহাদের লইয়া মনস্তত্ত্বের কারবার ফাঁদিবার বাসনা, তাহাদের মন আছে এবং নিঃসন্দেহে তাহা সক্রিয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ জগতে সেই ক্রিয়া-কলাপের নমুনা আমার জীবন-ধারণের সমস্যাকে যদি প্রতিনিয়তই আঘাত করিয়া চলে তো ঝরণা-কলম ঝরণার জলে (কিম্বা পুকুরের জলে) ভাসাইয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি ? একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, লেখক নির্ভীক না হইলে তাঁহার লেখনীধারণ অসার্থক। অত্যন্ত খাঁটি কথা এবং সত্য কথা। কাপুরুষতা লেখকের সাজে না। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে সমাজ আত্মীয়-স্বজন এমন কি প্রিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত অপরিহার্য্য। লেখকের জীবন হয়তো সাধকের জীবন, কিন্তু লেখকের সাধনা নির্জ্জন অরণ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলে না। লেখকের মস্তিষ্ক ও হৃদয় দুইই প্রখর হওয়া আবশ্যক : সংসার-আসক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-ক্ষমতার পরিচয় না দিলে, বাস্তব জগতে তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে কেহই যত্নবান হইবেন না। অথচ বাস্তব জগতের বিপদগুলি শুনুন। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে যাঁহাদের সহিত পরিচয়, তাঁহারা চিরকাল দোষগুণের অতীত। তাঁহারা প্রতিপালক ; বাক্য, অন্ন, জ্ঞান, বিদ্যা ইত্যাদি যত কিছু পার্থিব দানে মানুষকে শক্তিশালী ও সচেতন করার দরকার, তাহা শৈশব হইতেই স্নেহ ও কর্ত্তব্যের খাতিরে সামর্থ্যানুযায়ী অকাতরে (?) দিয়া আসিতেছেন। সুতরাং, তাঁহাদের ঋণভার মাথায় তুলিয়া তাঁহাদের পায়ের পানে না ঝুঁকিয়া আমাদের গত্যন্তর নাই। বাস্তব ক্ষেত্রে কলম ধরিয়া যদি দুঃসাহসীর মত তাঁহাদের যথাযথ চিত্র অঙ্কন করিতেই হয় তো তাঁহারা বিত্তশালী হইলে আমার ত্যাজ্যপুত্র হওয়া বিধাতাও রোধ করিতে পারিবেন না, মধ্যবিত্ত হইলে দৈহিক উৎপীড়ন কিছু ঘটিবেই এবং নিঃস্ব হইলে অভিশাপের অগ্নি প্রতিনিয়ত বর্ষিত হইতে

থাকিবে। এই সমস্তেও তত ভয়ের কারণ নাই, নির্ব্বাক বেদনার ভাষাকে আমার বড় ভয়। তাই তথাকথিত শ্রদ্ধেয় জনের চরিত্র লইয়া আলোচনা প্রথম হইতেই পরিত্যাগ করিয়াছি। বাবা-মায়ের পরই যাঁহাদের প্রভাব জীবনে অত্যন্ত প্রবল, তাঁহারা বন্ধু। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাদের লইয়াই জীবনের যত কিছু সম্পূর্ণতা। তাঁহাদের বাক্য, হাসি, বুদ্ধি ও হৃদয়ের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বিনিময় চলিতেছে; সুতরাং অনুরুদ্ধ না হইলেও তাঁহাদের জীবন যে উপকরণ হিসাবে আমার লেখার অত্যন্ত লোভের সামগ্রী, এ কথা অস্বীকার করি কি করিয়া! অথচ অন্তরঙ্গতার সুযোগ লইয়া যেই মাত্র অন্তরতম সুহৃদের গোপন কথাটি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তিনি মুখে আষাঢ়ের মেঘ নামাইয়া অন্তর-কপাট নির্ম্মম করেই রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। বন্ধুর ভালবাসায় যেখানে স্বার্থের সন্ধান মিলিয়াছে—সেইখানে আমি কপট, যেখানে ত্যাগের পরিচয় লেখা—সেইখানে আমি শক্তিমান। বুদ্ধি জিনিসটা মোটামুটি শুনিতে কর্ণরোচক, প্রতিভামণ্ডিত হইলে তো কথাই নাই, কিন্তু বিশ্লেষণে মর্য্যাদাহানিকর। চাতুরি, পাটোয়ারি, ধূর্ত্তামি ইত্যাদি নিম্নস্তরের জিনিসে মৌলিকত্ব থাকিলেও সে বর্ণনায় বন্ধুর মন বর্ষাকালের অমাবস্যা রাত্রির মতই হয়তো নিদারুণ হইয়া উঠিবে। স্নেহের ক্ষেত্রে বন্ধুকে যদি নির্ব্বোধ বলা যায়, অত্যন্ত উদারমনা হইলে অখুশি হয়তো তিনি নাও হইতে পারেন, কিন্তু পূর্ব্ববৎ প্রাণখোলা স্নেহ-রস উপভোগ করিতে পাইব কিনা সন্দেহ, অন্তত বুদ্ধিপ্রকাশের খাতিরেও তিনি সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য। বিদ্যার ক্ষেত্রে ইঁহাদের উপরে উঠিবার চেষ্টা করা বুদ্ধির পরিচায়ক নহে; বন্ধুত্বের পল্‌কা সূতার তো কথাই নাই, শক্ত কাছিও পট করিয়া ছিঁড়িয়া যায়। আশ্চর্য্য, ইঁহাদের সঙ্গে যত খুশি মনপ্রাণ বিনিময়ের মুহূর্ত্তে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ কর বা

তাঁহাদের দুর্ব্বলতা লইয়া পরিহাস কর, বুদ্ধিকে ধিক্কার দাও, বিদ্যাকে সঙ্কুচিত কর, স্নেহে স্বার্থের প্রকাশ দেখ, তর্কের খাতিরে হাতাহাতি কর, কিছুই স্থায়ী ফল প্রসব করিবে না; কিন্তু দুর্ব্বলতম মুহূর্ত্তের সামান্যতর পরিচয় যদি কাগজে কালির টানে রেখাপাত করিতে চাও তো বিপদের সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। পরম বন্ধু বিগড়াইলে যে চরম শত্রুকেও হার মানায়, এ কথা তো সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশের প্রবাদবাক্য।

অতঃপর আত্মীয়-স্বজন। যেবার ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়া দ্রুত স্থানত্যাগ করিতে পারি নাই, ফল বক্ষ্য হাতে হাতেই মিলিয়াছিল আত্মীয়-স্বজনকে তেমন হুলবিশিষ্ট ভীমরুলের সঙ্গে তুলনা করিবার সাহস আমার নাই, বরং মৌমাছির সঙ্গে তুলনা করিলে কতকটা মানায়; কিন্তু মধুর লোভ একেবারে ত্যাগ না করিতে পারিলে হুলের ভয় কাটানো দুষ্কর।

উহাদের পাশ কাটাইতে গেলে প্রতিবেশীদের সাক্ষাৎ মেলে। ইহারা আত্মীয়ও বটে, অনাত্মীয়ও বটে। ইহাদের সম্বন্ধে রুশ লেখকের উক্তিটুকু স্বতই মনে পড়ে।—

One can love one's neighbours in the abstract, or even at a distance, but at close quarters it's almost impossible.

কিন্তু আমার মতে প্রতিবেশীরা আসলে ভাল, তাঁহাদের সঙ্গে আয়নার তুলনা চলে। মাজিয়া ঘষিয়া যত্ন করিয়া রাখ, সে তোমার প্রতিমূর্ত্তিকে কোথাও অস্পষ্ট বা আবিল করিয়া তুলিবে না, ছাই দিয়া মলিন করিলে তোমারই ক্ষতি।

তবে ইহাদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া মধুরসম্পর্কীয়দের লইয়া কিছু লিখিতে বাধা নাই। যেমন ঠানদিদি, বউদিদি। একবার জনৈকা

ঠানদিদির হরিনামের ঝুলি ও পরচর্চ্চা-কীর্ত্তন লইয়া কিঞ্চিৎ চর্চ্চা করিয়াছিলাম, ফলে তিনি সম্পর্ক বজায় রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রখর রসনা-চালনার ফলে সাহিত্যের আবর্জ্জনা আমার মস্তিষ্ক হইতে প্রায় দূরীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ভাগ্যে শহরে দুই দশ দিন বাস করিবার স্থান ছিল, তাই রক্ষা।

বউদিদি আমার আধুনিকা নহেন, সাহিত্যের সংবাদ রাখার চেয়ে গৃহস্থালীর শৃঙ্খলা-বিধানকে বহু মূল্যবান জ্ঞান করেন। গল্প-উপন্যাস না পড়িয়াও তিনি যে সব স্থূল রসিকতা করেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিলে অধুনাবিলুপ্ত বাঙালী সমাজের সুন্দর চিত্র পাঠকের পক্ষে হৃদ্য হইবে বলিয়াই একদা ঐরূপ বাক্‌ভঙ্গির অনুকরণে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু হায়, এক মাস যাইতে না যাইতে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম, বউদিদি আমার সাহিত্য-ভক্ত হইয়া উঠিলেন। আমার পাতে সযত্নে রন্ধিত সুভোজ্য আর তেমন সমাদরে পরিবেশিত হয় না। আমাকে দেখিয়া রসিকতা করা দূরে থাকুক, পাশ কাটাইতে ব্যতিব্যস্ত হন। আমি যদি রসিক হইবার চেষ্টা করি, তিনি মুখ ভার করিয়া বলেন, থাক, আর কাজ নেই। আমরা মুখ্যু মানুষ লেখাপড়া জানি না, আমরা কি কথা কইবার যুগ্যি!

অনেক অনুসন্ধানের ফলে বউদিদির আলমারি হইতে কয়েকখানি পুরানো মাসিকপত্র উদ্ধার করিয়া সমস্যার সমাধান করিয়াছিলাম। উনি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিয়াছেন, আমাকে বুঝি বা সে পরিচয় ভুলিয়া যাইতে হয়। এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য জগতে কোথাও ঘটিয়াছে কি?

ভাবিলাম, দূর ছাই, বাড়ির লোক ও পাড়ার লোক ধরিয়া আর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিব না। কর্ম্মক্ষেত্রে সহকর্ম্মীর উপর কটাক্ষপাত

করাটা মন্দ কি? তাহাদের সঙ্গে দশটা পাঁচটার সম্পর্ক। তাহারা ক্ষুব্ধ হইলে জীবন হয়তো দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে না। রাগ করে, ঘরের অন্ন বেশি খাইয়া মুদির দেনা বৃদ্ধি করিবে · বড় জোর কথা কহিবে না, তাহাতে নির্ব্বিবাদে অফিসের কাজটুকু সুসম্পন্ন করিতে পারিব। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। যে দিকেই তাকাই—লেখার মশলার অত্যন্ত অভাব দেখি। ইহাদের জীবন লবণহীন ব্যঞ্জনের মত, পাতে সাজাইয়া রাখ, মন্দ দেখাইবে না, কিন্তু মুখে দিয়াছ কি পরিপূর্ণ এক গ্লাস জলের প্রয়োজন। Merry-go-round খেলার মত একটি সরলরেখাকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্ত রচনা করিয়া ঘুরিতেছে। সেই সাংসারিক অসচ্ছলতা, ছেলের অসুখ, কন্যাদায়, স্ত্রীর খিটখিটে মেজাজ, লটারির টিকেট, আলু-কপির দর-বর্ণনা, হিট্‌লার-মুসোলিনির মুণ্ডপাত ইত্যাদি ইত্যাদি। উহারই মধ্যে একজনের একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া মনে আনন্দ হইল। ইনি বড়বাবু, কেরানিকুলের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ দেবতা। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ইঁহার আচরণের অসামঞ্জস্য—মনস্তত্ত্বের একটি অলিখিত দিক অপূর্ব্ব হইয়া সারা মনের সঙ্গে ঝরণা-কলমটিকে পর্য্যন্ত নাচাইয়া তুলিল। হাঁ, চিত্রণোপযোগী চরিত্র বটে। ইঁহার মূলে মেঘ-রৌদ্রের খেলা তো প্রতিনিয়তই দেখিতেছি,—এই হাসি, এই হুঙ্কার। কাহাকেও সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া সদ্য মোক্ষ দিতেছেন, কাহাকেও নরকস্থ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। বিনা প্রয়োজনে অনেকে আসিয়া প্রত্যক্ষে লম্বা কুর্নিশের সঙ্গে স্তুতি নিবেদন করিতেছে, আবার পরোক্ষে অভিধান-বহির্ভূত ভাষায় অভিনন্দিত করিতেও ছাড়িতেছে না। সুন্দর চরিত্র, সুতরাং রঙের পোঁচ দেওয়া গেল। রঙের পোঁচ হয়তো বা গাঢ়তরই হইয়াছিল, সে মুখ অতঃপর sphinx-এর বলিয়াই মনে হইল; এবং সাহিত্যের কল্পধারা

এখানেও যে প্রবহমান, সে কথা বুঝিলাম বেতন-বৃদ্ধির সময়। সে যাহা হউক, প্রভুসম্পর্কীয়দের লইয়া খেলা করিবার প্রতিফল হাতে হাতেই মিলিল। চাঁদ সদাগরকে দেবী মনসা ইহার কত গুণ বেশি নাকাল করিয়া সম্মান আদায় করিয়াছিলেন জানি না, আমার তো মনে হয়, সে যুগে খানিকটা নিষ্ঠুরতা ও জিদের সঙ্গে খানিকটা দয়ার নমুনাও ছিল, এ যুগে যাহা বিরল হইয়া উঠিতেছে।

বড়বাবু যে আক্কেল-সেলামি দিয়াছেন, তাহাতে বড়তম কর্ত্তাদের লইয়া নাড়াচাড়া করিতে সাহস হয় না। অন্য দেশ হইলে রাষ্ট্রের সঙ্গে বোঝাপড়া চলিত, এখানে লালপাগড়িকে সভয়ে সম্মান না দিয়া উপায় কি? প্রেমের সঙ্গে রাজনীতির অহি নকুল সম্বন্ধ বলিয়াই শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক হইবার কামনায় শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হইবার অভিলাষ পোষণ করি নাই। সাহিত্যের বাগানে ফুল ফুটাইবার কাজ লইয়াছি; বড় জোর ফলের আস্বাদন লইতে পারি, কিন্তু গাছের গোড়ায় সার দেওয়া, মাটি কোপানো এ সব আমাদের সাজে কি? স্বাধীন দেশের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের উদ্যান-রচনার উদ্যম আছে; শক্তি, সাহস, নির্ভীকতা—কোন্‌টা নাই? তাঁহারা গাছটাকে শুধু জীয়াইয়া রাখিয়া নিরুদ্যম আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ক্ষুদ্র এবং বিবর্ণ ফুলের ফসল দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করেন না। তাঁহাদের সাহিত্য রাষ্ট্রকে নূতন করিয়া গড়িতেছে, আমাদের রাষ্ট্র সাহিত্যকে একটি কোণে কুণ্ডলীকৃত করিতেছে। সেই কুণ্ডলায়িত বৃত্তে নিরঙ্কুশভাবে যে চর্চ্চা সোৎসাহে ও সবেগে চালানো যায়, তাহা প্রেম। ভূমির প্রতি নহে, ভূমার প্রতিও নহে, স্বকীয়া বা পরকীয়া প্রীতি, যাহাতে সমাজকে নিষ্করুণ-ভাবে আঘাত দেওয়া চলে, শক্তিমান প্রাচীনদের মূল্যবান লেখাকে অনায়াসে অবজ্ঞা করা যায়, যত কিছু ভাল তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া প্রগতিবাদের মহিমার ধ্বজা সগর্ব্বে শূন্যে ঠেলিয়া তোলা যায়।

কিন্তু পরকীয়া-প্রীতি ছাড়া আর একটি বিষয় যেন আছে বলিয়া মনে হইতেছে। যাহাদের ক্ষোভে আমার হয়তো কোন ক্ষতিই হইবে না, সেই পতিতাদের লইয়া যদি কিছু লেখা যায়? মন্দ কি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার পূর্ব্বগামী বহু সাহিত্যরথী আলোকপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আলোকপাত করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, সে আলোক যেমন অস্পষ্ট, তাহার তলায় বা চারিদিকে তেমনই গাঢ় দুর্ভেদ্য অন্ধকার। তাঁহারা কলমের খোঁচায় পঙ্কিল পরিবেশটিকে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে, হাবভাবে ও কথাবার্ত্তায় যথেষ্ট পরিমাণে কৃত্রিমতা আনিয়াছেন। স্থান-বর্ণনা বা বৃত্তি-বর্ণনা ছাড়া সেই ম্লান ক্ষুধিত পতিত আত্মাগুলিকে যদি আমাদের সংসারের মধ্যে বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া সাজাইয়া রাখা যায় তো, এই গুলিকে আত্মীয়া বলিতে এতটুকু দ্বিধা আমাদের জাগিবে না। ইহাদের ক্ষুধার পরিমাণটা জানাইয়াছেন, হেতু নির্দ্দেশ করেন নাই। ফলে, সত্যকারের গোলাপে ও কাগজের গোলাপে যে তফাৎ, তাহাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণটুকুর মাত্র হুবহু নকল হইয়াছে, আর কিছুই হয় নাই। এই বিষয়ে আর একজন বিখ্যাত রুশ লেখকের কথা মনে পড়িতেছে।—

One must grow accustomed to this life, without being cunningly wise, without any ulterior thoughts of writing. Then a terrific book will result.

সুতরাং এ পথও আমার পক্ষে চিররুদ্ধ। এবং এই কারণেই চাষা ও শ্রমিক আন্দোলনকে পাশ কাটাইয়াছি।

কি করা যায়? ঘরের চেয়ে বাহিরের বিবাদ অধিক বুঝিয়া পুনরায় ঘরেই দৃষ্টিপাত করিলাম। আছে, আছে, লিখিবার বিষয় আছে। ঐ যে গৃহকোণে আবদ্ধ একটি প্রাণী নিঃশব্দে ছায়ার মত দুঃখ-দৈন্যের বোঝা হাসিমুখে মাথায় তুলিয়া শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনা সহিয়া উদয়াস্ত

খাটিয়া মরিতেছে ; বাহিরে অপমানিত হইয়া যাহার উপর তর্জ্জন করিয়া প্রভুত্ব ফলাইতেছি; যাহাকে ভাল জিনিস কিনিয়া দিবার অক্ষমতায় ত্যাগধর্ম্ম শিখাইতেছি ; সন্তানের বোঝা মাথায় তুলিয়া দিয়া মাতৃত্ব-মহিমায় মণ্ডিত করিয়া দেবী বানাইয়া পরম দুঃখেও চরম সুখ উপভোগ করিতেছি, সেই সর্ব্ব কর্ম্ম ও ধর্ম্মের অংশভাগিনী যে বিদ্যমান। ছাই ফেলিতে এমন ভগ্ন কুলা আর কোথায় মিলিবে ?

দুঃখে না পড়িলে সে কি হইতে পারিত, স্ত্রী না হইলে তাহার মধ্যে পরকীয়া-রস কিরূপে উদ্বেল হইয়া উঠিতে পারিত, এক কথায় কল্পনার পুষ্পকরথে চাপাইয়া তাহাকে আমার মানস-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিলাম। ছবি যা আঁকিলাম, নিজেরই বয়স অন্তত কুড়ি বৎসর কমাইয়া আনিলাম। কলেজ, ককটেল, সিগ্রেট, রেন্ডেভোঁ, সিনেমা, নুডিজিম, কম্প্যানিয়নেট ম্যারেজ, লেক, বান্ধবী, বেবি অস্টিন, বালিগঞ্জ ইত্যাদি আধুনিক ও তরুণ হইবার যত কিছু উপকরণ হাতের কাছে পাইলাম, সযত্নে আঁকড়াইয়া ধরিলাম। কিন্তু একচক্ষু হরিণের মত দিক্‌নির্ণয়ে আমার ভুল হইল। গৃহকোণের নিরীহ প্রাণীটি অসহযোগ করিয়া বসিলেন। তিনিও কি সাহিত্য-রসিকা হইয়া উঠিলেন ? সর্ব্বনাশ ! পাড়া-প্রতিবেশীরা কি ভয়ানক বস্তু এতদিনে বুঝিলাম। আমার কল্পনার পক্ষচ্ছেদে তাহারা সাংঘাতিকভাবে পরামর্শ দিয়াছে। স্ত্রীকে বুঝাইয়াছে, এতদিনে তাহার কপাল ভাঙিয়াছে। একান্ত অনুগত ও পরম বিশ্বাসী জন বুঝি বা এমন বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হইয়া গেল, যাহার তুলনায় ইতিহাসের সব কয়টি পূর্ব্বসূরির নাম ম্লান হইয়া যাইবে। হতাশ হইয়া চারিদিকে চাহিলাম। তবে কি মজ্জমান ব্যক্তির কোন অবলম্বনই নাই ? ঝরণা-কলম কি ঝরণার (অভাবে পুকুরের) জলেই ভাসাইয়া দিব ?

করজোড়ে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া মনে মনে আকুল কণ্ঠে আবৃত্তি করিলাম, হে ঈশ্বর, তবে কি কোন উপায় নাই ?

সহসা গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, আছে।

স্পন্দিত বক্ষে ও কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, কি উপায় ?

গম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনি উঠিল, উপায়—আমি।

মূঢ়ের মত ফাঁকা আকাশের পানে চাহিয়াই রহিলাম, অর্থ বুঝিলাম না।

গম্ভীর মৃদু কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, উপায়—আমি। আমাকে লইয়া যে তর্ক অনাদিকাল হইতে চলিতেছে, সেই অমীমাংসিত তর্ক-সভায় যোগদান কর। ধর্ম্মকে লইয়া (অবশ্য পরধর্ম্ম নহে, তাহাতে জীবন-হানির সুযোগ যথেষ্ট) যাহা খুশি লেখ, প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই।

গ্রীক দার্শনিকের মত উলঙ্গ হইয়া 'ইউরেকা' শব্দে আর্ত্তনাদ তুলিয়া রাজপথে না ছুটিলেও কলমটি দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিতেছিলাম, কিন্তু ধর্ম্মকে পরমুহূর্ত্তে ততখানি বে-ওয়ারিস ভাবিতে পারিলাম না। ধর্ম্ম—যাহা ধারণ করেন, তাহা হয়তো নিরাপদ, কিন্তু ধর্ম্মকে যাঁহারা বহন করিয়া ফিরিতেছেন, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপের অহিংসত্ব সম্বন্ধে আমার সন্দেহ যথেষ্টই আছে।

ভাল খরিদ্দার পাইলে ঝরণা-কলমটি বিক্রয় করিয়া দিব, স্থির করিয়াছি।

শ্রীঝটকেশ্বর শর্ম্মা

The reasonable man adapts himself to the world ; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.

G. Bernard Shaw

রিক্‌শ

আজকাল কলিকাতার তো কথাই নাই, ছোট ছোট শহরেও রিক্‌শ দেখিতে পাওয়া যায়। এক কলিকাতাতেই ৪৫৬৭খানি রিক্‌শ ও ৮৯৫৬ জন রিক্‌শ-টানা কুলী আছে। যদি বলেন, মহাশয়, রিক্‌শ তো একজন লোকেই ট্যানে, তবে ৪৫৬৭খানি রিক্‌শর জন্য ৮৯৫৬ জন কুলী হইল কি করিয়া? তবে আমরা উত্তরে বলিব যে, আপনি রিক্‌শ টানাই দেখিয়াছেন, বড় জোর চড়িয়াছেন দুই এক বার, কিন্তু আসল ব্যাপার কিছুই জানেন না। নূতন রিক্‌শ কিনিতে ৪০০।৪৫০ টাকা লাগে; তার পুলিস লাইসেন্স, মিউনিসিপ্যাল লাইসেন্স ইত্যাদিতে বছরে বছরে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। আর রিক্‌শ মেরামতি, রঙ ইত্যাদি ব্যাপারেও বছরে কিছু যায়। ৬।৭ বৎসরে রিক্‌শ একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া যায়। সুতরাং যে সে লোকে রিক্‌শ কিনিতে পারে না, ধনী রিক্‌শওয়ালা রিক্‌শ কিনিয়া কুলীকে ভাড়া দেয়। সকাল হইতে বেলা ২টা।৩টা পর্য্যন্ত একজন কুলী, আর ২টা।৩টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত আর একজন কুলী রিক্‌শ টানে। প্রত্যেক রিক্‌শতেই যে ২ জন করিয়া রিক্‌শ-কুলী আছে তাহা নহে। ২।৪ জন রিক্‌শ-কুলী টাকা জমাইয়া নিজেরাই রিক্‌শ কিনিয়াছে।

দেখি, তাহা
শেষভাগে
ৎসর মোট
নে ১৯১৮
n ক্লালকে

কলিকাতায় আলোকসজ্জা হয়। সেই সময় আমরা সর্ব্বপ্রথম রিক্‌শ চড়ি ও রিক্‌শতে করিয়া আলোকসজ্জা দেখিয়া বেড়াই। রিক্‌শ চড়া কিছুদিন ফ্যাশন ছিল। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান —বাবু, ওরফে ধববাবু, মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড পরিদর্শন উপলক্ষে মিউনিসিপ্যাল-রিক্‌শ চড়িয়া যাতায়াত করিতেন। ক্রমে রিক্‌শর মান কমিতে লাগিল। ইংরেজী ১৯২৫।১৯২৬ সালে যখন থার্ড ব্যাটল অব গ্যাঁড়াতলায় গুণ্ডারা হারিয়া গেল, রিক্‌শ মধ্যমশ্রেণীতে নামিল, আর এখন (অর্থাৎ ইং ১৯২৮।১৯২৯ সালে) ইহা নিম্নশ্রেণীতে নামিয়াছে। শিয়ালদহের মাছের গাড়ি হইতে জেলেরা পাইকারি দরে মাছ খরিদ করিয়া রিক্‌শতে মাছের ঝাঁকা বসাইয়া বরাহনগর কাশীপুর প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করেন। ধোপায় কাপড়ের গাঁট লইয়া তাহার উপর বসিয়া যায়। মা সরস্বতীকে রিক্‌শ চড়িয়া ১০।১২ মাইল দূর স্থানেও যাইতে দেখিয়াছি। সময়ে সময়ে রিক্‌শ কেবলমাত্র মাল-টানা রিক্‌শতে পরিণত হইয়াছে, ইহাও আমরা দেখিয়াছি।

রিক্‌শ বড় নিরীহ যান। ইহাতে চাপিলে অ্যাক্‌সিডেণ্ট বা দুর্ঘটনা হইবার সম্ভাবনা খুব কম। এয়ারোপ্লেনের তো কথাই নাই, এই সেদিন মাঝেরহাটের এয়ার ডিস্‌প্লেতে একখানি এয়ারোপ্লেন উল্টাইয়া ৩॥ জন আরোহীর 'চড়াই উল্টাইয়া দিল'। আজকাল রেলে যাওয়া আদৌ নিরাপদ নহে। একমাত্র পূর্ব্ব-ভারতীয় রেলপথে এক বৎসর এক মাসের মধ্যে বার বার পাঁচ বার রেল উল্টাইয়া ৫৫৫ জন হত বা আহত হইল। মোটরের তো কথাই নাই, শতকরা ১॥টি করিয়া অ্যাকসিডেণ্ট হইবেই হইবে। কলিকাতার গাড়োয়ানেরা যেরূপ নির্ভয়ে ঘর্ঘর ঝরঝর রবে দিক্‌মণ্ডল নিনাদিত করিতে করিতে গাড়ি চালায়, তাহাতে এই অধম লেখকের একবার প্রাণসংশয় হইয়াছিল, তিনি সেই

অবধি ঐ গাড়ি চড়া সভয়ে ছাড়িয়া দিয়াছেন। লেখক কিন্তু হিন্দুসভায় বছরে সওয়া পাঁচ আনা চাঁদা দেন বলিয়া—প্রেসের আঞ্জুমানিয়া ইস্‌লামিয়ার সম্পাদক বাবর্‌ মিঞা উহা কম্যুনালিজ্‌ম বলিয়া অভিহিত করেন।

আর জলযানের তো কথাই নাই। সামান্য নৌকায় চড়িয়া গঙ্গা পার হইবার সময় সম্রাট শাজাহানের পুত্র শাহস্‌জা—'এক ইঞ্চি তক্তার নীচে অগাধ জল' বলিয়া নদী পার হন্‌ নাই, ফলে আক্‌মহলের যুদ্ধে মুর্শিদকুলীখাঁর নিকটে পরাজিত হন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ বিষয়ে বৈদিক যুগের গাওয়া গাড়ি, অর্থাৎ বাংলার গরুর গাড়ি বড় নিরাপদ যান। কিন্তু তাহা নহে। গরুর গাড়ি চাপা পড়িয়া মানুষ আহত হইলে তাহাকে ১৮৬১ খ্রীঃ অঃ-এর ৫ আইনের ৩৪ ধারামতে ৫ টাকা জরিমানা দিতে হইবে।

কিন্তু এ যাবৎ বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র পড়িয়া রিক্‌শ চাপা পড়িয়া মানুষ মরার কথা জানিতে পারি নাই।

এইবার আমরা রিক্‌শর ইতিহাস লইয়া কিছু বলিব। রিক্‌শ চীনাদের আবিষ্কৃত যান নহে। চীনারা রিক্‌শ আবিষ্কার করিয়াছে এক হাজার বৎসর, এ কথা সত্য। কিন্তু চীনারা ইহা পাইল কোথা হইতে? আর ইহার নাম রিক্‌শই বা হইল কেন? আসলে ইহা ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট নহুষের আবিষ্কৃত; আর সে কতদিন আগে তা আমরা সঠিক বলিতে পারিব না। তবে 'পুরাণ-প্রবেশ'কার গিরীন্দ্রশেখরবাবুকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি নহুষের সময় খ্রীঃ পূঃ ১৫,০০০ বৎসর হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। Statistical Laboratory-তে এই সম্বন্ধে গবেষণা হইয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, নহুষের সময় ১৫,০০০ $(১+\cdot০০০০২\sqrt{-১}\times S_0 - S_5)$ অর্থাৎ

৯৮৭,৬৫৪,৩২১,০০০,০০০,০০০ দণ্ড পূর্ব্বে। নহুষ যখন স্বর্গের ইন্দ্রত্ব-পদ পাইলেন, তখন তিনি মুনিঋষিদের দ্বারা বাহিত যানে চাপিয়া স্বর্গের এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাইতেন। ইহাতে আজানুলম্বিতদাড়ি (কাহারাও আবার আপালম্বিতদাড়ি) ঋষিদের বড়ই কষ্ট হইত। এই ঋষি-বাহিত যানই কালক্রমে রিক্‌শতে পরিণত হইয়াছে (ইহাই ভাষাতত্ত্ববিৎ ডাঃ স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত; আর এ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কাশ্যপের মুখেও তিনি এইরূপই শুনিয়াছেন।) স্বর্গের রিক্‌শ। কিন্তু একজন ঋষিতে টানিতেন না।

মহাভারত পুরাণাদি পাঠে আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, সাধারণত চারজন ঋষিতে রিক্‌শ টানিতেন, তবে সময়ে সময়ে ইহার অধিক ঋষিতেও টানিতেন। রিক্‌শ যে একজনের বেশি লোকে টানে, ইহা আমরা স্বচক্ষে, ভারতের ভাগ্যবিধাতারা যেখানে গ্রীষ্মকালে বিচরণ করেন, সেই সিমলা-শৈলে দেখিয়াছি। সেখানে সাধারণত দুইজনে রিক্‌শ টানে। আবার সময়ে সময়ে পাহাড় চড়াই-উৎরাইতে চারজনে রিক্‌শ টানে বা রিক্‌শ ঠেলে। চারজনের বেশি লোককে রিক্‌শ টানিতে বা রিক্‌শ ঠেলিতে আমরা দেখি নাই। যদি সমুদ্রতল হইতে ৬,৫০০ ফুট উচ্চ সিমলাশহরে চারজনে রিক্‌শ টানে, তাহা হইলে স্বর্গে যে সময়ে সময়ে ইহার বেশি লোকে রিক্‌শ ঠেলিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

মোট কথা, রিক্‌শ আমাদের ভারতের নিজস্ব জিনিস। ভারতেরই একজন রাজা, যিনি মধ্যে স্বর্গের ইন্দ্রত্ব-পদ পাইয়াছিলেন, তাঁহার স্বর্গরাজ্য ইন্‌স্পেক্‌শন করিবার জন্যই ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

"যমদত্ত"

তুবড়ি ও ঝরণা

তুবড়ি বলিছে, আমি আলোকের ঝর্ণা,
অরূপের আমি রূপরঙ্গ,
রঙ্গিন মোর গতি রামধনু-বর্ণা,
উৎসব যাচে মোর সঙ্গ।

২

আলোকের হাসি আমি, আলোকের নৃত্য,
করি শত তারকার সৃষ্টি,
করি রূপ-রসিকের বিমোহন চিত্ত,
চলি তার চঞ্চলি দৃষ্টি।

৩

উজ্জ্বল জীবনের ধারা আমি তুবড়ি,
নাই তমঃ মোর জ্যোতি-বর্ণ্যে,
উর্ব্বশী রূপসীর প্রসাধন-চুবড়ি—
তুলনা আমার নাই মর্ত্ত্যে।

৪

রূপ কোথা ঝর্ণার, কোথা বৈচিত্র্য,
শুধু জলো জলসার ছন্দ,

শক্তি সে কোথা পাবে ? বল দেখি মিত্র,
পলে পলে উপলে যে বন্ধ !

৫

কবি বলে, তুমি শুধু আলোকের তুড়ি ত—
দেখিতে দেখিতে লীলা অস্ত ;
তার দান দিকে দিকে হয় বিচ্ছুরিত,
তার ভাণ্ডার অফুরন্ত ।

৬

সহজেই ফেটে তুমি মর মেটে গর্ব্বে,
বারুদের ফিন্‌কুটি বন্দী ;
মহাকাল জেনো তারে, মাথা পেতে ধরবে,—
ধারা চির-সুধানিস্যন্দী ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

There are few subjects, outside sex, religion, and politics, on which such nauseating nonsense is talked as folk-music. Let us beware of assuming that the traditional airs bawled out by the village idiot in his cups are going to change the whole theory of melody.

Stephen Williams

তরুণায়ন

আমার সব-চাইতে ইণ্টারেস্টিং কেস ঘটেছিল, ডাক্তার অর্দ্ধেন্দু বোস বললেন, এই কলকাতাতেই।

বড় ছেলে অনুপমের দশম জন্মতিথি। রাত দশটার পরে নিমন্ত্রিতেরা সবাই চ'লে গেলেন, বাকি রইলেন যাঁরা, তাঁরা আজ যাবেন না। বাড়ির সামনেকার লনে ঈজিচেয়ার বার ক'রে আড্ডা বসল; অর্দ্ধেন্দু, তাঁর স্ত্রী সুনীতি, সুনীতির বোন সুরুচি, সুরুচির স্বামী প্রভাত—পাটনার ব্যারিস্টার, আর বোনেদের ভাই তপেন—মেডিক্যালে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র।

সুরুচি বললেন, অর্দ্ধেন্দুবাবু, একটা গল্প বলুন। শুনেছি, আপনি খুব ভাল গল্প বলেন।

অর্দ্ধেন্দু বললেন, বলি না। তোমাকে যে বলেছে, সে লোক ভাল নয়।

সুরুচি বললেন, দিদি বলেছে।

অর্দ্ধেন্দু খাড়া হয়ে উঠে বসলেন। চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, বিশ্বাস ক'র না।

সুনীতি বললেন, তার মানে? তুমি আমাকে মিথ্যেবাদী বলছ?

অর্দ্ধেন্দু। না, অত্যুক্তিকারিণী বলছি।

সুরুচি। ছি ছি।

অর্দ্ধেন্দু। ছি-ছির কিছুই নয়। পতিব্রতা নারীমাত্রেই স্বামীর গুণপনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অত্যুক্তি ক'রে থাকেন। সেটা সদ্গুণ। কিন্তু তার সবটা বিশ্বাস করলে ঠকতে হয়।

প্রভাত। আপনি তা হ'লে স্বীকার করছেন যে, গল্প ওঁকে আপনি বলেন। শুধু সেগুলো উনি যতটা ভাল বলছেন, আপনার মতে ততটা ভাল হয় না। এই তো?

অর্দ্ধেন্দু। রাইট। গল্প বলি—বলি বললে ঠিক বলা হ'ল না, বলতাম। তবে সেগুলো ভাল হয় না।

সুরুচি। তা হোক, ভালমন্দ আমরা বুঝব। আপনি বলুন।

অর্দ্ধেন্দু। ঐ যে বললাম, গল্প আর আজকাল বলি না।

সুরুচি। আচ্ছা, সেই পুরোনো গল্পই বলুন।

অর্দ্ধেন্দু। বলব না। কারণ, প্রথমত, সুনীতিকে যে সব গল্প তখনকার দিনে শোনাতুম, সে তোমাকে শোনাতে গেলে প্রভাতের চটবার কথা। দ্বিতীয়ত, যে বয়সে সে গল্প বলা যায় ও শোনা চলে, সে বয়স আমার আর নেই, তোমারও সে বয়সটা বোধ করি পেরিয়ে—

প্রভাত। ফোর নাইন্টিনাইন।

অর্দ্ধেন্দু। যাওয়া বারণ। তৃতীয়ত, সে সব এখন ভুলেও গেছি। রুগী আর মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে, কাব্যকলা ওগায়রহ যত রকমের রসের ছিটেফোঁটা প্রাণে এককালে ছিল, তার সবটুকু নিঃশেষে উবে গেছে। এখন শয়নে স্বপনে একমাত্র চিন্তা—কেস। তার বাইরে আর কিছু ভাবতেই সময় পাই না তো গল্প বলা। চতুর্থত, সংসারে যে সব বস্তু নিয়ে গল্প বলা যেতে পারে, ভূত অ্যাড্‌ভেঞ্চার বা প্রেম, এর কোনটারই স্টক আমার নেই। ভূত দেখি নি, অ্যাড্‌ভেঞ্চারের মধ্যে হয়েছিল বিলেত যাবার সময় সী-সিকনেস, আর প্রেমের কথা বইয়েই পড়েছি।

সুরুচি। দিদি, সত্যি?

অর্দ্ধেন্দু। দিদি? কিন্তু সে নিয়ে গল্প হয় না। ওটা রিজার্ভ্‌ড্‌ স্যাব্‌জেক্ট, অপরের অশ্রাব্য ও অপরের সাক্ষাতে অকথ্য অনুচ্চার্য্য।

সুরুচি। সে শুনতেও চাই না। বেশ তো, কেসের গল্পই বলুন না হয়।

অর্দ্ধেন্দু। কেসের গল্প বলতে নেই। ডাক্তারের ডায়েরি গোপনীয় বস্তু। ব্যারিস্টারের নোট-বইয়ের মত প্রকাশ্য আদালতে ও খবরের কাগজে সালঙ্কারে প্রচারণীয় নয়।

সুরুচি। বাজে কথা। বলা যায় না এমন কিছু নেই—এ হতেই পারে না।

অর্দ্ধেন্দু। ডাক্তারের গল্পের মজাই তো ওই। যেটা বলা যায়, সেটা শোনবার মত হয় না। আর যেটা শোনবার মত হয়, সেটা বললে প্রফেশনাল সিক্রেসি ভাঙা হয়।

সুরুচি। ধুত্তোর সিক্রেসি। এত বছর পরে এলাম আমরা কত দূর থেকে, আর উনি খালি সিক্রেসি করছেন!

প্রভাত। ব'লে যান না, কেসে পড়েন আমি সামলাব'। আর আইনে বলে, নিকট-আত্মীয়দের বললে সিক্রেসি-ভাঙার অপরাধ হয় না

অর্দ্ধেন্দু। বিশেষত যখন সেই আত্মীয়দের মধ্যে একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি থাকেন এবং যখন সেই সিক্রেসি-ভাঙার দিকে বড় উৎসাহ থাকে তাঁরই স্ত্রীর এবং যখন সেই স্ত্রী আবার হন নিজের স্ত্রীর আদুরে বোন এবং যখন মনুর আইন অনুসারে নিজের স্ত্রী নিজেরই অঙ্গের সামিল—দেহে আত্মায় ও ডায়েরির অন্তরঙ্গতায়—

সুনীতি চোখ তুলে চাইলেন, কবে আমি তোমার ডায়েরি পড়েছি, শুনি?

অর্দ্ধেন্দু। পড়েছ বলি নি, জান বলেছি। লেখবার আগে শুনলেও জানা হয়।

প্রভাত। May I remind my learned friend that he is digressing from our original issue?

অর্দ্ধেন্দু। এই সেরেছে। একটু ডাইগ্রেসও করতে পাব না, তাও আবার নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কথা কইতে?

সুরুচি। না, অতিথিকে অনাদর ক'রে নিজের স্ত্রীকে সম্ভাষণ করতে ব্যস্ত থাকাটা রুচিবহির্ভূত।

সুনীতি। এবং অতিথির অনুরোধ রক্ষা না করাটা গার্হস্থ্যাশ্রমের নীতিবহির্ভূত। গল্প বলাই তোমার উচিত।

অর্দ্ধেন্দু। বাপ, কে বলে প্রপার-নেম্‌রা নন্‌কনোটেটিভ! কিন্তু তা হ'লে তো দেখা যাচ্ছে, গল্প বলতেই হয়।

সুরুচি। এবং কেসের গল্প, খুব ইণ্টারেষ্টিং দেখে।

তপেন। এবং খুব ইন্‌স্ট্রাক্‌টিভ দেখে, যেন শুনে আমার লাভ হয়।

প্রভাত। এবং আইন বাঁচাবার খাতিরে গল্পের রসভঙ্গ না ক'রে।

অর্দ্ধেন্দু। মাভৈঃ, আমার গল্পে রস থাকবেই না, সে ভঙ্গ আর হবে কি ক'রে!

সুরুচি তপেন প্রভাত। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি সুরু করুন তো এবার।

শোন তবে।—অর্দ্ধেন্দু কেসে গলা সাফ করলেন, চুরুটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে ঈজিচেয়ারে চিৎ হয়ে এলিয়ে প'ড়ে মিনিটখানেক চোখ বুজে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলতে সুরু করলেন।—

আমার সব চাইতে ইণ্টারেষ্টিং কেস ঘটেছিল এই কলকাতাতেই। ইউরোপ থেকে ফিরেছি বছর দুই হবে, প্র্যাক্‌টিস তখনও বেশি নয়, মেডিক্যালের চাকরিটি ভরসা। বকুলবাগানে ভাড়াটে বাড়িতে

তখন থাকি, কলেজে ক্লাস নিই, কাটাছেঁড়া করি আর বাকি দিনটার বেশির ভাগই শুয়ে শুয়ে চুরুট টেনে কাটাই। সংসারের দায়িত্ব তখন কম ছিল। পুত্রকন্যারা তখনও আসতে সুরু করেন নি, শুধু অনু আসবে ব'লে নোটিস দিয়েছে। সুনীতি সারাদিন ব'সে ব'সে লাল উলের জামা বুনতে ব্যস্ত। আর আমি ব্যস্ত সাংসারিক চিন্তায়।

প্রভাত। May I be permitted to point out যে, আপনি এইমাত্র বলেছেন, দায়িত্ব কম ছিল। তবে আবার চিন্তা এল কিসের ?

অর্দ্ধেন্দু। জোর ক'রে গল্প বলাবে তার ওপর আবার জেরা ? আমাকে পুলিসকোর্টের সাক্ষী পেয়েছ নাকি ? গল্প শুনবে তো চুপ ক'রে ব'সে যা বলি শোন এবং মেনে নিতে থাক। মনে রেখো, বিশ্বাসে মিলয়ে গল্প, তর্কে বহুদূর। আর কথায় কথায় জেরা করবে তো আমিও এই চুপ করলাম। স্কেপ্‌টিকদের আমি গল্প বলি না।

সুরুচি। না না, আপনি বলুন। তুমি চুপ কর তো। যত ব্যারিস্টারি বিদ্যে এইখেনে! আর সেবার যখন সেই ইয়ে ঘোল খাইয়ে দিয়েছিল—

অর্দ্ধেন্দু। সিভিল কলহেও নালম্‌। প্রভাতের কথার জবাব আমি দিচ্ছি। দায়িত্ব তখনই ছিল না বটে, কিন্তু দায়িত্ব আসন্ন ছিল। অনু নোটিস দিয়েছে, তখনও এসে পৌঁছতে ছ মাস দেরি। অ্যারাইভ করবার আগে তিনি অনুপম হবেন কি অনুপমা হবেন, জানা ছিল না। সেই এক চিন্তা—হাঁ ক'রে এলেই হয় কন্যাদায়। তারপর ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, দুধ-পেরাম্বুলেটারের দাম আছে। ওদিকে চুরুটের দাম চ'ড়ে গেছে, শুয়ে শুয়ে চুরুট টানতে টানতে যে চিন্তা করব, সেই বা আর কদিন করা চলবে কে জানে! মাস অন্তে কুড়িয়ে বাড়িয়ে জোর শ পাঁচেক টাকা তো আয়। এও চিন্তা। কাজেই প্রভাত, দেখতে

পাচ্ছ, দায়িত্ব না থাকলেও চিন্তা থাকবার পক্ষে কোন বিঘ্ন ঘটে নি। আর একটা কথা তোমরা—ইয়ংম্যানরা—প্রায়ই ভুল কর, সেটাও এই সঙ্গেই ব'লে দিই। তোমরা মনে কর, দায়িত্ব না থাকলে লোকের চিন্তা থাকতে পারে না, কিন্তু কথাটা ভুল। বরং দায়িত্ব আসবার আগেই লোকের চিন্তা থাকে, মানে চিন্তা করবার মত ফুরসৎ থাকে। চিন্তা করাটা অবসর সময়ের ব্যাপার, এক রকমের শৌকসারি। দায়িত্ব যখন সত্যি এসে ঘাড়ে পড়ে, তখন আর লোক চিন্তা করবার সময় পায় না, উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কাজেই দায়িত্ব ছিল না, কিন্তু চিন্তা ছিল বললে ভুল বলা তো হয়ই না, বরং দায়িত্ব ছিল না ব'লেই চিন্তা ছিল বললে আরও সায়ান্টিফিকালি সত্যি কথা বলা হয়।

এই সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ জ্ঞানগর্ভ কথা তোমাদের শোনাতে পারতুম, তোমাদের জীবনে কাজে লাগত। কিন্তু সুরুচি এরই মধ্যে ভ্রুকুটি করছে এবং তপেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অতএব গল্প বলাই চলুক।

সেদিনটা রবিবার এবং আমার তখন প্রায় রোজই রবিবার। স্টেট্‌স্‌ম্যানের বিজ্ঞাপনটা পরের উইক থেকে তুলে দোব ভাবছি। রাত তখন নটা হবে, হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরতে ওদিক থেকে আওয়াজ এল, হ্যালো, ডক্টর বোস আছেন ?

বললাম, কে আপনি ?

আমি xyz-এর রাজা বাহাদুরের বাড়ি থেকে বলছি।

রাজা বাহাদুরের নামটা শোনা ছিল না। বললাম, কি দরকার ?

একটা কেসের জন্যে। আপনি যদি কাল সকালে ফ্রী থাকেন—

ফ্রী আমি সারাক্ষণই। কিন্তু সে কথা স্বীকার ক'রে নিজকে খেলো

করতে নেই। অতএব স্টাইলসে বললাম, সকালে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে।

ওদিক থেকে জবাব এল, তাই হবে। আমরা ওর ভেতরেই আপনার ওখানে যাব।

সেই রাত্তিরেই স্থির হয়ে গেল, কম ক'রেও অন্তত এক ছড়া চন্দ্রহার আর একটা হীরে বসানো নথের অর্ডার কালই দিয়ে দিতে হবে, নইলে গৃহের শান্তি আর থাকবে না। পরদিন সকালবেলা চান ক'রে সবে বেরিয়েছি, বেয়ারা এসে কার্ড দিয়ে বললে, বাবু ব্যয়ঠে হেঁয়। কার্ডে দেখলাম, নাম লেখা—Mr P. C. Gosh, Private Secretary to the Raja Bahadur of xyz.

ধীরে-সুস্থে ড্রেস ক'রে নিয়ে ড্রইংরুমে এসে গুডমর্নিঙের অর্দ্ধেকটা ব'লে থেমে গিয়ে দেখলাম, পি. সি. আমাদের প্রফুল্ল। আমাদের সঙ্গেই বি. এস. সি. পাস ক'রে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছিল, থার্ড ইয়ারের মাঝামাঝি হঠাৎ দেশে চ'লে যায়। তারপর আর দেখা হয় নি; যদিও কলেজে সে আমার ভয়ানক বন্ধু ছিল। এবং আরও একটি দরকারী কথা হচ্ছে, তার নাম আদপেই প্রফুল্ল নয়। বুঝতেই পারছ, প্রফেশনাল সিক্রেসির খাতিরে আমি সমস্ত নামটাম বদলে বলব। প্রফুল্ল আমাকে দেখে প্রফুল্লতর হয়ে উঠল। বোঝা গেল, আমার সঙ্গে দেখা হবে বা ডক্টর এ. এস. বোস যে তাদেরই দলের অর্দ্ধেন্দু এটা সে কল্পনা করে নি। তারপর ব'সে দুজনে খুব খানিক আড্ডা দেওয়া গেল, চা সার্ভ করবার অজুহাতে সুনীতিও যোগ দিলে। তার কেসও শুনলাম। রাজা বাহাদুর কোনখানের রাজা নন, নর্থ বেঙ্গলের এক জমিদার মাত্র। রাজা খেতাবটা লব্ধ। বাহাদুর বৃদ্ধবয়সে কেঁচে বিয়ে করেছেন, অতএব যৌবন ফিরে পাবার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। মেডিক্যাল কলেজে

খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, আমি ইউরোপ থেকে ভরোনফ্‌স অপারেশনের স্পেশালিস্ট হয়ে এসেছি। অথ প্রফুল্লর আগমন। সংবাদের শেষে প্রফুল্ল একটু প্রাইভেট হিণ্টও দিলে, বুড়োর ঢের টাকা এবং ছেলেপুলে নেই, অতএব বুড়ো জোয়ান হবার জন্যে বেজায় ক্ষেপে গেছে। অপারেশনটা যদি ঠিক ক'রে দিতে পারি হাতে বেশ মোটা টাকা মিলবে। এই থেকে বুড়োর সার্কলেও রেকমেণ্ডেড হয়ে যেতে পারি, পারলে পয়সা আছে।

নগদ টাকা আয়ের ফাঁক পেলে ছাড়ব এমন সাত্ত্বিক অবস্থা তখন আমার নয়। প্রফুল্লর সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম। পথে যেতে যেতে প্রফুল্লর ইতিহাস শুনলাম। সেই যে সে বাড়ি চ'লে গিয়েছিল তার বাবার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে, তারপর তিনি মারা গেলেন, ওরও আর পড়া-শোনা করবার মত সংস্থান রইল না। কিছু দিন এদিক সেদিক ঘুরে শেষে এই চাকরিটি পেয়ে গেছে। এখন ভালই আছে। রাজা বাহাদুরের বাড়ি পৌছতে বেশি দেরি লাগলো না। প্রফুল্লই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল। প্রথমেই একটি জিনিস দেখে আশ্বস্ত হলাম, রাজা বাহাদুর নামে রাজা হ'লেও আসলে বেশ ভদ্রলোক। মোটাসোটা নধর চেহারা, টুকটুকে রঙ, এক সময়ে সুপুরুষ ছিলেন তার পরিচয় এখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায় নি। ঈজিচেয়ারে বিরাট দেহভার রেখে চোখ বুজে প'ড়ে ছিলেন, যেতেই শশব্যস্তে উঠে অভ্যর্থনা করলেন। একটু দূরে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি ছোকরা, অবিশ্যি তখনকার হিসেবে, ব'সে ছিল। সেও এগিয়ে এসে কাছে বসল। কথাবার্ত্তা বেশির ভাগই হ'ল আমাতে আর রাজা বাহাদুরে, প্রফুল্ল দরকার মত যোগ দিচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে সে ব্যক্তিটি ফোড়ন দিচ্ছিল। লোকটাকে প্রথমে তত লক্ষ্য করি নি, কিন্তু দুচারবার

অযাচিত ও অহেতুক ফোড়ন দেবার পর তাকে চেয়ে দেখতেই হ'ল। ছিপছিপে চেহারা, এক সময়ে সুন্দর ছিল, কিন্তু অকালে কাঠ হয়ে গিয়ে সবশুদ্ধ এমন একটা আকৃতি দাঁড়িয়েছে যা দেখলেই অশ্রদ্ধা হয়। সাজ-সজ্জায় বাহারের অভাব নেই, কিন্তু তার চেষ্টা এত খারাপ যে চারপাশের স্মার্ট সারাউণ্ডিংয়ের সঙ্গে মোটেই মানাচ্ছে না। আর সব চাইতে বিশ্রী হচ্ছে তার কথাবার্তা, যেমন অমার্জ্জিত তেমনই ইম্‌পুডেণ্ট।

রাজা বাহাদুরকে বললাম, আপনার শরীরটা একবার আমি এগ্‌জামিন করব।

তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, এখানে যদি সুবিধে না হয় বরং ও ঘরটাতে চলুন।

বললাম, ব্যস্ত হবেন না, এখানেই হতে পারবে। তবে তার সঙ্গে সঙ্গে আমি কিছু কিছু কোশ্চেনও আপনাকে করব। একা হ'লেই ভাল হ'ত।

কোশ্চেন করব তো ছাই, আসলে আমার মতলব হচ্ছে, সে লোকটাকে সরিয়ে দেওয়া। সে কিন্তু তার ধার দিয়েও গেল না, বেশ নিশ্চিন্তি হয়ে ব'সে রইল। প্রফুল্ল বেরিয়ে গেল। আমি বললাম, আপনিও একটু কাইণ্ড্‌লি—

সে বেশ অমায়িকভাবে বললে, আমি থাকলে কিছু ক্ষতি হবে না।

আমার গা জ্ব'লে গেল। রাজা বাহাদুর সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, ও থাকলে আমার কোন অসুবিধে হবে না।

আমার রাগ চ'ড়ে গেল। বললাম, আমার হবে। এসব ব্যাপারে আমাদের কতকগুলো প্রফেশনাল কন্‌ভেন্‌শন থাকে।

রাজা বাহাদুর তার দিকে চেয়ে বললেন, তা হ'লে তুমি না হয়—

বলতে তিনি যেন ভারী সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন মনে হ'ল। ছোকরা

উঠে গটগট ক'রে বেরিয়ে গেল। এবং তারপরই শুনলাম, পাশের ঘরে সে প্রফুল্লকে বলছে, এসব হাম্‌বাগ জুটিয়ে আনেন কোথা থেকে? ওঃ, আমরা যেন আর কখনও বড় ডাক্তার দেখি নি।

রাজা বাহাদুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দেখলাম, ভদ্রলোক বিব্রত হচ্ছেন। তাই কথাটা যেন আমি শুনতে পাই নি—এমনই ভাব দেখিয়ে তাঁকে এগ্‌জামিন করতে লাগলাম। শেষ হ'লে দুচারটে প্রশ্ন ক'রে বললাম, আপাতত আর কিছু আমার দরকার নেই। রাজা বাহাদুর ডেকে বললেন, প্রফুল্ল, এঁর হাতটা ধুইয়ে দাও। চাকর জল সাবান আর গামলা নিয়ে এল। ডাক্তারের প্রফেশনাল কন্‌ভেন্‌শন রুগীকে ফোন ক'রে কথা বললেও হাত ধুতে হয়। হাত ধুয়ে বসলে রাজা বাহাদুর বললেন, বলুন এবারে আপনার মতামত।

বললাম, দেখুন, আমার অনেস্ট ওপিনিয়ন যদি চান, আপনার বিয়ে করা উচিত হয় নি।

রাজা বাহাদুরের মুখটা কেমন একটু মলিন হয়ে গেল। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, দেখুন, আপনি সব জানেন না, নেহাৎ দায়ে প'ড়েই আমাকে এই বয়সে আবার বিয়ে করতে হয়েছে। এ কথা সব বুড়োই বলে। আমি চুপ ক'রে রইলাম। রাজা বাহাদুর আবার একটু চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, শুনতে চান তো আপনাকে বলতে আমার বাধা নেই। আমার প্রথম স্ত্রী ছিলেন প্যারালিটিক। ছেলেপুলে তাঁর হবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু তিনি বেঁচে থাকতে আবার বিয়ে করতেও আমি পারি নি। কাজেই এই বয়সে আমাকে বিয়ে করতে হয়েছে।

বুঝলাম, লোকটা নেহাৎ অপদার্থ নয়। একটু লজ্জাও পেলাম। বললাম, মাপ করবেন রাজা বাহাদুর, আমার কথাটা হয়তো একটু রূঢ়

হয়ে পড়েছে। কিন্তু কথাটা সত্যি। আপনার শরীর বাইরে সুস্থ হ'লেও তার কাঠামো শক্ত নয়।

রাজা বাহাদুর বললেন, অপারেশন তা হ'লে করা যাবে না?

বললাম, অপারেশনের কথা ব'লেই নয়। অপারেশন মেজর কেস হ'লেও খুব রিস্কি নয়, তার ধাক্কা সামলাতে হয়তো পারবেন, তাতে ফলও হবার কথা। কিন্তু আপনার জেনারেল হেল্‌থ যা, তাকে শুধু অপারেশন ক'রে সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়। সেইজন্যই বলেছিলাম, আপনার এই বয়সে আবার বিয়ে করা উচিত হয় নি। অবশ্য অন্য কারণ যা আছে আপনি বললেন, সে আলাদা কথা।

রাজা বাহাদুর কিছু বলবার আগেই দোরের কাছ থেকে সেই ছেলেটা ব'লে উঠল, অচ্ছা, আপনার কাজ তো আপনি ক'রে যান, বিয়ের ঔচিত্য অনুচিত্য সম্বন্ধে আপনার ওপিনিয়ন যখন চাওয়া হবে—

আমি বললাম, মাপ করবেন রাজা বাহাদুর, এর পরে আর আমি এখানে থাকতে পারি না।—ব'লে ঘর থেকে সোজা বেরিয়ে এলাম। প্রফুল্লও সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল। বাইরে গাড়ি তখনও দাঁড়িয়ে। আমাদের সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখেই সোফার গাড়ি স্টার্ট দিলে, কিন্তু আমি গাড়িতে না উঠে পাশ কাটিয়ে চ'লে আসতেই প্রফুল্ল আমার হাত ধ'রে বললে, ছি অর্দ্ধেন্দু, সে হয় না। গাড়ি ক'রে না গেলে রাজা বাহাদুর ভয়ানক দুঃখ পাবেন।

আমি বললাম, let him। তোমার তিনি মনিব হ'তে পারেন, কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর এমন কোনও অব্‌লিগেশনের সম্পর্ক নেই, যার জন্যে এর পরেও আমার তাঁকে খুশি করবার জন্যে তাঁর গাড়িতে চড়তে হবে। . .

প্রফুল্ল বললে, সে কথা নয়। ও যাই বলুক, তুমিও বেশ জান,

কথাটা রাজা বাহাদুরের নয়। তিনি নিজে অতি ভদ্রলোক, সে তুমি নিজেই দেখেছ। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হবেন ব'লেই বলছি, তাঁকে খুশি করবার কথা আমি বলি নি। তা ছাড়া এমনই ক'রে তুমি হেঁটে বেরিয়ে গেলে সোফার দরোয়ান পর্য্যন্ত একটা স্ক্যাণ্ডালের গন্ধ পাবে। আমার নিজের অনুরোধ রাখ, চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ভেবে দেখলাম, তার কথাটা মিথ্যে নয়। অগত্যা গাড়িতে উঠলাম। গাড়িতে দুজনেই চুপ ক'রে ব'সে রইলাম, সারাটা পথ আমাদের একটা কথাও হ'ল না। বাড়ির সামনে এসে নামতে প্রফুল্ল আমার পেছন পেছন নেমে পড়ল। বললে, অর্দ্ধেন্দু, কিছু মনে ক'র না, ভাই, আমি জানতুম না এমন হবে। তোমাকে আমিই টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম, তার জন্যে তোমার কাছে মাফ চাইছি।

আমারও তখন রাগের ঝোঁকটা ক'মে এসেছে, তার কথায় লজ্জা পেলাম। বললাম, চল, একটু ব'সে যাবে। ঘরে এসে বললাম, ছেলেটা কে হে?

প্রফুল্ল বললে, আর ব'ল না ভাই। উনি হচ্ছেন রাজা বাহাদুরের এ পক্ষের শালা, রাণীজীর দাদা। গরিবের ছেলে হঠাৎ বড়লোকের বাড়িতে এসে জেঁকে বসেছে। ঝাঁজে আমরা অস্থির।

দেখলাম, প্রফুল্ল তার ওপর মোটেই প্রসন্ন নয়। বললে, বাড়িতে এক ঝাঁক পোষ্য, আর রাজা বাহাদুরের নিজের স্বভাবটি অতি চমৎকার। চাকর ব'লে কখনও মনে করেন না, নিজের খুড়ো-জ্যাঠার কাছে এর চাইতে বেশি স্নেহ পেতাম না। তাই স'য়ে যায়।

শুনলাম, শালাটি সব দিকেতেই চৌকস। বিদ্যে ম্যাট্রিকের এধারে পৌঁছয় নি, যত রাজ্যের বখামি ইয়ার্কি ক'রেই কাটত। এখন হঠাৎ বোনের কল্যাণে জবরদস্ত হয়ে বসেছে, তার তাড়ায় আর বেয়াড়ামিতে

বাড়িসুদ্ধ লোক অস্থির। কিছুদিন আগে এরই একটা কথায় অপমানিত হয়ে রাজা বাহাদুরের বহুকালের বিশ্বাসী ম্যানেজার পর্য্যন্ত চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চ'লে গেছেন।

বললাম, রাজা বাহাদুর বরদাস্ত করেন কেন?

প্রফুল্ল বললে, বোঝ না, তাঁর হয়েছে সাপের ছুঁচো ধরা, গিলতেও পারেন না, ওগরাতেও পারেন না।

বৃদ্ধস্য তরুণীর সোদর ভাই, তাকে কিছু বললে ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি রাণীর কণ্ঠে উঠতে কতক্ষণ।

বললাম, তা হ'লে তো ভদ্রলোকের চটপট ম'রে যাওয়াই উচিত। আবার অপারেশন ক'রে কেঁচে তাজা হবার সখ কেন? দু ভাই-বোনে মিলে তাঁর দশা নিশ্চয়ই যা ক'রে তুলেছে, বাঁদরের থাইরয়েড কেন কচ্ছপের হার্ট জুড়ে দিলেও ও জান টিকবার নয়।

প্রফুল্ল বললে, এবার ভুল করলে। রাণীজির ভাইয়ের ওপর টান খুবই সত্যি, কিন্তু এমনিতে তাঁর মত মিষ্টি স্বভাব দেখা যায় না। ভাইয়ের দরুন তিনি যে কি লজ্জায় থাকেন, সে না দেখলে বুঝবে না।

বললাম, কি হে, কাব্য করছ যে!

প্রফুল্ল বললে, কাব্য নয়। ম্যানেজারবাবু যেদিন চ'লে যান, রাণীজি নিজে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে বললেন, তার হয়ে আমি আপনার পায়ে ধ'রে মাপ চাইছি, আপনি যাবেন না। আমি যদি আপনার নিজের মেয়ে হয়ে জন্মাতুম, আপনি কক্ষনো এমন ক'রে পরের অপরাধে আমাকে শাস্তি দিতে পারতেন না। ম্যানেজারবাবু যাবার সময় কাঁদতে লাগলেন, বললেন, এর পরে আমার যাওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু আমি তিন সত্যি ক'রে ফেলেছি। তাঁকে কাঁদিয়ে গেলাম, এ দুঃখ আমি ম'রলেও ভুলতে পারব না। তোমরা আমার হয়ে তাঁকে বোলো, আমি মনে কোন

ক্ষোভ নিয়ে যাচ্ছি না, বুড়ো হয়েছি, এখন আমার কাশীবাসের সময়, তাই যাচ্ছি। সত্যি, তার দিন দুই পরেই তিনি কাশী চ'লে গেলেন।

প্রফুল্লর চোখ ছলছল ক'রে উঠল। বুঝলাম এই ম্যানেজারবাবুকে সে সত্যিই ভালবাসে। রাণীজি নেহাৎ পরবশা, নইলে তাঁর ওপরেও এর যা টান, ওকে ভাল ক'রে না জানলে তার একটা সাইকিক্‌ মতের ব্যাখ্যাও দিতে পারতাম, শুনতে মন্দ হ'ত না।

সুরুচি। আচ্ছা, আপনার কি চোখে পড়তো ব'লে কিছু নেই, এমন সুন্দর সিচুয়েশনটার অমন ব্যাখ্যা করতে একটু বাধল না?

অর্দ্ধেন্দু। উঁহু, বাবরে রিসের সঙ্গে? প্রথমত ডাক্তারদের চক্ষুলজ্জা আর সেন্টিমেন্ট দু'টোরই দারুণ অভাব। দ্বিতীয়ত

সুরুচি। চুপ, আপনার বক্তৃতা আমরা শুনতে চাই না গল্প বলুন।

অর্দ্ধেন্দু। আচ্ছা, গল্পই হোক। কিন্তু ব্যারিস্টার, দেখে রাখ, আমাকে ন্যায্য ডিফেন্স নিতে দিলে না।

প্রভাত। নেভার মাইণ্ড। এর পাওয়ার অব অ্যাটর্নি মণ্টেজ অ্যাক্ট অব হিন্দু ম্যারেজ অনুসারে আমার ওপর ন্যস্ত আছে। তার জোরে আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি, আপনার বিরুদ্ধে এই অ্যালিগেশন নিয়ে আর বেশি নাড়াচাড়া করা হবে না, যদি আপনি আর তর্ক না ক'রে গল্পটা কন্টিনিউ করেন।

অর্দ্ধেন্দু। অগত্যা। প্রফুল্লকে বললাম, এতই যদি সবাই তাকে নিয়ে অস্থির, তাকে দেশে পাঠিয়ে দিলেই হয়।

প্রফুল্ল বললে, হয় না। হ'লে পাঠানো হ'ত। কিন্তু এর তো রাজাজি তাকে চ'লে যেতে বললে একটা যা চেঁচামেচি কোলাহলের সৃষ্টি হবে, সে দস্তুরমতো স্ক্যাণ্ডালাস। রাজা বাহাদুরের ওপরেও বাড়িতে ঘুঘুরা রয়েছেন না, যাঁদের নাম জ্ঞাতি শরিক। তাঁদের ভয়

করতে হয়। আমাদের এমন রাণীজি, যাঁকে মা ছাড়া আর কিছু ব'লে ডাকতে কারও ইচ্ছেই হয় না, তাঁরও উইক স্পট আছে, তিনি ছোট ঘরের মানে এদের তুলনায় গরিবের ঘরের মেয়ে। এর ওপর একটা স্ক্যাণ্ডাল হ'লে ঘরে বাইরে বহু জিভ চঞ্চল হয়ে উঠবে। কাজেই বুঝতে পারছ, ছুঁচোটাকে রাজা বাহাদুর আর রাণীজি দুজনে মিলেই গিলেছেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, শ্রীযুত এখানে তবু সবার চোখের ওপর যা আছেন আছেন, এক রকম মানিয়ে যাচ্ছে। দেশের বাড়িতে তিনি হবেন একেশ্বর, এবং যা কেলেঙ্কারি ক'রে বেড়াবেন সে অনির্ব্বচনীয়।

বললাম, তার মানে?

প্রফুল্ল বললে, মানে সরল। তিনি নিজেকে বলেন নবযুগের তরুণ, এবং তারুণ্যের লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর মতামত অতি আপ-টু-ডেট। কাজেই তাঁর পরকীয়ায় অরুচি নেই এবং কার্য্যক্ষেত্রে জাত-অজাতের সঙ্কীর্ণতাও তিনি মানেন না। জ্ঞাতিরা তাঁর খোঁজ রাখছিলেন ব'লেই একে এখানে এনে রাখা হয়েছে, এক কথায় নজরবন্দী।

বললাম, তা হ'লে সেই বন্দীটা আরও ভাল ক'রে রাখা উচিত, শেকল দিয়ে।

প্রফুল্ল বললে, আমাদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু সেখানেও ওই ভূতের ভয়—স্ক্যাণ্ডাল। জ্ঞাতিদের কান তো ধামার মত পাতাই রয়েছে কিনা। যাক এবারে উঠে পড়ি, অনেক ঘরোয়া কথা ফাঁস ক'রে গেলাম। কিন্তু ঐ কথাটি মনে রেখো ভাই, আমাদের ওপর রাগ ক'র না। আর যদি কিছু মনে না কর, আজকের ভিজিটের টাকাটা—

বললাম, বাড়াবাড়ি করেছ কি ঘুষি মেরে দোব। আমি গরিব মানি, কিন্তু আজকের টাকা আমি নোব না।

প্রফুল্ল সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, জোর করবার মত মুখ নেই, কিন্তু তাঁরা শুনে কতটা দুঃখ পাবেন, তুমি জান না।

বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে শুনল..., প্রফুল্ল দুতিনবার ফোনে আমার খোঁজ করেছে। এবং ব'লে রেখেছে, আমি ফিরলেই যেন তাকে খবর ...ওয়া হয়, খুব জরুরি দরকার। জরুরি এ.. কি থাকতে পারে ভেবে পেলাম না। ফোনে তাকে ডাকতেই সে সাড়া দিলে, সেই দুপুর থেকে তোমার ডাকের ভরসায় ব'সে আছি ভাই। তুমি এখন আবার বেরুচ্ছ না তো?

বললাম, অন্তত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নয়। কেন?

সে বললে, খানিক পরে বলছি, ধর মিনিট পনরো।

ব্যাপারটা বুঝলাম না। কিন্তু বুঝতে দেরিও হ'ল না, যখন মিনিট দশ-বারোর মধ্যেই প্রফুল্ল সশরীরে এসে আমার ড্রইংরুমের দোরে হাজির হ'ল এবং আমি কোন কথা বলবার আগেই ব'লে বসল, একটু রাস্তার ওপর আসতে হচ্ছে ভাই, ওঁরা গাড়িতে ব'সে।

ওঁরা কারা?

রাজা বাহাদুর আর রাণীজি।

সেকি! তাড়াতাড়ি নেমে গাড়ির কাছে এগিয়ে যেতেই, রাজা বাহাদুর রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছিলেন, দুহাত জোড় ক'রে বললেন, সকালবেলার ব্যাপারের জন্যে আমরা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে রয়েছি, তার জন্যে আপনার কাছে মাপ চাইতে এলাম।

বললাম, ছি ছি, ওকি করছেন, আপনি আমার গুরুজনের সমান!

রাজা বাহাদুর বললেন, তা হোক, তখন আপনি আমার বাড়িতে অভ্যাগত ছিলেন। বলুন, মাপ করলেন?

বললাম, মাপ করা-করির কি আছে এতে? তবু বিশ্বাস করুন,

আমার কোন নালিশ আর নেই। সকালবেলাই প্রফুল্লর কাছে আমি সব শুনেছি।

রাজা বাহাদুর বললেন, প্রফুল্লর! আপনাদের আগেকার জানা-শোনা ছিল নাকি?

প্রফুল্ল বললে, আমরা কলেজে একসঙ্গে পড়েছি।

রাজা বাহাদুর বললেন, আর সে কথা তুমি এই সারাদিনের ভেতর আমাকে বল নি! যাক, ডাক্তার যখন প্রফুল্লর বন্ধু, তখন তো—

বললাম, স্বচ্ছন্দে নাম ধ'রে ডাকতে পারেন, আমি একটুও রাগ করব না। তবে আমারও কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে, কষ্ট স'য়ে এতদূর যখন এসেছেন, তখন একবার গরিবের দোরে—

রাজা বাহাদুর বললেন, হাতীর পা? নিশ্চয় পড়বে, চার পা এক-সঙ্গেই পড়বে, চিন্তা ক'র না। তা হ'লে হস্তিনীটিকেও তো ডেকে নিতে হয়।—ব'লে তিনি গাড়ির দিকে একটু এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির দোর খুলে রাণীজি নেমে পড়লেন। বছর একুশ-বাইশ হবে বয়স, পাতলা ছিপছিপে চেহারা। সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় আমি দক্ষ নই, কিন্তু এঁর চেহারাটা কবির ভাষায় বর্ণনা করবার মত। সুনীতি তাঁকে দেখেছে; প্রভাত, তাঁকে দেখে যদি অনেস্টলি বর্ণনা করতে, তা হ'লে সুরুচির চ'টে যাবার কথা হ'ত। সুন্দর শান্ত মুখে ভাসা ভাসা বড় দুটি চোখ, কপালের ওপর একটুখানি ঘোমটা টানা। গাড়ি থেকে নামতে নামতে চকিতে রাজা বাহাদুরের দিকে চেয়ে, অতি সুন্দর একটু ভ্রূভঙ্গি ক'রে ফিসফিস ক'রে বললেন, আঃ, যত বুড়ো হচ্ছ—। তারপর কোনও সঙ্কোচ না ক'রে সামনে এসে নমস্কার ক'রে বললেন, আমাকেও মাপ করলেন তো?

আমি ঠিক কি জবাব দিলাম বলতে পারব না, এ কথাটা সত্যের

খাতিরে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ সেই মুহূর্ত্তটির জন্যে আমার কথা বলবার শক্তি যেন হারিয়ে গেল। আমার সমস্ত অন্তর ভ'রে তখন যার সাড়া পাচ্ছিলাম, সে হচ্ছে একটি অতি অকৃত্রিম ও বিপুল দীর্ঘশ্বাস। মনে মনে বললাম, হায় রে, সুনীতি যদি আমাকে অমন ক'রে ভুরু কুঁচকে বুড়ো বলতে জানত!

সুনীতি। তুমি বুড়ো হও, তখন দেখো বলতে জানব।

অর্দ্ধেন্দু। তেমন ক'রে বলতে পারবে না। এই তো আধ-বুড়ো হয়েছি, ও বেয়াল্লিশও-যা পঞ্চান্নও তাই। কই বল তো তার অর্দ্ধেকও মিষ্টি ক'রে, কেমন পার একটা টেস্ট হয়ে যাক।

প্রভাত। আঃ, digressing again।

অর্দ্ধেন্দু। অস্থির হয়ো না হে আইনজ্ঞ। শুকনো রেলের ওপর কলের গাড়ি চলতে পারে, গল্প চলে না। রস জমাতে হ'লে তার জন্যে অবসরের ইণ্টারস্পেস চাই। তুমি কোর্টে স্পীচ দিতে দিতে বারবার চশমা মোছ না?

সুরুচি। আঃ, একটু ফুরসৎ মিলেছে কি অমনই—

অর্দ্ধেন্দু। মেয়েদের মত খচখচি বাধিয়ে দিয়েছে। যাক, শোন। গরিবের দোরে হাতীর পা বেশ গভীর ক'রেই পড়ল। রাণীজি সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে গিয়ে সুনীতিকে আক্রমণ ও দখল করলেন। এদিকে রাজা বাহাদুর অনেক বার অনেক রকম ক'রে প্রশ্ন ক'রে আমি যে তাঁদের ওপর রাগ ক'রে নেই, তার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে নিলেন; এবং তারপর আর একবার ধ'রে পড়লেন, তাঁর অপারেশন আমাকেই করতে হবে, নইলে তাঁর বিশ্বাস হবে না যে, আমার রাগ সত্যিই ভেঙেছে। শেষ পর্য্যন্ত আমাকেও স্বীকার করতেই হ'ল।

তাঁরা চ'লে যাবার পর সুনীতি মতপ্রকাশ করলে, তার বিবেচনায়

প্রফুল্ল বললে, চল, তোমাকে এগিয়ে দিই।

রাজা বাহাদুর বললেন, বঙ্কু ফিরেছে? তাকে ডাক।

বঙ্কু আসতেই রাজা বাহাদুর বললেন, এঁর কাছে মাপ চাও।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না না, সেকি!

রাজা বাহাদুর বললেন, সেকি নয়। চাইতেই হবে। চাও বলছি মাপ।

বঙ্কু ঘাড় গোঁজ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। মাপ সে মুখ ফুটে চাইবে না, জানা কথা। অথচ তখন না চাইবার মানে আমার মাথাটা আরও ভাল ক'রে কাটা যাওয়া। কাজেই খুব সাত্ত্বিকভাবে সার্মন দিয়ে বললাম, আপনি মিথ্যে একটা সীন ক্রিয়েট করছেন রাজা বাহাদুর। আমি রাগ ক'রে নেই, আপনাকে বলেছি। তার ওপর, উনি বয়সে আমার চাইতে ঢের ছোট। যদিই কিছু অন্যায় ক'রে ফেলে থাকেন, সে যা হবার হয়ে চুকে-বুকে গেছে, তাকে খুঁচিয়ে তোলবার দরকার নেই।—ব'লে চট ক'রে বেরিয়ে এলাম।

বাড়ি ফিরে দেখি—অগ্নিকাণ্ড। সুনীতি রেগে ফুলে যা হয়ে রয়েছে একেবারে পাকা টম্যাটো। কি বার্ত্তা? নিশ্চয়ই সেই নথের অর্ডার দিতে ভুলে গেছি ব'লে। নিজে থেকেই ঘাট স্বীকার ক'রে বললাম, দেবি, প্রসীদ। এক্ষুনি অক্ষয় নন্দীকে ফোন করছি। সুনীতি বললে, নথটথ নয়, আরও গুরুতর ব্যাপার। বললাম, তবে নিশ্চয়ই চন্দ্রহার। কিন্তু তার অর্ডার তো দেওয়া হয়েই যাচ্ছিল, শুধু যদি না—। সুনীতি চ'টে বললে, চুলোয় যাক চন্দ্রহার। এদিকে মানসম্ভ্রম নিয়ে টানাটানি, আর তুমি করছ ইয়ার্কি।—ব'লে চোখে আঁচল দিলে।

অর্দ্ধেন্দু নিবে যাওয়া চুরুটটা ফের ধরিয়ে নিয়ে চিৎ হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে খুব দমভরে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

সুরুচি বললেন, তারপরে ?

অর্দ্ধেন্দু চুরুটে আর একটা জোর টান দিয়ে বললেন, দাঁড়াও, আগে মন ঠাণ্ডা হোক।

প্রভাত বললেন, হয়েছে, বলুন।

অর্দ্ধেন্দু। বাপ রে বাপ, বউয়ের সঙ্গে কথা কইতে দেবে না, চুরুট খেতে দেবে না, এ তো আচ্ছা মাস্টার-মাস্টারণীর পাল্লায় পড়লাম দেখছি; এমন জানলে আমি গল্প বলতেই বসতাম না।

প্রভাত। If যদি be হয়—থাক। এখন বাকিটা না বললে ব্রীচ অব কণ্ট্রাক্ট।

অর্দ্ধেন্দু। আর এদিকে ব্রীচ অব কণ্ট্যাক্ট হয়ে যাচ্ছিল। শালীর চাইতে চুরুটের সঙ্গে খাতির বজায় রাখবার তাড়া তুমি কম মনে কর ? বিশেষত যখন সেই শালীর বয়স পঁচিশ পেরিয়ে—

সুরুচি। ফের !

অর্দ্ধেন্দু। আইজ্ঞা না। যাক, কান্নাটান্না থামতে সুনীতিকে জিজ্ঞেস করলাম—

সুনীতি। হ্যাঁ, কেঁদেছিল বই কি !

অর্দ্ধেন্দু। আচ্ছা, না কেঁদে থাক, নেই নেই। তারপর কান্না না থামতে সুনীতিকে—। দেখলে গো, সেরে নিয়েছি কিন্তু। হ্যাঁ, সুনীতিকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে। সুনীতি বললে, সেই কে একটা লোক এসেছিল, মানে বঙ্কু, তাকে ভয়ানক অপমান ক'রে গেছে। তার যদি অবিলম্বে তীব্র প্রতিকার না করি, তবে তার সঙ্গে আমার এই জন্মের মত বিচ্ছেদ, জীবনে আর কক্ষনো সে আমার রুমালে ফুল তুলে দেবে না। কি ব্যাপার ? না, বঙ্কু যখন আসে, সুনীতি তখন ড্রইংরুমে ব'সে খুব নিবিষ্টচিত্তে ক্যাটালগ খুলে পেরাম্বুলেটারের মডেল পছন্দ

করছে—না না, চ'টো না, আই মীন, লাল উলের ছোট্ট সোয়েটার বোনবার জন্যে উলের ডিজাইন পছন্দ করছে। বন্ধু বোধ হয় বাইরে দরোয়ান বরকন্দাজ কারুর সাড়া পায় নি, সে এসে সোজা ঘরে ঢুকেছে এবং তারপর হাঁ ক'রে স্নীতির দিকে কি রকম ক'রে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কি রকম ক'রে সে তাকিয়েছিল, অবিশ্যি খুব ভাল বুঝলাম না, কারণ আমার দিকে কেউ কখনও কি রকম ক'রে তাকিয়েছে ব'লে মনে পড়ে না। তবে স্নীতির কথা থেকে বোঝা গেল, সে তাকানোর রকমটা ভাল নয়, মানে স্নীতির পছন্দ হয় নি। তারপর যখন স্নীতি পেছন ফিরে তাকে দেখতে পেয়েছে, তখনও সে একটুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নি; যতক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলেছে, সারাক্ষণই তার মুখের ওপর, গলার ওপর এটসেট্রা চোখ ফিক্স ক'রে বলেছে। স্নীতির মতে সেটা তার আত্মার ভালত্বের পরিচায়ক নয়। অতএব অবিলম্বে সেই দুরাত্মার শাস্তিবিধান করা চাই।

জ্বালিয়ে তুললে। এদিকে আমার পয়সার অভাব, ওদিকে টাকা আয়ের পথে এসে এই হতভাগাটা বারবার ক'রে জঞ্জাল সৃষ্টি করছে; ওদিকে আবার শাস্ত্রের বিধান, সময়বিশেষে স্ত্রীর সব খেয়াল পূরণ করতে হয়, নইলে ভবিষ্যৎ দেশবাসীর স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা। স্নীতি তো যা কান্না সুরু ক'রে দিয়েছে, ঘরে প্লাবন হয় আর কি! প্রভাত সেই যে গেল বারে সঙ্গে টাকা নেই ব'লে বড় হীরে বসানো ব্রোচটা নিতে পারলে না, একটু ছোট সাইজের একটা ব্রোচ কিনে নিয়ে গেলে তখনও সুরুচি, অত কাঁদতে পার নি।

সুরুচি বললে, কবে আবার আমি—

অর্দ্ধেন্দু অন্যমনস্কভাবে বাঁ হাতটা একটু তুলে বললেন, আঃ, তর্ক ক'রে রসভঙ্গ ক'র না, আমি এখন ক্রমেই উত্তেজিত হচ্ছি। হতে হতে

শেষে একসময় আমি দস্তুরমত চ'টে গিয়ে স্থির ক'রে ফেললাম, এর একটা হেস্তনেস্ত করবই। তাতে যদি ক্লায়েন্ট হাতছাড়া হয়ে গিয়ে নথটা এ যাত্রা কেনা নাও হয়, সোভি আচ্ছা আমি গরম হয়ে উঠতেই তার আঁচে সুনীতির চোখের জল চট ক'রে বাষ্প হয়ে উবে গেল। বর্ষণশ্রান্ত আষাঢ় রাত্রির অবসানে সদ্য-ধোওয়া কচি ঘাসের ওপরে প্রথম রোদের ঝলকানির মত তার সমস্ত মুখ খুশিতে এমনই ঝকমক ক'রে উঠল যে, আমার তখনকার মত মনেই রইল না নাক খাঁদা ব'লে তার দু-দুবার বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল।

সুনীতি। আঃ।

অর্দ্ধেন্দু। গোল ক'র না। আমি ইদানীং পরিশ্রান্ত, এক নিশ্বাসে অনেকখানি কাব্য ক'রে ফেলেছি। তারপর চ'টে গিয়ে দুম ক'রে ফোন তুলে নিলাম। লালবাজার নয়, প্রফুল্ল। তাকে বললাম, শিগগির এস।

প্রফুল্ল এলে তাকে বন্ধুর কীর্ত্তি বললাম। সে বলবে, আর ব'ল না ভাই। বুঝলে তো কি চীজ। আমরা চব্বিশ ঘণ্টা দেখছি। রাণীজি নিজে তার সামনে গায়ের চাদর খোলেন না।

বললাম, কিন্তু আমি এ স'য়ে যাচ্ছি না, ওর বাঁদরামো আমি ঘোচাব।

প্রফুল্ল বললে, সে যদি পার ভাই, তো আমরাও বেঁচে যাই—রাজা বাহাদুর রাণীজি সুদ্ধু। কিন্তু একটি কথা, মামলা করলে তাঁরা বড় লজ্জায় পড়বেন।

আমি বললাম, সে ইচ্ছে আমারও নেই, থাকলে তোমাকে ডাকতাম না। ঘরের কেচ্ছা নিয়ে কোর্টে যাওয়া আমার পক্ষেও প্যালেটেব্‌ল নয়। দাঁড়াও, সুনীতিকে ডাকি।

তারপর তিনজনে মিলে আমাদের ঘোরতর ওয়ার-কাউন্সিল বসল. প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে অত্যন্ত গোপন পরামর্শের পরে স্থির হ'ল, বন্ধুকে কেসে ফেলা চলবে না, রাজা বাহাদুরকেও বলা হবে না। গুণ্ডা লাগানো চলে কি না, তার আলোচনা শেষ হয়ে ভোটে 'না' খাড়া হতে হতে সাড়ে দশটা বেজে গেল। তার পরের প্রস্তাব ছিল, তাকে নিজেই চাবকে দেওয়া। কিন্তু এগারোটায় আমার একটা এক্সপেরিমেণ্টের ফল জানতে যাবার কথা। প্রফুল্লকে বললাম, আপাতত তা হ'লে ও আলোচনাটা মুলতুবি থাক, বেলা হয়ে গেল। সোফারকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, প্রফুল্লই আমাকে ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে নামিয়ে দিয়ে গেল।

সেদিনটা ছিল বুধবার। বিষ্যুৎ গেল, শুক্কুর গেল, শনিও যায়, চাবুক আর কেনা হয় না। সুনীতি ঝনঝন ক'রে হাতের চুড়িগুলো খুলে দিয়ে বললে, এই নাও, বিক্রি ক'রে যাও চাবুক নিয়ে এস। আমি বললাম, একটু র'স, আর একবার ভেবে দেখি, চাবুক আর্মস-অ্যাক্টে পড়ে কি না। সুনীতি রেগে বললে, আর্ম তো এমনিই দুটো দুপাশে ঝুলছে, ওগুলোকেও তা হ'লে কেটে ফেলে দিলেই তো হয়, জামা করতে কাপড়ও কম লাগত। যতই বুঝিয়ে বলি কথাটা নেহাৎই মেয়েমানুষের মত বলা হ'ল, আর্ম কাটা গেলে তখন জানা যাবে তার সঙ্গে আরও কত কি গেল, এবং সে অভাব শুধু আমিই নয়, তিনিও আমার চাইতে কম ফীল করবেন না। কে সে কথা কানে তোলে! সে বলে, হাতে চাবুক না থাকলে পুরুষমানুষের হাত থাকবার কোন মানেই হয় না, ঠিক যেমন সোনার চুড়ি হাতে না থাকলে মেয়েদের হাত থাকা না-থাকারই সামিল। এর পরে বুঝতেই পার, আমার তরফ থেকে একমাত্র লজিকাল উত্তর হচ্ছে যে, তাই যদি তার ধারণ হয়, তবে সুনীতি খুব ভাল দেখে একটি গাড়োয়ানকে বিয়ে করা

উচিত ছিল। কিন্তু ততদূর এগোবার আগেই একটা ব্যাপার ঘ'টে গেল, যা আশ্চর্য্য এবং অভিনব।

অর্দ্ধেন্দু আর একটা চুরুট ধরালেন, ধীরে ধীরে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, সোমবার খুব ভোরবেলা প্রফুল্ল এসে হাজির হ'ল। শেষ রাত্তির থেকে বন্ধুর হঠাৎ গলাটা ফুলে ব্যথা হয়ে উঠেছে, ভয়ানক পেন, আমাকে এক্ষুনি একবার যেতে হবে। পুনশ্চ সংবাদ, বন্ধু নিজে বারবার ক'রে ব'লে দিয়েছে, আমাকে যেতেই হবে, আমাকে না দেখতে পেলে সে আর কিছুতেই বাঁচবে না স্থির করেছে। তার কোনও অপরাধ যেন আমি মনে না রাখি।

চটপট ওভারকোট চড়িয়ে গাড়িতে চেপে বসলাম। শোবার ঘরে টেবিলে দেশলাই ছিল, সুনীতি তার ওপরকার কালির ছবিটার দিকে খুব ভক্তিভরে খানিক চেয়ে থেকে, তারপর আশেপাশে কেউ কোথাও নেই দেখে নিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম জানিয়ে মনে মনে বললে, ভগবান, তুমি নিশ্চয় আছ।

সুনীতি বললেন, হুঁ। তুমি জানলে কি ক'রে ?

অর্দ্ধেন্দু বললেন, মনে নেই, শালগ্রাম নুড়ি সামনে রেখে বলেছিলে, যদেতৎ মে হৃদয়ং ?

সুনীতি রেগে বললেন, কক্ষনো বলি নি। আমার ব'লে তখন ঘুমে দুচোখ ভেঙে আসছে—

অর্দ্ধেন্দু। আরে চুপ চুপ, রাগের মাথায় বেফাঁস কথা ব'লে ফেলতে নেই। ব্যারিস্টারকে জিজ্ঞেস কর, এক্ষুনি ক'লে দেবে, চীটিং কেস বড় শক্ত মোকদ্দমা।

প্রভাত। আঃ, কি সুরু করলেন দুজনে! ডক্টর, continue please, মানে ঝগড়া নয়—গল্পটা।

অর্দ্ধেন্দু। বলি। রাজবাড়িতে গিয়ে দেখি বন্ধু শয়ান, গলায় কম্ফর্টার জড়ানো। কণ্ঠার দু পাশ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। ব্যথা আছে, একটু জ্বরও হয়েছে। ব্যথাটা তখন পর্য্যন্ত খুব বেশি ব'লে মনে হ'ল না; কিন্তু যতটুকু হয়েছে এবং আরও যতখানি হবে ব'লে তার ধারণা হয়েছে, এই দুইয়ে মিলে বন্ধুকে একেবারে জেণ্টলম্যান বানিয়ে দিয়েছে। হাউ-মাউ ক'রে বললে, ডাক্তারবাবু, আমি ম'রে গেলাম।

ধমক দিয়ে বললাম, সে যখন মরবেন তখনকার কথা। এখন চুপ করুন, দেখতে দিন।

দেখা শেষ হ'লে রাজা বাহাদুর বললেন, কি দেখলেন?

বললাম, অ্যাকিউট টাইপের টিউমার হয়েছে। কাটাতে হবে।

রাজা বাহাদুর বললেন, টাইপটা কি রকম?

বললাম, খুব মাইল্ড হবার তো কথা নয়, এক রাত্রের মধ্যে যখন এতটা হয়েছে। কাল কিছু টের পান নি?

বন্ধু কেঁদে উঠল, কিচ্ছু না। আমাকে বাঁচান।

বললাম, এক্ষুনি মরবার আপনার কিছু হয় নি। উঠে রেডি হয়ে নিন। অপারেশন আজই করতে হবে, আরও বাড়বার আগে। প্রফুল্লকে বললাম, দেরি না ক'রে মেডিক্যাল কলেজে পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও। আমি তাদের ফোন করছি। বন্ধু আবার হাউমাউ ক'রে উঠল। ওরে বাবা রে, গলা কাটলে আমি ম'রে যাব। আমি ওখান থেকেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলাম।

এগারোটার মধ্যে অপারেশন হয়ে গেল। প্রফুল্লকে তার কাছে রেখে নার্স টার্সের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে বারোটা আন্দাজ বাড়ি ফিরলাম। স্নীতিকে বললাম, বেচারী যা কান্নাকাটি করছিল, তার

ওপর কেমন মায়া প'ড়ে গেল। তায় ডাক্তারের প্রফেশনাল কন্‌ভেন্‌শন আছে, রুগীর ওপর রাগ রাখতে নেই। তাকে একেবারে মাপ ক'রে ফেলেছি। সুনীতির মুখটা ঠিক পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া গোছের দেখতে হ'ল না।

বিকেলে গিয়ে দেখলাম, বন্ধু ভালই আছে। রাজা বাহাদুর, রাণীজি তাকে তখন দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁরা খুব একচোট ধন্যবাদ জানালেন। আমি বললাম, আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে ভালই হ'ল। খবর আছে।

রাজা বাহাদুর বললেন, কি, জবাব পেয়েছেন?

বললাম, শুধু জবাব নয়, একেবারে জিনিসই পেয়ে গেছি এখানে একজনের কাছে; সকালবেলা তাড়াতাড়িতে আপনাকে বলা হয় নি। আর এক ভদ্রলোক নিজের দরকারে আনিয়েছিলেন, তাঁর কাজে লাগবে না। তাঁরও সুরাহা হয়ে গেল, আমারও।

রাজা বাহাদুর বললেন, তা হ'লে অপারেশনটা কবে করতে চান?

বললাম, কালই। দেরি ক'রে লাভ নেই।

রাণীজির মুখ মলিন হয়ে গেল। বললেন, একসঙ্গে দুজনই?

তাঁকে সাহস দিয়ে বললাম, তাতে আর কি হয়েছে? ওরা শিগগিরই সেরে উঠবেন তো। আপনি যখন খুশি এসে দেখে যাবেন. আমি বন্দোবস্ত ক'রে দোব।

তাই হ'ল, পরদিন রাজা বাহাদুরের অপারেশন করলাম। দিন দশেকের ভেতর দুজনেই সেরে উঠে বাড়ি চ'লে গেলেন।

অর্দ্ধেন্দু পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে চুরুট টানতে লাগলেন।

সুরুচি বললেন, তারপর?

অর্দ্ধেন্দু বললেন, তারপর আর নেই। বছর দুই পরে সুনীতিকে

সঙ্গে ক'রে গিয়ে অন্নপ্রাশনের নেমতন্ন খেয়ে এসেছি। **And they have been blessed with the brightest boy I have ever seen**, মানে আমার ছেলেপিলে ছাড়া।

তপেন বললে, আর সেই বন্ধু ?

অর্দ্ধেন্দু বললেন, বর্ত্তমান খরব জানি না, অন্নপ্রাশনের সময় শেষ দেখেছি। দারুণ মোটা হয়েছে আর স্বভাবটা একদম বদলে গেছে। এখন সে অত্যন্ত শান্তশিষ্ট লোক। আমাকে যে ভক্তিশ্রদ্ধাটা দেখালে, সুনীতি পর্য্যন্ত ঈর্ষান্বিতা। প্রফুল্লকে বললাম, ভারী বাধ্য হয়ে পড়ছে তো হে, কত লোকেরই তো হাত পা গলা কাটি, এমন ভক্ত রুগী আর কখনও পাই নি।

প্রফুল্ল বললে, শুধু তুমি ব'লে নয়, ওর স্বভাবটাই এখন অমনই হয়ে গেছে। আগের আর কিছু বাকি নেই। রাণীজি কালীঘাটে জোড়া মোষ দিয়েছেন।

অর্দ্ধেন্দু উঠে দাঁড়ালেন, আর নয় রাত ঢের হ'ল।

সুরুচি বললেন, এটা একটা গল্প হ'ল ? মিথ্যে খানিক বাজে বকুনি শোনালেন।

অর্দ্ধেন্দু বললেন, কি করব, আমি তো ব'লেইছিলাম, গল্প বলতে পারি না। আমার কাজ ছুরি ছোরা নিয়ে, আমি কি ব্যারিস্টার যে, অনর্গল সুসজ্জিত রোমাঞ্চকর মিথ্যে ব'লে যাব !

সুরুচি ঠোঁট ফুলিয়ে বললেন, যান যান, আর ইয়াকি করতে হবে না, যত সব বাজে কথা ব'লে রাত জাগালেন।

অর্দ্ধেন্দু নিঃশব্দে চাদরটা তুলে গলায় ফেললেন।

সুরুচি আপীল করলেন, দেখ তো দিদি, এতে রাগ হয় না ?

সুনীতি স্মিতমুখে বললেন, হয়, কিন্তু হওয়া উচিত নয়।

প্রভাত বললেন, আপনি তো ওঁর হয়ে বলবেনই। কেন উচিত নয়, শুনতে পাই?

সুনীতি বললেন, পান। গল্পটার সবটা আপনারা শোনেন নি। একটুখানি বাকি আছে।

তপেন সুরুচি প্রভাত কোরাসে বললেন, কি? কি?

সুনীতি বললেন অ্যান্থ্রোপয়েড গ্ল্যাণ্ড পাওয়া যায় নি। রাজা বাহাদুরের অপারেশন হয়েছিল বঙ্কুর থাইরয়েড নিয়ে।

সুরুচি প্রভাত তপেন। তার মানে

অর্দ্ধেন্দু। সুনীতি, তুমি ডায়েরি পড় না বলেছ।

সুনীতি। পড়ি না, তুমিই বলেছ। কিন্তু এও বলেছ যে, শুনি এবং কাজেই ইচ্ছে করলে বলতেও পারি, কারণ আমার প্রফেশনাল ভাউ নেই।

তপেন সুরুচি। দিদি, বল।

প্রভাত। বলুন।

সুনীতি। ওঁর প্ল্যানমত প্রফুল্লবাবু বঙ্কুকে একটা ব্যাকটিরিয়া অ্যাড্‌মিনিস্টার ক'রে দেন। তাই তার থাইরয়েড ফুলে উঠেছিল। উনি অপারেশন ক'রে তার থাইরয়েড বার ক'রে নেন এবং সেটাকেই পরিষ্কার ক'রে নিয়ে রাজা বাহাদুরের শরীরে বসিয়ে দেন।

সুরুচি উত্তেজিতভাবে বললেন, অর্দ্ধেন্দুবাবু, সত্যি?

অর্দ্ধেন্দু উদারভাবে বললেন, নিজের মুখে কিছু স্বীকার করা প্রফেশনাল কন্‌ভেন্‌শনের বহির্ভূত। স্ত্রী যা খুশি বলুক, সেটা আদালতে গ্রাহ্য নয়, কারণ বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, মেয়েরা স্বামীর কীর্ত্তিকাহিনী বাড়িয়ে বলতে গিয়ে এমন অনেক কিছু বলে, যা তাদের বোনরা বা ভগ্নীপতিরা বিশ্বাস করলেও অন্য লোকে করবে না।

সুরুচি। হেঁয়ালি নয়, সত্যি বলুন।

অর্দ্ধেন্দু। ভদ্রে, ভ্রূকুটি করলেই অমনই ভড়কে গিয়ে একটা যা তা খারাপ কথা স্বীকার ক'রে ফেলব, সে বয়স আমার আর নেই।

প্রভাত। আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?

অর্দ্ধেন্দু। Provided it will be nothing to incriminate me।

প্রভাত। না, অতি অ্যাকাডেমিক প্রশ্ন। মানুষের গ্ল্যাণ্ড নিয়ে অপারেশন হয় ?

অর্দ্ধেন্দু। অ্যাকাডেমিক্যালি বলতে পারি, না হবার কোন কারণ নেই। বরং মানুষের গ্ল্যাণ্ডই মানুষের পক্ষে সব-চাইতে স্যুটেড। মানুষের পাওয়া যায় না ব'লেই বাঁদরের গ্ল্যাণ্ড নিতে হয়। আর সে বাঁদর জাতে মানুষের যত কাছাকাছি হয় ততই ভাল।

তপেন। আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি ?

অর্দ্ধেন্দু। Oh yes, you are a student।

তপেন। কি ব্যাক্‌টিরিয়া ব্যবহার করেছিলেন ?

সুনীতি। আমি বলছি। Strepto-Staphylococcus।

তপেন। কিন্তু তাকে না জানিয়ে ইন্‌জেক্ট করলেন কি করে ?

অর্দ্ধেন্দু। তুমি কলেজ ছেড়ে দাও। এইটুকু জ্ঞান নেই যে ডিজীজ্‌ড গ্ল্যাণ্ড নিয়ে অপারেশন হয় না, তোমার কিছু হবে না।

তপেন। তবে ?

অর্দ্ধেন্দু। ইয়ংম্যান, আরও বয়েস হোক, তখন জানবে, স্ত্রীকে প্রসন্ন করবার জন্যে মানুষ গণ্ডার মারে, তাজমহল বানায়, উপস্থিতমত দুচারটে রুচিকর কথা ব'লে দেওয়া তো সামান্য কথা।

সুনীতি। তার মানে ? তুমি আমাকে তখন ঠকিয়েছিলে ?

অর্দ্ধেন্দু। আহা, ছেলেমানুষকে শান্ত করতে কি বললাম, তুমি তাতে কান দিচ্ছ কেন ? তোমায় আমায় কি সেই সম্পর্ক ?

প্রভাত। উহুঁ, ব্যাপারটা বুঝে নিতে হচ্ছে। Where are we standing exactly ?

অর্দ্ধেন্দু। এই লনের ওপর।

প্রভাত। Hang it, এতক্ষণ ধ'রে আমরাই বোকা বনলাম, না উনিই এতদিন ধ'রে বোকা ব'নে ছিলেন?

অর্দ্ধেন্দু। (ঈষৎ হেসে) ওহে, জগৎটা গোলমেলে জায়গা, এর কোথায় কে কখন কি ভাবে বোকা বনে, তার মীমাংসা করা কি সহজ কথা! রাত অনেক হয়েছে, সব শুতে যাও। সম্বুদ্ধ

আলোকচিত্রে প্রগতি (১)

দি রাইট মোমেণ্ট

চিনাবাদাম

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া কম্প্যাস ছাড়াই দিকনির্ণয় করিতে গেলে যে অবস্থা হয়, পিনাকীলালের অনেকটা সেই অবস্থাই হইল। সে চুপচাপ আসিয়া মনুমেণ্টের তলায় বসিয়া পড়িয়া একটা সিগারেট ধরাইল। না ধরাইলেও হইত, তবু ধরাইল। "নেই কাজ তো খই ভাজ" কথাটাকে বদলাইয়া পিনাকীলাল করিয়া লইয়াছে, "নেই কাজ তো ধরা সিগারেট"। কেন না খই ভাজা অপেক্ষা সিগারেট ধরানোর হাঙ্গামা অনেক কম।

আজ পিনাকী যেন হঠাৎ দার্শনিক হইয়া গিয়াছে। সব কিছুই সে দর্শন করিতেছে চর্ম্মচক্ষু দিয়া নহে—দর্শনের চক্ষু দিয়া। উপরের দিকে চাহিয়া সে দেখিল, ঠিক যেন মনুমেণ্টেরই মাথার উপর দিয়া কয়েক খণ্ড নির্জ্জলা স্বচ্ছ সাদা মেঘ উড়িয়া যাইতেছে। পিনাকীর মনে হইল, মনুমেণ্ট সিগারেট বুঝি সাদা ধোঁয়া ছাড়িতেছে।

মালবিকা তাহাকে ইডিয়ট বলিয়াছে, জানোয়ার বলিয়াছে, বলিয়াছে আরো অনেক কিছু। তা বেশ করিয়াছে। আর কয়টা দিন যাক না। তারপর আবার ঠিক ঐ কথাগুলিরই উল্টা কথা অভিধান দেখিয়া দেখিয়াই হয়তো বলিবে। কয়টা দিন কি আর সহ্য করিয়া থাকা যাইবে না? কেন যাইবে না? চেষ্টা করিলে পৃথিবীতে কি না সহা যায়? পিনাকী মনুমেণ্ট দেখিতে লাগিল।

পিনাকী ইতিহাস জানিত। মনুমেণ্ট দেখিয়া তাহার মনে পড়িল সাহেব অক্‌টার্লোনির কথা। পড়িয়াই তাহার মনটা করুণ রসে ভরিয়া উঠিল, দুঃখ হইল সাহেবের জন্য। মনুমেণ্ট আছে, অক্‌টার্লোনি

নাই। স্মৃতিস্তম্ভ আছে, স্মৃতি নাই। লক্ষ লক্ষ লোক মনুমেণ্ট দেখে, তাহাদের মধ্যে ইতিহাস কয়জন জানে? যাহারা জানে, তাহাদের মধ্যেই বা কয়জন মনে করে? বুদ্বুদের মত স্মৃতি মিলাইয়া গিয়াছে, খাড়া আছে স্মৃতিস্তম্ভ। স্মৃতির চেয়ে স্মৃতিস্তম্ভই কি বড়? পিনাকী ভাবিতে লাগিল।

ক্রমে অকৃটার্লোনি হইতে সিপাহী-বিদ্রোহের কথা মনে হইল। হায়! সে সব দিন এখন কোথায়? তখনকার দিনে কোনও রাত্রে আজিকার রাত্রের মত এই জায়গায় এমন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবার কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত কি? তখন এই সবুজ মাঠই হয়তো নররক্তে ও অশ্বরক্তে লাল হইত। এখন ঐ ওখানে কয়েকটা ফাজিল ছোকরা প্রেমের গল্প করিতে করিতে হো হো করিয়া হাসিতেছে তখনকার দিনে কত লোক ঠিক ঐখানেই হয়তো ওহো হো করিয়া কাঁদিয়া আর্তনাদ করিয়াছে। সময়ের কি আশ্চর্য পরিবর্তন! সময়-বহুরূপীর অদ্ভুতরূপ পরিবর্তনের কথা ভাবিতে ভাবিতে পিনাকীলাল নিজের কথা ভুলিয়া গেল।

এভাবে কতক্ষণ সে নিজেকে ভুলিয়া থাকিত বলা শক্ত, কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ "চিনাবাদাম চাই বাবু, গরমাগরম" কথাটা কানে যাইতেই সে আবার নিজের কথা ভাবিতে লাগিল। কারণ, সে-ই চিনাবাদামওয়ালার লক্ষ্য। তাহার যে চিনাবাদাম দরকার, সে কথা লোকটা যেন কি করিয়া আন্দাজ করিয়াছিল।

লোকটা বাঙালী নহে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, তাহার বাড়ি মুঙ্গের জিলায়। শুনিয়া পিনাকীর মন সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সুদূর মুঙ্গের হইতে আসিয়া বাঙালী বাবুদের জন্য সে চিনাবাদাম ভাজিয়া ফিরি করিতেছে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সবাইকে হয়তো সে

দেশেই ফেলিয়া আসিয়া এই বিদেশে তাহাদের বিরহ-ব্যথা মুখ বুজিয়া সহ্য করিতেছে। হয়তো বা কখনও কখনও ব্যথা এত গভীর হইয়া উঠে যে, সে তাহার ঐ ময়লা কাপড়ের আঁচল দিয়াই চোখের জল মুছিয়া ফেলে। হয়তো কত রজনীতে বিরহিণী প্রিয়ার কথা ভাবিয়া অশ্রুজলে বালিশ ভিজাইতে ভিজাইতে সে জাগিয়া থাকে। নির্ম্মম বিধাতার এই নির্ম্মম বিধানের রহস্য বহু চেষ্টাতেও হয়তো সে ভেদ করিতে পারে না। আর ওদিকে হয়তো সুদূর মুঙ্গেরে জনৈক মুঙ্গেরী নারী কাতরপ্রাণে সুদূর বাংলা হইতে তাহার স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় দিন গুনিতেছে। হয়তো সেও বিধাতার এই হৃদয়হীন বিধানের নিন্দা করিতেছে। হয়তো স্বামী বাংলার টাকা মাঝে মাঝে মনি-অর্ডার করিয়া পাঠায় এবং সেই টাকাই স্বামীর স্পর্শমাখানো বলিয়া কত আদরে সে বক্ষে চাপিয়া ধরে। বিধাতা কর্ত্তৃক বাংলায় নির্ব্বাসিত পিতার জন্য তাহার কচি কচি ছেলেমেয়েগুলি হয়তো কত কাঁদে, কিন্তু সে কান্না হয়তো বা নির্ব্বাসিত পিতার প্রাণে গিয়া আঘাত করে, তবু বিধাতার পাষাণ প্রাণে আঘাত করে না।

এই রকম কত শত মুঙ্গেরী দীর্ঘশ্বাসে বাংলার আকাশ-বাতাস ভরিয়া আছে, কে তাহার হিসাব রাখে? শুধু মুঙ্গেরই বা কেন? ভারতের বহু প্রদেশের বহু জিলার এইরূপ কাতর আর্ত্তনাদে বাংলার আকাশ ছাইয়া গেল, বাতাস ভারী হইয়া গেল। হে বাঙালী! তাহা কি শুনিতে পাও নাই? সে আর্ত্তনাদ শুনিয়া কোনদিন এক ফোঁটা অশ্রু ঝরাইয়াছ কি? এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়াছ কি?

মনুমেণ্টের তলায় বসিয়া বসিয়া এভাবে চিন্তা করিতে করিতে পিনাকী আকুল হইয়া উঠিল। মনুমেণ্টের উপর দিয়া তখনও দুই এক খণ্ড সাদা মেঘ উড়িতেছে।

চিনাবাদামওয়ালা কহিল, "গরমাগরম চিনাবাদাম, বাবু।" তাহার কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত রকমের আকুতিপূর্ণ করুণ ছলছল ভাব। শুনিয়া পিনাকীলালের দুইটি নয়ন-শতদলে অশ্রু-শিশির টলমল করিয়া উঠিল।

পকেট হাতড়াইয়া পিনাকী দেখিল, একটি মাত্র পয়সা রহিয়াছে।

তাহাই বাহির করিয়া সে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে কহিল, "দে যাও এক পইসাকা।"

চিনাবাদাম দিয়া চিনাবাদামওয়ালা চলিয়া গেল। গরমাগরম চিনাবাদাম মুহূর্ত্তে কিরূপে ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে পারে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে মনুমেণ্টের তলায় বসিয়া পিনাকী ঠাণ্ডা চিনাবাদাম খাইতে লাগিল। শ্রীঅক্রুব

আলোকচিত্রে প্রগতি (২)

দি রাইট অ্যাঙ্গেল

'আনন্দমঠে' অনৈতিহাসিকতা

(আলোচনা)

পৌষ মাসের (১৩৪৫) 'শনিবারের চিঠি'তে "সোনার বাংলা'র পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত আমার "'আনন্দমঠে' অনৈতিহাসিকতা" শীর্ষক প্রবন্ধটির একটি "সমালোচনা" পড়িলাম। ইহাকে ঠিক সমালোচনা বলিতে পারি না, কারণ, ইহা গালাগালিতে ভরা; এবং এই গালাগালি মনে হইতেছে যেন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-প্রসূত। তাহা না হইলে সমালোচক মহাশয় মূল বিষয়টি ছাড়িয়া দিয়া একটি সামান্য অবান্তর কথা লইয়া মিছামিছি এতটা ঘাঁটাঘাঁটি করিতেন না এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ব্যতিরেকে এতটা গাত্রদাহের অন্য কোন কারণও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গালিবর্ষণ ও অভিসন্ধি আরোপের সুলভ সুযোগ পাইয়া তিনি তাহার পূর্ণ "সদ্ব্যবহার" করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বুঝা উচিত ছিল যে, কটূক্তি যুক্তি নহে। বোধ হয়, ইহা ভদ্রতাও নহে; এবং এই প্রকার সমালোচনা শিষ্টজনানুমোদিতও নহে।

যদিও একশ্রেণীর লোকের মত সমালোচক মহাশয় অনেক আবোলতাবোল বকিয়াছেন, তথাপি তিনি আমার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি এক প্রকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে তিনি "বিজ্ঞের" মত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে "মীরজাফরের মত ব্যক্তিকে দশ বিশ বৎসর আগে পরে কবর দিলে উপন্যাস তো দূরের কথা ইতিহাসেরও কিছু আসে যায় না।" এই প্রকার মনোবৃত্তি লইয়া ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে—যতই তাঁহারা নিন্দনীয় হউক না কেন—কিছু বলিতে যাওয়া, সমালোচক মহাশয়ের নিজের কথায় বলিতে গেলে, নিতান্ত "ধৃষ্টতা" ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি যাহাই বলুন না কেন, আমি এখনও মনে করি যে "যেখানে উপন্যাস রচনা করিতে যাইয়া ঔপন্যাসিক ইতিহাসের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানে প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা বা তথ্যগুলি সম্বন্ধে তাঁহার পাঠকগণের মনে তাঁহারও ভুল ধারণা উৎপাদন করিবার কোন অধিকার নাই"। বঙ্কিমবাবু নিজেও এই মত পোষণ করিতেন। তাহার প্রমাণ, তাঁহার 'আনন্দমঠের' "তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন" ও "পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন" পড়িলেই পাওয়া

যাইবে। এ সম্বন্ধে আমি আমার প্রবন্ধে পূর্ব্বেই সবিস্তারে লিখিয়াছি। সুতরাং এখানে আর বেশি কিছু বলিব না। তবে মাত্র এইটুকু বলিতে চাই যে, ইতিহাসের সহিত উপন্যাসের সমন্বয় রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পরবর্ত্তী প্রয়াস দেখিয়া আমি এই দাবি করিতে পারি যে, আমি আমার আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁহার প্রিয় কার্য্যই করিয়াছি।

"ছিয়াত্তরের' মন্বন্তরের জন্য কে বা কাহারা দায়ী, বা কেনই বা ঐ মন্বন্তর হইয়াছিল, ঐ সব বিষয়ে আমি কোনও মত আমার প্রবন্ধে প্রকাশ করি নাই। কারণ তাহা আমার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল না। আমার মূল কথাটি বলিতে যাইয়া প্রসঙ্গত আমি কেবলমাত্র বলিয়াছি যে 'বাংলা ১১৭৬ সালে (ইংরাজি ১৭৬৯-৭০ সালে) মীরজাফর জীবিত ছিলেন না। ঐ সময়ের অনেক পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, এবং ঐ সময়কার ঘটনাবলীর জন্য তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা যায় না'। এই মত আমি এখনও পোষণ করি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ সম্বন্ধে সমসাময়িক অনেক দলিলপত্র (records) Imperial Record Office এ (New Delhi) আছে। জানি না, সমালোচক মহাশয়ের সেই সব দলিল দেখিবার সুযোগ হইয়াছে কি না। বোধ হয়, না। কারণ তাহা হইলে এ সম্বন্ধে যে সব মত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তিনি অত সহজে করিতেন না। অজ্ঞতার একটা মস্ত সুবিধা আছে। সেটা এই যে কোন একটা বিষয়ে অতি সহজে মতামত প্রকাশ করা যায়। কিন্তু একটা জিনিসের সব দিক জানা থাকিলে সহজে কোনও মতামত প্রকাশ করা যায় না। আমি Imperial Record Office এ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্বন্ধে সমস্ত সমসাময়িক কাগজপত্র পড়িয়াছি, এবং জানি, কেন এ মন্বন্তর হইয়াছিল। কিন্তু সে কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। সেইজন্য সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব না। তবে মাত্র এইটুকু বলিতে চাই যে, দুই একখানা স্কুলপাঠ্য পুস্তক পড়িয়া বা দুই একখানা উপন্যাস পড়িয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা ঠিক নহে।

দ্বিতীয়তঃ, সমালোচক মহাশয় একটি ফুটনোটে বলিয়াছেন—

"দেবব্রতবাবু Forrest, Malcolm এবং Mill এর ভুল দেখাইয়া বাহবা লইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন বহির কোন পৃষ্ঠায় ভুল আছে কিছু লিখেন নাই। অন্তত Forrest সাহেব মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে ভুল করেন নাই। 'He (*Meer Jafar*) fell seriously ill···died at this (his হওয়া উচিত ছিল)

capital on February 6, 1765. (See Forrest, *Life of Lord Clive*, Vol. ii, p. 256, line 6 from top) সুতরাং প্রমাণ হইতেছে, দেবেন্দ্রবাবু এই সর্ব্বজনপরিচিত বহিখানা না পড়িয়াই Forrest সম্বন্ধে এই মন্তব্য করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন "রাজনীতি"র অধ্যাপকের পক্ষে ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা"।

এই মন্তব্যে সমালোচক মহাশয়ের মাত্রাজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। James Mill, Sir John Malcolm বা Sir George Forrest-এর মতের ভুল দেখানো আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল না। কাজেই সে সম্বন্ধে সবিস্তারে লিখিবারও কোন আবশ্যকতা ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে আমি তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমি লিখিয়াছিলাম—

"এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শুধু বঙ্কিমবাবু কেন, James Mill, Sir John Malcolm, Sir George Forrest প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা ঐতিহাসিকও মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে ভুল সংবাদ দিয়াছেন। এমন কি, পার্লামেণ্টের একটি রিপোর্টেও এই বিষয়ে ভুল সংবাদ রহিয়াছে"।

সমালোচক মহাশয়ের এতটুকু "সাধারণ বুদ্ধি" থাকা উচিত ছিল যে, যখন আমি এই গ্রন্থকারদের সম্বন্ধে একটি উক্তি করিয়াছি, তখন তাঁহাদের লিখিত পুস্তকগুলি না দেখিয়া ঐ প্রকার উক্তি করি নাই। প্রকারান্তরে তিনি আমাকে তাঁহাদের ভুল দেখাইতে বলিয়াছেন। আমি আনন্দের সহিত তাঁহার এই "চ্যালেঞ্জ" গ্রহণ করিতেছি। যাহা ঠিক নহে, তাহাই ভুল। আশা করি, ভুলের এই সংজ্ঞা তিনি গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন না। সরকারী দপ্তরখানায় রক্ষিত সমসাময়িক দলিলের সাহায্যে আমি আমার আলোচ্য প্রবন্ধে নিঃসংশয়ভাবে দেখাইয়াছি যে, মীরজাফরের মৃত্যুর ঠিক তারিখ হইতেছে ১৭৬৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী। Forrest সাহেব বলিয়াছেন (*The Life of Lord Clive*, Vol. ii, 1918, p. 256), "He (Mier Jaffier বা Mir Jafar) ...died at his capital on February 6, 1765." Sir John Malcolmও বলিয়াছেন (see his *Life of Robert, Lord Clive*, 1836, Vol. ii, p. 291 & the footnote on the same page) যে, মীরজাফর ১৭৬৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী মারা গিয়াছিলেন। James Mill বলিয়াছেন, (see his *History of British India*, 4th Edition, by H. H. Wilson, Vol. 3, 1848, p. 356) যে, মীরজাফর "died

in January, 1765." সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, Forrest, Malcolm বা Mill মীরজাফরের মৃত্যুর ঠিক তারিখ দেন নাই। এবং আমি যে Parliamentary Report-র উল্লেখ করিয়াছি, তাহার নাম হচ্ছে: 'The Third Report of the Select Committee (House of Commons) on the Nature, State, and Condition of the East India Company', dated 8th April, 1773। এই Report-এর এক স্থানে লেখা আছে: "That at the death of Myr Jaffier, which happened in the month of January in the year 1765,..."। আশা করি, সমালোচক মহাশয় এখন স্বীকার করিবেন যে, তাঁর "ইষ্ট দেবতারা" মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ ভুল দিয়াছেন। তবে যদি তিনি বলেন যে, তাঁহারা ভুল করিতে পারেন না, যেহেতু তাঁহাদের গায়ের রং কটা, তাহা হইলে অবশ্য আমার কিছু বলিবার নাই। Forrest সাহেব এক সময় ছিলেন ভারত গভর্ণমেণ্টের Director of Records। সুতরাং তাঁর পক্ষে ভুল তারিখ দেওয়া কোনও মতেই সমর্থন করা যায় না। যাক।

Forrest সাহেবের বইগুলি আমাকে অনেক সময়ই নাড়াচাড়া করিতে হয়। তার একটি প্রমাণ ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত আমার *Early Land Revenue System in Bengal and Bihar*, Vol. I. 1765-1772, Longmans, p. 213 দেখিলেই সমালোচক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন। আরও প্রমাণ আমার আর একখানি বহিতে শীঘ্রই পাইবেন; আরও প্রমাণ দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা দিব না। কারণ, সেটা নিতান্ত ছেলেমানুষি হইয়া যায়। সমালোচক মহাশয় Forrest সাহেবের যে বইখানির নাম ফুটনোটে উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানি না পড়িয়া আমি তাঁর সম্বন্ধে মত প্রকাশ করি নাই। সুতরাং আমার "লজ্জিত" হইবার কোনও কারণ নাই। বরং যে উদ্‌ভ্রান্ত সমালোচক মহাশয় পরের লেখার সমালোচনায় নিজের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার এবং ভদ্রতা ও মাত্রাজ্ঞানের অভাবই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাঁহারই লজ্জিত হওয়া উচিত। তিনি এতটা উদ্‌ভ্রান্ত না হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, Forrest সাহেবের গ্রন্থখানি আমি দেখিয়াছি কি না। বোধ হয় তিনি দেখিয়াও দেখেন নাই।

আমি আমার আলোচ্য প্রবন্ধের কোনও স্থানেই বলি নাই যে, আমিই সর্ব্বপ্রথম মীরজাফরের মৃত্যুর ঠিক তারিখ দিয়াছি। সুতরাং তিনি এইরূপ মনে করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না।

এখন কথা উঠিতে পারে যে, আমি কেন সরকারী দপ্তরখানায় রক্ষিত সমসাময়িক দলিলের সাহায্য লইলাম। তাহার একমাত্র কারণ যে, মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়ভাবে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দিতে চাহিয়াছিলাম। যখন দেখিলাম যে, Parliamentary Report, James Mill, Sir John Malcolm, Sir George Forrest, Peter Auber (*Rise and Progress of the British Power in India*, Vol. 1, 1837, p. 98), William Bolts (*Considerations on India Affairs*, 1772, p. 43, এ বইখানা বোধ হয় সমালোচক মহাশয়ের দেখিবার সুযোগ হয় নাই), Edward Thornton (*The History of the British Empire in India*, 1841, Vol. 1, p. 467), *The Cambridge Shorter History of India* (edited by Prof. H. H. Dodwell), Part III, 1934 প্রভৃতির মধ্যে মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ * রহিয়াছে, তখন এই সম্বন্ধে সরকারী দপ্তরখানায় রক্ষিত সমসাময়িক দলিলগুলিকেই চূড়ান্ত প্রমাণস্বরূপ দেওয়াটা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলাম। ইহাতে ঐতিহাসিক এবং রসজ্ঞ সমালোচকগণের কোনও আপত্তি হইবার কারণও দেখি না। ইংরাজ আমলে ভারতের বা বাংলার যথার্থ ইতিহাস জানিতে হইলে কয়েকখানি সাহেবের বা এদেশী লোকের লেখা পুস্তকই চূড়ান্ত গ্রন্থ নহে। সমসাময়িক হস্তলিখিত দলিলগুলিই (records) এ বিষয়ে চরম প্রমাণ। সমালোচক মহাশয়ের বোধ হয় এই সব records দেখিবার কোনও সুযোগ হয় নাই। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তিনি কয়েকখানা স্কুল বা কলেজ পাঠ্য পুস্তককে প্রামাণিক গ্রন্থস্বরূপ লইতে উপদেশ দিতেন না। এখানে ইহাও বলিতে পারি যে, তিনি যে সমস্ত "প্রামাণিক" গ্রন্থগুলির নাম করিয়াছেন, সেগুলি সব নির্ভুল নহে। তবে সে কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

তৃতীয়ত, সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন যে, "নাজিমুদ্দৌলা" "নামের কোন ব্যক্তি মুরশিদাবাদের নবাব-বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।" ইহাকেই বলে 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী'!

---

* Peter Auber, William Bolts, ও *Cambridge Shorter History of India*-র Part III-র গ্রন্থকার মহাশয় ঠিক তারিখই দিয়াছেন—১৭৬৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী। Thornton সাহেব কেবল February (১৭৬৫) মাসের কথা বলিয়াছেন, কোনও নির্দিষ্ট তারিখ দেন নাই। Mill, Malcolm ও Forrest সাহেবের কথা তো আগেই বলিয়াছি।

Aitchison-র *Treaties, Engagements and Sanads*, etc, (শুধু *Treaties and Sanads* নহে), 1909, পুস্তকে (Volume I) যাঁহাকে Nudjum-ul-Dowlah ও Nudjum ul Dowla বলা হইয়াছে, সমসাময়িক সরকারী দলিলে (records) তাঁহাকেই কখনও Nazim-O-Dowla, Najim-O-Dowla, Nayym al Dowlah, Nadjum ul Dowla, এমন কি Nezemal Dowlah বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। ইনিই মীরজাফরের পরবর্তী বাংলার নবাব। আমার যুক্তির ভিত্তি যখন সমসাময়িক দলিলপত্র, তখন দলিলে প্রদত্ত বানান অনুসারে বাংলায় নাড্জুম্-উল-দৌলা বা নাজমুদ্দৌলাকে নাজিমুদ্দৌলা লিখিলে কোনও দোষ হতে পারে না। আর কেনই বা আমরা বাংলায় পারসী বা আরবী নামের উচ্চারণ পারসী বা আরবীর মত করে করিব? সেটা পাণ্ডিত্য হবে না, তবে pedantry হবে বটে। ইংরাজির বেলাও আমরা সে রকম করি না। Calcuttaকে কলিকাতা বলি; Delhiকে দিল্লী বলি; Bombayকে বোম্বাই বলি; এবং অনেক খ্যাতনামা গ্রন্থকারও সেক্স্পীয়ারকে সেক্সপীয়র বলিয়া অভিহিত করেন। অনেক জার্মান ও ফরাসী নাম ইংরেজরা ইংরাজির মতন করিয়াই লেখেন ও উচ্চারণ করেন। সমালোচক মহাশয়কে আরও জানাইতে পারি যে, তাঁর Forrest সাহেব পর্যন্ত "Nudjum-ul-Dowlah" বা Najmu-d-daulah"কে তাঁহার পূর্বে উল্লিখিত বইয়ের textএ (See his *Life of Lord Clive* Vol. II, p. 261) Najim-ud-Dowla (নাজিমুদ্দৌলা বা নাজিম্-উদ-দৌলা) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁকে আরও জানাইতে পারি যে, তাঁর Peter Auber সাহেবও (See his *Rise and Progress of the British Power in India*, 1837, Vol. I.) এই নবাবের নাম দিয়াছেন একবার (p. 163) "Nujeem-ool-Dowla" ও আর একবার (p. 98) "Nazim-ood-Dowla"; Thornton সাহেব তাঁর নাম দিয়াছেন (See his *History of the British Empire in India*, 1841, Vol. I, p. 467) Noojum-ad-Dowlah; এবং James Mill তাঁর নাম দিয়াছেন (See his *History of British India*, 4th Ed., Vol. III, pp. 357-58) "Nujum-ad-dowla". কই, সমালোচক মহাশয় তো এঁদের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই? এঁরা সাহেব বলিয়া বুঝি? ইহারই নাম "slave mentality"। Forrest সাহেব যদি ইংরাজিতে Najim-ud-Dowla লিখিতে পারেন, আমরাও বাংলায় নাজিমুদ্দৌলা বলিতে পারি।

উপরে যে সব কথা বলিলাম, Syef-ul-Dowlaর (Nudjum-ul-Dowlahর পরবর্ত্তী নবাব) বেলায়ও সে রকম যুক্তি দিতে পারিতাম। এই উত্তরের কলেবর ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

তবে আশা করি, এস্থলে একথা বলিলে বিশেষ দোষ হইবে না যে, আমার প্রবন্ধে যাহা "বঙ্গানুবাদ" ভাবে দেওয়া হইয়াছে, তাহার জন্ত আমি আইনত দায়ী হইলেও—কারণ আমার নামে যখন বাহির হইয়াছে—প্রকৃতপক্ষে আমি তাহার জন্ত দায়ী নহি। কারণ, ঐ বঙ্গানুবাদ সমগ্রভাবে আমি নিজে করি নাই। আমি করিলে হয়তো কিছু কিছু তফাৎ হইত। আমার প্রবন্ধে আমি ইংরাজি extractগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। তাহাদের বঙ্গানুবাদ কে করিয়াছিলেন, আমি জানি না। 'সোনার বাংলা'র সম্পাদক মহাশয় তাহা জানেন। কিন্তু এইটুকু আমি এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, আমার প্রতিপাদ্য বিষয়টি ছাড়িয়া আমাকে শুধু গালাগালি করিবার জন্ত নানা প্রকার অবান্তর প্রসঙ্গ তুলিয়া সমালোচক মহাশয় নিজেই "মক্ষিকাবৃত্তি"র চূড়ান্ত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষাতেই তাঁকে উত্তর দিলাম। নতুবা এই প্রকার ভাষা আমাদের অব্যবহার্য্য।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, মীরজাফরের কলঙ্ক ক্ষালন করা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল না। এবং তাহা আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ও ছিল না। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তির সহিত ইতিহাসের অনৈক্য দেখানই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্কিমবাবু সমালোচক মহাশয়ের যেমন পূজনীয়, সেইরূপ তিনি আমারও পূজনীয়। সাহিত্যসৃষ্টির কথা ছাড়িয়া দিলেও, যতদিন পৃথিবীতে অকৃত্রিম দেশভক্তির আদর থাকিবে, ততদিন তিনি আমাদের পূজ্য হইয়া থাকিবেন। বাংলা সাহিত্যের ও বর্ত্তমান বাংলার ইতিহাসে তাঁহার স্থান এত উচ্চে যে, যদি কেহ বলেন যে, তাঁহার লেখার মধ্যে এখানে ওখানে একটু আধটু অনৈতিহাসিকতার দোষ আছে, তাহাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না। কিন্তু আমার সমালোচক মহাশয় তাঁহার সমালোচনায় যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অন্ধ ও নির্ব্বুদ্ধিতাসূচক "গোঁড়ামি"র পরিচায়ক, তাঁহার প্রতি প্রকৃত ভক্তির পরিচায়ক নহে। এবং এই প্রকার সমালোচনাও কেবল পরছিদ্রানুসন্ধানের দূষিত মনোবৃত্তির নিদর্শন। বস্তুত আমি বঙ্কিমবাবুর প্রিয় কার্য্যই করিয়াছি। ইহারই যথার্থ নাম ভক্তি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের পক্ষে জবাব

আমাদের পূর্ব্বপ্রকাশিত সমালোচনার উত্তরে শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমেই, আমাদের ভয়-ভক্তি উদ্রেক করিবার জন্য, তিনি যে কেউ-কেটা নহেন, তাহা ভাল করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন, নামের সঙ্গে উপাধি, পদবী ও উপ-পদবীর প্রদর্শনী সাজাইয়াছেন। আরও এক কাজ করিয়াছেন—এবার তিনি 'শনিবারের চিঠি'র খরচায় বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, ১৯৩৬ সালে তাঁহার *Early Land Revenue System in Bengal*, Vol. I, 1765-1772, Longman, p. [?] 213 প্রকাশিত হইয়াছে। অতঃপর আসিতেছে তাঁহারই আর একখানি বহি—ইহার এখনও নামকরণ হয় নাই। 'সোনার বাংলা'য় তাঁহার মৌলিক গবেষণা পড়িয়া আমাদের যে সন্দেহ হইয়াছিল, এবার তিনি স্বয়ং তাহার হাঁড়ি হাটে ভাঙিয়াছেন। প্রবন্ধে দলিলগুলিই যাহা কিছু সারবস্তু; অবশিষ্ট অংশটুকুতে বঙ্কিমচন্দ্রকে ও ফরেষ্টপ্রমুখ ঐতিহাসিকগণকে "হম্ মারা হ্যায়্"-বাহবা লইবার চেষ্টা ভিন্ন আর কেহ কিছু পাইয়াছেন কিনা জানি না।

দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমাদের তর্কের বিষয় ছিল, বঙ্কিমকর্ত্তৃক ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় মীরজাফরকে বাঁচাইয়া রাখার কারণ কি?—দেবেন্দ্রবাবু তাহা খুঁজিয়া না পাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র" ইহা জানিতেন না; শুধু তিনি কেন, Mill, Forrest পর্য্যন্ত মীরজাফরের মৃত্যুর ঠিক তারিখ জানিতেন না। 'আনন্দমঠ' ও ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের বালকপাঠ্য ইতিহাস পড়িয়া যদি সপ্তম কি অষ্টম মানের কোন ছাত্র আমাদিগকে একই প্যারায় বঙ্কিমচন্দ্রের তিন তিনটি মারাত্মক ভুল দেখাইয়া দিত,—আমরা তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিতাম, সে বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছে; তাহার ইতিহাস পাঠ সার্থক হইয়াছে; কেন না, উপন্যাসকে ইতিহাস বলিয়া ভুল করা বালকের পক্ষে দোষাবহ নহে। 'রাজসিংহে' বঙ্কিমচন্দ্র আওরঙ্গজেব ও উদিপুরী বেগমের প্রতি ঘঃঐতিহাসিক অবিচার করিয়াছেন, এতদিন কোন ইতিহাসবেত্তা সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই; কেন না, বাংলা দেশে দেবেন্দ্রবাবু ছাড়া চক্ষুষ্মান আর কেহ নাই। ঢাকায় চাকরি করিলেও দেবেন্দ্রবাবু ভদ্রলোক; সুতরাং তাঁহার এক কথা—বঙ্কিমচন্দ্র ভুল করিয়াছেন; জানিতেন না বলিয়াই তাঁহার এ ভুল। মূল প্রবন্ধে দেবেন্দ্রবাবু এমন ভাব দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বে মীরজাফরের মৃত্যুর সঠিক

তারিখ এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাংলার নবাব কে ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র দূরের কথা, ফরেষ্ট প্রমুখ ঐতিহাসিকেরাও অন্তত মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ ঠিক ঠিক জানিতেন না। এটা "সাধারণ জ্ঞানে"র অভাববশত আমাদের কাছে কেমন কেমন ঠেকিয়াছিল বলিয়া আমরা লিখিয়াছিলাম, ঐ সমস্ত ঐতিহাসিকগণের কোন্ পুস্তকে কোন্ পৃষ্ঠায় ভুল আছে, তাহা দেখানো হয় নাই। দেবেন্দ্রবাবুর গবেষণা যে "বে-নজীর", তাহা আমরা জানিতাম না। তাঁহার কাছে প্রমাণ-সূচী (reference) চাহিয়া আমরা যেন সতী-সাধ্বী বিধবার কাছে অনবধানতাবশত চুণ চাহিবার মত গুরুতর অপরাধ করিয়া বসিয়াছি। দেবেন্দ্রবাবু এক কাল্পনিক "চ্যালেঞ্জ" গ্রহণ করিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত বহি তিনি ভাল রকম পড়িয়াছেন; যাহা কোন মূর্খও কোন দিন সন্দেহ করিবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভুলের কারণ দেবেন্দ্রবাবু বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া আমরা দেখাইয়াছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস পড়িতেন এবং তাঁহার জন্মের এক বৎসর পূর্ব্বে পিটার অবারের বহিতে দেবেন্দ্রবাবুর বহু গবেষণার ফল সাধের সেই ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৭৬৫ খ্রীঃ লেখা আছে। পিটার অবারের বহি বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সুলভ না হইলেও মিলের বহিখানা তখন ভারতে অপ্রাপ্য ছিল না। মিল সাহেব ভুল করিয়াছেন; রিপোর্ট ভুল করিয়াছে—কিন্তু ভুলটি ফেব্রুয়ারির স্থলে জানুয়ারি অর্থাৎ ৩০ দিনের তফাৎ। মিল সাহেবের বহিতে যদি ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৭৬৫ খ্রীঃ মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ লেখা থাকিত, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভুল করিয়াছেন উহা হইতে কি তিনি নিবৃত্ত হইতেন? সুতরাং দেখা যাইতেছে, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফর মরিয়াছে জানিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছা করিয়া তাহাকে ১৭৭০ সাল পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন; ইহাই ছিল আমাদের কথা। কেন বঙ্কিমচন্দ্র ইহা করিয়াছিলেন, আমরা সাহিত্যের দিক দিয়া তাহারই সংক্ষেপ আলোচনা করিয়াছি। কাব্য নাটক ও উপন্যাস সাহিত্যে শিল্পকলার প্রয়োজনে আখ্যানবস্তুর একটা ঐতিহাসিক আবেষ্টনী সাহিত্যিকেরা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এ আবেষ্টনী ইতিহাসের দিক দিয়া শুধু ভাবত সত্য হওয়া চাই; সন তারিখ নাম হিসাবে সত্য হওয়া শুধু অপ্রয়োজনীয় নহে, রসসৃষ্টির পক্ষে ক্ষতিকর, দেবেন্দ্রবাবু কিছুতেই তাহা স্বীকার করিবেন না. কারণ তাহা হইলে তাঁহার এই 'মৌলিক' গবেষণা মাঠে মারা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র কেন ভুল করিয়াছেন, এইজন্য মাথা না ঘামাইয়া ঐতিহাসিকেরা কেন

এ ভুল করিয়াছেন এটা বিচার করিলেও বুঝিতাম তাঁহার বুদ্ধির অভাব নাই। কথাটা যখন উঠিয়াছে, আলোচনা করাই ভাল। বিলাতে যে সমস্ত রিপোর্ট গিয়াছে, যথা দেবেন্দ্র-বাবু-কথিত Third Report, 1773—তাহাই দেখিয়া মিল সাহেব তাঁহার বহিতে ভুল লিখিয়াছেন। Third Reportএর ভুলটা লেখার দোষেই ঘটিয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য। দেবেন্দ্রবাবু ৮ই ফেব্রুয়ারির (১৭৬৫ খ্রীঃ) দলিল পাইয়াছেন—১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কে কি ভুল করিল এই চীৎকার ছাড়ার অর্থ জগৎকে জানাইয়া দেওয়া, তিনি একটা মারাত্মক রকম ভুল সংশোধন করিয়াছেন। ফরেষ্ট ও মাল্‌কমের বহি হইতে দেবেন্দ্রবাবু যে অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার গবেষণার পাহাড় অবশেষে মূষিক প্রসব করিয়াছে। এখন এই দাঁড়াইতেছে, মীরজাফর কি ৫ই ফেব্রুয়ারি (১৭৬৫) মরিয়াছিলেন, না ৬ই ফেব্রুয়ারি? ভয়ানক কথা, প্রায় ২৪ ঘণ্টার তফাৎ! এমন অঘটনঘটন কি প্রকারে সম্ভব হইল? ৫ই ফেব্রুয়ারির পক্ষে প্রবন্ধ লিখিবার সময় দেবেন্দ্রবাবু নিতান্ত একা ও অসহায় অবস্থায় ছিলেন; আমাদের সমালোচনার প্রসঙ্গে তাঁহার সাথী জুটিয়াছেন—পিটার অবার; দুইজনের মধ্যে ১০১ বৎসরের ব্যবধান। অপর পক্ষে আছেন, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ফরেষ্ট ও মাল্‌কম—যাঁহাদিগকে দেবেন্দ্রবাবু 'সোনার বাংলা'র সেরেস্তাদারী প্রবন্ধে নামাইয়া একটা sensation সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কোন্ পক্ষে পাল্লা ভারী বিচার করিবার শক্তি ও বিদ্যা আমাদের নাই; তবে দলিল পড়িতে গিয়া দেবেন্দ্রবাবু যে "বাঁশ বনে ডোম কানা" বনিয়াছেন, তাহার আর একটা প্রমাণ আমরা পাইতেছি। Imperial Record Department হইতে প্রকাশিত 'Calender of Persian Correspondence'গুলির প্রথম খণ্ডটি (vol. I, 1759-1767) পড়িয়া লওয়া তিনি আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই; কারণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে দেবেন্দ্রবাবুর চোখে তাহার কোন মূল্য নাই—তাঁহার চাই খাঁটি কাঁচা মাল। এই কাঁচা মাল উদরস্থ করিয়া এবং হজম করিতে না পারিয়া পূজার হিড়িকে সাহিত্যের আসরে যে কার্য্যটি করিয়াছেন, আমরা ভদ্রসমাজের পক্ষ হইতে তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, যেদিন দুপুরবেলার পর মীরজাফর মারা যান, সেদিন তিনি কলিকাতায় একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন এবং সকালবেলা মহারাজা নন্দকুমারের কোলে মাথা রাখিয়া রাজ্য-সংক্রান্ত শেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছিলেন। সেদিন ছিল মঙ্গলবার, মুসলমানী শাবান মাসের ১৪ তারিখ। ঐ চিঠি এবং মাহারাজা নন্দকুমার ও নজমুদ্দৌলা লিখিত

মীরজাফরের মৃত্যু-সংবাদ একই দিনে অর্থাৎ ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল (vol. I. পৃ. ৩৭৭-৩৭৮)। সার্ ই. ডেনিসন রস পাদটীকায় (পৃ. ৩৭৭) লিখিয়াছেন, "This is the last letter from the Nawab Mir Jafar, as he died on the 6th Feb. 1765"। ফরেষ্ট সাহেব দেবেন্দ্রবাবুর চেয়ে ঢের বেশিদিন দলিল লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছেন। তিনি ১৪ই শাবান মঙ্গলবার, 6th Feb, 1765 ধরিয়া এ তারিখ দিয়াছেন, অথবা অন্য ইংরেজী দলিলে ৬ ফেব্রুয়ারি পাইয়াছেন, আমরা বলিতে পারিব না। তবে আমরা মোটামুটি জানি, new style এবং old styleএর গণনায় প্রায়ই একদিন গোলমাল হয়। বার মিলাইতে গেলে তারিখ মিলে না; তারিখ মিলাইতে গেলে বার মিলে না। দেবেন্দ্রবাবুর মিঃ মিডল্‌টন ব্যতীত জর্জ গ্রে, মিঃ ড্রোক্স এবং অন্যান্য সাহেব মীরজাফরের মৃত্যুর সময় মুরশিদাবাদে ছিলেন। ফরেষ্ট, মাল্‌কম, সার্ ডেনিসন রসকে অপ্রতিভ করিতে হইলে আরও কয়েকখানা দলিলের প্রয়োজন, 'শনিবারের চিঠি'তে এ বিষয়ে আর আলোচিত হইবে না, কলিকাতায় এজন্য বহু ঐতিহাসিক পত্রিকা আছে। এক দিনের ভুল হইলেও ভুল তো বটেই—ইহাই দেবেন্দ্রবাবু "উত্তরে" উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, কারণ এইরূপ ভুল দেখাইয়াই তিনি বোধ হয় স্কুলে first prize পাইতেন। দেবেন্দ্রবাবু ঐতিহাসিক না হইয়া দৈবজ্ঞ হইলে অধিক সুনাম অর্জ্জন করিতেন। তাঁহার ধারণা, ইতিহাস একটা দিন-পঞ্জিকা। আমাদের "মনোবৃত্তি"কে দেবেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "ধৃষ্টতা"; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকীর বৎসরে নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য সেই মহাপুরুষের বিদ্যা ও বুদ্ধির ছিদ্র অন্বেষণ করাকে আমরা কি নাম দিব ?

দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার উত্তরে "আমি জানি" "অপ্রাসঙ্গিক" "বলিব না" ইত্যাদি মুরব্বিয়ানার কথা বলিয়াছেন। ভাবখানা অনেকটা সেই "হেলায় লঙ্ঘিতে পারি শতেক যোজন"-এর মত ; কিন্তু কেহ কোন দিন লম্ফটা দিতে দেখিল না। আমরা এটা পড়ি নাই, সেটা পড়ি নাই বলিয়াছেন। উইলিয়ম বোল্টসের পুস্তকখানা পড়ি নাই, নামও শুনি নাই, ইহা আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিতেছি। কিন্তু যেখানে ১৭৬৫ খ্রীঃ ৫ কি ৬ই ফেব্রুয়ারি—ইহাই নির্ণয় করিবার বিষয়, সেক্ষেত্রে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের কোনও দলিল আদৌ প্রয়োজনীয় হইতে পারে,—এমন সন্দেহ দেবেন্দ্রবাবুর মত পণ্ডিত ব্যতীত আর কে করিবে ? ঠিকমত জাহির বোঝাই না হইলে দেবেন্দ্রবাবুর মত পণ্ডিতেরা বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করেন।

ইহার পর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা। এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রবাবু আক্ষেপ করিয়াছেন, আমাদের অজ্ঞতার একটা মস্ত সুবিধা আছে—যাহা তিনি "সমসাময়িক" অনেক দলিল-পত্র পড়িয়া হারাইয়াছেন। পাছে সে সমুদয় পড়িবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদের হয়, সেজন্য ইহাও জানাইয়াছেন যে, ঐগুলি নূতন দিল্লীতে চলিয়া গিয়াছে। খবরটাও কি মারাত্মক রকম নূতন! ইহাকেই বলে, "খবরদার"! মীরজাফর সম্বন্ধে তিনি জোর গলায় বলিয়াছেন "ঐ সময়ের ঘটনাবলীর জন্য তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা যায় না"; কেন না, তিনি প্রমাণ করিয়াছেন পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মীরজাফরের মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাহা বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন না। অতি সত্য কথা। মীরজাফর দেশের যে দুর্দ্দশা চোখে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, সেজন্য কেমন করিয়া তাঁহাকে "প্রত্যক্ষ" দায়ী করা যায়? "প্রত্যক্ষ" শব্দের অর্থ দেবেন্দ্রবাবু 'চলন্তিকা' দেখিয়া ঠিক করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার ভুল হইতে পারে না। মন্বন্তরের জন্য "প্রত্যক্ষ" শব্দের এ অর্থ দায়ী মীরজাফর কিম্বা ক্লাইভ নহে; দোষী হইতেছেন পর্জ্জণ্যদেব। বৃষ্টি না হইলে দুর্ভিক্ষ হয়, মানুষ মরে—এ কথা সকলেই জানে। অতএব দেখা যাইতেছে, দেবেন্দ্রবাবু যেমন মনে করিয়াছেন তাঁহার প্রতি আমাদের "ব্যক্তিগত বিদ্বেষ" আছে, সে রকম বঙ্কিমচন্দ্রেরও মীরজাফরের প্রতি নিশ্চয়ই একটা "ব্যক্তিগত বিদ্বেষ" ছিল; নতুবা হাতের কাছে মিল সাহেবের বহিখানা থাকা সত্ত্বেও তিনি মীরজাফর-চরিত্রকে মন্বন্তরের কলঙ্ককালিমায় বিকৃত করিলেন কেন? দেবেন্দ্রবাবুর মতে মীরজাফর 'আনন্দমঠে'র একজন প্রধান (?) ঐতিহাসিক ব্যক্তি! তাঁহার সম্বন্ধে "ভুল ধারণা" জন্মাইবার অধিকার বঙ্কিমচন্দ্রের নাই—আমরা বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের এ অধিকার ছিল; তিনি উহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

বড়ই আক্ষেপের বিষয়, আমাদের "অজ্ঞতা" দেখিয়া দেবেন্দ্রবাবুর দারুণ অভিমান হইয়াছে। তিনি আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা-কাটাকাটি করিবেন না; কেন না, ইতিপূর্ব্বেই তিনি একখণ্ড মোটা বহি ছাপাইয়াছেন, আর একখানি লেখা শেষ করিয়াছেন; অতএব মন্বন্তর সম্বন্ধে তাঁহার সব-কিছুই জানা আছে। কিন্তু এই মন্বন্তর-পারদর্শী অধ্যাপক মহাশয়ের সেই সর্ব্বজ্ঞতা তাঁহার বহিতে কোথাও চোখে পড়িল না, শুধু একটা দিক তিনি দেখিয়াছেন—সেটা হইল ভারত গভর্মেণ্টের দপ্তরখানার দলিল, যাহা এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক চক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে মনে করিয়া তিনি আত্মপ্রতারিত

হইয়াছেন। এহেন দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমরা কেমন করিয়া "মন্বন্তর" সম্বন্ধে তর্ক করিব? স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই বলিয়াছেন—আমাদের সম্বল "খোলা আর সিটে"; তবুও আমাদের দুরাশা 'তিতীর্ষুঃ দুস্তরং মোহাৎ উড়ুপেনস্মি সাগরম্।" কিন্তু দেবেন্দ্রবাবুই যে মন্বন্তর সম্বন্ধে মন্ত্রদ্রষ্টা হইয়াছেন, ইহার "নিঃসংশয়" প্রমাণ তিনি কোথায় দিয়াছেন? তাঁহার সম্বলের মধ্যে তো দেখিতেছি, ইংরেজের সরকারী দপ্তরে রক্ষিত দলিল এবং ইংরেজের লেখা কেতাব। সুধীবর্গ বিবেচনা করিবেন, ইংরেজ রাজত্বের ঘোরতর কলঙ্ক ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য কে দায়ী—ইংরেজের দপ্তরে গরু খোঁজা করিয়া কি কোন ঐতিহাসিক তাহার সন্ধান পাইবে? এক-তৃতীয়াংশ মরিলেও মন্বন্তরের সময় এ দেশে লোক কিছু কিছু ছিল। বাদী ও বিবাদী দু-পক্ষের সাক্ষ্যবিচার না করিয়া একতরফা ডিক্রী দিলে কাজির বিচার হয় বটে; কিন্তু ইতিহাস হয় না।

এ সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে দেবেন্দ্রবাবু স্বপ্রণীত *Early Land Revenue System in Bengal and Bihar*, vol I. 1765-1772 পুস্তকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; যেহেতু তিনি যে ফরেষ্ট সাহেবকে ঝাঁকুনি দিয়া কাবু করিয়াছেন, উহাতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। ইহা ছাড়া আরও প্রমাণ তাঁহার কাছে আছে; "ছেলেমানুষি হইয়া যায় বলিয়া ওইগুলি দিব না"—ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু তাঁহার পুস্তক পড়িয়া মনে হইল না, তিনি ফরেষ্ট সাহেবকে কোথাও 'হাঁটুর নীচে ছাড়া' উপরে বিদ্ধ করিতে পারিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অবশ্য আমাদের মতামতের কোন স্থায়ী মূল্য নাই। ঐতিহাসিকেরা উহা বিবেচনা করিবেন। বহিখানিতে আছে কেবল "সঞ্জয় উবাচ", "বৈশম্পায়ন উবাচ" ইত্যাদি, কিন্তু গ্রন্থকার 'কিমুবাচ' বুঝিয়া লওয়া দুষ্কর। শুনিয়াছিলাম স্বর্গীয় গৌরাঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শোচনীয় মৃত্যুর পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অমূল্য আঠার শিশি ও ধারালো কাঁচিখানার কোন হদিস মিলে নাই। দেবেন্দ্রবাবু সগোত্রাধিকারসূত্রে ৺গৌরাঙ্গবাবুর জিনিসগুলি পাইয়াছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উহার নোটিস দেওয়া উচিত ছিল।

দেবেন্দ্রবাবু টিপ্পনী কাটিয়াছেন, আমাদের ইষ্টদেবতারা ভুল করিয়াছেন; ইহা আমরা স্বীকার করিব। আমাদের ইষ্টদেবতা পিটার অবার ও ডড্‌ওয়েল যে দেবেন্দ্রবাবুর বহু পূর্ব্বেই এই সত্যটুকুরও সন্ধান পাইয়াছিলেন, একথা গলা টিপিয়া ধরার পূর্ব্বে ভদ্রলোকের মত তাঁহার মূল প্রবন্ধে স্বীকার করিলে তাঁহাকে এতটা নাকাল হইতে হইত

না, ইহা বোধ হয় তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, রাজনীতিক্ষেত্রে ইংরেজের সহিত আমাদের বিরোধ থাকিলেও ইংরেজ তথা সমগ্র ইউরোপীয় মনীষিগণকে আমরা ইষ্টদেবতা জ্ঞানে চিরকাল শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আসিতেছি। এজন্য বৎসর বৎসর আমাদের ছেলেরা তাঁহাদের কাছে বিদ্যাশিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা করে। না হয় এবার হইতে ঢাকাতেই যাইবে!

আমরা দেবেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধেরই সমালোচনা করিয়াছিলাম; কোন সাহেব তো পাল্লার ভিতর আসেন নাই। আমরা যে সমস্ত "প্রামাণিক" গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করিয়াছি, দেবেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, সেগুলি সব নির্ভুল নহে। দেবেন্দ্রবাবুর বিদ্যার মাপে নিশ্চয়ই কোনটা নির্ভুল নহে—প্রামাণিক হওয়া তো দূরের কথা। তাঁহার প্রবন্ধ ও "উত্তর" পড়িয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন "ভুল" অর্থে দেবেন্দ্রবাবু কি বুঝেন—বড় জোর ৫ই কি ৬ই ফেব্রুয়ারি। বঙ্কিমচন্দ্র বৎসরটা হয়তো জানিতেন, কিন্তু ৫ই কি ৬ই তাহা তো জানিতেন না। এতদিন পরে শ্রীদেবেন্দ্র সেই স্বর্গত আত্মার প্রীত্যর্থে এই ভুলটি বাহির করিয়াছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রও নিশ্চয় গলদশ্রুলোচনে ও গদগদভাবে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। আমাদের পাদটীকায় *this* (his হওয়া উচিত ছিল) এবং অন্যত্র Aitchison-র Treaties, Engagements and Sanads, etc. (শুধু Treaties and Sanads নহে) ইত্যাদি ভুল দেবেন্দ্রবাবুর চোখে বড় লাগিয়াছে—কাজেই "নির্ভুল" অর্থে দেবেন্দ্রবাবু কি বুঝেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের দেশে এ রকম Proof-readerএর নিতান্ত অভাব। কি করিব? আমাদের তো Longman নাই! দেবেন্দ্রবাবু ইতিহাসের লোক নহেন বলিয়াই "Treaties and Sanads" লিখিয়াছিলাম; কোন ঐতিহাসিককে লিখিতে হইলে শুধু "Treaties" লিখিতাম—ইহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না—মাছি আর কাহাকে বলে?

তবু, ভুল না হয় হইয়াছে, মূর্খ লোকের ভুল হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু, ১৭৬৫ সালে মীরজাফরের মৃত্যু, ইহা কেহ তাঁহার পূর্ব্বে আবিষ্কার করে নাই, তাঁহার প্রবন্ধের সেই প্রতিপাদ্যটি কোন্ জাতীয় মূর্খতা? আমরা মূর্খ হইলেও হস্তিমূর্খ নই।

দেবেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "আমার যুক্তির ভিত্তি যখন সমসাময়িক দলিলপত্র, তখন দলিলে প্রদত্ত বানান অনুসারে বাংলায় নাড্জুন্-উল-দৌলা বা নাজমুদ্দৌলাকে নাজিমুদ্দৌলা লিখিলে কোনও দোষ হইতে পারে না।" যুক্তিটি যেমন মৌলিক তেমনই

অদ্ভুত। দেবেন্দ্রবাবু ভুলিয়া গিয়াছেন, দলিল His Master's Voice নহে যে, চোঙ্গার ভিতরে মুখ ঢুকাইয়া দিলে উচ্চারণ শুনিতে পাইবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ৫ কি ৬ই লইয়া যিনি আকাশ-পাতাল তোলপাড় করিতে পারেন, একটা নাম শুদ্ধ করিবার বেলায় তাঁহার গবেষণা এমন হোঁচট খায় কেন? Calender-এর vol. I—যেখানে স্বয়ং ডেনিসন রস মীরজাফরের চিঠি হইতে তাঁহার পুত্রের নামের শুদ্ধ উচ্চারণ ইংরেজী করিয়া দিয়াছেন, সেখানে দপ্তরী-বিদ্যা পৌঁছিতে পারিল না কেন? তাঁহার দাবি—"অনেক জার্মান ও ফরাসী নাম ইংরেজরা ইংরাজির মত করিয়াই লেখেন ও উচ্চারণ করেন"; সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া "কেনই বা বাংলায় পারসী বা আরবী নামের উচ্চারণ পারসী বা আরবীর মত করে" করিবেন? ইংরেজের সহিত ফরাসী কিম্বা জার্মানদের যে সম্বন্ধ, মুসলমানের সহিত হিন্দুদের কি সেই সম্বন্ধ? ইহাকেই বলে, ঐতিহাসিক উপমা এবং ইতিহাসবেত্তার কাণ্ডজ্ঞান! সুতরাং আশা করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাঁ বাহাদুর নাজির্ উদ্দীন্ সাহেবকে দেবেন্দ্রবাবু এখন হইতে নজীর্ উড্ডান্ সম্বোধন করিয়া জাত্যাভিমানের পরিচয় দিবেন। দেবেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, "ইংরাজির বেলাও আমরা সে রকম করি না। Calcuttaকে কলিকাতা বলি; Delhiকে দিল্লী বলি; Bombayকে বোম্বাই বলি"। এ যুক্তি কোন্ পক্ষে? "উত্তর" দিতে হইবে বলিয়া এমনই দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইতে হয়! যে ফরেষ্টের উপর, ৫কে ৬ করার দরুন, দেবেন্দ্রবাবু দারুণ খাপ্পা হইয়াছেন, তিনিই textএ নাজিম-উদ্দোলা লিখিয়া নীচে পাদটীকায় ঐ নাম শুদ্ধ করিয়া নজমুদ্দৌলা লিখিয়াছেন। দোহাই দেবেন্দ্রবাবু! ইহার উত্তর আর আমরা চাহি না।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, হস্তলিখিত দলিল ভিন্ন আর কিছুতেই যখন দেবেন্দ্রবাবুর আস্থা নাই; তখন তাঁহার বহি লেখার পূর্ব্বে যে সমস্ত দলিল ছাপা হইয়া গিয়াছে, ঐগুলি সবই নিশ্চয় বাতিল হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে ভয়ের কথা এই যে, তাঁহার সমধর্ম্মী ভবিষ্যৎ গবেষকগণও তাঁহার এই ছাপা দলিলগুলির প্রতি হয়তো সেই রকমই আস্থাহীন হইবে। তাহারাও হস্তলিখিত দলিল ভিন্ন আর কিছুই মানিবে না, এবং যেহেতু ঐরূপ দলিল নকল করাই গবেষণার পরাকাষ্ঠা, অতএব স্বয়ং Longmanও তাহাদের ভক্তি উদ্রেক করিতে পারিবেন না—সেই কথা ভাবিয়া আমরা দেবেন্দ্রবাবুর প্রতি আমাদের "ব্যক্তিগত বিদ্বেষ" সম্বরণ করিলাম।

নেতার উক্তি

(ড্রয়িং-রুমে)

মূল্য আমার আছে কি না আছে, কে করিবে বল নির্দ্ধারণ ?
মূঢ় মর-মানুষের মূল্য লইয়া কেনই বা এত শিরঃপীড়া !
জনতার মন করেছি হরণ, মুগ্ধ জনতা মোর চারণ—
বাহাদুরি নাই ? শুষ্ক কথায় ভিজাই কেমন শক্ত চিঁড়া !
মূল্য আমার থাক্ না থাক,
চিরকাল ধ'রে রেডিও কাগজে বাজিছে, বাজিবে আমারি ঢাক।

২

যাহা বলি, তার গভীর অর্থ এখনও বন্ধু বোঝ নি নাকি ?
আপেল আঙুরে নিন্দা করিয়া চুম্বন করি কুমড়ো কদু,
বুলবুল শ্যামা তাড়াইয়া দিয়া পুষিয়াছিলাম ছাতারে পাখী,
তাহাও তাড়াব, মশা ছারপোকা চাহে আধুনিক রামা ও যদু।
আসল অর্থ কথার নয়,
আসল অর্থ ব্যাঙ্কেতে থাকে, দুনিয়া জুড়িয়া যাহার জয়।

৩

সেকেলে-মার্কা বিবেকের সখা, কি ব'লে এখনও দোহাই দাও ?
নতুন রকম নানান বিবেক ছেয়েছে বাজার, ভরেছে গোলা,
নাৎসি, জাপানী, খদরি, ফ্যাসিস্ত, লাঙল, কাস্তে—যা খুশি চাও,
তোমার বিবেক, আমার বিবেক ? শিকায় সেগুলি থাকুক তোলা
এবার বন্ধু কুম্ভীপাক,
কাকের পালক চুরি ক'রে ক'রে ময়ূরেরা সব সাজিছে কাক।

"বনফুল"

মীরজাফরীয় বিভ্রাট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং Corresponding Member, India Historical Records শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধের সমালোচনা আমরা 'শনিবারের চিঠি'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "প্রসঙ্গ কথা"র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য ঐ সমালোচনা আমাদের অনুমোদিত ছিল বটে, কিন্তু ঐ সমালোচনা আমাদের কৃত নয়; কারণ আমরা পণ্ডিত নহি, কোনও বিদ্যার বিশেষজ্ঞ বলিয়া আমাদের কোনও দাবি নাই। এক্ষণে ঐ সমালোচনার উত্তর এবং তাহারও প্রত্যুত্তর প্রকাশিত করিয়া আমরা যুযুধান পণ্ডিতযুগলের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করিলাম; ফলাফল মীমাংসার ভার অবশ্যই 'চিঠি'র পাঠকগণের উপরেই রহিল। কি উদ্দেশ্যে আমরা এইরূপ বাদ-প্রতিবাদকে এতখানি স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলাম, তাহারই প্রসঙ্গে দুই চারি কথা নিম্নে লিখিতেছি।

* * * *

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে যে, "কেঁচো খুঁড়িতে গেলে অনেক সময়ে সাপ বাহির হইয়া পড়ে"। আমরাও আশ্চর্য্য হইয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া মূল প্রবন্ধলেখক কিরূপ সাপের মুখে পড়িয়াছেন! 'শনিবারের চিঠি'র সমালোচনা যে একটু

তীব্র হইয়াছিল, তাহা আমরাও জানি; কিন্তু ইহাও স্বীকার করি যে, সমালোচকের এইরূপ মনোভাবের হেতু ছিল; কারণ কোনও পণ্ডিতম্মন্য বিদ্যাভিমানী ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ তুচ্ছ বিষয়কে এরূপ উচ্চ করিয়া তোলা নিতান্তই বিরক্তিকর। এবার দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার সেই তুচ্ছ প্রবন্ধটিকে গুরুত্ব দিবার জন্য, আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তিনি অর্থাৎ সেই প্রবন্ধলেখক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান অধ্যাপক, এবং Corresponding Member ইত্যাদি! শেষোক্ত পদবীটির গুরুত্ব বুঝিবার মত জ্ঞান আমাদের নাই। কিন্তু সেই প্রবন্ধ ও তাহার সমালোচনার উত্তরে এই পণ্ডিত-মানুষটির যে পাণ্ডিত্য ও যুক্তিশীলতার পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রধান অধ্যাপক হইতে হইলে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন কি থাকা চাই, তাহাই ভাবিয়া পাইতেছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বপণ্ডিতগণের গবেষণার নমুনা আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেক পাইয়াছি, এবং 'চিঠি'র পাঠকবর্গকে তাহার পরিচয়ও দিয়াছি। এবার ঢাকাই গবেষণার ও তথা গবেষকের বিচারবুদ্ধির একটি মনোরম নমুনা দৈবক্রমে লাভ করিয়া 'চিঠি'র সৌভাগ্য সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। কলিকাতার সহিত ঢাকার প্রভেদ এই যে, এখানে বিশ্বপণ্ডিতগণ ছোট কথায় কান দেন না—এরূপ সমালোচনার উত্তরে কিছুই না বলিয়া অতি গম্ভীরভাবে মৌন অবলম্বন করিয়া চাণক্য পণ্ডিতের উপদেশ পালন করেন। কিন্তু ঢাকা একটি storm-centre, সেখানকার বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ কিছু বেশি, তাই সেখানকার বিশ্বপণ্ডিতগণের কচ্ছ সহজেই মুক্ত হইয়া পড়ে। দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ দিন দিন কোথায় নামিতেছে! প্রধান অধ্যাপকের মতিগতি ও বিদ্যাবুদ্ধি

যদি এই দরের হয়, তবে সেই অনুপাতে অপ্রধানদের চিত্তপ্রকর্ষ কিরূপ হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি।

লেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা জানিতাম না, সেটা আমাদেরই দুর্ভাগ্য; তিনি যে এত বড় একজন পদস্থ ব্যক্তি, এবং শুধু তাহাই নয়, বিলাতী লংম্যান কোম্পানি তাঁহার পুস্তক ছাপাইয়াছে, তাহা না জানিয়া আমরা কি ভুলই করিয়াছি! 'গবর্মেণ্ট রেজিষ্ট্রিকৃত' বলিয়া অনেক বস্তু বাজারে বিজ্ঞাপিত হয়, সেগুলিও নিশ্চয় ঐ লংম্যান কোম্পানির প্রকাশিত পুস্তকের মতই মহামূল্যবান! লেখকের বক্তব্য বস্তু যাহা, তাহা তো এক আঁচড়েই সাফ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তবুও এই অতি তুচ্ছ বিষয়টিকে অবলম্বন করিয়া স্বমহিমা প্রচারের কি প্রাণান্ত প্রয়াস! আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক, আমি corresponding clerk, আমি মোটা মোটা বহি লিখিয়াছি! অথচ আসল কথাটা যে কোথায় গিয়া ঠেকিল, তাহার আর উদ্দেশ নাই! বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'আনন্দমঠে' ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সম্পর্কে মীরজাফরের নাম করিয়াছেন, ঐ মন্বন্তরের জন্য তাঁহাকেও দায়ী করিয়াছেন, ইহা তাঁহার ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাববশতই ঘটিয়াছে, কারণ মীরজাফর ঐ ঘটনার প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছিলেন। ইহাই ছিল দেবেন্দ্রবাবুর যুগান্তকারী গবেষণার ফল। ইহার উত্তরে আমাদের সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র মীরজাফরের মৃত্যু-তারিখ যে জানিতেন না, তাহা মনে করিবার কারণ নাই; কারণ ঐ তারিখ দেবেন্দ্রবাবুর আবিষ্কার নহে, বঙ্কিমবাবুর বহু পূর্ব্বে ও সমসময়ে নানা ঐতিহাসিক আলোচনায় তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এবং আজ যাহা দেবেন্দ্রবাবু নিজ আবিষ্কার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা শুধুই বড়

বড় ইতিহাস-গ্রন্থে নয়, স্কুলপাঠ্য পুস্তকেও স্থান লাভ করিয়াছে। এই কথাটা আমাদের সমালোচক বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কারণ, দেবেন্দ্রবাবুর লেখাটি পড়িলে কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'কে অবলম্বন করিয়া ঐ তারিখটির সঠিক সংবাদ নিজ আবিষ্কার বলিয়া ঘোষণা করাই এবং তজ্জন্য বাহাদুরি লওয়াই ছিল লেখকের আসল অভিপ্রায়। আমাদের সমালোচক একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, ঐতিহাসিক হিসাবেই তাঁহার কিছু প্রতিষ্ঠা আছে এবং সে প্রতিষ্ঠা যে অমূলক নহে, তাহা এই বাদানুবাদ যাঁহারা পড়িবেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন। দেবেন্দ্রবাবু সম্পূর্ণ পরাস্ত হইলেও হাল ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি এক্ষণে পাঁচ বৎসরের ব্যাপারটাকে ২৪ ঘণ্টার সূক্ষ্মতায় টানিয়া ধরিয়া মল্লভূমি কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র কথা যাহাই হউক, তাঁহার বিদ্যা তো নিষ্ফল হয় নাই। ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার পক্ষে ৫ বৎসরও যাহা ৫ ঘণ্টাও তাহাই, ইহা যে না মানে এবং সেই সঙ্গে দেবেন্দ্রবাবুর আবিষ্কারের মাহাত্ম্য যে না স্বীকার করে, তাহার মত দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির ঐতিহাসিক বিচারে অবতীর্ণ হওয়া ধৃষ্টতা নহে কি? আমাদের ইতিহাস-নিষ্ঠা যে এতখানি নাই তাহা স্বীকার করি; কিন্তু বঙ্কিমবাবুকে লইয়া টানাটানি কেন? উত্তরে দেবেন্দ্রবাবু সে সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন নাই। কেবল ইহাই বলিয়াছেন যে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য মীরজাফর দায়ী হইতে পারেন না। কেন, তাহা তিনি অন্যত্র বিশদভাবে বুঝাইয়া দিবেন।

ইহাকেই বলে 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী'; স্পর্দ্ধারও একটা মাত্রা আছে আমরা স্বীকার করি, তথ্য এক হইলেও তত্ত্ববিচারে পণ্ডিতগণের মত ভেদ হইয়া থাকে এবং হওয়াও অসঙ্গত নহে। বঙ্কিমবাবু যে বুদ্ধি, যে বিদ্যা, যে দৃষ্টিশক্তির বলে, তথ্যবিচার করিয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য মীরজাফরকেও দায়ী করিয়াছেন, আমাদের এই নবদপ্তরবিদ্যা-বিশারদের মতে তাহা ঠিক নহে; অর্থাৎ যেহেতু ৫ই ও ৬ই-এর গুরুতর প্রভেদ সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর ঐতিহাসিক সূক্ষ্মজ্ঞান ছিল না এবং যেহেতু

এই দপ্তর-মুদ্রারাক্ষসের সেইরূপ তথ্যঘটিত জ্ঞান পরিমাণে অত্যধিক হইয়া উঠিয়াছে, অতএব তাঁহার বিচার বঙ্কিমবাবুর অপেক্ষা নির্ভুল হইতে বাধ্য। অর্থাৎ মাছিমারা কেরানির বিদ্যাই একজন মহামনীষী লেখকের চেয়ে বেশি। দেবেন্দ্রবাবুর এই প্রতিবাদটিব মধ্যেই যে যুক্তি-জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে মীরজাফরের কলঙ্কস্থালনে তিনি যে বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিবেন, সে সম্বন্ধেও আমাদের কোনও কৌতূহল নাই। দেবেন্দ্রবাবুর প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই; বরং যথেষ্ট হিতৈষণা আছে, সেই কারণেই তাঁহাকে আমরা এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, অতঃপর এইরূপ গবেষণার ফল প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বে তিনি যেন কেবলই দলিল-সাহায্যে তৃপ্ত না হন এবং দলিলের টুকরা উদ্ধৃত করিয়াই যে পণ্ডিত হওয়া যায় না, ইহা মনে করিয়া প্রধান অধ্যক্ষ প্রভৃতির অভিমান ত্যাগ করেন; কারণ তাহাতে বাংলা দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গৌরবহানিই হয়, আমাদিগেরও লজ্জা হয়। প্রতিবাদ লিখিবার কালে তিনি এতই অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছেন যে, প্রতিপক্ষকে ইংরেজ পণ্ডিতের অন্ধ স্তাবক বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, দেন্দ্রেবাবুর বিদ্যা কোথা হইতে? ইংরেজ পণ্ডিতের আরাধনা না করিলে তাঁহার মত পণ্ডিত আমাদের দেশে এত সস্তা হইতে পারিত? তিনি কোন্ দেশীয় বিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছেন? ভারতীয় বিদ্যার কোন্ বিভাগে তিনি কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন? বাংলাও তো ভাল লিখিতে পারেন না। বরং সেই ইংরেজ পণ্ডিতদের নিকটেই আরও ভাল করিয়া পাঠগ্রহণ করিলে তিনি সমধিক উপকৃত হইবেন। তাঁহাদেরই এক পণ্ডিত তাঁহাকে এই উপদেশ দিবেন যে—

He who possesses a sense of values cannot be a Philistine; he will value art and thought and knowledge for their own sakes, not for their possible utility...Knowledge is not a direct means to good: its action is remote. An exact knowledge of the dates of the Kings and Queens of England will put no one into a flutter. Knowledge is a food of infinite potential value which must be assimilated by the intellect and imaginatian before it can become positively valuable.

ভূয়োদর্শন

১৮

যুগলবাবু লোকটিকে আগে অবশ্য চিনিতাম, অল্প দিন হইতে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে ভদ্রলোক সুগন্ধি কেশ-তৈলের ব্যবসায় করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এখনও সে প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু অধুনা গোপনে গোপনে (কেন যে গোপন করিতেছেন, জানি না) তিনি কেরোসিন তৈলের ব্যবসাতেও লিপ্ত হইয়াছেন শুনিতেছি। চোরাবাজারেও যাতায়াত আছে। রাই কুড়াইয়া একটি নয়, কয়েকটি বেলই তিনি বানাইয়াছেন—এইরূপ জনশ্রুতি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অর্থবান বলিয়া ভদ্রলোকের এতটুকু অহমিকা নাই, তাঁহার গর্ব্ব হৃদয় লইয়া। তাঁহার নিজের হৃদয় তো সর্ব্বদাই গলগল করিতেছে, তাঁহার সংস্রবে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাও নিস্তার পান নাই, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।

আসিয়াই বলিলেন, একটা সিগারেট দিন।

দিলাম। সিগারেট ধরাইয়া ভদ্রলোক পকেট হইতে একতাড়া নানা রঙের খামের চিঠি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, পঁচিশ জনের চিঠি; বাড়িতে আরও অনেক আছে।

উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সহসা বক্তৃতা দিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। এই বাই আমার আছে এবং একবার চাগিলে রোধ করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং সোৎসাহে বলিলাম, একটি বক্তৃতা দিব। শুনিবেন কি?

সিগারেটে টান মারিয়া যুগলবাবু বলিলেন, নিশ্চয়। বলুন বলুন, আপনার কথা শুনিতে আমার বেশ লাগে।

হাঁটু দোলাইতে লাগিলেন। আমিও গলা-খাঁকারি দিয়া সুরু করিলাম, দেখুন, পুরাকালে ফুলবাগানের সখ ছিল। সখ ছিল, কিন্তু সুবিধা ছিল না। যে বস্তু থাকিলে মানবের অধিকাংশ আধিভৌতিক অসুবিধাই বিদূরিত হয়, সেই বস্তুটিরই অভাব ছিল,—টাকা ছিল না। অল্প মাহিনায় সর্ব্বদিক রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে যে সকল কলা-কৌশল ক্ষুদ্রত্ব-মহত্ত্ব-সরলতা-কপটতার চর্চ্চা করিতে হয়, আমাকেও সে সকল করিতে হইয়াছিল। দারুণ দুর্য্যোগের মধ্যে ফুটা সংসার-তরণীটিকে ময়ূরপঙ্খীর মত সাজাইয়া সগৌরবে যে বিদ্যার জোরে সেটি তীরস্থ করিয়াছি, তাহাকে ভোজবিদ্যা আখ্যা দিলে অসঙ্গত হইবে না। বাক্‌চতুর বাজিকর অন্যমনস্ক দর্শকের মূঢ়তার সুযোগ লইয়া যে ভাবে অসম্ভবকে সম্ভবপর করিয়া দেখায়, অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত আমিও সম্ভবত ভোজবিদ্যাবলে বলীয়ান হইয়াই সেই ভাবে বাহিরের ভড়ং বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এই জাতীয় কোন একটা অঘটনঘটনপটিয়সী নিপুণতা না থাকিলে আমার স্বল্প আয় সত্ত্বেও শোভনতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ কোন নিমন্ত্রণ-বাড়িতে অথবা থিয়েটার-সিনেমায় গৃহিণীকে বেশবাস-অলঙ্কার-দৈন্যে কখনও বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইতে হয় নাই, বাড়ির ভোজ-কাজে শাকভাজা চচ্চড়ি হইতে সুরু করিয়া লুচি, পোলাও, দইমাছ, মাছের কালিয়া, চিংড়িমাছের মালাইকারি, মাংসের কোর্ম্মা, কাট্‌লেট, চপ, দ্বিবিধ ডাল ও চাটনি, দই, পায়েস, রসগোল্লা, সন্দেশ, বুঁদিয়া, জিলাপি, পুডিং, কাস্টার্ড প্রভৃতি শালপাতার উপর থরে থরে সাজাইয়া হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান তিনটি সভ্যতারই মান রক্ষা করিয়াছি, নিজের দরিদ্র আত্মীয় অথবা আত্মীয়াকে অকারণে কখনও কিছু কিনিয়া দিবার সামর্থ্য হয় নাই বটে, কিন্তু লৌকিকতা-ব্যাপারে ছোট নজরের

পরিচয় দিয়াছি, অতি বড় শত্রুও এ কথা বলিতে দ্বিধা করিবে। সংক্ষেপে চিঠির ভাষা ও ভাব যেমনই হউক না কেন (তাহা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না), চিঠির কাগজ, বিশেষত চিঠির লেফাপা দ্বারা সকলকে সম্মোহিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি। এই অসাধ্যসাধনের ইতিহাস একাধিক কুসীদজীবী মহাজনের খাতায় কড়ায় ক্রান্তিতে বিধিবদ্ধ হইয়া আছে।

অভিভূত যুগলবাবুর হাঁটু-নাচানো বহুক্ষণ পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এইবার সুযোগ পাইয়া তিনি কণ্ঠাগত প্রশ্নটিকে বাঙ্ময় করিলেন, সবই বুঝিলাম, কিন্তু যাহা বলিলেন, তাহার সহিত আমার এই চিঠিগুলির সম্পর্ক কি? সম্পর্ক কিছুমাত্র নাই। বক্তৃতা দিতে হইলে অবান্তর কথা দুই-চারিটা অনিবার্য্য ভাবেই আসিবে, উহাতে কিছু মনে করিবেন না। আসল কথা, ফুলবাগানের সখ ছিল। কিন্তু তখন সমাজের যে স্তরে বিরাজ করিতাম, সে স্তরে এ সখের মূল্য কেহ দিত না, সুতরাং ইহার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে সঙ্কুচিত হইতাম। দামী জুতা, শাল, গহনা অথবা শাড়ির জন্য অর্থ জুটাইতে হইত, কারণ সেগুলি প্রতিবেশীগণের অন্তরে শ্রদ্ধা সম্ভ্রম এবং হিংসার উদ্রেক করিয়া বিচিত্র পদ্ধতিতে আমাদের সুখোৎপাদন করিত। সংক্ষেপে ফুলবাগানের জন্য উদ্বৃত্ত বিশেষ কিছু থাকিত না, এবং ফলে উঠানের এক কোণে অপরের নিকট হইতে চাহিয়া আনা কয়েকটি ফুলগাছ পুঁতিয়া সসঙ্কোচে মনের সখ মিটাইতাম। আমার সেই নগণ্য বাগান কোন লোকের প্রশংসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই বটে, কিন্তু সে যুগের আমার লেফাপা-লাঞ্ছিত জীবনে উঠানের সেই ছোট বাগানটুকুই আমার প্রাণের সত্যকার আশ্রয় ছিল। ওইটুকুর মধ্যেই কোন লেফাপা ছিল না। বস্তুত সেই ছোট বাগানটিকে আজও আমি ভুলি নাই। সর্ব্বসমেত বোধ হয় গুটি

দশেক গাছ ছিল, কিন্তু প্রত্যেক গাছের প্রত্যেক পাতাটি আমি চিনিতাম। প্রতি গাছের প্রতি ফুলটির উন্মেষ হইতে অবসান পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতাম। কোন্ গাছে কখন কুঁড়ি হইল, কুড়িটি কতদিনে ফুটিয়া ফুল হইল এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে কেমন করিয়া ঝরিয়া পড়িল—কিছুই আমার দৃষ্টি এড়াইত না। প্রত্যেক গাছের প্রতিটি আচরণ সাগ্রহে দেখিতাম। মনে হইত, উহাদের ভাষা যেন আমি বুঝি। প্রথম যেদিন গোলাপ গাছটায় কুঁড়ি হইল, সেদিনের কথা এখনও আমার বেশ মনে আছে। মনে হইয়াছিল, গোলাপ গাছটার ডালে ডালে পাতায় পাতায় বেশ যেন একটু অহঙ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া যেন বলিতেছে, কেমন কুঁড়ি হইয়াছে, দেখিতেছ তো!

সেই ফুল ফুটিয়া যখন ঝরিয়া গেল, তখন তাহার নীরব শোকও আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। তাহার পর দ্বিতীয় ফুলটি যখন ফুটিল, তখন তাহারও মুখে আবার হাসি ফুটিল বটে, কিন্তু তাহা বিষণ্ণ সশঙ্ক। ফুল ফোটে, ফুল ঝরে। প্রতিদিন দুই একটি ফুল ফুটিত, দুই একটি ঝরিত। প্রতি গাছটির হাসিকান্না আমি শুনিতে পাইতাম। আমার বাগান নগণ্য ছিল বটে, কিন্তু তাহাতেই আমি তন্ময় হইয়া থাকিতাম।

যুগলবাবু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া একবার আমার প্রতি চাহিলেন। একটু থামিয়া আমি পুনরায় সুরু করিলাম, তাহার পর অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। আমার প্রথম জীবনের অর্থকৃচ্ছ্রতা আর নাই বাগান বড় করিবার মত আর্থিক সঙ্গতি হইয়াছে এবং সত্য সত্যই বাগানকে বিস্তৃত করিয়াছি। এখন আমার বাগানখানা ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে অন্ততপক্ষে একবেলা কাটিয়া যায়। অনেকখানি জমি, অনেক রকম সার, অনেক রকম যন্ত্র, অনেক রকম গাছ, অনেকগুলি মালী জুটাইয়া বাগানের খ্যাতি বাড়াইয়াছি। আভিজাত্যগর্ব্বিত বহু

দুর্লভ ফুল আমার বাগান আলো করিতেছে, কিন্তু আমার সেকালের সেই ছোট বাগানের শীর্ণ গাঁদা, কীটদষ্ট গোলাপ, অপরিপুষ্ট মল্লিকা, আলোক-বঞ্চিত রজনীগন্ধাকে আজও ভুলি নাই। তাহাদের যত ভালবাসিতাম, ইহাদের তত ভালবাসি না। ইহাদের আমি চিনিই না। এই ভিড়ের সহিত আমার প্রাণের পরিচয় নাই। সহস্র সহস্র ফুল রোজ ফুটিতেছে ও ঝরিতেছে, খবর রাখা আর সম্ভবপর নহে। ইহাদের সকলের কুল, গোত্র, বংশপরিচয়, বৈশিষ্ট্য অবশ্য অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি। আপনিও পারিবেন, কারণ যে কোন ভাল ক্যাটালগে তাহা আছে। শুধু ফুল কেন, বইয়ের কথাই ধরুন না। সেকালে যখন বই কিনিবার ক্ষমতা ছিল না, অপরের বই চাহিয়া অথবা চুরি করিয়া যখন পড়িতে হইত, তখন কি আগ্রহেই না পড়িতাম! প্রত্যেকটি পুস্তকের সহিত, প্রতি পুস্তকের প্রতি পাতাটির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। এখন নিজের লাইব্রেরি প্রকাণ্ড, প্রতি মাসে নানা দেশের বিখ্যাত লেখকদের বই কেনা হইতেছে, কিন্তু সে আগ্রহ তো আর নাই। আলমারিতে সারি সারি বই জমিতেছে, অধিকাংশ পুস্তকেরই বাহিরের সৌষ্ঠব দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছি, হয়তো দুই-একখানা খুলিয়া দুই-চারিপাতা উল্টাইতেছি, উহাদের সম্বন্ধে দুই-চারিটা ধার করা জ্ঞানগর্ভ বুলিও হয়তো আওড়াইতে পারি, কিন্তু সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, ইহাদের কাহাকেও আমি চিনি না। যাহাদের চিনি, বহুপূর্ব্বেই তাহাদের চিনিয়াছি। নূতন করিয়া চিনিবার আগ্রহ আর নাই। এখন যাহা আছে, তাহা সংগ্রহ করিবার আগ্রহ।

মঙ্গলবাবু অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। বলিলেন, এ চিঠিগুলোর সম্বন্ধে বলিতে চান?

বলিতে চাই, আপনার বাগান অথবা লাইব্রেরিটি মন্দ নয়।

ইংরেজী ভাষায় যাহাকে বলে, এ গুড কালেকশন! শত বাধাসত্ত্বেও কখনও লুকাইয়া কাহাকেও যদি ভালবাসিয়া থাকেন (বাসিয়াছেন কি না জানি না), তাহা হইলে সেই একমাত্র ভালবাসা যাহা সত্য, এবং তাহাকে যদি আপনি সত্য-মর্য্যাদা না দিয়া থাকেন ঠকিয়া গিয়াছেন।

বাকিগুলি ?

বাকিগুলি আপনার অর্থ, খ্যাতি অথবা রূপের টানে স্বতই জুটিয়াছে অথবা আপনি জুটাইয়াছেন। বলিলাম তো, গুড কালেকশন। কিন্তু উহারা আমার বর্ত্তমান বাগানের ফুলের মত। আয়ত্তের মধ্যে থাকিয়াও অনায়ত্ত।

কেন ?

আসল কথা কি জানেন, আমরা যতই বড়াই করি না কেন, আমাদের প্রাণ সত্যই এত বড় অথবা মজবুত নহে যে, একাধিক নিবিড় পরিচয়ের ধাক্কা সামলাইতে পারে। সত্যকার প্রেম বড় সঙ্গীন বস্তু। অধিকাংশ লোকের জীবনে তাহা আসেই না। কিন্তু মজা এই যে, অধিকাংশ লোকই একাধিক রমণীর সংস্পর্শে আসিয়া মনে করেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই আদিঅন্ত তিনি নখদর্পণে দেখিতে পাইয়াছেন। আসলে আমরা প্রায় সকলেই দরিদ্র দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, পিটুলিগোলা পান করিয়া উদ্বাহু হইয়া নৃত্য করিতেছি।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সহসা অত্যন্ত দমিয়া গেলাম। সহসা মনে পড়িয়া গেল, প্রাণকান্তের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সন্ধ্যাবেলায় এক গ্লাস সিদ্ধি পান করিয়াছি। বিবেকের ধমকে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। বার দুই ঢোঁক গিলিলাম। যুগলবাবু বলিলেন, দিন মশাই, আর একটা সিগারেট

দিলাম।

যুগলবাবু সিগারেটটি ধরাইয়া সন্দিগ্ধভাবে আমার প্রতি চাহিতে লাগিলেন। আমার মনে হইতে লাগিল, আহা, লোকটি মানুষ না হইয়া যদি গাছ হইত, বাগানে পুঁতিয়া রাখিতাম।

"বনফুল"

"কবিতা একরকমের ব্যাধি, জীবাণু তার অগ্রদূত

—'জীবাণু' মাসিক পত্রিকার শিরোনামা, পৌষ ১৩৪৫

অর্থাৎ 'কবিতা' যদি ম্যালেরিয়া-জাতীয় ব্যাধি হয়, 'জীবাণু' তাহার অ্যানোফিলিস-মশক-বাহন; 'কবিতা' তিন মাসে একবার প্রকাশ পায়, 'জীবাণু'র সাক্ষাৎ পাই মাসে মাসে; 'জীবাণু' কামড়ায়, কিন্তু 'কবিতা' ভোগায়।

এমন অর্থপরিপূর্ণ অত্যুক্তিহীন "মটো" কদাচিৎ দেখা যায়।

* * *

গত পৌষে দুইটিরই প্রকাশ দেখা গিয়াছে, সুতরাং দৃষ্টান্ত দিতে পারিব।

ম্যালেরিয়া:— সেখানে এখন
পদসঞ্চরণ
বন-ভোজন
কাঁপন
শিহরণ
গোধূলি-রক্তিম আঁচে
সভ্যতার ছাঁচে
স্বভাবের তাড়নায় নাচে
শতাব্দীর
কৃষ্টির
দৃষ্টির
সোল্লাস মিলন।

—'কবিতা', পৌষ, পৃ. ২৫-২৬

ম্যালেরিয়ার কাঁপুনির সহিত তাল রাখিয়া ইহা রচিত। বিকারের ঘোরে প্রলাপেরও অভাব নাই। যথা—

১। মৈনাক, সৈনিক হও
ওঠো কথা কও।
দূর কর মন্থর মন্থরা—
এ সুদীর্ঘ দিন-রাত্রি প্রেত পদক্ষেপে
স্মৃতিরে করেছে পিরামিড।
আর সুব উর্মিময় আরক্ত প্রহর
মিশরের মাম, হায়, শিশিরে ধূসর।
মৈনাক, সৈনিক হও
ওঠো কথা কও।

—ঐ, পৃ. ২২

২। সন্ধ্যায় ভিড়াক্রান্ত মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা
দেবতারো চোখে অনিদ্রা আনে;
পুজোর পচা ফলে ফুলে পিচ্ছিল পথে
রক্তচক্ষু পুরোহিত হাঁকে,
হাঁকে জগদ্দল বৃষভ।

—ঐ, পৃ. ৫৫

*

মশক-গুঞ্জনও কম চিত্তাকর্ষক নয়! যথা—

১। হে পুরানো পাণ্ডুর সুদূর!
তোমার বেহায়াপণা; সুন্দর ছেনালী—

—'জীবাণু', পৌষ, পৃ. ৮

২। নিরালা ঘরেতে নিরাপদ মোর আক্রমণ,
মালতী, তোমার দুই ঠোঁট ভরো নীল বিষে,—
মালতী, তোমার দু'চোখে বাড়াও আজ বোমা

—ঐ, পৃ. ১৭

অমিতার ওষ্ঠপ্রান্তে দ্রাবিকার রবে না তিমিত
পৃথিবী মরুভূ হলে ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিবে বায়স?

—ঐ, পৃ. ২৩

৪। আর এই পৃথিবীর কঠিন নীল ছাদে
জোনাকি যোনির আলোর বিচরণ।

—ঐ, পৃ. ৩১

কুইনিন-তিক্ত ও মশারি-কঠোর হইয়া উঠিয়া যে এই কম্পন ও গুঞ্জন রোধ করিব, তাহারও দেখিতেছি উপায় নাই—মশা ও ম্যালেরিয়া ক্রমশই চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

—

বাংলা দেশের মন্ত্রীমণ্ডলী যে কত অসহায়, তাহা তাঁহাদের রক্ষা-কবচের বহর দেখিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। চারিদিকেই শত্রু, সুতরাং দ্বারবান্ ও গুপ্তচরের প্রয়োগবাহুল্য স্বাভাবিক বিশেষত তাহাদিগকে বশে রাখিবার যাবতীয় উপকরণ যখন অপরে যোগাইতেছে, তখন তাহাদের সাহায্য না লওয়াটাই অসমীচীন। মন্ত্রীদের আক্ষেপ ছিল, তাঁহাদের গুণগ্রামের কথা কেহ প্রচার করে না, মিথ্যা দোষকীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে হেয় করা হয়; সুতরাং সপ্তাহে সপ্তাহে প্রচুর অর্থ-ব্যয় করিয়া 'বাংলার কথা' ও 'দি বেঙ্গল উইকলি' বাহির করা হইল, কিন্তু তাহাতেই কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? 'দি স্টার অব ইণ্ডিয়া' ও 'আজাদ' এই শত্রুব্যূহমধ্যে দ্বাদশ (১৬ই পর্য্যন্ত) অভিমন্যু সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার যে সৎসাহস এতাবৎকাল দেখাইয়া আসিতেছিলেন, নিন্দুকে সে সম্বন্ধে নানা নিন্দা রটাইতেছিল। কিন্তু যাঁহারা দেশপ্রাণ মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবকে চেনেন, তাঁহারা জানেন, কি নিদারুণ নির্যাতনের মধ্য দিয়া তিনি ভারতের স্বাধীনতাযজ্ঞে এই 'আজাদ'রূপী দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন। আজ যাঁহারা কৌরবরাজসভায় এই একবস্ত্রা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণলাঞ্ছনা দেখিয়া লজ্জায় ও সহানুভূতিরত অধোবদন হইয়া আছেন, তাঁহারা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন, ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেটে বিপদবারণ মধুসূদন দ্রৌপদীর জন্য ত্রিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন, ঈশ্বরানুগ্রহের এমন প্রত্যক্ষ, এমন চমকপ্রদ নিদর্শন দেখিলে অতি বড় নাস্তিকও বিশ্বাসী হইয়া উঠিবে।

'আজাদে'র প্রসঙ্গ অবান্তর, আমাদের কথা লাঞ্ছিত মন্ত্রীমণ্ডলীকে লইয়া। তাঁহাদের অত্যধিক ঔদার্য্যই তাঁহাদের কাল হইয়াছে। যেখানে অতি সহজে তাঁহারা চোর ধরিয়া কয়েদে দিতে পারিতেন (জেলখানার অভাব বাংলা দেশে এখনও হয় নাই), সেখানে সহজলভ্য সুলভ পয়সার বিনিময়ে আরও কতকগুলা চোর নিযুক্ত করিয়া চোর ঠেকাইবার এই পন্থা আমাদের ভাল ঠেকিতেছে না। আশা করি, পরবর্ত্তী বাজেটে আমাদের এই কথা বিবেচিত হইবে।

—

ফাল্গুনের 'ভারতবর্ষে' "শুক্রাচার্য্যের স্বপ্ন" চিত্রটি কোন্ স্টুডিয়োয় গৃহীত তাহা লিখিতে ভুল হইয়াছে। ভূমিকায় কাহারা অভিনয় করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে আমরা অধিক উৎসাহিত হইতাম। শুক্র কবে মঙ্গল হইবে?

—

'**মন্দিরা**'য় (ফাল্গুন, ১৩৪৫) শ্রী (মতী?) পরিমল দাসের "ভাঙ্গনের গান" বাক্-অর্থ সকল দিক দিয়াই সার্থক হইয়াছে। এরূপ হরগৌরী-সম্মিলন এযুগে ক্বচিৎ দেখা যায়।

[হে ধনিক]

মানুষেরে তুমি যন্ত্র করেছ, অন্তরে তুমি করনি স্বীকার,
তাই যত আজ বিদ্রোহী আত্মা করে দাবী অধিকার।

[শোষিত-মানব,]

ধরিতে হইবে রুদ্রের বেশ, পুরাতন জরাজীর্ণ
লাখি মারি তোমা প্রবল আঘাতে করিতে হইবে দীর্ণ।

ভাঙ্গনের গানও বাঁধা ছন্দে লিখিলে ভাল শোনায়, এইটাই আশ্চর্য্য।

—

মাঘের 'ভারতবর্ষে' একটি "শিকার-কাহিনী" বাহির হইয়াছে। আলিপুর দুয়ারের প্রবীণ শিকারী শ্রীপুলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

জানাইয়াছেন, লেখাটির কাহিনী-অংশ সম্ভবত ঠিক আছে, কিন্তু শিকার-অংশ নির্ভুল বলিয়া তিনি স্বীকার করিতে পারেন না।

লেখাটি পড়িয়া দেখিলাম। কাহিনী-অংশও সমর্থনযোগ্য নয়। এমন পঙ্গু ভাষায় লেখা রচনা 'ভারতবর্ষে' যে স্থান পাইতেছে, তাহার কারণ সম্ভবত সম্পাদকীয় শৈথিল্য; রবিবাসরের ভোজবাহুল্যে শ্রবণ এবং দৃষ্টি দুইই গিয়াছে, ঘ্রাণের সাহায্যে রচনা নির্ব্বাচিত হইতেছে।

* * *

শিকার সম্বন্ধে যাঁহাদের সখ আছে, অথচ যাঁহাদের বিদ্যা এই জাতীয় প্রবন্ধ হইতে আহৃত, তাঁহারা হাতে-বন্দুকে শিকার করিতে গিয়া পাছে বিপন্ন হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় পুলিনবাবু প্রতিবাদ করিয়াছেন। হাতুড়ে ডাক্তারের শাস্তির ব্যবস্থা আছে, হাতুড়ে শিকারীর শাস্তি হওয়া উচিত কি না, আইনকর্ত্তারা বিবেচনা করিবেন। গাঁজাখুরির একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি।

জঙ্গলে দুটা বাঘের বাচ্চা খেলা করছিল। বাচ্চা দুটি ছোট—বেশ সুন্দর—খুব পুষ্ট। মেঘু নামে আমাদের এক সঙ্গী গিয়ে একটা বাচ্চা ধরে কোলে তুলে নিল এবং গায়ের মোটা চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে ফেলল।

ছমকু চীৎকার করে উঠল—মেঘা, ও মেঘা, ও পাজী, সর্ব্বনাশ হবে রে—এখনই এটার চেঁচা-মেচিতে বাঘিনী এসে উপস্থিত হবে। উপায় থাকবে না রে পাজী, শীগ্‌গির ছাড়—ছাড়—এ গহিন জঙ্গল—ছাড়—

মেঘা বলে বসল—হঃ, হাতে দোনালা বন্দুক, উঠব গিয়ে ঐ তেঁতুল গাছে—বাঘের বড় ভয় লাগছে।

হারামজাদা পাজী, সবাইর জীবন শেষ করবি নাকি। বাঘিনীর কোপে আজ আর রক্ষা থাকবে না।

অদূরে বাঘিনীর ভীষণ গর্জ্জন শোনা গেল। মেঘার কোলে বাচ্চাটাও চীৎকার করেছিল। অনন্যোপায় হয়ে আমরা গাছে উঠে পড়লাম। আমাদের দলের 'চাঁদ ঠাকুর'

গাছে উঠতে পারেন না জানালেন। তাঁকে যে ভাবে উপরে তোলা হ'ল—তা বলবার নয়। ছম্‌কুর মত শক্তিমান লোক ছিল বলেই আমরা চাঁদকে বুকে চাদর বেঁধে গাছে ওঠাতে পেরেছিলাম।

ততক্ষণ বাঘিনীর গর্জ্জনে বন তোলপাড়। রক্তচক্ষু বাঘিনী গাছের দিকে চেয়ে যে রকম ঘোঁ ঘোঁ করেছিল, তাতেই আমাদের আত্মাপুরুষ তুলারাম খেলারাম করতে লেগে গেল। মেঘা বলল—গুলি লাগাও, একবারে পাঁচটা সাতটা।

ছম্‌কু বলল—সাবধান, যদি কখনও সময় হয় গুলি ছোঁড়বার—আমিই বলব।

ক্রমে তিনটা বাঘ সেই গাছতলায় এসে চীৎকার আরম্ভ করল। চাঁদ-ঠাকুরকে কাপড় দিয়া গাছে বেঁধে না রাখলে যে কি দশা হ'ত, তা বলাই বাহুল্য। আমি শীকারে দুর্ব্বল যুবক, কোন মতে গাছ ধরে বেঁচে আছি মাত্র।

বেলা পশ্চিমে হেলে পড়ল। ছম্‌কু বলল—শীঘ্র জঙ্গল থেকে বার হতে না পারলে আজ এখানেই রাত্রিযাপন করতে হবে।

আমি প্রস্তাব দিলাম—বাঘের বাচ্চাটা ফেলে দাও—গোলমাল চুকে যাক।

ছম্‌কু বলল,—তবু বাঘ এখান থেকে সরবে না। এখন মনে হয়, কাছে আর বাঘ নেই—যারা ছিল, এসেছে; এখন ঠিক নিশান-সই করে গুলি ছোঁড়। ঐ যে একটা খাল দেখা যায়—ওটা পার হয়ে না গেলে বাঘকে বিশ্বাস নাই।

পরামর্শমত দুজনে বাঘিনীটাকে, দুজনে বাঘটাকে 'রাম, এক, দো' বলে গুলি ছুঁড়লাম। বাঘিনী ঠায় পড়ে গিয়ে লম্বা দিল—বাঘা মাথা ঝাঁকতে ঝাঁকতে গোঁ গোঁ করে ছুটতে লাগল। অপর বাঘ পালিয়ে গেল। ছম্‌কু গুলী-লাগা বাঘটাকে তাক্ ক'রে আর একটা গুলি ছুঁড়ল—বাঘা লম্ফ দিয়ে খালের জলে গিয়ে পড়ল—তারপর চুপ।

(১) বাঘের বাচ্চা মায়ের কাছ হইতে দূরে খেলা করে এবং বিড়ালের ছানার মত অবলীলাক্রমে তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাওয়া যায়; (২) বাচ্চাবতী বাঘিনীর আশেপাশে ছলো-মেনি অন্যান্য বাঘেরা এমন ভাবে অবস্থান করে যে এক ডাকেই কাছে আসিয়া পড়ে; (৩) ধৃতবাচ্চা বাঘিনীর গর্জ্জন শোনার পরেও বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল শিকারীরা

সদলবলে তেঁতুলগাছে চড়িয়া বসিবার এবং একজনকে বুকে চাদর বাঁধিয়া টানিয়া তুলিবার অবকাশ পায়—এগুলি মারাত্মক সংবাদ।

'ভারতবর্ষ' যাহা শিকার করিতেছেন, তাহাই করিতে থাকুন বাঘীয় 'পরিস্থিতি'র মধ্যে তাঁহারা নাই গেলেন।

বন্ধুত্ব নানা প্রকারের হইতে পারে; প্রণয়াত্মক, প্রেমাত্মক, ঋণাত্মক, ধনাত্মক, অবসর-বিনোদনাত্মক ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সহিত শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দের যে বন্ধুত্ব সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, তাহা উপরোক্ত কোন পর্য্যায়েই পড়ে না; ইহা সম্পূর্ণ অভিনব বন্ধুত্ব—ধ্বন্যাত্মক বন্ধুত্ব। ফাল্গুনের 'পরিচয়ে'র ১৬৮ পৃষ্ঠায় শ্রীবিষ্ণু দের দুই নম্বর প্রার্থনা দেখুন—

> বৃষস্কন্ধে সূর্য স্থির, বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মের মড়কে
> বর্ষভোগ্য রুক্ষ শাপ চৈতালির গণ্ডূলচড়কে
> আজো দেখি খণ্ড বর্ষে। বৈশাখের অজবন্ধু মেঘে
> কর্কটক্রান্তির পাপ ক্লান্তিহীন দুর্বাসার স্নেহে
> তাপমানে আজো জাতিস্মর। বজ্রপাণি উদাসীন,
> স্বরম্বশ অমরার শীতকক্ষ ফরাসে আসীন!
> দয়াহীন ইরম্মদ!

গোপালদা বলিলেন, থাম। সম্মুখেই টেবিলের উপর 'শব্দকল্পদ্রুম' ছিল, তিনি তাহাতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন এবং তুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে মুখে শুধু বলিলেন, অজ বন্ধু মেঘ!

"আমরাও বলি, সময় ও সুযোগ পেলে এবং ধীর-স্থির-চিত্তে কাব্যসাধনায় নিয়োজিত থাকলে ডি. এনানৎসিও, রবীন্দ্র-নজরুল তিনি (জসীম-উদ্দীন) না হ'তে পারেন—কালিদাস, ফেরদৌসী বা মাইকেল হ'তে পারেন।"

—ফজলুর রহমান, 'মাসিক মোহাম্মদী,' মাঘ ১৩৪৫, পৃ. ২৮৪

গোপালদা এবারে যাহা বলিলেন, তাহা ছাপা যায় না। কিন্তু কটূক্তি তো আর যুক্তি নয়! ডেনান্‌ৎসিও-রবীন্দ্র-নজরুলে আমাদের প্রয়োজন নাই, কিন্তু কালিদাস-মাইকেলকে আমরা চাই। তজ্জন্য জসীম-উদ্দিন সাহেবকে সম্পূর্ণ সময় ও সুযোগ দিতে বাঙালীমাত্রেই প্রস্তুত আছে; সদ্যপ্রসূত বাজেটে একটা সংশোধনী প্রস্তাব দিতেও কেহ আপত্তি করিবে না। কিন্তু এমনিতেই ব্যক্তিগত এবং সম্প্রদায়গত নানা কারণে তিনি যেরূপ অধীর এবং অস্থির আছেন, উপরোক্ত মন্তব্যের পর যদি সম্পূর্ণ অধীর-অস্থির হইয়া উঠেন, তাহার জন্য 'মাসিক মোহাম্মদী'র সম্পাদক মহাশয় কি দায়ী হইবেন? বাঙালী বড় দুর্ভাগ্য জাতি, তাই ভয় হয়।

—

আধুনিক "Last Ride Together"-পড়া চালাক মেয়েদের ট্র্যাজেডি সত্যই ভয়ানক। ললিতার অবস্থা কি করুণ নয়? ফ্ল্যাট-বাড়ির কত তাজা তরুণীর প্রাণ যে এই বেদনায় জীর্ণ হইয়া গেল, সিটি-ফাদাররা তার কি খবর রাখেন?

পাশাপাশি তিনটি ফ্ল্যাট। একটিতে পরেশরা থাকে, সে কলেজে পড়ে, বয়স বাইশ বছর। একটিতে থাকে ললিতারা। তৃতীয়টিতে থাকেন ধীরেনবাবু। তাঁহার বোন লীলা ললিতার কাছে দুপুরে পড়িতে আসে।

উচ্ছ্বসিত যৌবনের ফেনাকে শীতল করা ললিতার সাধ্য নয়। পরেশকে ও ভালবাসে—হ্যাঁ ভালই বাসে বলা যায়। কিন্তু পরেশ ভালবাসার সব ইঙ্গিত বোঝে না। মেয়েদের সঙ্গে মেশে নাই বলিয়াই হয়ত'। খালি ভালবাসার উপর কল্পনার রঙ চড়াইয়া একটা মাদকতা অনুভব করিতে চায়, ভালবাসার আনুসঙ্গিকগুলো ছাঁটিয়া ফেলিতে পারিলেই যেন ও বাঁচে। পরেশ কি বোঝে না ললিতার প্রায়-ব্যক্ত ইঙ্গিতগুলো?

কিন্তু ধীরেনবাবু বোঝেন। ভগিনী বীণার মারফৎ তিনি চিঠিও পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু ললিতা চায় পরেশকে জাগাইয়া তুলিতে। সেদিন দুপুরে ললিতার দুঃখ খুব গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। পরেশ

আজকের দুপুরটা থাকিলেও পারিত। আজকে তাহ'লে পরেশকে ও জোর করিয়া এ ঘরে আনিতে পারিত। কিংবা নিজেই হয়ত ওদিকে যাইতে পারিত। যাওয়া তো আর কঠিন কিছু নয়—বাথরুমের পাশের ঐ ছোট্ট দরজাটা খুলিয়া ফেলিলেই তো পরেশদের রান্নাঘর। পরেশটা বোকা।

সুতরাং দি আদার ফ্ল্যাট—ধীরেনবাবুর চিঠি—

পরেশের মত ফাঁকা এবং কল্পনাসর্ব্বস্ব নয়—এর পিছনে বাস্তবতার একটা উগ্র, রিমঝিমে [?] গন্ধ আছে। চিঠির শেষে একটা অনুগ্রহ চাহিয়াছেন—তাঁহার সহিত নির্জ্জনে দেখা করিবার সুবিধা ললিতার হইবে কি? দুপুরে তিনি বাড়ীই থাকেন।

তা' হইবে না কেন? দুপুরে তো ললিতাও থাকে; আর যদি নির্জ্জনতার কথা বল, ললিতার বাড়ীর মত পাড়ায় আর একটিও নির্জ্জন বাড়ী আছে কি না সন্দেহ। বুড়ো পিসী কানে শোনেন না—দুপুরে আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়া ঘুমান। বাপ অফিসে যান, ফিরিবেন তো সেই সাতটায়। অফুরন্ত নির্জ্জনতা! ধীরেনবাবু যে কোনওদিন আসিতে পারেন; ইচ্ছা করিলেই কালকেই।

একটি অতি-আধুনিক পত্রিকায় গল্পটি মাঘ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। সমর্থা কন্যাদের লইয়া কলিকাতায় যাঁহাদের ঘর করিতে হয় এবং অর্থাভাবে যাঁহাদিগকে ফ্ল্যাটের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাঁহাদের অবগতির জন্য গল্পের মোদ্দাকথাগুলি উদ্ধৃত করিলাম। পরেশদের ভয় নাই, কিন্তু ধীরেনবাবুরা যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছেন, দৈনিক সংবাদপত্রের আইন-আদালতের পৃষ্ঠায় তাহার প্রমাণ মিলিবে। ধীরেনবাবুদের উগ্র বাস্তবতার রিমঝিমে গন্ধ হইতে দুপুরে বেকার ললিতাদের উদ্ধার করাটা প্রতিদিনই একটা সমস্যার মধ্যে দাঁড়াইতেছে। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান পরেশদের হাতে, তাহাদিগকেই আর একটু বাস্তব করিয়া তুলিবার জন্য অতি-আধুনিক সাহিত্যিকেরা চেষ্টা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে আমরা নূতন বৎসরের সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার এবং ডায়েরি পাইয়া আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
ক্যালকাটা বিল্ডার্স স্টোর্স লিমিটেড
ইস্টার্ন টাইপ ফাউণ্ড্রি
বালিকা টাইপ ফাউণ্ড্রি
বেঙ্গল ড্রাগ স্টোর্স
ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স লিমিটেড
হুগলি ইঙ্ক কম্পানি লিমিটেড
মার্টিন এণ্ড কোং
ইসাভি ইণ্ডিয়া ম্যাচ ফ্যাক্টরি ও ইণ্ডিয়ান সিল্ক উইভিং কম্পানি

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত ও শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শব্দ-প্রতিযোগিতা

নির্ম্মাণকর্ত্তা—একাদশ রুদ্র

কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না, 'শনিবারের চিঠি'তে শব্দ-প্রতিযোগিতা দিবার কারণ ঘটিয়াছে। উত্তুঙ্গ হিমালয় আজ যেখানে মাথা খাড়া করিয়া আছে, একদিন সেখানে উত্তাল সমুদ্র ছিল বিশ্বাস করিতে পারেন? 'ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি' একদিন ক্রস-ওয়ার্ড পাzল ছাড়া বাহির হইত বিশ্বাস হয়? ভবিষ্যতের আশা প্রকাশ করিয়া বলিতে নাই; তবে অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে অদূর-ভবিষ্যতে জলে জাহাজ, স্থলে ট্রেন, আকাশে এরোপ্লেন, হোটেলে মদ, রাষ্ট্রে শাসন, কর্পোরেশনে ঘুষ এবং গোপনে প্রেম যথাবিধি চালাইবার জন্যও যে ক্রস-ওয়ার্ড বা শব্দ-প্রতিযোগিতার সাহায্য লইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাধ্য হইয়া জাত দিবার পূর্ব্বে সাধ করিয়া গলায় কণ্ঠিধারণ বুদ্ধিমানের কাজ। 'প্রবাসী'-দিদি ও 'ভারতবর্ষ'-দাদাকেও বেশি দিন কৌলীন্য-গর্ব্ব বজায় রাখিতে হইবে না—অক্টোপাসের বাহু সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতেছে। ইহাই আমাদের কৈফিয়ৎ। নিয়মাবলী অত্যন্ত সহজ।

১। প্রতিযোগিতায় যাঁহারা যোগদান করিবেন, তাঁহারা আমাদিগকে লজ্জা দিতে পারিবেন না, আমরাও তাঁহাদিগকে লজ্জা দিব না।

২। কুপনে জবাব পাঠাইলে আমাদের লাভ হয়, কিন্তু আমাদের হইলে সকলে খুশি না হইতেও পারেন; সুতরাং কুপন বাদ দিয়াও জবাব দেওয়া চলিবে।

৩। জব্দ-প্রতিযোগিতা জবাবের অপেক্ষা রাখিবে না।

৪। আমাদের জবাবই শিরোধার্য্য করিতে হইবে।

৫। উকিলে মানহানির ভয় দেখাইয়াছে, সুতরাং কোনও সমাধানই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না, বিবিধ পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট গাঙ্গুলী-উপাধিধারীদের মুখে মুখে সমাধান প্রচারিত হইবে। ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় কেহ নির্দ্দেশ করিলে তাহা গৃহীত হইবে।

৬। পুরস্কারের পরিমাণ সমাধানের মধ্যেই দেওয়া থাকিবে—পুরস্কৃত ব্যক্তি যে কোন উপায়ে তাহা লইতে পারিবেন।

৭। আমাদের উদ্দেশ্য বর্ত্তমানে সাধু।

৮। চিঠিপত্র জব্দ-প্রতিযোগিতা সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

১					২		
		৩			৪		
			৫	৬			
	৭	৮		৯			১০
১১							
	১২						
১৩					১৪		
	১৫			১৬			

সঙ্কেত

পাশাপাশি

১। এঁর পরিচয় ইনি দিয়েছেন নিজে।
স্থবির লেখনী চালে চটুল গতি যে॥
সাহিত্য-সীমানা হ'ল জীবনবীমায়।
বিদেশী বাদ্যের সাথে ধ্রুপদ ঝিমায়॥

২ মূল্য এঁর নেই কিছু বিদ্যা ঘোরে পিছু পিছু
ভূষণে জড়িত দেহ নির্ঘোষিত তাই।
কোষ-অগ্রে মহা-মারী ক্ষিপ্ত-জ্ঞান অম্বুবারি
ধারে ভারে কাটে তবু অতৃপ্তি সদাই।

৩। প্রতিভাবান্ কবি।

৪। বিবেকানন্দের শ্বশুর।

৫। প্রথমে রয়েছে দেখ আধশিশি মাল।
প্রথমে দ্বিতীয়ে তার শুভ চিরকাল॥
বিপরীত শব্দ রাশি প্রথমে তৃতীয়ে।
প্রথম চতুর্থে রাঁধ ব্যঞ্জনেতে দিয়ে॥
অর্দ্ধেক দেবতা তার আধখানা নর।
দুইটি পুরুষে জোড় লেগেছে সুন্দর॥

৭। কালিদাস নালিস করেছে।

৯। অনন্ত নজির।

১১। বর্ত্তমান বাংলার অর্থসচিব ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অনর্থসচিব।

১২। এই শব্দসন্ধানের নির্ভুল সমাধান যিনি করতে পারবেন, তিনি পাবেন "—"।

১৩। অ-চতুর্ নিরাকার সাহিত্যিক।
বিরাম লভিয়া মন তাঁহারেই বন্দে—
মোহনে দোহন করি আছেন আনন্দে।

৫ এঁর নামটি শুনলেই মনিব্যাগটির কথা মনে পড়ে।

১৬। আধখানা অনামুখ আদি তৃতীয়ে।
দ্বিতীয়ে চতুর্থে কুড়ি আছে থিতিয়ে ॥
বান ডাকে মাঝে তায় দুকূল ছেপে।
শরতের কালে শুনি গিয়েছে ক্ষেপে ॥
পিছনে সাঁতার কাটে গোপনে খাসা।
ঘোলের ভিতরে ডুবে অনাদি চাষা ॥

উপর থেকে নীচে

১। রবিরে দেখাতে ইনি জ্বালেন লণ্ঠন।
তরুণে করেন কভু প্রগতি বণ্টন ॥
নহে পিকপুচ্ছ—গায়ে ব্রাউনিঙ-জামা।
মরে গেল ভাগিনেয়, বেঁচে গেল মামা ॥

২। জনৈক মহিলা-কবি। ডুমুরের ফুলের মত ইনি। হ'ল,—একটিবার ঔপন্যাসিক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে এর জিজ্ঞাসা করবেন, মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

৬। এঁর নামটি তো আপনাদের কাছে বলাই আছে। তবু সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর এ নামের বিশেষ কোন মূল্য নেই।

৭। জগতের সাহিত্যিকদের সাধনার উপাদান। এবং বা তরুণ সাহিত্যিকদের অন্যতম সাধনক্ষেত্র ছিল।

৮। চুণিনা ধনী হয়ে বেসামাল।

১০। রাণীত্ব ত্যজিলে ইনি নৃপতি বৈষব।
কৃষ্ণনাম জুড়ে নিত্য করে যার স্তব ॥
কলিকালে ভালোবাসা সুলভ তো নয়।
ভাগ্যগুণে হইয়াছে ইহার আশ্রয় ॥

সূচী

ফাল্গুন—১৩৪৫

শনিবারের চিঠির নিয়মাবলী

১। শনিবারের চিঠির বার্ষিক চাঁদা ডাকমাশুলসহ ৩৷০ ভি-পিতে ৩৷৶০ ; ষাণ্মাসিক ১৸৶০, ভি-পিতে ১৸ ব্রহ্মদেশে ৩৷৵০, ভি-পিতে ৩৸৶০ ; ও ভারতের বাহিরে বার্ষিক ৪৵০ । প্রতি সংখ্যা ৷০, ডাকে ৷১০ ।

২। শনিবারের চিঠির বর্ষ কার্ত্তিক হইতে গণনা করা হয়।

৩। নমুনার জন্য সাড়ে চারি আনার স্ট্যাম্প পাঠাইতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ চিঠি লিখিবার সময় গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ করিবেন।

১১শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৪৫ [৫ম সংখ্যা

বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক

১

আধুনিক যুগ সাহিত্য-রসের যুগ নহে; কেন নহে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। ইহা লইয়া দুঃখ করিবার কারণ থাকিলেও তাহাতে লাভ নাই। দেহের পক্ষে পথ্যাভাব এবং মনের পক্ষেও নানা কুপথ্যের প্রাচুর্য্যে এ যুগে যে সকল ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাহাতে সাহিত্য মাথায় উঠিয়াছে, বুকের কাছে তাহার আর টিকিয়া থাকিবার জো নাই। যাঁহারা, 'render unto Cæser what is Cæser's due'—এই আশ্বাসবাক্যে বাস্তবের সহিত রফা করিয়াই রসের স্বর্গরাজ্যে বাস করিবার আশা রাখেন, তাঁহারা হয়তো এখন সংখ্যায় আরও অল্প; এবং বোধ হয় সেই কারণেই, যাহারা শিশ্নোদর ছাড়া আর কিছুই মানিবে না, এবং যাহাদের সংখ্যা এ যুগে ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে, তাহারা এই রসব্রহ্মের পূজারীদিগকে কেবলমাত্র ভোটের জোরে

পিষিয়া শেষ করিতে চায়। সত্য কোন্ পক্ষে, ন্যায় কোন্ পক্ষে ধর্ম্ম কোন্ পক্ষে—আজিকার রাষ্ট্রনীতিতেও সে প্রশ্নের মীমাংসা যে ভাবে হইয়া থাকে—অর্থাৎ, একমাত্র দেখিবার বিষয় কোন্ পক্ষ সংখ্যায় বা জড়শক্তিতে প্রবল, তেমনই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রসিকের কথা গ্রাহ্য নয়; যাহারা সংখ্যায় অধিক সেই শিশ্নোদরপরায়ণ জনমণ্ডলী রসের যে নূতন অর্থ করিবে, তাহাই পণ্ডিত-মূর্খ রসিক-বেরসিক নির্ব্বিশেষে সকলকে মানিয়া লইতে হইবে এবং ব্যাস-বাল্মীকি হইতে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত—বেদ-উপনিষদের ঋষি হইতে আধুনিক মন্ত্রদ্রষ্টা পর্য্যন্ত সকলকে বাতিল করিয়া দিয়া, 'প্রগতি' নামক একটি অনার্য্য শব্দকে বিশাল বংশদণ্ডে বাঁধিয়া, ভদ্রবেশী বর্ব্বরগণের অগ্রণী হইয়া, আধুনিক নগর-চত্বরের পণ্যবীথি প্রকম্পিত করিতে হইবে!

যুগধর্ম্ম তাহাই বটে, এবং তজ্জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। জীবনের সহিত রসের যে আত্মিক সম্বন্ধ, তাহা একালে রক্ষা করা বড়ই দুরূহ; এমন কি, রসিকজনের পক্ষে যেখানে-সেখানে সেই রস নিবেদন করিতে যাওয়াও নিরাপদ নহে। কিন্তু একটা বিষয় ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়; রসকে যাহারা স্বীকার করে না, তাহার সেই ধ্বংসাবশেষের ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে শিবির-সন্নিবেশ করিতে তাহারা এতই অনিচ্ছুক কেন? গত দুই আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর রসিক-সমাজ যে বস্তুকে যে নামে ও যে রূপে সাক্ষাৎ করিয়াছে সৃষ্টি করিয়াছে এবং উপভোগ করিয়াছে, তাহা যদি একালে একান্তই অচল হয়, তবে এই নূতন দেশ ও কালের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন নামে একটা নূতন বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিলে তো আর কোনও বাদ-বিসম্বাদের কারণ থাকে না। 'প্রগতি'র মতলব তাহা নয়, সেই সাহিত্যের বুকের উপরে বসিয়া, সেই রসেরই জাত মারিয়া, আপন মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে

হইবে, নতুবা ভুঁইফোঁড় হওয়ার একটা অসুবিধা আছে। অতএব জোর গলায় ঘোষণা করা চাই যে, 'প্রগতি'ও রসেরই প্রগতি, রস এতদিন বদ্ধ অবস্থায় ছিল, আমরা তাহাকে every aspect of life জুড়িয়া—অর্থাৎ নালা-নর্দ্দমা পর্য্যন্ত, মুক্তধারায় বহাইয়া দিয়াছি। যাহারা অতীতকালের অপ্রগতিজনিত মধুদুগ্ধ-পিপাসাকেই রসপিপাসা বলিয়া মনে করে, তাহারা শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করে নাই—চা খাইতে শেখে নাই। আড়াই হাজার বৎসরেও মানুষের যে যৌবনলাভ ঘটে নাই, বিংশ শতাব্দীর একপাদ পূর্ণ না হইতেই সেই যৌবন উপস্থিত হইয়াছে; এত যুগ এত জাতি ও এত বিভিন্ন ভঙ্গির কাব্য-সাহিত্যে যে রসের শাশ্বত ভিত্তি টলে নাই, আজ সহসা তাহার আয়ু ফুরাইয়াছে! যদি ফুরাইয়াই থাকে, তবে তাহা লইয়া এত লাফালাফি কেন?

পৃথিবী যে ঘুরিতেছে, সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে স্থির হইয়া নাই, এই প্রগতিতত্ত্ব তো বহুপূর্ব্বে আবিষ্কৃত ও ঘোষিত হইয়াছে। স্থির পরিণাম অপেক্ষা গতিই যে শ্রেষ্ঠতর, রূপের জড়-পরিসমাপ্তি অপেক্ষা ভাবের অনিয়ত চিৎ-প্রেরণাই যে মহত্তর, এইরূপ চিন্তা বা দার্শনিক মতবাদ তো বহুকাল প্রচলিত আছে। তথাপি এইরূপ মতবাদ সত্ত্বেও সেই প্রাচীন রসবাদ কাব্যে ও কলাশিল্পে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চিরদিন জড়-নিয়মের উর্দ্ধে আপন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আধুনিক প্রগতিবাদীর দল এমন কি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, এমন কোন্ অজ্ঞাত সত্যের সন্ধান দিয়াছে, যাহার ফলে মানুষের আত্মা একেবারে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইতে বাধ্য হইবে?

আসল কথা, এই 'প্রগতি'র ধ্বজাধারীগণ এতদিন এই ভূমণ্ডলেই অন্য নামে পরিচিত ছিলেন; বিদগ্ধ রসিক-সমাজও যেমন সকল দেশে

সকল কালেই ছিল ও আছে, এই পণ্ডিতম্মন্য অসভ্য বর্ব্বরেরাও তেমনই সকল যুগে সকল সমাজে বিদ্যমান ছিল। আজ যুগধর্ম্মের সুযোগে মানব-সভ্যতার এই অতিশয় সঙ্কটময় দুর্দ্দিনে, ইহারা, এই রস-অধিকার-বঞ্চিত হরিজনেরা, জাতে উঠিবার জন্য বিষম কোলাহল সুরু করিয়াছে। যাহাদের রসবোধের অভাব জন্মগত, রস কি বস্তু সেই চৈতন্যই যাহাদের নাই, তাহারাই আজ রসের অধিকার দাবি করিয়া সাহিত্যিক হইতে চায়। ইহারাই রস-ব্রহ্মের ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারকে পদাঘাত করিয়া আপনাদের শূদ্রতারই জয়ঘোষণা করিতেছে। কাল তাহাদের অনুকূল, আজ দিকে দিকে মানবাত্মার দুর্গতি, মানবজাতির সুদীর্ঘ সাধনার পরমধনের অপচয়, যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ তাহারই ধূলিধূসর পরিণাম জ্ঞানী ভক্ত ও রসিকের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে— এ হেন সময়ে, যাহারা পৃথিবীর ব্রাহ্মণ-সমাজে কখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেই ইতর মানুষেরা মহা সুযোগ লাভ করিবে, ইহাই তো স্বাভাবিক।

২

'প্রগতি' শব্দটির যাহা অর্থ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইংরেজীতে progress বলিতে যাহা বুঝায়, তাহারই বিশেষ ও ব্যাপক অর্থ বাংলায় প্রকাশ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ এই শব্দটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শব্দের মোহ ও মাহাত্ম্য কম নয়, তাই এই শব্দটিকেই আশ্রয় করিয়া ক্রমশ ইহার অর্থগত বিদেশী ভাব আমাদের ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজের বড় কাজে লাগিয়াছে। সম্প্রতি ইহারা নিখিল-ভারতীয় প্রগতি-কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাঁহাদের এই উপবঙ্গীয় প্রগতিবাদকে বঙ্গবাসীর চক্ষে, প্রীতিপ্রদ না হউক, ভীতিপ্রদ করিবার চেষ্টা

করিয়াছেন, তাঁহারা সাহিত্যে প্রগতিবাদ প্রচার করিয়াছেন। রাষ্ট্রে, সমাজে এবং জাতির জীবনঘটিত নানা সমস্যায় প্রগতিতত্ত্বের অবকাশ আছে; এবং সেই সকল ব্যাপারে তাহার আলোচনা ও প্রচারমূলক গ্রন্থরাজিকে প্রগতিবাদী সাহিত্য বলিতে কাহারও আপত্তি নাই; কারণ, ইংরেজীতেও literature শব্দটি অতিশয় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যসংক্রান্ত বিবরণও literature আখ্যা পাইয়া থাকে। কিন্তু সাহিত্যের নামেই এই যে প্রগতির দাবি, ইহা একপ্রকার সাহিত্যকেই অস্বীকার করা—ইহার মূলে আছে রসের বিরুদ্ধে বেরসিকের আক্রোশ। এই প্রগতিবাদ হইতে সাহিত্যের আদর্শকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য ইদানীন্তনকালে য়ুরোপীয় সাহিত্যাচার্য্যগণ কাব্যরসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। যাহারা এইরূপ প্রগতিবাদী তাহাদের সহিত সাহিত্যের কোনও সম্পর্কই নাই, বরং সম্পর্ক অস্বীকার করাই উভয় পক্ষে মঙ্গলকর। ওদেশে সে চেষ্টা যথেষ্টই হইতেছে; আমাদের দেশে এ কাজ করিবার কেহ নাই, তাই অপর পক্ষের অনাচার এত বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই প্রগতিবাদীর দল সাহিত্যের অর্থান্তর করিতে চায়, কিন্তু নামান্তর করিতে রাজি নহে। জীবনকে ইহারা যন্ত্ররূপেই ভাবনা করে, যন্ত্রের কালোপযোগী পরিবর্ত্তন আছে, নূতন অংশ যোজনা ও পুরাতন অঙ্গসংস্কার অবশ্যম্ভাবী। এবং যেহেতু যন্ত্রের ক্রিয়াও তদনুরূপ হইতে বাধ্য, অতএব সে বিষয়ে আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না। সাহিত্যও সেই জীবন-যন্ত্রেরই একটা ক্রিয়াবিশেষ। মানব-সমাজের গতি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই জীবন-যন্ত্রও জটিলতর হইতেছে, সেই জটিলতাই তাহার গৌরব। অভাব যত বাড়িতেছে, ততই যন্ত্রও চক্রবহুল হইয়া উঠিতেছে; এই সকল চক্রের মিলিত ঘর্ঘরধ্বনি

চক্রবৃদ্ধির হারে কালক্রমে বিশালতর হইতেছে; সাহিত্যও তাই চক্রমুখরতায় পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর ঘোরনাদী হইয়া উঠিতেছে। ইহাই সাহিত্যের প্রগতি, এই নাদের উগ্রতাই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। সাহিত্যও সৃষ্টিধর্ম্মী নয়, যন্ত্রধর্ম্মী; ইহাতে কেবল যুগের গতিধর্ম্মই আছে, কোনও শাশ্বত আদি-অন্তের স্থিতিধর্ম্ম নাই। আমাদের দেশের প্রগতিবাদী যাঁহারা, তাঁহাদের মত এতখানি বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজনও নাই, কারণ সেই মত কোনও মূলতত্ত্বের অপেক্ষা রাখে না। তথাপি যে তত্ত্বকে তাঁহারা অতিশয় সুলভ বিদ্যায় কতকগুলি বাক্যের সাহায্যে আয়ত্ত করিয়া, আপনাদের রিপুবিশেষকে চরিতার্থ করিতেছে, তাহার মূলে এইরূপ ধারণাই আছে। সাহিত্য সৃষ্টিধর্ম্মী অর্থাৎ প্রাণধর্ম্মী, তাহা যে যন্ত্রধর্ম্মী নয়, তাহার প্রমাণ কোনও উৎকৃষ্ট কবিকীর্ত্তি এ পর্য্যন্ত বাতিল হইয়া যায় নাই; বাতিল হওয়া দূরের কথা, সেই কাব্যের অন্তর্নিহিত রসরূপ কালে কালে নবনবোন্মেষিত হইয়া উঠে, সে রসের বিকাশধারার শেষ নাই। এ বিকাশ আর ঐ যান্ত্রিক বিবর্ত্তন এক নয়—যাহা একবার সত্যকার সৃষ্টিপদবী লাভ করিয়াছে, রসের জগতে তাহার আর মৃত্যু নাই, মৃত্যুনির্জ্জিত মানুষও তাহার প্রসাদে অমর হইয়া উঠে। অতএব সাহিত্যের প্রগতি বলিতে যদি ইহাই বুঝিতে হয় যে, এক কালের সাহিত্য অন্য কালে অচল, যাহা অগ্রবর্ত্তী তাহাই পশ্চাৎবর্ত্তী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তবে তাহা প্রগতি হইতে পারে, কিন্তু কদাপি সাহিত্য নহে। যত প্রাচীন হউক, কোন কাব্য যদি উৎকৃষ্ট হয়, তবে তাহার প্রকৃতি কিরূপ, সে সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ কবি-রসিকের এই উক্তি রসিকসমাজকে আশ্বস্ত করিবে—

All high poetry is infinite, it is as the first acorn, which contained all oaks potentially. Veil after veil may be withdrawn, and the inmost naked beauty of the meaning never exposed. A great poem is

a fountain for ever overflowing with the waters of wisdom and delight; and after one person and one age has exhausted its divine effluence which their peculiar relations enable them to share, another and yet another succeeds, and new relations are ever developed, the source of an unforeseen and an unconceived delight.

—কিন্তু প্রগতিবাদীরা, বিশেষত আমাদের দেশের ইঁহারা, এ কথা স্বীকার করিবেন না; তার কারণ, তাঁহাদের যা সাহিত্য তাহাতে poetry-র বালাই নাই—high poetry আবার কি? ও দেশের নব্য সম্প্রদায় এ সকল কথা নিত্য শুনিতেছে, এবং শুনিয়া তাঁহার পাল্টা জবাব দিতে নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করিতেছে। কারণ তাহারা আমাদের এই ধনুর্দ্ধরদের মত এতটা নিরঙ্কুশ নহে। তাই যখন তাহারা শোনে—

I quite freely admit, that to a man hesitating between socialism and anarchy, or between polygamy and eugenics, or between overhead and underground connexions for tramways, *The Tempest* or *Macbeth* would have very little to say of any profit.

তখন তাহারা বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্যও চুপ করিয়া থাকে।

৩

আমাদের প্রগতিওয়ালারা সেদিন সভা করিয়া, যে ভাষায় ও যে অর্থে, সাহিত্যের সদ্গতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা শুনিলে ওদেশের গুরুভাইয়েরা লজ্জা পাইত, সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের দিন যে গত হইয়াছে, এবং এক্ষণে তাঁহাদের দিন আসিয়াছে, ইহা কি আর কাহাকেও ডাকিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে? সেই জন্যই তো দেশে যে কয়জন ভদ্র সাধু-সজ্জন অবশিষ্ট আছে, তাহারা ঘটি-বাটি সামলাইতে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রীয় পরিষদে যেমন ক্রমাগতই মন্ত্রীমণ্ডলের পদত্যাগ

এবং অধিকতর দুঃসাহসী বিপ্লববাদী ব্যক্তিসংঘের মন্ত্রীপদলাভ রাজনৈতিক প্রগতির লক্ষণ, তেমনই রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্য-নায়কগণের পরাজয় ও এইরূপ যষ্টিধারীদের অভ্যুদয় সাহিত্যিক প্রগতির অকাট্য প্রমাণ। তুলনাটা আদৌ অসঙ্গত নয়; এই সকল বহ্বাস্ফোট-সম্বল বীরগণ, আর কোনও ক্ষেত্রে তাদৃশ প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, অগত্যা বাংলা দেশের নির্বিকার ও নির্জ্জীব সাহিত্য-সমাজে প্রতিপত্তি লাভের জন্য হাঁকডাক করিতেছেন। উপরি-উদ্ধৃত উক্তির সেই profit-ই ইঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, সাহিত্যের দোহাই দিয়া কিছু profit করিয়া লইবার জন্যই ইঁহারা এই অপেক্ষাকৃত নরম মাটিতে কুস্তির আখড়া স্থাপন করিয়াছেন; সাহিত্য-হিসাবেই সাহিত্যের ভাবনা করিতে ইঁহারা অক্ষম; কিন্তু সাহিত্য যাঁহাদের ধর্ম্ম ও সাধনার ধন, তাঁহাদের একজন এই ম্লেচ্ছদের সম্বন্ধে বড় দুঃখে বলিয়াছেন—

It is an awful truth, that there neither is, nor can be, any genuine enjoyment of poetry among nineteen out of twenty of those persons who live or wish to live, in the broad light of the world—among those who either are, or are striving to make themselves, people of consideration in society. This is a truth, and an awful one, because to be incapable of a feeling of poetry, in my sense of the word, is to be without love of human nature and reverence of God.

—ইহাই উদ্ধৃত করিয়া একজন অপর মনীষী বলিতেছেন—'That is an emphatic answer'।

কিন্তু শুনিবে কে? Love of human nature এবং reverence of God—মানব-প্রীতি ও ভগবদ্ভক্তিকে যে কাব্যরস-রসিকতার ভিত্তি-বলিয়া একজন কবি-ঋষি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আধুনিক প্রগতির ধাপ্পাবাজি যাহাদের রসিকতার চরম পরিণাম, তাহাদের অভিধানে সেই প্রেমভক্তির বিন্দুবিসর্গও নাই। Human nature বা humanity

বলিতে ইহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব চরিত্র, আত্মগত অভিমান বা অহংচর্চ্চা, এবং শিশ্নোদরসাধন বুদ্ধিবৃত্তিই বোঝে। যত বড় বড় কথা তাহারা বলুক, এবং যত বড় পাণ্ডিত্য ও পৌরুষই তাহাতে থাকুক, মূল বক্তব্য সেই একই, অর্থাৎ আমরা যাহা খুশি বলিব, যাহা খুশি করিব, এবং যাহা খুশি খাইব ; এই 'যাহা-খুশি'কে 'আহা-মরি' করাইতে না পারিয়াই তাহারা রাগিয়া কাঁদিয়া অনর্থ করিতেছে। নিজের নিদারুণ অক্ষমতা ও অন্তঃসারশূন্যতাকেই গৌরবান্বিত করিতে হইবে; তাই, রবীন্দ্রনাথের যুগ আর নাই—ইহাই চীৎকার করিয়া বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের মত আক্ষেপ করিতেছে, আমাদের লেখা কেহ পড়িতেছে না। ইহাতে যেমন অকালপক্কের মর্কটকাঠিন্য আছে, তেমনই এক প্রকার করুণরসের নাকিকান্নাও আছে। কিন্তু বিকাল-পক্ক প্রবীন যিনি, যাঁহার পাণ্ডিত্য-দম্ভের সীমা নাই, তাঁহার আস্ফালন কৃত্তিবাসী অঙ্গদ-রায়দরবারকেও লজ্জা দিয়াছে। তাঁহার বাণীতে সত্যকার বীরত্ব আছে—

Croakers are not wanting to tell you—with sighing glances fixed on the past these men would tell you...

—এই 'tell you' যে কি, তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না, কারণ এই প্রবন্ধই তো তাহাই—কত বড় croakers আমরা! কিন্তু—

To these gloomy judgments I take the liberty respectfully to demur, and I claim that despite the wailings of those defeatists...the literature produced by lesser personalities today, is neither lacking in art, nor in any way, of the qualities that make high class literature. This literature, I claim, can, as pure works of art, hold its own against any literature in the rest of India, and perhaps of the world outside.

সেই দামু আর চামু! বাংলা সাহিত্যে ইহারা আর মরিল না, অমর হইয়াই রহিল! কি ওজস্বিনী ভাষা, রসনার কি দিগন্তবিসর্পী লেলিহতা! "I claim"—অবশ্যই! সেইটাই যে আসল কথা ;

কারণ, বাংলার এই প্রগতি-সাহিত্যের অনেকখানিই তিনি যে নিজের অংশে দাবি করেন! "High class literature" "pure works of art"—এ সব যে তাঁহার নিজেরই কীর্ত্তির জয়গান! এইরূপ মনোবৃত্তি যাহাদের তাহাদেরই সম্বন্ধে ঋষি-কবির সেই উক্তি স্মরণ করিতে হইবে—"those who either are, or are striving to make themselves, people of consideration in society"। ইহারা যে কস্মিনকালে কোন জন্মে সাহিত্যরসের ধার ধারে না, ইহাদের রচিত সাহিত্য পড়িলে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে? পণ্ডিত হইয়াও এমন অপণ্ডিতের মত কথা বলে, ইহার কারণ কি? কারণ, যে দেশ ও যে সমাজ হইতে ইহারা সাহিত্যিক অভিযানে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, সে সমাজে রসবোধের বালাই, উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা কোনও কালেই ছিল না; কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সেই উক্তি যে বিদ্বেষবিজৃম্ভিত নয়, তাহা যে অতিশয় সত্য, আজ এই প্রগতিসম্প্রদায়ের মনোভাব ও সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকে না।

বাংলা দেশের প্রগতি-সাহিত্যের নেতা সাহিত্যের উপর প্রগতির শাসন প্রচার করিয়াছেন এই বলিয়া যে—

No writing deserves the name of literature unless it marks some progress beyond the literature of the past.

The name of literature! ইংরেজীর জোর কম নয়! Name of literature-এর সংজ্ঞা দিন দিন যেরূপ ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আমরা তো ইহাই বুঝি যে, যে কোনও writing—এমন কি কবিরাজী মোদকগুলির বিজ্ঞাপনও literature-নামের দাবি করিতে পারে। তাহাই যদি না হইবে, তবে এই সিনিয়র

প্রগতি-মহাশয় সাহিত্যের বিধানদাতা হইলেন কেমন করিয়া? সে কোন্ সাহিত্য? সেকালের কথা ছাড়িয়া দিই একালে পৃথিবীর সাহিত্যিক-সমাজে যাঁহারা সাহিত্যরস ও তাহার তত্ত্ব-আলোচনায় নিখিল রসিক-সমাজকে বিস্মিত ও পুলকিত করিতেছেন, তাঁহাদেরও কেহ সাহিত্যের এমন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হন নাই; সেই জন্যই কি ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, মর্ম্মাহত ও পরিশেষে ক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের এই বাঙালী সাহিত্য-বীর সাহিত্য-সম্বন্ধে এত বড় একটা সত্য 'একাং লজ্জাং পরিত্যজ্য' এমন ভাবে ঘোষণা করিয়া ফেলিলেন? রসজ্ঞান না হয় নাই থাকিল—সকলের তাহা থাকে না; কিন্তু এমন বুদ্ধিনাশ হইবার কারণ কি? সাহিত্য পড়িতে পড়িতে বুড়া হইয়া গেলাম; এত কবি, এত ক্রিটিক, এত মনীষী—প্রাচীন ও আধুনিক এত পণ্ডিতের এত কথাই শুনিলাম, কিন্তু এমন মগজভেদী উক্তি আর কোথায়ও শুনি নাই! হোমার-শেক্সপীয়রকে লইয়া এখনও যাহারা খাঁটি সাহিত্যসৃষ্টির গবেষণা করে, ব্যাস-বাল্মীকির মধ্যে এখনও যাহারা কাব্যরসের অন্ত পাইল না—তাহারা তো এই "Some progress beyond the literature of the past"-এর কথা কখনও ভাবিল না! সাহিত্যের রসটাই বড় কথা নয়—বড় কথা ওই progress? প্রগতি—প্রগতি—প্রগতি!—Progressive literature বাক্যটি একটি tautology! 'কোনও সাহিত্যই সাহিত্যপদবাচ্য নয়, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই'; অস্যার্থ—সাহিত্য ক্রমাগতই সাবালক হইতেছে, তারিখ যতই আগাইয়া যাইতেছে, ততই তাহা শেয়ানা হইয়া উঠিতেছে। অতএব যত আধুনিক হইতেছে, ততই তাহার দাবি বাড়িতেছে, পূর্ব্বের বইগুলিকে পিঁজরাপোলে অর্থাৎ মিউজিয়মে রাখিয়া দিতে হইবে। এই নব-অভিনবগুপ্তের মাপ-লাঠিতে আজিকার

সাহিত্য কালিকার সাহিত্যের কাছে হাত-পা ভাঙিয়া পড়িয়া থাকিবে—কেন না, progress চাই; সাহিত্যরস, ও রামা-শ্যামার দল বাঁধিয়া 'হাম্-বড়া'মির হুল্লোড়—এ দুইই যে একই পদার্থ! 'প্রগতি',—অর্থাৎ আপনাদের কীর্ত্তির কৃতিত্ব ঘোষণার জন্য পূর্ব্বযুগের সকল কবি-মহাকবিকে হঠাইয়া দিতে হইবে, যাহারা কবিকুলপুঙ্গব তাহারা এই মূষিকের দলকে প্রণাম করিবে! তার কারণ—

By a long course of evolution we have reached an ampler synthesis which embraces equal freedom for all and freedom in every aspect of life; and social organisations till yesterday were striving to achieve this freedom in as full measure as possible.

—অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য অপেক্ষা আধুনিক সাহিত্য শ্রেষ্ঠ না হইবে কেন? এ যে কোন্ রসের সাহিত্য, তাহা ওই 'every aspect of life' এবং 'social organisations' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এ আর কিছুই নয়—সেই শিশ্নোদরসমস্যারই কথা; সেই জন্য আর সকল সাহিত্য বাতিল হইয়া গিয়াছে। 'Freedom in every aspect of life'—ইহাই যে আধুনিক সাহিত্যের মূলমন্ত্র! আমরাও তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি, কেবল ইহাই বুঝিতে পারিতেছি না যে, এই মন্ত্রটির সাধনার জন্য একটা নূতন পঞ্চবটীর প্রতিষ্ঠা করিলেই তো ভাল হইত—পূর্ব্ববর্ত্তীদের সেই আসনটির উপরেই এত লোভ কেন? ঐ সাহিত্য নামটাকেও বর্জ্জন করিয়া একটা নূতন নামে এই 'brave new world'-এর পত্তন করিলে তো আর কোনও হাঙ্গাম হইত না। কিন্তু তাহা যে ইহাদের মনঃপূত নয়, তার কারণ, 'সাহিত্য' নামটার একটা বনিয়াদী প্রতিপত্তি আছে, অসাহিত্যিক হইয়াও সেই প্রতিপত্তি-টুকু চাই। শূদ্রের ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষের কারণও তাহাই—যাহাকে বলে দারুণ inferiority complex; ব্রাহ্মণত্বের প্রতি সভয় শ্রদ্ধা আছে,

লোভও কম নয়; কিন্তু তাহা যে হইবার উপায় নাই, জন্মক্ষণেই বিধাতা বাদ সাধিয়াছেন—তাই এত আক্রোশ, এত চীৎকার।

এই আক্রোশের বশেই ছোট প্রগতি-মহাশয় এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইতে চান যে, রবীন্দ্রনাথের দিন গিয়াছে, এবং রবীন্দ্রোত্তর কবি-সাহিত্যিকগণ গড্ডলিকাবৃত্তি করিয়া সেই মৃতযুগের মৃতভার বহন করিতেছেন। এ আশ্বাস যে চাই-ই, নতুবা বাঁচে কেমন করিয়া? কিন্তু ইহাতেও একটু গোল রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথকে যাহারা কেবলমাত্র অনুকরণ করিয়াই বাঁচিতে চায়, তাহাদের কথা বলি না; কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যে রসের যে আদর্শ রহিয়াছে, তাহা যে সর্ব্বযুগের আদর্শ—রবীন্দ্রনাথও যে গড্ডলিকাবৃত্তি করিয়াছেন! তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথও কখনও বাঁচিয়া থাকেন নাই—খাঁটি-প্রগতিতত্ত্ব অনুসারে রবীন্দ্রযুগও একটা পৃথক যুগ নয়, যেহেতু তাহাও পূর্ব্বতন যুগের মূল রসপ্রেরণাকে বাতিল করিয়া দিতে পারে নাই, সেও মৃতযুগের মৃতভার বহন করিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত এই দাঁড়ায় যে, ইহারা সাহিত্যকেই চায় না, চায়—যাহা খুশি বলিব, যাহা খুশি করিব, এবং যাহা খুশি খাইব; এবং যে সমাজ তাহাতে আপত্তি করিবে, তাহাকে decadent, vicious ও putrescent বলিয়া গালি দিব।

৪

বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যিক দলের মতি-গতি ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম; ইহাদের কথার জবাব দিবার চেষ্টা অনর্থক, তার কারণ—প্রথমত, যাহারা সাহিত্য বোঝে না এবং

রিশ্বাসও করে না, আত্মপ্রতিষ্ঠাই যাহাদের একমাত্র অভিপ্রায়, তাহারা কোনও জবাব মানিবে না। দ্বিতীয়ত, যে দেশ হইতে এইরূপ সাহিত্য-তত্ত্বের আমদানি হইয়াছে এবং এখানকার জল-মাটির গুণে তাহার এমন বৈজ্ঞানিক ভাষ্য প্রস্তুত হইয়াছে—সেই দেশেই বিষলতাও যেমন জন্মিয়াছে, তেমনই বিষঘ্ন ভেষজের অভাব ঘটে নাই। সেখানে আচার্য্যকল্প সাহিত্যিকের মুখে সাহিত্যবস্তুর যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ শোনা যাইতেছে, ইংরেজী-অভিজ্ঞ বাঙালী পাঠকের পক্ষে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই অ যে কয়টি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটি বিভিন্ন ব্যক্তির ; পরে আরও কিছু উদ্ধৃত করিব, তাহা হইতে অন্তত এইটুকু সপ্রমাণ হইবে যে—প্রকৃত সাহিত্য-জ্ঞান এখনও পৃথিবী হইতে লুপ্ত হয় নাই। একালেও সভ্যতম সমাজের শিক্ষিততম ব্যক্তিরাই সাহিত্যের প্রসঙ্গে অসাহিত্যিক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতেছেন না। সমাজে যেমন্ চোর আপনা হইতেই চোরের দলে আকৃষ্ট হয়—সাধু সাধুর দলে, তেমনই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রসিক রসিকের দলে, এবং বেরসিক বেরসিকের দলে মিশিয়া থাকে। অতএব দল গড়িলেই কোন-কিছুর প্রাধান্য প্রমাণিত হয় না ; বরং, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নানা স্থানে শাখা স্থাপন করিয়া একটা 'নিখিল'-রকমের বড় দল গড়িয়া তুলিলেই বুঝিতে হইবে, উদ্দেশ্যটা সাহিত্যের দিক দিয়া সৎ বা সত্য নহে। এই সকল প্রগতিপন্থী সাহিত্যিক-বীরকে আকাশে তুলিয়া সংবাদপত্রে পত্রপ্রেরকদিগের যে হুড়াহুড়ি লাগিয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, আমাদের দেশে শিক্ষাবিস্তারের অনুপাতে কাল্চার কত কমিয়া গিয়াছে—সাহিত্য-রসবোধ দুর্লভ হইয়াছে বলিয়াই যশ এত সুলভ হইয়াছে।

বাংলার প্রগতি-সাহিত্য যে প্রগতির পরিচয় কিছুকাল যাবৎ দিয়া

আসিতেছে, এতদিনে তাহা কোনও সুস্থ ও সহৃদয় ব্যক্তির অবিদিত নাই। এই সাহিত্য অতিশয় আধুনিক হইলেও ইহার লক্ষণ নূতন নহে, এবং ইহার সম্ভাবনা কোনও কালেরই অগোচর ছিল না; তাহার প্রমাণ, ১৩১৩ সালে, প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

আমাদের প্রবৃত্তি উগ্র হইয়া উঠিলে বিধাতার জগতের বিরুদ্ধে নিজে যেন সৃষ্টি করিতে থাকে। তখন চারিদিকের সঙ্গে তাহার আর মিল খায় না। আমাদের ক্রোধ, আমাদের লোভ নিজের চারিদিকে এমন সকল বিকার উৎপাদন করে, যাহাতে ছোটই বড় হইয়া উঠে, বড়ই ছোট হইয়া যায়; যাহা ক্ষণকালের তাহাই চিরকালের বলিয়া মনে হয়, যাহা চিরকালের তাহা চোখেই পড়ে না। যাহার প্রতি আমাদের লোভ জন্মে তাহাকে আমরা এমনি অসত্য করিয়া গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড় বড় সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়, চন্দ্রসূর্য্যতারাকে সে ম্লান করিয়া দেয়। ইহাতে আমাদের সৃষ্টি বিধাতার সঙ্গে বিরোধ করিতে থাকে।

—পড়িয়া মনে হয় নাকি যে, এ যেন এই প্রগতি-সাহিত্যের সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের একটি অতি-আধুনিক উক্তি? ঐ যে 'freedom'-এর অভিযান—সাহিত্যে তাহার এই দলবদ্ধ আস্ফালনই 'বিধাতার জগতের বিরুদ্ধে' আধুনিক মানুষের চীৎকার। আমি এই সাহিত্যকে শিশ্নোদর-সর্ব্বস্ব বলিয়াছি—বাক্যটি অশ্লীল হইলেও, অর্থটি সত্য অতএব সাধু। সেকালের সত্যদর্শী ঋষিগণ আধুনিক প্রগতিবাদের অর্থ বুঝিতেন—পৃথিবীময় আজ যে মানুষের দল "freedom in every aspect of life" বলিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের সেই ব্যাধির নিদান এক কথায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য তাঁহারা ঐ অতিশয় সাধুবাক্যটি সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অতএব আমাদেরও লজ্জিত হইবার কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ ঋষি নহেন, তিনি কবি; তাই তিনি অতখানি নগ্নতার পক্ষপাতী হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার বক্তব্য সেই একই, অতিশয়

ভদ্রভাবে তিনি বলিয়াছেন, "যাহার প্রতি আমাদের লোভ তাহাকে এমনি অসত্য করিয়া গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড় বড় সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়।" প্রগতি-সাহিত্য হইতেই ইহার উদাহরণ দিব। বাংলা কাব্যে প্রেমের কবিতা প্রায় নাই বলিলেই হয়—'অত বড় ইংরেজী সাহিত্যেও তেমন প্রেমের কবিতা ঝুড়ি ঝুড়ি নাই'—ইহাই বুঝাইবার জন্য মহাপণ্ডিত ও মহাসাহিত্যিক ছোট প্রগতি-মহাশয় এক স্থানে লিখিয়াছেন—

যৌন অভিজ্ঞতা জীবনে বেশির ভাগ মানুষেরই হয় কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা কবিদের মধ্যেই বা ক'জন বর্ণনা করতে পেরেছেন?...ব্যাপারটা যদি এতই সহজ হ'ত তা'হলে যে-কোনো মানুষই কি অল্প 'নৈপুণ্যের' দ্বারা তার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে পারতো না?

এই জন্যই প্রেমের কবিতা বাংলায়, এমন কি ইংরেজীতেও, এত দুর্লভ! যৌন অভিজ্ঞতাই যে-প্রেমের গভীরতম উপলব্ধির মূল, এবং তাহার "যে শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া" উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতায় নিখুঁত ভাবে অঙ্কিত হওয়া চাই, তাহা পশুর মতই মানুষের পক্ষেও অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া—তেমন কবিতা লেখা বড়ই দুরূহ। সে যে কত দুরূহ, তাহা বুঝে না বলিয়াই সাধারণ মানুষেরা এইরূপ কবিতার কবিকে ন্যায্য সম্মান দান করিতে চাহে না। এইরূপ সার্থক রচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক এই লাইন কয়টি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, "এ রকম পংক্তি জগতে খুব বেশি লেখা হয় না"—

The moment of desire! the moment of desire! the virgin that pines for the man shall awaken her womb to enormous joys in the secret shadows of her chamber.

হায় বাল্মীকি, হায় কালিদাস! হায় শেক্সপীয়র, হায় রবীন্দ্রনাথ! বাংলার বৈষ্ণবপদাবলী তো গোল্লায় গিয়াছে। কারণ, এমন রজকিনী

পাইয়াও দ্বিজ-কবি 'শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া'র মশলাগুলি কবিতার রসে মিশাইতে পারেন নাই। আমার 'শিশ্নোদরপরায়ণ' কথাটা কি মিথ্যা? না, রবীন্দ্রনাথ ভুল বলিয়াছেন?—'যাহার প্রতি আমাদের লোভ তাহাকে এমনি অসত্য করিয়া গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড় বড় সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়, চন্দ্রসূর্য্যতারাকেও সে ম্লান করিয়া দেয়।'

এইরূপ মনোবৃত্তি যাহাদের, তাহারাই যদি সাহিত্যিক হয়, তাহা হইলে সাহিত্যের আদর্শ কি হইবে, তাহা তো জানাই আছে। একজন ইংরেজ সমালোচক আধুনিক সাহিত্যিকদিগকে একটি নাম দিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন, সে নাম অবশ্য তাহারা গৌরবের সহিত গ্রহণ করিবে; কারণ, কিছুতেই তাহাদের গৌরবহানি হয় না। এই লেখক বলিতেছেন—

If we fasten then, one label on these books, on which is one word materialists, we mean by it that they write of unimportant things; that they spend immense skill and immense industry making the trivial and the transitory appear the true and the enduring.

শেষের বাক্যটি যেন হুবহু রবীন্দ্রনাথেরই অনুবাদ! লেখক ইহাদিগকে নাম দিয়াছেন—materialists, অর্থাৎ জড়বাদী; এবং কি অর্থে, তাহাও বুঝাইয়া বলিয়াছেন। সে দেশের আধুনিকদের সম্বন্ধে ইহাই হয়তো যথার্থ; কিন্তু আমাদের এই প্রগতির দল জড়বাদীও নহে, জড়েরও যে ধর্ম্ম আছে, ইহাদের তাহা নাই; কারণ জড়েরও প্রকৃতি-গুণ আছে, ইহারা সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। ইহাদের এই যে অমাচার, এই যে অসত্যের আরাধনা, ইহাতে immense skill and immehse industryর প্রয়োজন হয় না; কারণ, তাহার সাড়ে পনরো আনাই অনুকরণ, ইহাদের জীবধর্ম্মই স্তিমিত, জড়ধর্ম্ম বরং ভাল ছিল।

উপরি-উক্ত সমালোচকের আর একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। আমাদের এই 'শিশুবিদ্যা-গরীয়সী' প্রগতি-প্রতিভার যাঁহারা গুরু, সেই ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের বিখ্যাত কয়েকজনের নাম করিয়া, তাঁহাদের তথাকথিত বাস্তবতার অজুহাত সম্বন্ধে, এই লেখকই বলিতেছেন—

Let us hazard the opinion that for us at the moment the form of fiction most in vogue more often misses than secures the thing we seek. Whether we call it life or spirit, truth or reality, this, the essential thing has moved off......we suspect a momentary doubt, a spasm of rebellion, as the pages fill themselves in the customary way. Is life like this? Must novels be like this?

পরিশেষে আর এক আধুনিক মনীষীর একটিমাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। যাহারা অন্তরে ধর্ম্মহীন, আধুনিক যুগের অহং-মদমত্ততায় যাহারা প্রাণের স্থৈর্য্য হারাইয়াছে, যাহারা মৃত্যুকেই মোক্ষ জানিয়া চিরকালের উপর ক্ষণকালকে আসন দিয়াছে, এবং সর্ব্বশেষে যাহারা বিকৃত দেহ-মনের স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যকেই প্রজ্ঞা ও প্রতিভার নিদান বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহারাই প্রগতির ধূয়া তুলিয়া সাহিত্যকে বিকারগ্রস্ত করিতেছে। যে ধরণের প্রগতিবাদের দম্ভ ইহারা করিয়া থাকে তাহাতে তত্ত্বগত প্রগতিও নাই—কালের প্রবহমানতাকেই ইহারা কার্য্যত অস্বীকার করে। নিজের আত্মাভিমানের অনুকূল করিয়া ইহারা কালকে বিচ্ছিন্ন বর্ষসমষ্টিরূপে ধারণা করে, এক একটি বর্ষসমষ্টি আপনাতেই সমাপ্ত। যেন কালের কোনও সুনিয়ত প্রবাহ নাই, তাহার প্রত্যেক অংশই এক একটি স্বতন্ত্র ঘূর্ণি। অতীত নাই, ভবিষ্যৎও ভাবনার বহির্ভূত; প্রেম নাই, বিশ্বাস নাই—আছে কেবল স্বাধিকার, স্বাতন্ত্র্য, ও পাশব স্বার্থের অসৎ উত্তেজনা। ইহাদের মনস্তত্ত্বে রসতত্ত্বের স্থান নাই—থাকিতে পারে না; তাই ইহারা কাব্যরসের চিরনির্ঝরকে বিদ্রূপ করে, মানুষের জীবনে যে বস্তুর প্রয়োজন সবচেয়ে

বেশি, যাহার অভাবে মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না, তাহাকে ইহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পায়। তাই যাঁহারা যুগে যুগে মানুষের অধ্যাত্মজীবন পুষ্ট করিয়া, সার্ব্বজনান মনুষ্যত্বের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া মানুষকে অশেষ ঋণে ঋণী করিয়াছেন, সেই অমৃত-সমাজ কবিগণের চিরনবীনতাময়ী বাণীকে ইহারা অতীতের আবর্জ্জনাস্তূপ বলিয়া মনে করে। তাহার কারণ, ইহারা জড়বাদী নাস্তিক, প্রেমহীন ও ধর্ম্মহীন। কিন্তু যাঁহাদের আত্মা এখনও সুস্থ আছে, যাঁহারা জ্ঞানে ও প্রেমে সমান বলীয়ান, কবিত্বের অমৃত-হ্রদে অবগাহন করিয়া যাঁহাদের কান্তি উজ্জ্বল ও শান্তিসুস্নিগ্ধ হইয়া উঠে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। এমনই একজন জগতের মহাকবিদিগের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

To men such as these the debt of humanity is inestimable. They, above all others, keep the souls of men alive; they do not *tell* us of spiritual felicity; they *create* it in us from the substance of our coarser elements....Not that Shakespeare was a Christian, any more than the poet is a mystic. But he was religious, as all great poets must be. For high poetry and high religion are at one in the essential that they demand that a man shall not merely think thoughts, but feel them—that this highest mental act be done with all his heart and with all his mind and with all his soul.

আমাদের যুগন্ধর সাহিত্যিকদিগের যে সকল উক্তি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সহিত এই উক্তি তুলনা করিলে, যাহারা মানুষ, পশু নয়, তাহারা কি বুঝিতে পারে না, কোন্ উক্তিটির মধ্যে, কাহার কণ্ঠস্বরে, মানুষের সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্ব মহত্তর ও বৃহত্তর ছন্দে স্পন্দিত হইতেছে? মনে হয়, জাতিতে জাতিতে যেমন, মানুষে মানুষেও তেমনই কত তফাৎ! নহিলে আমাদের দেশে, এই অতি-আধুনিক সাহিত্যিক সমাজে, এমন কথা এ পর্য্যন্ত কাহারও মুখে শুনিতে পাইলাম না কেন? প্রগতি তো সে দেশেও আছে।

ধাত্রী দেবতা

উনিশ

শ্রাবণের শেষ, আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া মেঘের সমারোহ জমিয়া উঠিয়াছে। কলেজের মেসের বারান্দায় রেলিঙের উপর কনুইয়ের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া হাত দুইটির উপরে মুখ রাখিয়া শিবনাথ মেঘের দিকে চাহিয়া ছিল। মাঝে মাঝে বর্ষার বাতাসের এক একটা দুরন্ত প্রবাহের সঙ্গে রিমিঝিমি বৃষ্টি নামিয়া আসিতেছে, বৃষ্টির মৃদু ধারায় তাহার মাথার চুল সিক্ত, মুখের উপরেও বিন্দু বিন্দু জল জমিয়া আছে। পাতলা ধোঁয়ার মত ছোট ছোট জলীয় বাষ্পের কুণ্ডলী সনসন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, একের পর এক মেঘগুলি যেন এদিকের বড় বড় বাড়িগুলির ছাদের আড়াল হইতে উঠিয়া ওদিকের বাড়িগুলির ছাদের আড়ালে মিলাইয়া যাইতেছে। নীচে জলসিক্ত শীতল কঠিন রাজপথ—হ্যারিসন রোড। পাথরের ইটে বাঁধানো পরিধির মধ্যেও ট্রাম-লাইনগুলি চকচক করিতেছে। একতলার উপরে ট্রামের তারগুলি স্থানে স্থানে আড়াআড়ি বাঁধনে আবদ্ধ হইয়া বরাবর চলিয়া গিয়াছে। তারের গায়ে অসংখ্য জলবিন্দু জমিয়া জমিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। এই দুর্যোগেও ট্রামগাড়ি মোটর মানুষ চলার বিরাম নাই। বিচিত্র কঠিন শব্দে রাজপথ মুখরিত।

কলিকাতাকে দেখিয়া শিবনাথের বিস্ময়ের এখনও শেষ হয় নাই। অদ্ভুত বিচিত্র ঐশ্বর্যময়ী মহানগরীকে দেখিয়া শিবনাথ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল। সে বিস্ময়ের ঘোর আজও সম্পূর্ণ কাটে নাই। তাহার বিপুল বিশাল বিস্তার পথের জনতা যানবাহনের উদ্ধত

ক্ষিপ্র গতি দেখিয়া শিবনাথ এখনও শঙ্কিত না হইয়া পারে না। আলোর উজ্জ্বলতা, দোকানে দোকানে পণ্যসম্ভারের বর্ণবৈচিত্র্যে বিচ্ছুরিত হইয়া আজও তাহার মনে মোহ জাগাইয়া তোলে; স্থান কাল সব সে ভুলিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে ভাবে, এত আছে, এত সম্পদ আছে পৃথিবীতে—এত ধন, এত ঐশ্বর্য্য!

সেদিন সে সুশীলকে বলিল, কলকাতা দেখে মধ্যে মধ্যে আমার মনে হয় কি জানেন, মনে হয় দেশের যেন হৃৎপিণ্ড এটা; সমস্ত রক্ত-স্রোতের কেন্দ্রস্থল।

সুশীল প্রায়ই শিবনাথের কাছে আসে, শিবনাথও সুশীলদের বাড়ি যায়। সুশীল শিবনাথের কথা শুনিয়া হাসিয়া উত্তর দিল, উপমাটা ভুল হ'ল ভাই শিবনাথ। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে, হৃৎপিণ্ড অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত সঞ্চালন করে, সঞ্চার করে, শোষণ করে না। কলকাতার কাজ ঠিক উল্টো, কলকাতা করে দেশকে শোষণ। গঙ্গার ধারে ডকে গেছ কখনও? সেই শোষণ-করা রক্ত ভাগীরথীর টিউবে টিউবে ব'য়ে চ'লে যাচ্ছে দেশান্তরে, জাহাজে জাহাজে—ঝলকে ঝলকে। এই বিরাট শহরটা হ'ল একটা শোষণযন্ত্র।

এ কথার উত্তর শিবনাথ দিতে পারে নাই। নীরবে কথাটা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সুশীল আবার বলিল, মনে করুন তো আপনার দেশের কথা, ভাঙা বাড়ি, কঙ্কালসার মানুষ, জলহীন পুকুর, সব শুকিয়ে যাচ্ছে এই শোষণে।

তারপর ধীরে ধীরে দৃঢ় আবেগময় কণ্ঠে কত কথাই সে বলিল, দেশের কত লক্ষ লোক অনাহারে মরে, কত লক্ষ থাকে অর্দ্ধাশনে, কত লক্ষ লোক গৃহহীন, কত লক্ষ লোক বস্ত্রহীন, কত লক্ষ লোক মরে কুকুর-বেড়ালের মত বিনা চিকিৎসায়। দেশের দারিদ্র্যের দুর্দ্দশার

ইতিহাস আরও বলিল, একদিন নাকি এই দেশের ছেলেরা সোনার ভাঁটা লইয়া খেলা করিত, দেশে বিদেশে অন্ন বিতরণ করিয়া দেশজননী নাম পাইয়াছিলেন অন্নপূর্ণা। অফুরন্ত অন্নের ভাণ্ডার, অপর্য্যাপ্ত মণিমাণিক্য-স্বর্ণের স্তূপ। শুনিতে শুনিতে শিবনাথের চোখে জল আসিয়া গেল।

সুশীল নীরব হইলে সে প্রশ্ন করিল, এর প্রতিকার?

হাসিয়া সুশীল বলিয়াছিল, কে করবে?

আমরা।

বহুবচন ছেড়ে কথা কও ভাই, এবং সেটা পরস্মৈপদী হ'লে চলবে না।

সে একটা চরম উত্তেজনাময় আত্মহারা মুহূর্ত্ত। শিবনাথ বলিল, আমি—আমি করব।

সুশীল প্রশ্ন করিল, তোমার পণ কি?

মুহূর্ত্তে শিবনাথের মনে হইল, হাজার হাজার আকাশস্পর্শী অট্টালিকা প্রশস্ত রাজপথ কোলাহল-কলরবমুখরিত মহানগরী বিশাল অরণ্যে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার অরণ্যতলে দূর হইতে যেন অজানিত গম্ভীর কণ্ঠে কে তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে, তোমার পণ কি? সর্ব্বাঙ্গে তাহার শিহরণ বহিয়া গেল, উষ্ণ রক্তস্রোত দ্রুতবেগে বহিয়া চলিয়াছিল; সে মুহূর্ত্তে উত্তর করিল, ভক্তি।

তাহার মনে হইল, চোখের সম্মুখে এক রহস্যময় আবরণীর অন্তরালে মহিমমণ্ডিত সার্থকতা জ্যোতির্ম্ময় রূপ লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। তাহার মুখ-চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে সে সুশীলের মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল।

সুশীলও নীরব হইয়া একদৃষ্টে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, শিবনাথ অধীর আগ্রহে বলিল, বলুন সুশীলদা, উপায় বলুন।

বিচিত্র মিষ্ট হাসি হাসিয়া সুশীল বলিল, ওই ভক্তি নিয়ে দেশের সেবা কর ভাই, মা পরিতুষ্ট হয়ে উঠবেন।

শিবনাথ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, আপনি আমায় বললেন না!

বলব, আর একদিন।—বলিয়াই সুশীল উঠিয়া পড়িল। সিঁড়ির মুখ হইতে ফিরিয়া আবার সে বলিল, আজ আমাদের ওখানে যেও। মা বার বার ক'রে ব'লে দিয়েছেন; দীপা তো আমাকে খেয়ে ফেললে

দীপা সুশীলের আট বছরের বোন, ফুটফুটে মেয়েটি, তাহার সম্মুখে কখনও ফ্রক পরিয়া বাহির হইবে না। সুশীল তাহাকে বলিয়াছে, শিবনাথের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে; সে শাড়িখানি পরিয়া সলজ্জ ভঙ্গিতে তাহার সম্মুখেই দূরে দূরে ঘুরিবে ফিরিবে, কিছুতেই কাছে আসিবে না; ডাকিলেই পলাইয়া যাইবে।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া মৃদু বর্ষাধারায় ভিজিতে ভিজিতে শিবনাথ সেদিনের কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে দীপার প্রসঙ্গে আসিয়াই মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; এমন একটি অনাবিল কৌতুকের আনন্দে কেহ কি না হাসিয়া পারে!

কি রকম? আকাশের সজল মেঘের দিকে চেয়ে বিরহী যক্ষের মত রয়েছেন যে? মাথার চুল গায়ের জামাটা পর্য্যন্ত ভিজে গেছে, ব্যাপারটা কি?—একটি ছেলে আসিয়া শিবনাথের পাশে দাঁড়াইল।

তাহার সাড়ায় আত্মস্থ হইয়া শিবনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল, বেশ লাগছে ভিজতে। দেশে থাকতে কত ভিজতাম বর্ষায়!

ছেলেটি হাসিয়া বলিল, আমি ভাবলাম, আপনি বুঝি প্রিয়ার কাছে লিপি পাঠাচ্ছেন মেঘমালার মারফতে। By the by, এই ঘণ্টা দুয়েক

আগে, আড়াইটে হবে তখন—আপনার সম্বন্ধী এসেছিলেন আপনার সন্ধানে—কমলেশ মুখার্জি।

চকিত হইয়া শিবনাথ বলিল, কে ?

কমলেশ মুখার্জি। চেনেন না নাকি ?

শিবনাথ গম্ভীর হইয়া গেল। কমলেশ ! ছেলেটি হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, আমরা সব জেনে ফেলেছি মশায়। বিয়ের কথাটা আপনি স্রেফ চেপে গেছেন আমাদের কাছে। আমাদের feast দিতে হবে কিন্তু।

শিবনাথ গম্ভীর মুখে নীরব হইয়া রহিল।

সামান্যক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকিয়া ছেলেটি বলিল, আপনি কি রকম লোক মশাই, সর্ব্বদাই এমন serious attitude নিয়ে থাকেন কেন, বলুন তো ?

শিবনাথের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কমলেশের নামে, তাহার এখানে আসার সংবাদে তাহার অন্তর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তবুও সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, কি করব বলুন, মানুষ তো আপনার স্বভাবকে অতিক্রম করতে পারে না। এমনিই আমার স্বভাব সঞ্জয়বাবু।

সঞ্জয় বারান্দার রেলিঙের উপর একটা কিল মারিয়া বলিল, You must mend it, আমাদের সঙ্গে বাস করতে হ'লে দশজনের মত হয়ে চলতে হবে।—কথাটা বলিয়াই সদর্প পদক্ষেপে সে চলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে তখন কোন একটা কারণে প্রবল উচ্ছ্বাসের কলরব ধ্বনিত হইতেছিল।

শিবনাথ একটু হাসিল, বেশ লাগে তাহার এই সঞ্জয়কে। তাহারই সমবয়সী সুন্দর সুরূপ তরুণ, উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, যেখানে হৈচৈ সেখানেই সে আছে। কোন রাজার ভাগিনেয় সে; দিনে পাঁচ ছয় বার বেশ-

পরিবর্ত্তন করে, আর সাগর-তরঙ্গের ফেনার মত সর্ব্বত্র সর্ব্বাগ্রে উচ্ছ্বসিত হইয়া ফেরে। ফুটবল খেলিতে পারে না, তবুও সে forward lineএ left outএ গিয়া দাঁড়াইবে, চীৎকার করিবে, আছাড় খাইবে; অভিনয় করিতে পারে না, তবুও সে কলেজের নাটকাভিনয়ে যে কোন ভূমিকায় নামিবে; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, গতি তাহার অতি স্বচ্ছন্দ, কাহাকেও আঘাত করে না, আর সে ভিন্ন কোন কলরব-কোলাহল যেন সুশোভনও হয় না।

কিন্তু কমলেশ কি জন্য এখানে আসিয়াছিল? যে তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে পর্য্যন্ত লজ্জা করে, সে কি কারণে এখানে আসিল? নূতন কোন আঘাতের অস্ত্র পাইয়াছে নাকি? তাহার গৌরীকে মনে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপরের আকাশের দুর্য্যোগ তাহার অন্তরে ঘনাইয়া উঠিল। একটা দুঃখময় আবেগের পীড়নে বুকখানি ভরিয়া উঠিল।

সিঁড়ি ভাঙিয়া দুপদাপ শব্দে কে উঠিয়া আসিতেছিল, পীড়িত চিত্তে সে সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। উঠিয়া আসিল একটি ছেলে, পরণে নিখুঁত Boys-scoutএর পোষাক, মাথার টুপিটি পর্য্যন্ত ঈষৎ বাঁকানো; মার্চের কায়দায় পা ফেলিয়া বারান্দা অতিক্রম করিতে করিতেই বলিতেছিল, হ্যালো সঞ্জয়, a cup of hot tea my friend, oh, it is very cold।

ছেলেটির গলার সাড়া পাইয়া ঘরের মধ্যে সঞ্জয়ের দল নূতন উচ্ছ্বাসে কলরব করিয়া উঠিল। ছেলেটির নাম নিত্য, শিবনাথের সঙ্গেই পড়ে। চালে চলনে কায়দায় কথায় একেবারে যাহাকে বলে নিখুঁত কলিকাতার ছেলে। আজও পর্য্যন্ত শিবনাথ তাহার পরিচিত দৃষ্টির বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে।

ধীরে ধীরে শিবনাথের উচ্ছ্বসিত আবেগ শান্ত হইয়া আসিতেছিল; মেঘমেদুর আকাশের দিকে চাহিয়া সে উদাস মনে কল্পনা করিতেছিল, একটা মহিমময় নিপীড়িত ভবিষ্যতের কথা। গৌরী তাহাকে মুক্তি দিয়াছে, সেই মুক্তির মহিমাতেই সে মহামন্ত্র পাইয়াছে, 'বন্দে মাতরম্, ধরণীম্ ভরণীম্ মাতরম্'।

পিছনে অনেকগুলি জুতার শব্দ শুনিয়া শিবনাথ বুঝিল, সঞ্জয়ের দল বাহির হইল।—হয় কোন্ রেস্তোরাঁয় অথবা এই বাদল মাথায় করিয়া ইডেন গার্ডেনে।

Hallo, is, it true you are married? নিত্যর কণ্ঠস্বরে শিবনাথ ঘুরিয়া দাঁড়াইল, সম্মুখেই দেখিল একদল ছেলে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে, দলের পুরোভাগে নিত্য, কেবল সঞ্জয় দলের মধ্যে নাই। শিবনাথের পায়ের রক্ত যেন মাথার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

সে অসঙ্কুচিত ভঙ্গিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া অকুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিল, Yes, I am married।

এমন নির্ভীক দর্পিত স্বীকারোক্তি শুনিয়া সমস্ত দলটাই যেন দমিয়া গেল, এমন কি নিত্য পর্য্যন্ত। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই কিন্তু নিত্য মাত্রাতিরিক্ত ব্যঙ্গভরে বলিয়া উঠিল, Shame!

ছেলের দল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দলটার পিছনে আপনার ঘরের দরজায় বাহির হইয়া সঞ্জয় ডাকিল, Well boys, tea is ready। বাঃ, ওকি, শিবনাথবাবুকে নিয়ে আসছ না কেন, he is not an outcaste! একি, শিবনাথবাবুর মুখ এমন কেন? It is you নিত্য, তুমি নিশ্চয় কিছু বলেছ। না না না, শিবনাথবাবু, আপনাকে আসতেই হবে, you must join us।

চায়ের আসরটা জমিয়া উঠিল ভাল। মনের মধ্যে যেটুকু উত্তাপ জমিয়া উঠিয়াছিল, সেটুকু ধুইয়া মুছিয়া দিল ওই সঞ্জয়। ঘরের মধ্যে বসিয়া স্টোভের শব্দে নিত্য এবং অন্যান্য ছেলেদের কথা হাসি সে শুনিতে পায় নাই। চায়ের জলটা নামাইয়া ফুটন্ত জলে চা ফেলিয়া দিয়া নিত্যদের ডাকিতে বাহিরে আসিয়াই শিবনাথের মুখ দেখিয়া ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। সমস্ত শুনিয়া সে শিবনাথের পক্ষ লইয়া সপ্রশংস মুখে বলিল, That's like a hero. বেশ বলেছেন আপনি শিবনাথবাবু! বিয়ে করা সংসারে পাপ নয়। বিয়ে করা পাপ হ'লে scout হওয়াও সংসারে পাপ।

এমন ভঙ্গিতে সে কথাগুলি বলিল যে, দলের সকলেই এমন কি নিত্য পর্য্যন্ত না হাসিয়া পারিল না। সঞ্জয় বলিল, নিত্য, তুমি shame বলেছ যখন, তখন শিবনাথবাবুর কাছে তোমাকে apology চাইতে হবে। You must।

All right! ভুলের সংশোধন করতে আমি বাধ্য, I am a scout, শিবনাথবাবু।

শিবনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, না না না, আমি কিছু মনে করি নি। We are friends।

Certainly।

You must prove it, both of you।—একজন বলিয়া উঠিল।

নিত্য বলিল, How? প্রমাণ করতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

বক্তা বলিল, তুমি দুটাকা দাও, আর শিবনাথবাবু দুটাকা—

সঞ্জয় বলিয়া উঠিল, No, not শিবনাথবাবু, say শিবনাথ। নিত্য দুটাকা, শিবনাথ দুটাকা and my humble self দুটাকা। নিয়ে এস খাবার।

নিত্য বলিল, All right, কিন্তু not a copper in my pocket now ; any friend to stand for me ?

শিবনাথ বলিল, I stand for you my friend। চার টাকা এনে দিচ্ছি আমি।—সে বাহির হইয়া গেল।

সঞ্জয় হাঁকিতে আরম্ভ করিল, গোবিন্দ গোবিন্দ !—গোবিন্দ মেসের চাকর।

শিবনাথ টাকা কয়টি সঞ্জয়ের হাতে দিতেই নিত্য নাটকীয় ভঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমার একটা amendment আছে। We are eight, আটজনে দুটাকা cinema, একটাকা tram and tea there, আর three rupees এখানে খাবার।

অধিকাংশ ছেলেই কলরব করিয়া সায় দিয়া উঠিল। সঞ্জয় বলিল, All right, তা হ'লে এখানে শুধু চা, খাওয়া-দাওয়া সব cinemaয়। কিন্তু চার আনার সীট বড় nasty, আট আনা না হ'লে বসা যায় না ! চাঁদা বাড়াতে হবে শিবনাথ, তুমি তিন, নিত্য তিন, আমি তিন ; ন টাকার পাঁচ টাকা সিনেমা, চার টাকা খাবার।

শিবনাথও অমত করিল না, পরম উৎসাহভরেই সে আবার টাকা আনিতে চলিয়া গেল। এ মেসে আসিয়া অবধি সুশীল ও পূর্ণের আকর্ষণে সে সকলের নিকট হইতে একটু দূরে দূরেই ছিল। সুশীল, পূর্ণ ও তাহাদের দলের আলোচনা, এমন কি হাস্য পরিহাসেরও স্বাদ-গন্ধ সবই যেন স্বতন্ত্র ; তাহার ক্রিয়া পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র। সে রসে জীবন-মন গম্ভীর গুরুত্বে থমথমে হইয়া উঠে। এমন কি, মাটির বুক হইতে আকাশের কোণ পর্য্যন্ত যে অসীম শূন্যতা, তাহার মধ্যেও সে রসপুষ্ট মন কোন এক পরম রহস্যের সন্ধান পাইয়া অনুচ্ছ্বসিত প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে গম্ভীর হইয়া উঠে। আর সঞ্জয়ের দলের আলাপ-আলোচনা মনকে

করে হাল্কা রঙিন, বুদ্বুদের মত একের পর এক ফাটিয়া পড়ে, আলোকচ্ছটার বর্ণবিন্যাস মনে একটু রঙের ছাপ রাখিয়া যায় মাত্র। তাই আজ এই আকস্মিক আলাপের ফলে সঞ্জয়দের সংস্পর্শে আসিয়া শিবনাথ এই অভিনব আস্বাদে উৎফুল্ল না হইয়া পারিল না।

এবারে আপনার ঘরের মধ্যে আসিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল, সুশীল তাহার সীটের উপর বসিয়া আছে। নীরবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে বাহিরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। শিবনাথ তাহার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, সুশীলদা!

হ্যাঁ।

কখন এলেন? আমি এই তো ওঘরে গেলাম!

আমিও এই আসছি। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বলুন।—শিবনাথ একটু বিব্রত হইয়া পড়িল।

দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও।

শিবনাথ দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার কাছে আসিয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, দেরি হবে? তা হ'লে ওদের ব'লে আসি আমি।

না। তোমার কাছে টাকা আছে?

কত টাকা?

পঞ্চাশ।

না।—আমার কাছে দশ-পনরো টাকা আছে মাত্র।

তাই দাও, দুটো টাকা তুমি রেখে দাও। না, এক টাকা রেখে বাকি সব দাও।

শিবনাথ আবার বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার নিজের ও নিত্যর দেয় দুই টাকা যে এখনই লাগিবে!

সুশীল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, তাড়াতাড়ি কর শিবনাথ। আর্‌জেণ্ট, পঞ্চাশ টাকায় দুটো রিভল্‌ভার। জাহাজের খালাসী তারা, অপেক্ষা করবে না।

শিবনাথ একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বাক্স খুলিয়া বাহির করিল সোনার চেন। চেনছড়াটি সুশীলের হাতে দিয়া বলিল, অন্তত দেড়শো টাকা হওয়া উচিত। বাকি টাকাও কাজে লাগাবেন সুশীলদা।

বিনা দ্বিধায় চেনছড়াটি হাতে লইয়া সুশীল উঠিয়া বলিল, আর একটা কথা, এদের সঙ্গে যেন বেশিরকম মেলা মেশা ক'র না।—বলিতে বলিতেই সে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকাল।

এখনও বাদল সম্পূর্ণ কাটে নাই। শিবনাথ অভ্যাসমত ভোরে উঠিয়া পূর্ব্বদিনের মত বারান্দার রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সিক্ত পিচ্ছিল রাজপথে তখনও ভিড় জমিয়া উঠে নাই। শেয়ালদহ স্টেশন হইতে তরি-তরকারি, মাছ, ডিমের ঝুড়ি মাথায় ছোট ছোট দলে বিক্রেতারা বাজার অভিমুখে চলিয়াছে; দুই-একখানা গরুর গাড়িও চলিয়াছে। এইবার আরম্ভ হইবে ঘোড়ার গাড়ি রিক্স ট্যাক্সির ভিড়। যাত্রীবাহী ট্রেন এতক্ষণ বোধ হয় স্টেশনে আসিয়া গিয়াছে।

শিবনাথের বর্ষার এই ঘনঘটাচ্ছন্ন রূপ বড় ভাল লাগে। সে দেশের কথা ভাবিতেছিল, কালী-মায়ের বাগানখানির রূপ সে কল্পনা করিতেছিল; দূর হইতে প্রগাঢ় সবুজ বর্ণের একটা স্তূপ বলিয়া মনে হয়। মধ্যের সেই বড় গাছটার ডাল বোধ হয় এবার মাটিতে আসিয়া ঠেকিবে। আমলার গাছে নূতন চিরল চিরল ছোট ছোট পাতাগুলির উজ্জ্বল কোমল সবুজবর্ণের সে রূপ অপরূপ! বাগানের কোলে কোলে

কাঁদড়ের নালায় নালায় জল ছুটিয়াছে কলরোল তুলিয়া। মাঠে এখন অবিরাম ঝরঝর শব্দ, এ জমি হইতে ও জমিতে জল নামিতেছে। শ্রীপুকুর এতদিনে জলে থৈথৈ হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে। ঘোড়াটার শরীর এ সময় বেশ ভরিয়া উঠিবে; দফাদারি পুকুরে এখন অফুরন্ত দলদাম। পিসীমা এই মেঘ মাথায় করিয়াও মহাপীঠে এতক্ষণ চলিয়া গিয়াছেন; মা নিশ্চয় বাড়িময় ঘুরিতেছেন, কোথায় কোন্‌খানে ছাদ হইতে জল পড়িতেছে তাহারই সন্ধানে।

সিঁড়িতে সশব্দে কে উঠিয়া আসিতেছিল, শিবনাথের মনের চিন্তা ব্যাহত হইল। সে সিঁড়ির দুয়ারের দিকে চাহিয়া রহিল। একি, সুশীলদা! সুশীল আসিতেছিল যেন একটা বিপুল বেগের উত্তেজনায় অস্থির পদক্ষেপে। মুখ চোখ যেন জলিয়া জলিয়া উঠিতেছে।

Great news, শিবনাথ!—সে হাতের খবরের কাগজটা মেলিয়া ধরিল।

"ইউরোপের ভাগ্যাকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা। অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ প্রিন্স ফার্ডিনাণ্ড গুলির আঘাতে নিহত। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অষ্ট্রিয়ান গভর্মেণ্টের রুমানিয়ার নিকট কৈফিয়ৎ দাবি। যুদ্ধসজ্জার বিপুল আয়োজন।"

শিবনাথ সুশীলের মুখের দিকে চাহিল। সুশীল যেন অগ্নিশিখার মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শিবনাথ বলিল, রুমানিয়ার মত ছোট একফোঁটা দেশ—

বাধা দিয়া সুশীল বলিল, ক্ষুদ্র শিশিরকণায় সূর্য্য আবদ্ধ হয় শিবনাথ, ক্ষুদ্রতা দেহে নয়, মনে। তা ছাড়া ইউরোপের রাজনীতির খবর তুমি জান না। যুদ্ধ অনিবার্য্য। শুধু অনিবার্য্য নয়, সমগ্র ইউরোপ জুড়ে যুদ্ধ। এই আমাদের সুযোগ।

কিঙ্করকে প্রণাম করিয়া নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। কমলেশও নত-মুখে অকারণে জুতাটা ফুটপাথের উপর ঘষিতেছিল।

রামকিঙ্কর আবার বলিলেন, এস, গাড়িতে এস; আমাদের ওখান হয়ে আসবে।

শিবনাথ বলিল, না। আমি এখন একজন বন্ধুর ওখানে যাচ্ছি।

বেশ তো, চল, গাড়িতেই সেখান হয়ে আমাদের বাসায় যাব। মা এসেছেন কাশী থেকে, ভারী ব্যস্ত তোমাকে দেখবার জন্যে।

মা? নান্তির দিদিমা? তবে—! শিবনাথের বুকের ভিতরে যেন একটা আলোড়ন উঠিল। নান্তি, নান্তি আসিয়াছে—গৌরী!

'ইহার পর কোন ভদ্রকন্যা-ভদ্ররমণীর বাস অসম্ভব' এই কথাটা তাহার মনে পড়িয়া গেল। আরও মনে পড়িয়া গেল তাহার মা-পিসীমার সহিত রামকিঙ্করবাবুর রূঢ় আচরণের কথা। তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহের ঔদ্ধত্যে উদ্ধত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে ঔদ্ধত্যের প্রকাশ হইবার লগ্নক্ষণ আসিবার পূর্ব্বেই তাহার নজরে পড়িল, দূরে একটা চায়ের দোকানে দাঁড়াইয়া সুশীল বার বার তাহাকে পূর্ণর নিকট যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। সে আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিল না, পথে পা বাড়াইয়া বলিল, না, গাড়িতে সেখানে যাবার নয়; আমি চললাম, সেখানে আমার জরুরি দরকার।

মুহূর্ত্তে রামকিঙ্করবাবু উগ্র হইয়া উঠিলেন, কঠোর উগ্র দৃষ্টিতে তিনি শিবনাথের দিকে চাহিলেন, কিন্তু ততক্ষণে শিবনাথ তাঁহাদিগকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া আপন পথে দৃঢ় দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

কমলেশের ঠোঁট দুইটি অপমানে অভিমানে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

কুড়ি

রামকিঙ্করবাবু সামাজিকতা বা আত্মীয়তার ধার কোন দিনই ধারিতেন না। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে নিদ্রাভিভূত হইবার মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত তাঁহার একমাত্র চিন্তা,—বিষয়ের চিন্তা, ব্যবসায়ের চিন্তা, অর্থের আরাধনা। ইহার মধ্যে আত্মীয়তা কুটম্বিতা এমন কি সামাজিক সৌজন্য-প্রকাশের পর্য্যন্ত অবকাশ তাঁহার হইত না। ধনী পিতার সন্তান, শৈশব হইতেই তাঁবেদারের কাঁধে কাঁধে মানুষ হইয়াছেন, যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই তাহাদের মালিক ও প্রতিপালকের আসনে বসিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, ফলে প্রভুত্বের দাবি, মানসিক উগ্রতা তাঁহার অভ্যাসগত স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর একটি বস্তু—সেটি বোধ হয় তাঁহার জন্মগত, কর্ম্মী পিতার সন্তান তিনি, কর্ম্মের নেশা তাঁহার রক্তের ধারায় বর্ত্তমান। এই কর্ম্মের উন্মত্ত নেশায় তিনি সব কিছু ভুলিয়া থাকেন; আত্মীয়তা কুটুম্বিতা সামাজিক সৌজন্য-প্রকাশের অভ্যাস পর্য্যন্ত এমনই করিয়া ভুলিয়া থাকার ফলে অনভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু আসল মানুষটি এমন নয়। এই কৃত্রিম অভ্যাস করা জীবনের মধ্যে সে মানুষের দেখা মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, যে মানুষের আপনার জনের জন্য অফুরন্ত মমতা; অদ্ভুত তাঁহার খেয়াল, যে খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া স্বর্ণমুষ্টিও ধূলায় ফেলিয়া দিতে পারেন। কাশীতে অকস্মাৎ প্লেগ দেখা দিতে কমলেশ তাহার দিদিমা ও গৌরীকে লইয়া কলিকাতায় আসিতেই রামকিঙ্করবাবু গৌরীকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, নাস্তি যে অনেক বড় হয়ে গেলি রে, এ্যাঁ!

গৌরী মামাকে প্রণাম করিয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই দুই মাসের মধ্যেই গৌরীর সর্ব্ব অবয়ব হইতে জীবনের গতির

স্বাচ্ছন্দ্য পর্য্যন্ত ঈষৎ ক্ষুণ্ন ম্লান হইয়া গিয়াছে। শিবনাথকে যে পত্র সে লিখিয়াছিল, সে পত্রের ভাষা তাহার স্বকীয় অভিব্যক্তি নয়, সে ভাষা অপরের, সে তিরস্কার অন্যের; শিবনাথের প্রতি তাহার নিজের অকথিত সকল কথা ধীরে ধীরে তাহার রূপের মধ্যে এমনই করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। গৌরীর রূপের সেই অভিনব অভিব্যক্তি রামকিঙ্করবাবুর চোখে পড়িল, তিনি পরমুহূর্ত্তেই বলিলেন, কিন্তু এমন শুকনো শুকনো কেন রে তুই?

নাস্তির দিদিমা—রামকিঙ্করবাবুর মা এতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন আপনার পূজার ঝোলাটির সন্ধানে; ঝোলাটি লইয়া উপরে উঠিতে উঠিতে তিনি রামকিঙ্করের কথাগুলি শুনিয়া সিঁড়ি হইতেই বলিলেন, তুমিই তো তার কারণ বাবা। মেয়েটাকে হাতে পায়ে বেঁধে জলে দিলে তোমরা। আবার বলছ, এমন শুকনো কেন?

গৌরী দিদিমায়ের কথার ধারা লক্ষ্য করিয়া সেখান হইতে সরিয়া বাড়ির ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। রামকিঙ্করবাবু চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার সব মনে পড়িয়া গেল, শিবনাথের মায়ের কথা, পিসীমায়ের কথা, সঙ্গে সঙ্গে শিবনাথের সেবাকার্য্যের পরম প্রশংসার কথাও মনে পড়িল। আরও মনে পড়িল, শিবনাথের সঙ্গে গৌরীর দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত নাই। তিনি বলিলেন, দাঁড়াও, আজই খোঁজ করছি শিবনাথ কোন্ কলেজে পড়ে, কোথায় থাকে। আজই নিয়ে আসছি তাকে।

কমলেশ বলিয়া উঠিল, না মামা।

কেন?—রামকিঙ্করবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন।

রামকিঙ্করবাবুর মা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, না, নিয়ে আসতে হবে না তাকে, সে একটা ছোটলোক, ইতর; একটা ডোমেদের মেয়ের মোহে—

বাধা দিয়া রামকিঙ্কর বলিলেন, ছি ছি, কি বলছ মা তুমি? কে, কার কথা বলছ তুমি?

ক্রোধ হইলে নাস্তির দিদিমায়ের আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, তিনি দারুণ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া ডোমবধূর সমুদয় ইতিবৃত্তটি উচ্চ-কণ্ঠে বিবৃত করিয়া কহিলেন, তুই করেছিস এ সম্বন্ধ; তোকেই এর দায় পুরোতে হবে। কি বিধান তুই করছিস বল আমাকে, তবে আমি জল-গ্রহণ করব।

রামকিঙ্কর বলিলেন, কথাটা একেবারে বাজে কথা ব'লেই মনে হচ্ছে মা। আমি আজই আমাদের ম্যানেজারকে লিখছি, সঠিক খবর জেনে সে লিখবে। আমার কিন্তু একেবারেই বিশ্বাস হয় না মা।

চিঠি সেইদিনই লেখা হইল; কয়দিন পরে উত্তরও আসিল। ম্যানেজার লিখিয়াছেন, "খবর আমি যথাসাধ্য ভালরকমই লইয়াছি; এমন কি এখানকার দারোগাবাবুর কাছেও জানিয়াছি, ওটা নিতান্ত গুজবই। দারোগা বলিলেন, ও সব ছেলের নাম পাপের খাতায় থাকে না। ওদের জন্য আলাদা খাতা আছে। কথাটা ভাঙিয়া বলিতে বলায় তিনি বলিলেন, সে ভাঙিয়া বলা যায় না, তবে এইটুকু জানাই যে, ও রটনাটা রটাইয়াছে ওই বউটার শাশুড়ী এবং ভাসুর; মেয়েটা আসলে পলাইয়াছে তাহার বাপের বাড়ির গ্রামের একজন স্বজাতীয়ের সঙ্গে। সে লোকটা কলিকাতায় থাকে, সেখানে মেথর বা ঝাড়ুদারের কাজ করে। এখানে সর্ব্বসাধারণের মধ্যেও কোন ব্যক্তিই কথাটা বিশ্বাস করেন নাই। বরং শিবনাথবাবুর এই সেবাকার্য্যের জন্য এতদঞ্চল তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।"

চিঠিখানা পড়িয়া কমলেশকে ডাকিয়া রামকিঙ্করবাবু হাসিয়া বলিলেন, পড়। ম্যানেজার সেখান থেকে পত্র দিয়েছেন।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে কান্নার আবেগে কমলেশের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। শিবনাথ তাহার বাল্যবন্ধু, তাহার উপর গৌরীর বিবাহের ফলে সে তাহার পরম প্রিয়জন, তাহার প্রতি অবিচার করার অপরাধবোধ অন্তরের মধ্যে এমনই একটা পীড়াদায়ক আবেগের সৃষ্টি করিল। কমলেশ শিবনাথকে খুব ভাল করিয়া জানিত, উলঙ্গ শৈশব হইতে তাহারা দুইজনে খেলার সাথী, বাল্যকাল হইতে তাহাদের মধ্যে প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা জাগিয়াছে, কৈশোরের প্রারম্ভে তাহারা কর্ম্মের সহযোগিতার মধ্যে পরস্পরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যৌবন-জীবনে প্রবেশ করিয়াছে; একের শক্তি দুর্ব্বলতা দোষ গুণ অন্যে যত জানে, সে নিজেও আপনাকে তেমন ভাল করিয়া জানে না। তাই কমলেশের অপরাধবোধ এত তীক্ষ্ণ হইয়া আপনার মর্ম্মকে বিদ্ধ করিল। সে যেন কত ছোট হইয়া গেল শিবনাথের নিকট, গৌরীর নিকট সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া!

রামকিঙ্কর বলিলেন, যাও, মাকে চিঠিখানা প'ড়ে শুনিয়ে এস। আর দেখ, নাস্তিকে চিঠিখানা পড়তে দিও।

চিঠিখানা শুনিয়া নাস্তির দিদিমা খুব খুশি হইয়া উঠিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাঁকডাক সুরু করিয়া বলিলেন, নাস্তি, নাস্তি, অ নাস্তি।

নাস্তি তাহার সমবয়সী মামাতো মাসতুত বোনদের সহিত গল্প করিতেছিল, দিদিমার হাঁকডাক শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, এই নে হারামজাদী, এই পড়। চিলে কান নিয়ে গেল ব'লে সেই কে চিলের পেছনে পেছনে ছুটেছিল, তোর হ'ল সেই বিত্তান্ত। কে কোথা থেকে কি লিখলে, আর তাই তুই বিশ্বেস ক'রে কেঁদে-কেটে—বাবাঃ, এ কালের মেয়েদের চরণে দণ্ডবৎ মা!

গৌরী রুদ্ধশ্বাসে চিঠিখানা হাতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। দিদিমায়ের মনের আবেগ তখনও শেষ হয় নাই, তিনি তাঁহার অপরাধটুকু গৌরীর স্কন্ধে আরোপিত করিয়া কহিলেন, তা একাল অনেক ভাল মা, তাই পরিবার এখন স্বামীর ওপর রাগ করতে পারছে। সেকালে বাবুদের তো ওসব ছিল কুকুর-বেড়াল পোষার সামিল। ওই কি বলে শ্যামাদাসবাবুর ভালবাসার লোক ছিল—কাদম্বিনী; সে বলেছিল, বাবু, তোমার পরিবারের গোবরের ছাঁচ তুলে এনে আমাকে দেখাও, সে কেমন সুন্দরী। তোরা হ'লে তো তা হ'লে গলায় দড়ি দিতিস, না হয় বিষ খেতিস।

গৌরীর চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। চোখের জলের লজ্জা গোপন করিতেই সে চিঠিখানা ফেলিয়া দিয়া দ্রুত সেখান হইতে চলিয়া গিয়া আপনার বিছানায় মুখ লুকাইয়া শুইয়া পড়িল।

কমলেশ নতমুখেই বলিল, দিদিমা!

দিদিমা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, তুই ছোঁড়াই হচ্ছিস ভারী হেপো। একেবারে রেগে আগুন হয়ে লেক্‌চার-মেক্‌চার ঝেড়ে এই কাণ্ড ক'রে ব'সে থাকলি। যা এখন, যা, খোঁজখবর ক'রে নিয়ে আয় তাকে।

সে যদি না আসে?

আসবে না? কান ধ'রে নিয়ে আসবি। গৌরী কি আমার ফেলনা নাকি? সে বিয়ে করেছে কেন আমার গৌরীকে?

তারপর তাঁহার ক্রোধ পড়িল কলিকাতার বাসায় যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের উপর। কেন তাঁহারা এতদিন শিবনাথের সংবাদ লন নাই। তাঁহাদের নিজের জামাই হইলে কি তাঁহারা এমন করিয়া সংবাদ লইতে ভুলিয়া বসিয়া থাকিতেন? শেষ পর্য্যন্ত তিনি মৃতা কন্যা—গৌরীর মায়ের জন্য কাঁদিয়া ফেলিলেন। একি দারুণ বোঝা সে তাঁহার বুকের উপর চাপাইয়া দিয়া গেল!

ইহারই ফলে কমলেশ ও রামকিঙ্করবাবু শিবনাথের নিকট আসিয়াছিলেন সমাদর করিয়া শিবনাথকে লইয়া যাইবার জন্য, কিন্তু শিবনাথ একটা তন্ময় শক্তির আবেগে তাঁহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া মেঘ মাথায়

করিয়া ভিজিতে ভিজিতে আপন পথে চলিয়া গেল, তাঁহারা যেন তাহার নাগাল পর্য্যন্ত ধরিতে পারিলেন না।

নাস্তির দিদিমায়ের নির্ব্বাপিত ক্রোধবহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার ক্রোধ পড়িল শিবনাথের পিসীমা ও মায়ের উপর। শিবনাথ যে তাঁহাদিগকে এমন করিয়া লঙ্ঘন করিয়া গেল, এ শিক্ষা যে তাঁহাদেরই, তাহাতে আর তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি অত্যন্ত দৃঢ় ভঙ্গিতে বার্দ্ধক্যনত দেহখানিকে সোজা করিয়া তুলিয়া বলিলেন, আমি আমার নাস্তিকে রাণী ক'রে দিয়ে যাব। আসতে হয় কি না হয় আমার নাস্তির কাছে, আমি ম'লেও যেখানে থাকি সেইখান থেকে দেখব।

রামকিঙ্করবাবুও মনে মনে অত্যন্ত আহত হইয়াছিলেন, তিনি মায়ের কথার প্রতিবাদ করিলেন না, গম্ভীরভাবে নীচে নামিয়া গেলেন। কমলেশ চুপ করিয়া বারান্দায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গৌরী ঘরের মধ্যে জানালার ধারে বসিয়া উল বুনিতেছিল; জানালাটা দিয়া পথের উপরটা বেশ দেখা যায়, তাহার হাতের আঙুল রচনা করিতেছিল উল দিয়া ছাঁদের পর ছাঁদ, দেখিতেছিল সে পথের জনতা। সমস্ত শুনিয়া তাহার হাতের কাজটি থামিয়া গেল, পথের দিকে চাহিয়া সে শুধু বসিয়াই রহিল।

সেদিন সন্ধ্যায় সমগ্র পরিবারটিকেই রামকিঙ্করবাবু থিয়েটার দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

ঠিক মাসখানেক পর।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গে তরঙ্গে সংবাদ আসিয়া পৌছিল, বৃটেন জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ফ্রান্স রাশিয়া বেলজিয়াম রুমানিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। সমগ্র কলিকাতা যেন চঞ্চল সমুদ্রের মত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। হাজার হাজার মাইল পশ্চিমের মানুষের অন্তরের বিক্ষোভ আকাশ-তরঙ্গে আসিয়া এখানকার মানুষকেও ছোঁয়াচ লাগাইয়া দিল শেয়ার-মার্কেটে সেদিনের সে ভিড়, ব্যবসায়ী-মহলে সেদিনের ছোটাছুটি দেখিয়া কমলেশের মন বিপুল উত্তেজনায়

ভরিয়া উঠিল। প্রত্যেক মানুষটি যেন উত্তেজনার স্পর্শে দৃঢ় দ্রুত পদক্ষেপে সোজা হইয়া চলিয়াছে।

কয়লার বাজার নাকি হু-হু করিয়া চড়িয়া যাইবে, প্রচুর ধন, অতুল ঐশ্বর্য্যে বাড়িঘর ভরিয়া উঠিবে। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা করিতে করিতে অকস্মাৎ তাহার শিবনাথকে মনে পড়িয়া গেল; তাহার মনে হইল, আর একবার খোঁজ করিতে দোষ কি? সেদিন সত্যই হয়তো তাহার কোন কাজ ছিল। আর তাহার সহিত একবার মুখোমুখী সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া লওয়ারও তো প্রয়োজন আছে। মোট কথা, যুক্তি তাহার যাহাই হউক না কেন, যাওয়ার উত্তেজিত প্রবৃত্তিই হইল আসল কথা। তাহাদের ভাবী সৌভাগ্যের সম্ভাবনার কথাটাও শিবনাথকে জানানো হইবে।

শিবনাথ ঘরে বসিয়া আপন মনে কি লিখিতেছিল। কমলেশ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এই যে!

মুখ তুলিয়া শিবনাথ তাহাকে দেখিয়া লেখা কাগজখানা বাক্সের মধ্যে পুরিয়া অতি মৃদু হাসিয়া বলিল, এস।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কমলেশ সবিস্ময়ে বলিল, একি, এমন উস্কোখুস্কো চেহারা কেন তোমার? অসুখ করেছে নাকি? সত্যই শিবনাথের রুক্ষ চুল, মার্জ্জনাহীন শুষ্ক মুখশ্রী, দেহও যেন ঈষৎ শীর্ণ বলিয়া মনে হইতেছিল।

হাসিয়া শিবনাথ বলিল, না, অসুখ কিছু না। আজ নাওয়া-খাওয়াটা হয়ে ওঠে নি।

এই সামান্য বিস্ময়ের হেতুটুকু লইয়া কমলেশ বেশ স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল, সে বলিল, কেন? নাওয়া-খাওয়া হ'ল না কেন?

কাজ ছিল একটু, সকালে বেরিয়ে এই মিনিট পনরো ফিরেছি।

কলেজ যাও নি?

যাক গে সে কথা। তারপর দেশে কবে যাবে বল।

দেশে এখন যাব না, এইখানেই পড়ব ঠিক হয়েছে। কিন্তু তোমার খবর কি বল তো? সেদিন মামা নিজে এলেন, আর তুমি অমন ক'রে-চ'লে গেলে যে?

বলেছিলাম তো, কাজ ছিল।

কি এমন কাজ যে, ছুটো কথা বলবার জন্যে তুমি দাঁড়াতে পারলে না?

এবার শিবনাথ হাসিয়া বলিল, যদি বলি কোন নতুন love affair, যার মোহে মানুষ আপনাকে একেবারে হারিয়ে ফেলে!

কমলেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যাক, বুঝলাম, বলতে বাধা আছে।

শিবনাথ এ কথার কোন জবাব না দিয়া একটা পেপার-ওয়েট লুফিতে লুফিতে বলিল, চা খাবে একটু?—বলিতে বলিতেই সে বারান্দায় বাহির হইয়া হাঁকিল, গোবিন্দ, ছু পেয়ালা চা!

কমলেশ খবরের কাগজটা টানিয়া লইয়া বলিল, আজকের news একটা great news!

হাসিয়া শিবনাথ বলিল, নতুন ইতিহাসের সন তারিখ বন্ধু,—Ninteen Fourteen—Fourth August!

আজই business market-এ অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে গেল। কয়লার দর তো হু-হু ক'রে বেড়ে যাবে। মামা বলছিলেন, প'ড়ে কি হবে, এবার business-এ ঢুকে পড়। তোমার কথাও বলছিলেন। অবশ্য তোমার যদি পছন্দ হয়।

Business অবশ্য খুবই ভাল জিনিস।

হাসিয়া কমলেশ বলিল, কিন্তু কবিতা লেখা ছাড়তে হবে তা হ'লে। আমাকে দেখে লুকোলে, ওটা কি লিখছিলে? কবিতা নিশ্চয়।

না।

তবে? কি, দেখিই না ওটা কি?

এবার শিবনাথ হাসিয়া বলিল, ওটা নতুন love affair—প্রেমপত্র একখানা; সুতরাং ওটা দেখানো যায় না।

কমলেশ আবার নীরব হইয়া গেল। চাকরটা আসিয়া চা নামাইয়া দিল, কমলেশ নীরবে চায়ের কাপ তুলিয়া লইয়া তাহাতে চুমুক দিল। তাহার নীরবতার মধ্যে শিবনাথও অন্যমনস্ক হইয়া জানালার দিকে নীরবেই চাহিয়া রহিল।

এ অশোভন নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সেই প্রথম বলিল, তোমরা কি কাশীর বাসা তুলে দিয়েছ ?

হ্যাঁ।

অ।

কমলেশ বলিল, দিদিমা, নাস্তি এখানেই চ'লে এসেছে আমার সঙ্গে।

শিবনাথ নীরব হইয়া গেল।

কমলেশ এবার বলিল, আমাদের বাসায় চল একদিন।

হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া শিবনাথ যেন তন্ময় হইয়া গিয়াছে।

কমলেশ বলিল, গৌরী দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। তার মুখ দেখলে আমাদের কান্না আসে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শিবনাথ বলিল, আজও আমার কলঙ্ক-মোচন হয় নি কমলেশ, আমি যেতে পারি না।

কমলেশ যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ; মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা। Mischievous লোকের রটনা ওসব—আমরা খবর নিয়ে জেনেছি।

শিবনাথের মুখ চোখ অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ দীপ্তিতে প্রখর হইয়া উঠিল। সে বলিল, কিন্তু আমায় তো বিশ্বাস করতে পার নি। যেদিন নিজেকে তেমনই বিশ্বাসের পাত্র ব'লে প্রমাণ করতে পারব, সেইদিন আমার সত্যকার কলঙ্কমোচন হবে।

কমলেশের মাথাটা আপনা হইতেই লজ্জায় নত হইয়া পড়িল। সে নীরবে ঘরের মেঝের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। শিবনাথ মৃদু হাসিয়া আবার বলিল, 'সময় যেদিন হইবে, আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।'

একটি ছেলে দরজার সম্মুখেই বারান্দায় রেলিঙে ঠেস দিয়া নিতান্ত উদাসীনভাবেই দাঁড়াইয়া ছিল ; তাহাকে দেখিয়াই শিবনাথ ঈষৎ চঞ্চল হইয়া বলিল, এখানেই যখন থাকবে, মাঝে মাঝে এস যেন। একদিনে সকল কথা ফুরিয়ে দিলে চলবে কেন ?

উঠিতে বলার এমন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত কমলেশ বুঝিতে ভুল করিল না। সে উঠিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরবেই বাহির হইয়া গেল।

কমলেশ বাহির হইয়া যাইতেই ছেলেটি শিবনাথের ঘরে আসিয়া বলিল, হয়ে গেছে সেটা ?

শিবনাথ বাক্স খুলিয়া সেই কাগজখানা তাহার হাতে দিয়া বলিল, সুশীলদাকে একটু দেখে দিতে বলবেন।

কাগজখানা একটা বৈপ্লবিক ইস্তাহারের খসড়া।

কাগজখানি সযত্নে মুড়িয়া পরনের কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া ছেলেটি বলিল, পূর্ণদার সঙ্গে একবার দেখা করবেন আপনি। জরুরি দরকার।

করব।

ছেলেটি আর কথা কহিল না, বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

পূর্ণ যেমন মৃদুভাষী, কথাবার্ত্তাও তাহার তেমনই সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনের অধিক একটি কথাও সে বলে না। শিবনাথের জন্যই সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। শিবনাথ আসিতেই ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া সে বলিল, আপনাকে এইবার একটা বিপদের সম্মুখীন হতে হবে শিবনাথবাবু।

শিবনাথ প্রশান্তভাবে বলিল, কি বলুন।

পূর্ণ বলিল, অরুণের ওপর পুলিসের বড় বেশি নজর পড়েছে। তার কাছে কিছু আর্ম্‌স আছে আমাদের। সেগুলো এখন সরাবার উপায় পাচ্ছি না। আপনি মেস বদল ক'রে অরুণের মেসে যান। আর্ম্‌সগুলো আপনার কাছে থেকে যাবে, অরুণ অন্য মেসে চ'লে যাক। তা হ'লে অরুণের জিনিসপত্র সার্চ করলে তার আর ধরা পড়বার ভয় থাকবে না। পরে আপনার কাছ থেকে ওগুলো আমরা সরিয়ে ফেলব।

শিবনাথের বুক যেন মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। ওই মুহূর্ত্তটির মধ্যে তাহার মাকে, পিসীমাকে মনে পড়িয়া গেল। ম্লানমুখী গৌরীও একবার উঁকি মারিয়া চলিয়া গেল।

পূর্ণ বলিল, আপনি তা হ'লে দু তিন দিনের মধ্যেই চ'লে যান। সম্ভব হ'লে কালই। এই হ'ল অরুণের মেসের ঠিকানা।

ততক্ষণে শিবনাথ নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। সে এবার বলিল, বেশ।

পূর্ণ তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিল, good luck!

সমস্ত রাত্রিটা শিবনাথের জাগরণের মধ্যেই কাটিয়া গেল।

নানা উত্তেজিত কল্পনার মধ্যেও বার বার তাহার প্রিয়জনদের মনে পড়িতেছিল। সহসা এক সময় তাহার মনে হইল, যদি ধরাই পড়িতে হয়, তবে পূর্ব্বাহ্ণে মা-পিসীমার চরণে প্রণাম জানাইয়া বিদায় লইয়া রাখিবে না? গৌরী, আজিকার দিনেও কি গৌরীকে সে বঞ্চনা করিয়া রাখিবে? না, সে কর্ত্তব্য তাহাকে সুশেষ করিতেই হইবে। মাকে ও পিসীমাকে খুলিয়া না লিখিয়াও ইঙ্গিতে সে বিদায় জানাইয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিল। তারপর পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল গৌরীকে। লিখিতে লিখিতে বুকের ভিতরটা একটা উন্মত্ত আবেগে যেন তোলপাড় করিয়া উঠিল। এত নিকটে গৌরী, দশ মিনিটের পথ, একবার তাহার সহিত দেখা করিয়া আসিলে কি হয়, হয়তো জীবনে আর ঘটিবে না! অর্দ্ধসমাপ্ত পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে জামাটা টানিয়া লইয়া গায়ে দিতে দিতেই নীচে নামিয়া গেল।

গেট বন্ধ। রাত্রি এগারোটায় গেট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মেসটি নামে মেস হইলেও কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত; মেস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে চাবি থাকে। রুদ্ধ দুয়ারের সম্মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শিবনাথ উপরে আসিয়া আবার চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠিখানি শেষ করিয়া বিছানায় সে গড়াইয়া পড়িল শ্রান্ত-ক্লান্তের মত। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাহার মনে হইল, সে করিয়াছে কি! ছি, এত দুর্ব্বল সে! এই বিদায় লওয়ার কি কোন প্রয়োজন আছে? কিসের বিদায়, আর কেন এ বিদায় লওয়া? আবার সে উঠিয়া বসিয়া দেশলাই জ্বালিয়া পত্রগুলি নিঃশেষে পুড়াইয়া ফেলিল।

কোথায় কোন্ দূরের টাওয়ার-ক্লকে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। মনকে দৃঢ় করিয়া সে আবার শুইয়া পড়িল। অভ্যাসমত ভোরেই তাহার ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই সে অনুভব করিল, সমস্ত শরীর

যেন অবসাদে ভাঙিয়া পড়িতেছে। তবুও সে আর বিছানায় থাকিল না, মন এই অল্প বিশ্রামেই বেশ স্থির হইয়াছে, সম্মুখের গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া উঠিয়া পড়িল। মনের মধ্যে আর কোন চিন্তা নাই, আছে শুধু ওই কর্ম্মের চিন্তা। কেমন করিয়া কোন্ অজুহাতে কলেজের মেস পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবে?

একে একে ছেলেরা উঠিতেছিল। সঞ্জয়ও উঠিয়া বাহিরে আসিল; সঞ্জয় তাহার অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে নাই, কিন্তু অতি দূরত্বের ব্যবধানও আর নাই। সঞ্জয় তাহাকে দেখিয়াই বলিল, হ্যালো শিবনাথ, তোমার ব্যাপার কি বল তো? কলেজেও যাচ্ছ না, এখানেও প্রায় থাক না। একি, তোমার চেহারা এমন কেন হে? অসুখ নাকি? ঠাণ্ডা লাগিও না, ঘরে চল, ঘরে চল।

শিবনাথ সঞ্জয়ের সঙ্গে তাহারই ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সম্মুখেই দেওয়ালে একখানা প্রকাণ্ড বড় আয়না। পূর্ব্বদিন হইতে অস্নাত অভুক্ত রাত্রিজাগরণক্লিষ্ট শিবনাথ আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সত্যই তো একি চেহারা হইয়াছে তাহার, কিন্তু সে তো কোন অসুস্থতা অনুভব করে না!

সঞ্জয় বলিল, অনিয়ম ক'রে শরীরটা খারাপ ক'রে ফেললে তুমি শিবনাথ। কি যে কর তুমি, তুমিই জান। সত্যি বলত কি, তুমি রীতিমত একটা mystery হয়ে উঠেছ। প্রত্যেকের notice attracted হয়েছে তোমার ওপর।

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, জান, জীবনে এই আমি প্রথম কলকাতায় এসেছি। কলকাতা যেন একটা নেশার মত পেয়ে বসেছে আমাকে। সোজা কথায়, পাড়াগাঁয়ের ছেলে কলকাত্তাই হয়ে উঠছি আর কি।

ঘাড় নাড়িয়া সঞ্জয় বলিল, not at all; বিশ্বাস হ'ল না আমার। However আমি তোমার secret জানতে চাই না। কিন্তু আমার একটা কথা তুমি শোন, তুমি বাড়ি চ'লে যাও, you require rest, শরীরটা সুস্থ করা প্রয়োজন হয়েছে।

শিবনাথের মন মুহূর্ত্তে উল্লসিত হইয়া উঠিল, শরীর-অসুস্থতার অজুহাতে বাড়ি চলিয়া যাওয়ার ছলেই তো মেস ত্যাগ করা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্প তাহার স্থির হইয়া গেল। সে হাতের আঙুল দিয়া মাথার রুক্ষ চুলগুলি পিছনের দিকে ঠেলিয়া দিতে দিতে বলিল, তাই ঠিক করেছি ভাই, শরীর যেন খুব দুর্বল হয়ে গেছে; আজই আমি বাড়ি চ'লে যাব। দেখি, আবার সুপারমশায় কি বলেন!

বলবে? কি বলবে? চল, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। আমাদের দেশটাই এমনই, healthএর দাম এখানে কিছু নয়, degree is everything here; nonsense! জান, আমি এই জন্যে ঠিক ক'রে ফেলেছি and it is certain, এই I.A. examinationএর পরেই আমি বিলেত যাব। মামা warএর জন্যে আপত্তি করছিলেন, কিন্তু time is money, পড়ার বয়স চ'লে গেলে বিলেত গিয়ে কি হবে?

শিবনাথ সঞ্জয়কে শত ধন্যবাদ দিল তাহার সুপরামর্শের জন্য, তাহার সাহায্যের জন্য। সঞ্জয় নিজেই তাহার জিনিসপত্র গুছাইয়া দিল, বিদায়ের সময় বলিল, বেশিদিন বাড়িতে থেকো না যেন। percentage কোন রকমে দু বছরে কুলিয়ে যাবে।

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, যত শিগগির পারি ফিরব।

হাসিয়া সঞ্জয় বলিল, তোমার better halfকে আমার নমস্কার জানিও।

জানাব।

এদিকে অরুণের মেসে সকল বন্দোবস্ত হইয়াই ছিল। অরুণ তাহার কিছুক্ষণ পূর্বেই মেস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মারাত্মক অস্ত্রের ছোট সুটকেস একটি ঘরের কোণে কাগজের মধ্যে চাপা ছিল।

শিবনাথ সেটিকে তাহার নিজের ট্রাঙ্কের মধ্যে বন্ধ করিয়া ফেলিয় নিশ্চিন্ত হইয়া আপনার জিনিসপত্র গুছাইতে মনোনিবেশ করিল।

জিনিসপত্র গুছাইয়া সে চাকরকে ডাকিয়া বলিল, ঘর-দোরটা একবার পরিষ্কার ক'রে দাও দেখি। বড্ড নোংরা হয়ে রয়েছে।

চাকর বলিল, অরুণবাবু—ওই যে বাবুটি এ ঘরে ছিলেন, তাঁর মশাই ওই এক ধরণ ছিল। কিছুতেই ঘর ভাল ক'রে পরিষ্কার করতে দিতেন না। তা দিচ্ছি পরিষ্কার ক'রে।

কিছুক্ষণ পর সে মেসের ঝাড়ুদারণীকে সঙ্গে করিয়া ঘরে আসিয়া তাহাকে বলিল, এক টুকরো কাগজ যেন না প'ড়ে থাকে। ভাল ক'রে পরিষ্কার ক'রে দাও।

শিবনাথ স্তম্ভিত বিস্ময়ে মেয়েটির দিকে চাহিয়া ছিল। এ কে? এ যে সেই নিরুদ্দিষ্টা ডোমবউ! শরীর তাহার সুস্থ সবল, শহরের জল-হাওয়ায় বর্ণশ্রী উজ্জ্বল, কলিকাতার জমাদারণীদের মত তাহার গায়ে পরিষ্কার জামা, সৌষ্ঠবযুক্ত শাড়িখানি ফের দিয়া আঁটসাট করিয়া পরা, তাহাকে আর সেই ডোমবধূ বলিয়া চেনা যায় না, তবুও শিবনাথের ভুল হইল না, প্রথম দৃষ্টিতেই তাহাকে চিনিয়া ফেলিল।

মেয়েটিও তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রথমটা বিস্ময়ে যেন হতবাক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য, পরমুহূর্ত্তেই তাহার মুখখানি যেন দীপালোকের মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, মুখ ভরিয়া হাসিয়া সে পরম ব্যগ্রতাভরে সম্ভাষণ করিল, বাবু! জামাইবাবু! সঙ্গে সঙ্গে হাতের ঝাঁটাটা সেইখানে ফেলিয়া দিয়া সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

ক্রমশ

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ'

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সে যাহা হউক, আমরা এই স্থলে উভয় কবির নির্লজ্জতার কিঞ্চিৎ২ তুলনা করি, যথা।

সুন্দরের উক্তি।

"সুন্দরীর করে ধরি, সুন্দর বিনয় করি,
কহে শুন শুন প্রাণেশ্বরি।
আজি দিনে দুপ্রহরে, দেখিলাম সরোবরে,
কমলিনী বাঁধিয়াছে করী॥
[২৬] গিরি অধোমুখে কাঁদে, এ কথা কহিতে চাঁদে,
কুমুদিনী উঠিল আকাশে।
সে রস দেখিতে শশী, ভূতলে পড়িল খসি,
খঞ্জন চকোর মিলে হাসে॥"

অন্য মর্ম্ম।

"রায় বলে আমি করী, তুমি কমলিনীশ্বরী,
বাঁধহ মৃণাল ভুজপাশে।
আমি চাঁদ পড়ি ভুমি, ফুল্ল কুমুদিনী তুমি,
উঠ মোর হৃদয় আকাশে॥
নয়ন খঞ্জন মোর, নয়ন চকোর তোর,
দুহে মিলে হাসিবে এখনি।
ঘাম ছলে কুচগিরি, কাঁদিবেক ধীরি ধীরি,
করি দেখ বুঝিবে তখনি॥

বীনসের উক্তি।

"Fondling," she saith, "since I have hemm'd thee here
[২৭] Within the circuit of this ivory pale,
I'll be a park, and thou shalt be my deer;
Feed where thou wilt, on mountain or in dale:
Graze on my lips; and if those hills be dry,
Stray lower, where the pleasant fountains lie.

"Within this limit is relief enough,
Sweet bottom-grass, and high delightful plain,
Round rising hillocks, brakes obscure and rough,
To shelter thee from tempest and from rain:
Then be my deer, since I am such a park;
No dog shall rouse the, though a thousand bark."

[২৮]

অস্যার্থ।

গজদন্ত সম, ভাতি অনুপম, দুই বাহু বেড়া প্রায়।
আদরে তোমারে, চারু মৃগাগারে, বদ্ধ করিয়াছি তায়॥
আমি মৃগালয়, তুমি রসময়, কুরঙ্গ স্বরূপ ধর।
শেখরে গহ্বরে, যথা ইচ্ছা করে, ওষ্ঠ গিরিপরে চর॥
যদি ওষ্ঠাধর, যুগ্ম গিরিবর, রসশূন্য হয় তায়।
তবে অনুরাগে, গেলে নিম্নভাগে, পাবে সুখ কুহারায়॥
এই সীমা মাত্র, ওহে রসরাজ, বিশ্রামের দ্রব্য ভান।
আছয়ে প্রচুর, তৃণ সুমধুর, সুখপ্রদ উচ্চ স্থান॥
উন্নত বর্তুল, গিরি স্থূল স্থূল, জঙ্গল তিমিরাবৃত।
ধারা বরিষণে, ঝড় প্রবহনে, রবে তথা লুক্কায়িত॥
প্রিয় বাক্য ধর, হও মৃগবর, আমা সম মৃগাগারে।
সহস্র কুকুরে, যদি বা ফুকুরে, তব কি করিতে পারে॥

রসতৃষ্ণাতুর মত্ত মাতঙ্গবৎ সুন্দরের আকর্ষণে অবিকচ পঙ্কজিনী বিদ্যা কহিয়াছিলেন,

"ক্ষম হে পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে।
[২৯] নব যৌবন বিক্রম * যোগ্য নহে॥
রস লাভ হবে রহিয়া ফুটিলে।
বল কি হইবে কলিকা দলিলে॥
রস না হুইবে করিলে রগড়া।
অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া॥

ইউরোপীয়দিগের কাম দেবতার জননী প্রফুল্ল চির যৌবনবতী লীলারসবিহ্বলা বীনসের দ্বারা অজ্ঞাত-যৌবন এডোনিস্ আলিঙ্গিত হইয়া কহিতেছেন, যথা।

"Who wears a garment shapeless and unfinish'd ?
Who plucks the bud before one leaf put forth ?
If springing things be any jot diminish'd,
[৩০] They wither in their prime, prove nothing worth :
The colt that's back'd and burden'd being young
Loseth his pride, and never waxeth strong."

And again,—

"No fisher but the ungrown fry forbears :
The mellow plum doth fall, the green sticks fast,
Or being early pluck'd is sour to the taste."

অস্যার্থ।

অঙ্গহীন অপ্রস্তুত বস্ত্র কেবা পরে
অস্ফুট কুসুম কলী কে চয়ন করে॥

---

* মূল গ্রন্থে "জোরের" ইতি শব্দ আছে, কিন্তু তাহাতে ছন্দপতন দোষ হয় এই জন্য আমি "বিক্রম" শব্দ প্রয়োগ করিলাম।

কোন দ্রব্য পায় যদি অঙ্কুরে আঘাত।
শুখায় কোমল কালে, আশায় ব্যাঘাত॥
শিশুকালে অশ্ব যদি বহে গুরু ভার।
বল বীর্য্যবান্ কভু নাহি হয় আর॥

[৩১] অন্যচ্চ।

শিশু মীন ধরে নাকো ধীবর সকলে।
পাক! কুল আপনি খসিয়া পড়ে তলে॥
দৃঢ়রূপে লগ্ন ডালে অপক্ক বদরী।
আস্বাদনে অম্ল লাগে যদি ছিন্ন করি॥

আমারদিগের অসভ্য কবি ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন।

ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে।
রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে॥
বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে॥
রসিয়া পশিল ভ্রমরা কমলে॥

ইংরাজদিগের সুসভ্য কবি শেক্সপিয়র কহিতেছেন।

What wax so frozen but dissolves with tempering,
And yields at last to every light impression ?
Things out of hope are compass'd oft with venturing,
[৩২] Chiefly in love, whose leave exceeds commission :

অস্যার্থ।

কঠিন জমাট মোম গলালে গলিবে।
ছোঁবামাত্র তাই হবে যেরূপ গঠিবে॥
অসাধ্য সাধন হয় করিলে সাহস।
বিশেষতঃ প্রেমে, যার বিদায়েতে রস॥

এই ক্ষণে ভারতচন্দ্রের একটি প্রভাতী এবং শেক্সপিয়রের একটি সাঁজাই গাইয়া এই নির্লজ্জতার প্রস্তাব সাঙ্গ করি, যথা।

বিদ্যাসুন্দরের প্রভাতী।

আসি বলি বাসায় বিদায় হৈল রায়
কুমুদ মুদিল আঁখি চন্দ্র অস্ত যায়॥
বিদ্যা বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ।
পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান
ও নয়ন চকোর ও মুখ সুধাকর।
না দেখে কেমনে রব এ চারি প্রহর॥
[৩৩] বিরহদহনদাহে যদি রহে প্রাণ।
রজনীতে করিব ও মুখ সুধাপান॥

বীনস্ এবং এডোনিসের সাঁজাই।

এডোনিসের উক্তি।

"Look, the world's comforter, with weary gait,
His day's hot task hath ended in the west;
The owl, night's herald, shrieks, 't is very late;
The sheep are gone to fold, birds to their nest;
The coal-black clouds that shadow heaven's light
Do summon us to part, and bid good night."

অস্যার্থ।

দেখ, জগতের সুখদাতা দিনপতি।
শ্রান্ত হয়ে পশ্চিমেতে করিতেছে গতি॥
নিশাচর নিশাচর ডাকে, দিবা শেষ।
বিহঙ্গ বাসায় যায়, গোষ্ঠ ভেজে মেষ॥

আকাশের আলো ঢাকে ঘনাসিত ঘন।
বিদায় হইতে তারা কহিছে বচন।

বীনসের উক্তি।

"Sweet boy," she says, "this night I 'll waste in sorrow,
For my sick heart commands mine eyes to watch.
Tell me, Love's master, shall we meet to-morrow?
Say, shall we? shall we? wilt thou make the match?"

অন্যার্থ।

প্রিয় কিশোর, এ যামিনী মোর, যাতনায় গত হবে।
রোগী মম মন, প্রহরী নয়ন, কাযেই জাগিয়ে রবে।
বল প্রাণনাথ, হইলে প্রভাত, দেখা হবে পুনরায়।
হবে সন্দর্শন, সুখদ মিলন, কিম্বা যাবে বৃথায়।

এই ক্ষণে আমি আপনারদিগের সম্মুখে এক বাক্স [৩৫] রিয়েল লণ্ডন বেকেড্ সুইট্‌মীট্ এবং এক খুঞ্চে আসল কৃষ্ণনগুরে সরভাজা উপস্থিত করিলাম, আপনারদিগের অভিরুচি, যাঁহার যাহাতে ইচ্ছা, তিনি তাহাই গ্রহণ করুন, কিন্তু এই কথা যেন মনে থাকে, বিলাতী মেঠাই হজম করিতে ভাল কাষ্টিলিয়ন লাল জলের আবশ্যক, সরভাজা পাকে নির্ম্মল খড়িয়া নদীর এক পাত্র জলই যথেষ্ট হইবেক।

প্রিয় প্রতিযোগী যদ্যপি কহেন, ইংলণ্ডীয় কবিতা বৃদ্ধাকালে তপস্বিনী অর্থাৎ সদাচারশালিনী হইয়াছেন, কিন্তু এ কথা সপ্রমাণ হইবার নহে; আমরা যেমন ব্যাস বাল্মীকির পর কালিদাসকে মহাকবি বলিয়া মানি, ইংরাজেরাও সেইরূপ শেক্সপিয়র মিল্টনের পর লার্ড বাইরণকে মান্য করিয়া থাকেন, কিন্তু লার্ড বাহাদুরের লিখিত ডন্ জুয়ান্ কাব্যের

কিয়দংশ পাঠ করিলেই ইংরাজী কবিতার বিলক্ষণ সাধ্বীত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—কৈলাস বাবু কহিতে পারেন, ইংরাজী কবিতায় যেমন অধমতা আছে, তেমন উত্তমতাও সমধিক আছে, সত্য কথা, এ কথা লঙ্ঘন [৩৬] করিতে কে পারে? ফলে বাঙ্গালা কবিতায় অপকৃষ্টতা ব্যতীত উৎকৃষ্টতার অভাব বলিয়াই কি তাহা কোন কালে উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হইবেক না? যদি বালুকানির্ম্মিত সেতু দ্বারা স্রোতিস্বতীর স্রোতঃ রুদ্ধ হয়, যদি নবীন নিবিড় নীরদ কর্তৃক দিনকরের খরতর কর প্রচ্ছন্ন হয়, যদি মণিময় পেটিকায় বদ্ধ বিধায় মৃগনাভীর মনোহর সৌরভ স্থগিত হয়; তবেই জানিব এবং মানিব, দৈবানুগ্রহরূপ কবিতাশক্তি পরাধীনতাশৃঙ্খলে জড়িতা হইয়া স্বীয় প্রভা প্রকাশে অক্ষম হইবেক।

বসু বাবু বিদ্যার রূপ বর্ণনের কিয়দংশ পাঠ ও তদনুবাদ করিয়া গত সভায় অতীব রহস্য রসোদ্দীপন করিয়াছিলেন, অতএব এই স্থলে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিদুল্লেখ করা কর্ত্তব্য; প্রতিযোগী অঙ্গহীনা বঙ্গভাষার যথার্থ ভঙ্গী অবগত আছেন কি না, সন্দেহস্থল; কিন্তু অনায়াসে বীর-সিংহবালা বিদ্যা বিনোদিনীর রূপ বর্ণনা পাঠ করিয়া তাঁহাকে ভয়ঙ্করী নিশাচরী ভাবিয়া থর থর কম্পিত কলেবর হইয়াছিলেন,—এই [৩৭] ক্ষণে উক্ত নিন্দিত বর্ণনার আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, যথা "নব নাগরী নাগর মোহিনী। রূপ নিরুপম সোহিনী॥ শারদ পার্ব্বণ, শীধু ধরানন, পঙ্কজ কানন মোদিনী। কুঞ্জরগামিনী, কুঞ্জবিলাসিনী, লোচন খঞ্জনগঞ্জিনী॥ কোকিলনাদিনী, গীঃপরিবাদিনী, স্ত্রীপরিবাদবিধায়িনী। ভারতমানস, মানস সারস, রাসবিনোদবিনোদিনী॥"—কৈলাস বাবু এই কতিপয় পংক্তির দোষ ধরিবেন, যদি ধরিতে পারেন, তবে আমি তদপেক্ষা ইংরাজ কবিদিগের অধিক দোষ দেখাইয়া দিব। অপিচ

'বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥" বিপক্ষ মহাশয় কহিয়াছিলেন, কেশের সহিত সর্পের তুলনা অতি ভয়ানক, তবেই বলিতে হইল, তিনি বেণী শব্দের অর্থাবগত নহেন, হিন্দু কামিনীগণ কালসর্পাকারে বিনোদ বেণী বিনাইয়া থাকেন, প্রিয় সখা কি তাহা দেখেন্ নাই. অহো দেখিয়াছেন বই কি? তবে বুঝি ইংরাজী [৩৮] বিদ্যাপ্রভাবে তেঁহ খাট খাট রাঙ্গা চুলের প্রিয় হইয়া থাকিবেন। "কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥" কৈলাস বাবু এই অত্যুক্তি ধরিয়া বিস্তর উপহাস করিয়াছিলেন, এবং শেক্সপিয়রের রোমীয় নায়কের জুলিয়েট্ নায়িকার রূপ বর্ণনায় অত্যুক্তি বিধানকল্পে কহিয়াছিলেন, প্রেমিকের মুখে প্রিয়তমার রূপ বর্ণনায় অত্যুক্তিপ্রয়োগ দোষাবহ না হইয়া গুণভাজন হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উক্ত মহাকবি স্বীয় উক্তিতে লুক্রিশিয়ার পয়োধরের সহিত দন্তিদন্তনির্ম্মিত যুগল ভূগোলের তুলনা করিয়া যদ্যপি নিস্তার পান, তবে অভাগা ভারতচন্দ্র কি জন্য এত গালাগালি খান? প্রেমিকের মুখে অত্যুক্তি রসদায়িকা বটে, কিন্তু নায়ক নায়িকাদিগের সহায়স্থলীস্বরূপা দূতীর মুখে তদুভয়ের রূপ গুণ বর্ণনায় অত্যুক্তি প্রয়োগ কোন মতেই অসঙ্গত নহে। সে যাহা হউক, ধরাস্থিত বিবিধ জাতির রূপানুভাবকতা শক্তি বিভিন্ন প্রকার, ভারতবর্ষে কটা চক্ষু, কটা কেশ এবং বরফের ন্যায় শ্বেতবর্ণ নিন্দনীয়, কিন্তু [৩৯] ইউরোপীয়দিগের নিকট তত্তাবৎ আদরণীয়, চীনদেশীয় লোকেরা অঙ্গুলের ন্যায় পদ এবং কুঁচের ন্যায় চক্ষু সুদৃশ্য জ্ঞান করে বলিয়া তাহারদিগের সৌন্দর্য্যানুভাবকতা শক্তি অপকৃষ্টতর বলা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বায়রেলের কবিত্ব অতি সুন্দর অলঙ্কার এবং যথার্থ মানসিক ভাবসমন্বিত বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু তদ্গ্রন্থের উপমা সকল অধিকাংশই

আমারদিগের নিকটে অতি জঘন্যতর বোধ হয়; সলোমন অর্থাৎ যাহাকে মুসলমানেরা স্থলেমান কহে, সেই মহাপুরুষের টপ্পা গীতাবলী যাহাকে খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর পরস্পর প্রেম প্রকাশ বলিয়া উল্লেখ করেন, ফলে চোর কবি-রচিত পঞ্চাশৎ শ্লোকের মধ্যে যেরূপ দ্ব্যর্থ অর্থাৎ একার্থ কালী পক্ষে, অন্যার্থ বিদ্যা পক্ষে হয়, স্থলেমানের টপ্পাতে তদ্রূপ দ্ব্যর্থ অন্বেষণ করা ব্যর্থ, এবং যদিও কোন২ স্থলে তাহা ঘটাইতে পারা যায়, তাহা কষ্টকল্পনা মাত্র; ইংরাজী উদ্ধৃত করা বাহুল্য হয়, এজন্য আমি বাঙ্গালা অনুবাদ কিঞ্চিৎ গ্রহণ [৪০] করিলাম, শ্রোতৃবর্গ বিবেচনা করুন, খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মপুস্তকে কিরূপ কবিতাশক্তি মূর্ত্তিমতী আছেন, যথা।—

"হে আমার প্রিয়ে, তুমি সুন্দরী ও তুমি পরম সুন্দরী; ঘোমটার মধ্যে তোমার চক্ষু কপোতের চক্ষুর ন্যায়, এবং গিলিয়দের পার্শ্বে চরে এমত ছাগপালের ন্যায় তোমার কেশ। এবং যে২ মেষী পুষ্করিণী হইতে ধৌতা হইয়া আগতা ও যমজবৎসবিশিষ্টা হয় এবং যাহাদের মধ্যে একও বন্ধ্যা নাই, এমত ছিন্নলোম মেষপালের ন্যায় তোমার দন্ত। এবং সিন্দূরবর্ণ সূত্রের ন্যায় তোমার ওষ্ঠাধর, ও তোমার বাক্য অতি মনোহর, ও তোমার ঘোমটার মধ্যস্থিত গণ্ডদেশ দাড়িম্বখণ্ডের ন্যায়। এবং অস্ত্রাগারের নিমিত্তে নির্ম্মিত এক সহস্র বলবানের ঢালবিশিষ্ট দায়ুদের দুর্গের ন্যায় তোমার গলদেশ। এবং শোশন্ পুষ্পের মধ্যে ভক্ষণকারী মৃগের দুই যমজ বৎসের ন্যায় তোমার দুই স্তন। * * * *

"হে রাজকন্যে, তোমার চরণপাদুকাদ্বারা কিবা শোভা [৪১] পাইতেছে! তোমার কটিমণ্ডল নিপুণ কর্ম্মকারদ্বারা নির্ম্মিত মণিময় হারস্বরূপ। এবং তোমার নাভিদেশ মিশ্রিত দ্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ এক গোল পাত্রের ন্যায়, এবং তোমার উদর শোশন্পুষ্পবেষ্টিত গোধূমরাশির

ন্যায়। এবং তোমার স্তনদ্বয় যুগলহরিণবৎসের ন্যায়। এবং তোমার গলদেশ হস্তিদন্তময় উচ্চগৃহের ন্যায়। এবং তোমার চক্ষু বৈৎরব্বীমের দ্বারের নিকটস্থ হিশ্‌বোণের সরোবরের ন্যায়, এবং তোমার নাসিকা দম্মেষকের সম্মুখস্থ লিবানোনের উচ্চগৃহের ন্যায়। এবং তোমার মস্তক কর্ম্মিল্‌ পর্ব্বতের ন্যায়, ও তোমার মস্তকের বেণী বাগুণীয়া রঙ্গের কেশবন্ধনীর ন্যায়। তোমার কেশবেশেতে রাজা বদ্ধ আছে।"

"হে প্রিয়ে, তুমি প্রেমদ্বারা সন্তোষ দিবার জন্যে কেমন সুন্দরী ও মনোহারিণী! তোমার দীর্ঘতা তালবৃক্ষের ন্যায়, ও তোমার স্তন তাহার ফলস্বরূপ। আমি কহিলাম, আমি তালবৃক্ষে আরোহণ করিব ও তাহার বাগুড়া ধরিব; এখন তোমার স্তন দ্রাক্ষাফলের গুচ্ছস্বরূপ ও তোমার নাসিকার গন্ধ তপুহ [৪২] ফলের ন্যায়। যে উত্তম দ্রাক্ষারস পান করা প্রিয়ের সুখদায়ক হয় ও তন্দ্রাযুক্ত লোককে কথা কহায়, তাহার ন্যায় তোমার কথা"—এই পর্য্যন্তই ভাল, আর কায নাই।

অনেকে কহেন, রায় গুণাকর অনেক স্থানে ভাব চুরি করিয়াছেন, কিন্তু ভিন্ন২ জাতীয় আদি কবিগণ ব্যতীত এই দোষ কোন কবিতে দৃশ্যমান না হয়, মহাকবি বারজিলের এবং মিণ্টনের কি এই দোষ নাই? ভারতচন্দ্র রায় মূর্খ কবি ছিলেন না, তিনি আপনিই স্থানে২ পরিচয় দিয়াছেন, সংস্কৃত এবং পারস্য শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, ফলতঃ সামান্য ধনচোরদিগের ন্যায় ভাবচোরদিগেরও সতর্কতা এবং কৌশলের আবশ্যকতা আছে, অপিচ এমত সকল প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে, মূল অপেক্ষা অনুবাদে অধিকতর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের প্রাবল্য হইয়াছে, অন্যে পরে কা কথা, ভারতচন্দ্র রায় কাশীদাসের মহাভারত হইতেও অনেক ললিত পদাবলী অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, আমি ভারত[৪৩]চন্দ্রের দোষের কথাই কহিয়া যাইতেছি, কিন্তু তিনি

যে প্রকৃত দৈবশক্তিমান্ কবি ছিলেন, তৎপ্রমাণে আমরা কিছুই কহিলাম না ; অতএব তদ্বিষয়ে কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে, যথার্থ কবির চিহ্ন যথার্থ বর্ণন অর্থাৎ কবি যে বিষয়ে বর্ণনা করিবেন, সে বিষয় পাঠ করিতে২ বোধ হইবেক, যেন তাহা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হইতেছে, "Thoughts that breathe and words that burn" ভারতচন্দ্র রায়ের গাথায় শ্বাস প্রবহন এবং ভাবজালে অনল প্রভবন হইয়াছে কি না, তাহা রতিবিলাপ এবং বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ প্রথম মিলনের পূর্ব্বাবস্থা পাঠ করিলেই প্রমাণীকৃত হইবেক, আমারদিগের ইয়ং বেঙ্গাল বাবুরা যদি বিলাতীয় বিজাতীয় কুসংস্কার এবং দ্বেষ মৎসরতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত বর্ণনা সকল পাঠ করেন, তবে তত্তাবতে লার্ড বাইরণের ন্যায় প্রখর ভাবসমূহ দেখিতে পাইবেন। কবিকঙ্কণের ন্যায় ভারতচন্দ্র রায় যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময়ের প্রচলিত দেশাচার প্রভৃতি যথার্থ-রূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার [৪৪] কাব্য সকলের বয়ঃক্রম অদ্য একশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তথাচ এই শতাব্দের মধ্যে অস্মদ্দেশের আচার ব্যবহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা মনে করিলে নয়ন-পথে অশ্রুধারার শেষ হয় না! ভারতের শব্দসৌন্দর্য্য ভাবের মাধুর্য্য এবং রসের প্রাচুর্য্য ও প্রাখর্য্যের কথা অধিক কি বর্ণনা করিব, বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ সুমিষ্ট রচনা অদ্যাবধি আর দ্বিতীয় হয় নাই, ভারতের পদ্য পংক্তি পাঠকালীন বোধ হয়, যেন মধুকরনিকরের ঝঙ্কার হইতেছে, রায় গুণাকর বাঙ্গালা ছন্দে সন্তুষ্ট না হইয়া স্থানে২ ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূনক, তোটক প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ ঋণ করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু অপার্য্যমানে স্থানে২ ছন্দপতন দোষ হইয়াছে, সংস্কৃত ছন্দাবলীর যতি অর্থাৎ বর্ণের লঘুত্ব গুরুত্ব রাখিয়া অন্য ভাষায় কবিতা রচনা করা অতি কঠিন কর্ম্ম,— ভারতচন্দ্রের বিষয়ে এতাবন্মাত্র উক্তি করিয়া অন্যান্য কবিদিগের প্রতি কিয়দুক্তি করিয়া প্রস্তাব সাঙ্গ করি।

উল্লেখিত প্রসিদ্ধ২ বাঙ্গালি কবি ব্যতীত বাঙ্গালা [৪৫] দেশে শতাবধি ব্যক্তি কবিত্বপ্রকাশে চেষ্টা করিয়াছেন, এতাবন্মধ্যে রামপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ, রামচন্দ্র, রামেশ্বর, এবং দেওয়ান রঘুনাথ রায়, রাজা রামমোহন রায়, নিধুবাবু, রামবসু ও রাধামোহন সেন, তথা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনুরাগ পাইয়াছেন, রামপ্রসাদ প্রকৃত কবির অনেক চিহ্ন দর্শাইয়াছেন, তৎকৃত গীতাবলীতে পৌতুলিক তান্ত্রিক কল্পনা সকল কল্পিত হইয়াছে, তথাপি তাহা কবিত্বশূন্য নহে, যেহেতু কল্পনাই কবিতার জীবনস্বরূপ হইয়াছে, তন্ত্রের কোন২ কল্পনা সুচারুতর রূপক ব্যতীত আর কিছুই নহে, বিশেষতঃ রামপ্রসাদী পদের স্থানে২ এরূপ বলবতী ভাষায় মনের কথা সকল কথিত হইয়াছে, কোথায় এপ্রকার সদুপদেশ সকল প্রদত্ত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা তাঁহার দৈবশক্তির প্রতি কোন সন্দেহই থাকে না, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর যদিও ভারতের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় সুন্দরতর না হউক, ফলতঃ পঠনীয় বটে, তদ্ব্যতীত কালীকীর্ত্তনে তিনি বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্গাপ্রসাদের গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী কবিতারসের তরঙ্গিণী বটেন, কিন্তু সে [৪৬] তরঙ্গিণী সুরতরঙ্গিণীর ন্যায় প্রবলা না হইয়া ক্ষুদ্র এক নির্ঝরপ্রভূতা সুনির্ম্মলজলধারিণী কুলু২ শব্দকারিণী তটিনীর ন্যায় প্রবাহিত আছে; রামচন্দ্র এবং রামেশ্বরের কবিতা তেজস্বী জাঙ্গল লতার ন্যায়। দেওয়ান রঘুনাথ রায় অর্থাৎ যিনি অকিঞ্চন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহার গীতাবলীর মধ্যে কোন২ গীত এরূপ অনুতাপ ভাবোদ্দীপক এবং ঔদাস্য-জনক যে, কালী এবং তারা শব্দের পরিবর্ত্তে খ্রীষ্ট কিম্বা খোদা শব্দ প্রয়োগ করিয়া খ্রীষ্টানেরা ও মুসলমানেরা স্বচ্ছন্দে গান করিতে পারেন, দেওয়ান মহাশয় স্বয়ং গায়ক এবং গীতশাস্ত্রে পরিপক্ব ছিলেন, সুতরাং স্বরানুমেলকতাগুণে সুনিপুণ ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের কৃত

কতিপয় পরমার্থসংগীতে কবিত্বলক্ষণ ঈক্ষণ করা যায়, রাজা মহাত্মা কবিতার প্রতি মনোযোগ করিলে বাঙ্গালা ভাষার অনেক গণ্য কবি হইতেন, কিন্তু তিনি পদ্যলেখক হইলে আমরা তাঁহার নিকটে যে উপকার প্রাপ্ত হইতাম, তিনি গৌড়ীয় ভাষার আদি গদ্যলেখক এবং স্বদেশীয় লোকের চরিত্রসংশোধক হওয়াতে আমরা তদপেক্ষা সহস্রগুণ উপকার প্রাপ্ত [৪৭] হইয়াছি। রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধুবাবুর প্রেমরসের সংগীত সকল অধিকাংশই অপহৃতভাবে সংকলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ ব্যাকরণ-দোষও আছে, কিন্তু কোন২ টপ্পা এরূপ স্বভাবিপূর্ণ যে, তাহাতে বিশেষ কবিত্ব প্রকাশও পাইয়াছে, নিধুবাবুর ভাষা সহজ প্রকার হওয়াতে তিনি অধিকাংশ লোকের প্রিয় হইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যা দেবী প্রকীর্ণ প্রভায় উদিতা হইলে তাঁহার আদর সমভাবে থাকা কঠিন হইয়া উঠিবেক; রামবসুর বিরহ কবিতায় এরূপ সুরস আছে যে, অনবরত শ্রবণপথে তাহা পান করিলেও তৃষা কৃশা হয় না। রাধামোহন সেন সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার কবিতা অথবা গীতে ছন্দ অলংকার অথবা ব্যাকরণের দোষ দৃষ্ট হয় না, তাহার সঙ্গীত সকল অধিকাংশই সংস্কৃত শ্লোক বা কবিতার অনুবাদ মাত্র। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কুকবি নহেন, সুকবিও নহেন, তদ্বিরচিত বাবুবিলাস বিবিবিলাস দূতীবিলাস গ্রন্থে ইয়ং বেঙ্গাল ওল্ড বেঙ্গালের যথার্থ চিত্র বিচিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার লেখাও প্রাচীন হইয়া পড়িল, [৪৮] যেহেতু তাঁহার জীবদ্দশাতেই কলিকাতার ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে, ধর্ম্মসভার গয়া গঙ্গা লাভ হইয়াছে, সভ্যতা এবং স্বাধীনতার পথ পরিমুক্ত হইয়া আসিতেছে, এই ক্ষণে আর গোবর ভক্ষণ, হুঁকা বারণ, বিষ্ণু স্মরণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের প্রথা প্রসিদ্ধ নহে, হিন্দু সন্তানগণ এবং স্বধর্ম্মত্যাগী খ্রীষ্টানেরা একাসনে উপবেশনপূর্ব্বক

দেশের মঙ্গলামঙ্গল বিষয় বিবেচনা করিতেছেন; অতএব কি আহ্লাদ! কি আহ্লাদ! এরূপ কাহার মনে ছিল যে, কলিকাতার স্বদেশীয় বিদেশীয় বিদ্বান্ লোকেরা একত্রে বসিয়া বাঙ্গালা কবিতার বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন? অতএব হে সভাস্থ মহোদয়গণ, হে দেশীয় ভ্রাতৃবর্গ, হে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা কবিতার বন্ধুবর্গ, আপনারা আর কালবিলম্ব করিবেন না, বাঙ্গালা কবিতা-হার যাহাতে সভাকণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হয়েন, এমত উদ্যোগ করুন, উর্ব্বরা ভূমি আছে, বীজ আছে, উপায় আছে, কেবল কৃষকের আবশ্যক, অতএব গাত্রোত্থান করুন, উৎসাহসলিল সেচন করুন, পরিশ্রমরূপ হল চালনা করুন, [৪৯] দ্বেষ প্রভৃতি জাঙ্গল কণ্টকবৃক্ষ উৎপাটন করুন, তবে ত্বরায় সুশস্যলাভ হইবেক, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! আপনারদিগের মধ্যে অনেকে অনায়াসে প্রাপ্য স্বদেশীয় শস্যকে ঘৃণা করিয়া বিলাতী ফসল ফলাইতে যান, অথচ বিবেচনা করেন না, যেরূপ বকুলবৃক্ষে আম্রমুকুল উদয় হয় না, সেইরূপ বাঙ্গালি কর্ত্তৃক ইংরাজী কবিতা অথবা ইংরাজ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা কবিতা রচনা অসম্ভব হয়, যদি বলেন—বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত এবং রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি বাবুরা যে সকল ইংরাজী কবিতা রচনা করিয়াছেন, সে সকল কবিতা কি কবিতা হয় নাই? উত্তর—হইয়াছে, হইবেক না কেন, অশ্বতর শব্দের অগ্রে কি অশ্ব শব্দ যোজিত নাই? উক্ত বাবুরা ইংরাজী কবিতা রচনা কল্পে যেরূপ আয়াস, যেরূপ পরিশ্রম এবং যেরূপ আকুঞ্চনের দাসত্ব করিয়াছেন, বাঙ্গালা কবিতা রচনায় যদ্যপি সেইরূপ আয়াস, সেরূপ পরিশ্রম এবং সেইরূপ আকুঞ্চন অথবা তাহার কিয়দংশের অনুবর্ত্তী হইতেন, তবে তাঁহারা গণ্যমান্য বাঙ্গালি কবি হইতে পারি-[৫০]তেন, এবং তাহা হইলে কত বড় আস্পর্দ্ধার বিষয় হইত? অদ্যতনী সভায় আমার এই এক পরম ক্ষোভের বিষয়

যে, প্রতিযোগীদিগের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে প্রস্তাববাহুল্য হইল, অতএব বাঙ্গালা কবিতার স্বরূপ বর্ণনা এবং ছন্দ প্রভৃতি বিষয়ে কোন উক্তি করিতে পারিলাম না, পুস্তকান্তরে এই ক্ষোভ নিবারণ করণের ইচ্ছা আছে। বাবু নবীনচন্দ্র পালিত গত সভায় বর্ত্তমান বাঙ্গালি কবিদিগের বিষয়ে যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আমার অধিক বক্তব্য নাই, যেহেতু যথার্থ কথা কহিলে বন্ধুবিচ্ছেদ হওনের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু একথা অবশ্যই বলিব, মনুষ্য বড় বিদ্বান্ হইলেই যদ্যপি বড় কবি হইতেন, তবে শেক্সপিয়র অপেক্ষা বেন্ জন্সন এবং কালিদাস অপেক্ষা বররুচি শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেন; পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার কাব্যশাস্ত্রের পয়োধিবিশেষ এবং প্রকৃত কবিত্ব অনেক লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু অস্মদ্ ক্ষুদ্র বিবেচনায় বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তদপেক্ষা অধিকতর কবিতাশক্তি ধারণ করেন, [৫১] বোধ করি ঈশ্বর বাবু বিদ্যা বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হইলে নবীন বাবু তাঁহাকেই অগ্রগণ্য করিতেন। অক্ষয় বাবুর কাব্যগ্রন্থ আমি দেখি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি, তেঁহ উক্ত কাব্যের জনকত্ব স্বীকারে অধুনা লজ্জিত হয়েন।

আমরা অদ্য যে মহাত্মার নামে প্রতিষ্ঠিত সভায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, সেই মহাত্মা বাঙ্গালা কবিতার একজন বিশেষ বান্ধব ছিলেন, তিনি মৃত্যুর কিয়ৎ মাস পূর্ব্বে এ অকিঞ্চনের প্রতি এবং অন্য এক বন্ধুকে এই বিষয় সম্পাদনার্থ স্বতন্ত্র রূপে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এই ক্ষণে কে আমারদিগকে উৎসাহ দিবেক? অতএব যে মহাশয় বাঙ্গালা দেশের, বাঙ্গালা ভাষার এবং বাঙ্গালা কবিতার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন, সেই মহাত্মা জন, এলিয়েট, ড্রিঙ্কওয়াটর বীটন ঈশ্বরসমীপে অনন্ত নির্ম্মলানন্দ সম্ভোগ করুন, এবং তাঁহার নাম ঘোষক, তাহার মত পোষক, সজ্জনমনস্তোষক এই বীটন সমাজ চন্দ্রাদিত্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকুক, ইহাই আমারদিগের ঐকান্তিকী প্রার্থনা।

সমাপ্ত।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে

হে বন্ধু, কল্পনা করি, শিশুকৃষ্ণ যশোদার কোলে,
বিগলিত স্নেহরস মার বুকে স্বতঃ উথলায় ;
দুয়ারে প্রতীক্ষা করে ক্রীড়াসঙ্গী গোপবালকেরা,
প্রাঙ্গণেতে ব্রজধেনু হানে ক্ষুর অধীর আগ্রহে,
গোঠের সময় হ'ল—প্রভাতেই গোধূলি-বিভ্রম !

বিমুগ্ধা জননী হেরে অকস্মাৎ শঙ্কিত বিস্ময়ে—
কোলের সন্তান তাঁর সঞ্জীবিত নিখিলের প্রেমে,
লক্ষ বাহু তার পানে স্নেহভরে নিত্যপ্রসারিত ।
হর্ষে মুদে আসে আঁখি, আনন্দাশ্রু ঝরে অবিরাম,
জননী কৃতার্থা—তাঁর একান্তই বুকের দুলাল—
তার মুখ চেয়ে আছে চরাচর পরম আগ্রহে ।

তোমারে বক্ষেতে পেয়ে ভাগ্যবতী মাতা বীরভূমি
নিভৃতে লালন করি সুগভীর সন্তান-সোহাগে—
অরণ্য কান্তার আর শস্যক্ষেত দিগন্তপ্রসারী
গুল্ম-নুড়ি-কঙ্করের লালমাটি ডাঙায় ডাঙায়
খোয়াই রচিয়া চলে ঝিরিঝিরি গিরি-নির্ঝরিণী,
উঠানে মরাই বাঁধা, লাউমাচা পালঙের ক্ষেত,
খড়ো কুটিরের গ্রাম—পুরাতন ইষ্টক-পঞ্জর,
ডোবায় বিস্মৃত-স্মৃতি অতীতের দীর্ঘিকা বিশাল,

শিবের দেউল কোথা, শ্মশানের দিগম্বরী দেবী,
শৃগালদেবতা আসে সুনির্দ্দিষ্ট পূজার প্রহরে,
গ্রামশেষে হরিধ্বনি জেগে রহে চব্বিশ প্রহর,
বৈষ্ণবের আখড়ায় গ্রামান্তের বাউলেরা আসে।

পারে নি রাখিতে মাতা এরই মাঝে তোমারে ভুলায়ে,
দূরের ইসারা জাগে চোখে চোখে [illegible]লের,
টানিল অজানা পথ—ঘণ্টাধ্বনি বল্লমের শিরে
গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ছুটে চলে ডাকহরকরা,
নিশীথে পেচক ডাকে, ডাকে [illegible] টহলদারের।
এদেরই ইঙ্গিতে বন্ধু, তোমারে টানিয়া নিল দূরে,
মুছে গেল রসকলি, [illegible]দের জলসা-আসরে
ঘনায় জীবনরস বাইজীর নূপুর নিক্কণে
সারেঙ্গীর সুরে সুরে টলমল কাচের গেলাসে।

মাধবী-যামিনী শেষ, ভেঙে গেল সখের আসর,
চৈতালীর ধ্বনি জাগে অট্টহাসি কালবৈশাখীর,
ভাঙিল পাষাণপুরী—হে বন্ধু, সে ঝঞ্ঝার প্রহারে
তুমি বাহিরিলে পথে, পথ ও পথিক চিরন্তন,
আজ আছে কাল নাই, অপরূপ বেদের ছাউনি,
গৈরিক সরণি শেষ সাপুড়ের বাঁশী বাজে দূরে।
হে বন্ধু, দেখেছ তুমি আগুন লেগেছে লোকালয়ে,
জ্বলিতেছে দাউ দাউ—দেবতা হাসিছে শান্ত হাসি,
নিরুদ্দেশ যাত্রা তব, মাতৃভূমি প্রতীক্ষা-ব্যাকুল।

পরিব্রাজকের ডায়েরি

কোলেদের দেশ

সিংহভূম জেলার একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। নিকটে একটি পার্ব্বত্য নদী, তাহারই কূলে নাকি এক অতি প্রাচীন কালে মানব বাস করিত। তখনও ধাতুর আবিষ্কার হয় নাই, পাথরের অস্ত্রশস্ত্র দিয়াই মানুষ নিজের সব কাজ চালাইত। সেই যুগের কিছু অস্ত্র এ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে শুনিয়া এখানে অনুসন্ধানের জন্য আসিয়াছি। সকাল হইতে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া দুইখানি চমৎকার কুঠার খুঁজিয়া পাইয়াছি, নীল কঠিন পাথরে তৈয়ারি, কি তাহার ধার, কি সুন্দর গড়ন!

সেই যুগের মানুষের কথা ভাবিতেছি। শুধু কুঠার কেন? ইহারা কি কেবল যুদ্ধই করিত? পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ইহাদের ছিল না? না, তাহা হয় না। হয়তো চাষবাসের যন্ত্রগুলি তাহারা কাঠের দ্বারা নির্ম্মাণ করিত, এখনও পৃথিবীর কোন কোন জাতি তাহা করিয়া থাকে। হয়তো পাথরের কুঠারগুলি অন্য কোনও উপায়ে ব্যবহার হইত, যাহা আমাদের এখন জানা নাই। যাক, বৃথা কল্পনা করিয়া লাভ নাই। এই রকম পাথরের অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে কত পরিশ্রম লাগে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।

নিকটে নদীর জল কলকলস্রোতে বহিয়া যাইতেছিল। দূরে অনাবৃত দেহে কয়েকজন কোল-রমণী স্নান করিতেছিল, কেহ বা পিতলের কলস মাটি দিয়া মাজিতে বসিয়াছিল। যাহারা স্নান করিতেছিল, তাহারা অনাবৃত দেহের আনন্দে হাসিতেছিল। আর দুইজন পরণের কাপড় পাথরের উপরে শুকাইতে দিয়াছিল। তাহাদের গায়ে শুধু ক্ষুদ্র কটিবস্ত্র ছিল বলিয়া পিছন ফিরিয়া কতক্ষণে কাপড় শুকায়, তাহারই

অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। জলে নামিয়া দুইখানি ভাল পাথর কুড়াইয়া ভাঙিতে বসিলাম। ঠক ঠক শব্দে ঠুকিয়া ঠুকিয়া যাহা গড়ি, তাহাকে কল্পনার সাহায্যেই বলিতে হয়, ইহা কুঠার, ইহা কোদাল। দেখিয়া বলে কাহার সাধ্য? তবু ছাড়িলাম না, ঠুকিতে ঠুকিতে মোটামুটি যখন একখানি অস্ত্রের মত পদার্থ গড়িয়া আনিয়াছি, তখন হঠাৎ শেষের আঘাতে তাহার অগ্রভাগ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। দুঃখ হইল বটে, কিন্তু প্রাচীন মানবের প্রতি আমার ভক্তি সহসা বাড়িয়া গেল। তাহাদের পরিপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কুঠার তো আমার পাশেই রহিয়াছে! কতখানি পরিশ্রম, কত কৌশল এবং অভিজ্ঞতাই না ইহার পিছনে লুকাইয়া আছে! পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করিত বলিয়াই কি তাহারা অসভ্য? ধাতু ব্যবহার তখনও মানুষে শিখে নাই। কিন্তু যাহা জানিত, তাহার জন্য তো কম বুদ্ধি, কম অধ্যবসায় ব্যয় করে নাই!

অলস মধ্যাহ্নে এই সকল কথা ভাবিতে লাগিলাম। দূরে মাঠ ধূ ধূ করিতেছিল। মাঘ মাসের শেষ, মাঠে আর ধান নাই, সব কাটা হইয়া গিয়াছে। কেবল নদীর পরপারে ক্ষুদ্র ক্ষেতে খেসারি ও ছোলার গাছ হইয়াছিল, সেখানে খড়ের সামান্য নীড় বাঁধিয়া একজন লোক পাহারা দিতেছিল। রাখাল-বালকেরা গরু-মহিষের পাল লইয়া জলের ধারে নামিয়া আসিতেছিল। তাহার মধ্যে একজন বাঁশের বাঁশীতে অতি সাধারণ একটি সুর বার বার সাধিতেছিল, সুরটির মিষ্টতার যেন আর শেষ নাই। নদীর ধারে কোথাও বা এক-আধটি কুলগাছ। কোল-রমণীগণ ইতস্তত জ্বালানি-কাঠ সংগ্রহ করিতে আসিয়া কুল পাড়িতে লাগিয়াছিল। একজন গাছ ধরিয়া নাড়া দেয়, পাঁচজনে তাহা কুড়াইয়া খায়। ইহারা বনের মধ্যে একা চলে না, দুই চারি জন একসঙ্গে যায়। বোধ হয়, একা যাইতে ভয় করে।

ওপারে যে ক্ষুদ্র গ্রামখানি দেখা যাইতেছিল, তাহার প্রান্তে গভর্মেণ্টের পাকা সড়ক চলিয়া গিয়াছে। একদল কোল-রমণী সেই পথে মজুরি করিয়া ফিরিতেছিল। রৌদ্রতপ্ত অপরাহ্নে তাহারা এক বৃক্ষের ছায়ায় বসিল। আমি পাথরের উপর বসিয়াই তাহাদের দেখিতে পাইতেছিলাম। সিংহভূমের অধিকাংশ অধিবাসী কোল হইলেও অনেক সময়ে বাংলা গান গাহিয়া থাকে। রমণীগণ ছায়ায় বসিয়া গান ধরিল। কি গান, ভাল বুঝিতে পারিলাম না; তবে দুই তিনটি পরিচিত শব্দ কানে ভাসিয়া আসিল—পিরীতি, কালা, রমণী। এই খোলা মাঠের দেশে, যেখানে দূরে বনে ভরা শ্যামল পাহাড়ের মালা দিগন্ত ঘিরিয়া আছে, সুরটি যেন সেখানে চারিপাশের সঙ্গে মিশিয়া যায়। অনেকক্ষণ তাহাদের টানিয়া টানিয়া গান গাওয়া শুনিলাম। পথ দিয়া একখানি মোটর-লরি যাত্রীর দল লইয়া ধূলা উড়াইয়া ছুটিয়া গেল। বোধ হয় কেহ রসিকতা করিয়া থাকিবে, রমণীগণের কলহাস্যে চকিত হইয়া উঠিলাম। তাহারা হাসিয়া উঠিয়া পড়িল এবং আবার পথ বাহিয়া চলিয়া গেল।

অলস দিবস পার হইয়া সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। জলের প্রান্তে নামিয়া আসিলাম। কত বিচিত্র রঙের পাথরের উপর দিয়া স্বচ্ছ জলধারা বহিয়া যাইতেছিল, তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। কোনটি লাল, কোনটির গায়ে সমান্তরাল কৃষ্ণরেখার মালা, জলের তরঙ্গে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। কোনটি বা নীলাভ, চতুষ্কোণ, তরঙ্গের আঘাতে তাহার নীল আভা যেন নৃত্য করিতেছে। পাথরগুলিকে কুড়াইয়া লইলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, হাতে লইতেই তাহাদের শোভা নিমেষে অন্তর্হিত হইল। তাহারা প্রাচীন স্থাণু পাথরের খণ্ডে পরিণত হইয়া গেল। কোথায় বা তাহাদের রূপ, কোথায় বা সেই রঙ!

কোলেদের জীবননাট্যের কথা ভাবিতে লাগিলাম। তাহারা আমাদের দেশের লোকের মতই পরিশ্রম করে, লজ্জা পায়, ভয় করে, গান গায়, বাঁশী বাজায়। সবই করে, কিন্তু জীবনের কলরবে তাহাদের সবই যেন সুন্দর দেখায়। সেই একই মানুষের মন, এখানেও যেমন, আমাদের দেশেও তেমনই, প্রভেদ কেবল প্রকাশের রীতিতে। আমরা লজ্জা পাই, ভয় শ্রম সকলই করি, কিন্তু স্পষ্টভাবে যেন সব কথা প্রকাশ করিতে পারি না। কোলেরা প্রকাশ করিতে ভয় পায় না। আনন্দ হইলে সে গান গায়, খেলার ইচ্ছা হইলে খেলে। আবার স্ত্রীর নাচগান পছন্দ না হইলে চেলা-কাঠ লইয়া তাহাকে তাড়া করে, স্ত্রী ভয়ে পলাইয়া যায়। কিন্তু তাহার প্রতি স্বামীর অনুরাগের আভাস পাইয়া পুলকিত মনে হাসে, ইহাও দেখিয়াছি। এই স্বচ্ছ প্রকাশেই ইহাদের জীবনকে আমাদের অপেক্ষা লীলায়িত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের জীবনের উপর দিয়া যেন স্বল্পতোয়া পার্ব্বত্য নদী মুখর শব্দে বহিয়া চলিয়াছে, আমাদের জীবনের অন্তস্থল যেন সভ্যতার গভীর জলে ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। তাহার না আছে গতি, না আছে স্বচ্ছতা। আবরণের ভারে আমরা নিষ্পেষিত হইয়া আছি, জীবনের অন্তরে যাহা ঘটিতেছে, তাহা ঋজু সরল ভাবে ভাবিতে বা করিতে আমাদের হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনের কথা ভাবিতে আর ভাল লাগিল না। নদী পার হইয়া মাঠ ভাঙিয়া প্রবাসের ঘরের দিকে ফিরিতে লাগিলাম। ওপারে গ্রামের প্রান্তে, নদীর কূলে দেখিলাম, কাহার একখানি নূতন সমাধি রচিত হইয়াছে। বোধ হয় কোনও নারী হইবে, তাহাকে উত্তর শিয়রে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। মাটি একান্ত কাঁচা রহিয়াছে, সমাধির উপরে কতকগুলি পাথর চাপানো, যেন শেয়াল-কুকুরে শবদেহ

লইয়া না যায়। আর তাহার উপরে একখানি দড়ির খাটিয়া পায়া ভাঙিয়া রাখা হইয়াছে। এই খাটেই নারীর দেহ শেষ প্রবাসের যাত্রায় আসিয়াছিল। কাছে একখানি কুলার উপরে লালপাড় শাড়ির ছিন্ন অংশ এবং কয়েকখানি হরিদ্বর্ণ পত্র সযত্নে সজ্জিত ছিল। আত্মীয়েরা হয়তো স্মৃতির উদ্দেশে বসন ও ভূষণের এই সামান্য আয়োজন নিবেদন করিয়া গিয়াছে।

মনটা ভারী হইয়া গেল। পথের উপর দিয়া ধীরে ধীরে ফিরিতে লাগিলাম। দূরে পাঁচ ছয় জন লোক একটি বাঁশে এক মৃত গাভীর চারি পা একত্র বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছিল। আশ্চর্য্য হইবার কিছুই ছিল না। গাভীর মাথাটি নেতাইয়া পড়িয়াছিল এবং বাহকগণের অসমান গতির জন্য দুলিতেছিল। হয়তো অল্পক্ষণ আগেই ইহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু কাছে আসিতে হঠাৎ চমক লাগিল। গাভীটির পশ্চাদ্‌ভাগে অর্দ্ধপ্রসূত বৎসের দেহার্দ্ধ প্রলম্বিত হইয়া ছিল, তাহার মাথা ও একটি পা যেন বাহির হইবার বিপুল চেষ্টায় টান হইয়া হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম, এই অনাগত বৎসই মাতার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। বাহকগণের পশ্চাতে এক ব্যক্তি আসিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মর গয়া? সে আমার দিকে না চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিল, হাঁ বাবু, মর গয়া।

হায় রে! জন্ম এবং মৃত্যুর এই দুর্জ্ঞেয় পটভূমির সম্মুখে আমরাই বা কি, আর এই অবোধ জীবই বা কোথায়? দুইজনের মধ্যে প্রভেদ তো কোথাও নাই, ব্যথা তো দুইজনেই সমান পায়। মানুষে মানুষেই বা প্রভেদ কোথায়? কেহ বা ক্ষণেকের আনন্দে কলরব করিয়া উঠে, কেহ বা করে না। কিন্তু দুইজনের পিছনেই সেই একই অজ্ঞেয় পটভূমি, যাহার সম্মুখে জীবনের সকল লীলা আকাশের অন্ধকারের পটভূমিতে নক্ষত্রের মত জ্বলিতে থাকে এবং অবশেষে একদিন অন্ধকারের মধ্যেই ম্লান শীতল হইয়া যায়। প্রাচীন যুগের প্রাচীন মানব যেমন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, আমরা সবাই তো তেমনই একদিন ধরিত্রীর ক্রোড় হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব।

ভোলার সুবিধা

উপকার করি ভুলিবে পত্রপাঠ,
নতুবা নিত্য লেগে রবে ঝঞ্ঝাট।
মানুষ চায় না খাটো হ'তে কারো,
লইবে সে তুমি যত দাও পারো,
ফিরিবার পথে ও তরী দেয় না আঁট।

২

ক্রীতদাস ছিল মুক্তি দিয়েছ যার,
সেও চিনিবে না, তুমিও চিনো না আর
যাহারে যা দিবে দেওয়া শেষ হ'লে
বালিতে লিখিয়া মুছে ফেল জলে,
উসুল না হ'ক, হবে না উসুল ছাঁট।

৩

উপকার করি ভুলিলে তাহার কথা,
দিতে পারিবে না বেদনা কৃতঘ্নতা।
সেটাও একটা কত বড় লাভ
বোঝ নাকো তুমি সরলস্বভাব,
চেনা ঘোড়া হ'লে অধিক বাজিবে চাঁট

৪

যে শর বিঁধিবে না চেনাই সেটা ভাল,
ডাকাতের হাতে রূঢ়তর গৃহ আলো,
শুধাই তোমারে ওহে সুধীবর,
পড়ে যদি হবে সে কি প্রীতিকর,
তোমারি পৃষ্ঠে তোমারি চেলানো কাঠ?

৫

ভুলিয়া থাবার বিশেষ সুবিধা এই,
পাবে না যেটারে আগেই ভাবিবে নেই।
নতুবা হৃদয় করিতে শান্ত
পড়িতে হইবে গোটা বেদান্ত,
ভোলানাথ হ'ল বিশ্বের সম্রাট।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

When the peoples of the earth had decided what gifts they would ask of God, they gathered before His throne and made their requests.

The Latins said : "we want wisdom."

The English said : "we want the sea."

The Turks said : "Allah, give us the fields."

The Russians said : "Give us the mountains and the iron mines."

The Franch said : "Give us gold,"

The Germans said : "Give us weapons."

"National Zeitung," Basel.

The Indians said : "Give us—er—what ?
Give us non-violence."

কেন আমি লেখক নহি

প্রায়ই বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন অথবা পরিচিত মহল হইতে অনুরোধ আসে তাঁহাদের জীবনী হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া গল্প লিখিবার জন্য। হয়তো তাঁহারা নিজেদের সম্বন্ধে সত্য কথা শুনিতে চাহেন না, বা সত্য কথা সহ্য করিবার সাহস তাঁহাদের নাই, তাই গল্পের মধ্য দিয়া আত্মজীবনের খানিকটা মনোরম অংশ ও মনোহর কীর্ত্তি-কাহিনী শুনিবার বাসনা তাঁহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই বলেন, দোষে-গুণে মানুষ। দুষ্কৃত্তম মানুষের মধ্যেও এমন অনেক সদ্‌গুণ আছে যাহা ঋষি-তুল্য শ্রদ্ধেয়ের মধ্যে বিরল, আবার ঋষি-তুল্য ব্যক্তির অবচেতন মনের মালিন্য অসতর্ক মুহূর্ত্তে প্রকাশ হইয়া পড়িলে জঘন্য চরিত্রের ব্যক্তিকেও লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। মনস্তত্ত্বের অনেক জটিল ও দুরূহ তথ্য ইহাদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়; ফ্রয়েড ও হ্যাভেলক এলিসের কোটেশনে ইহারা দুরস্ত; কিন্তু হায়, সত্য কথা যে প্রিয় কথা নহে, এই সামান্য প্রবচনটুকু ইহারা মনে রাখেন না! অপরের সম্বন্ধে যে নির্ম্মম সত্যের প্রকাশ মনকে পুলক-বিহ্বল করিয়া তুলে, নিজের সম্বন্ধে সেই প্রকাশকেই অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া মনে হয় এবং লেখককে অনুরোধ করিয়া যাহা লিখাইয়া থাকেন, তাহার মধ্যে রূঢ় সত্যের ছায়া কিছু পড়িলে অভিমান বা ক্রোধের সঞ্চার হয়। অভিমান সব ক্ষেত্রে ততটা মারাত্মক নহে; কেন না, তাহা অহিংস। হিংসামূলক ক্রোধ অতি ভয়ানক। ইহা অগ্নির ন্যায় দাহ্য বস্তুকে পুড়াইয়া নিঃশেষ না করা পর্য্যন্ত সমান তেজমান থাকে। আসল কথা, অনুরোধে পড়িয়া বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বা

পরিচিতের চরিত্র চিত্রণ করিতে যাওয়ায় অনেকখানি বিপদ আছে। তাঁহাদের লইয়া স্তবমালা রচনা চলে, সত্যভাষণ চলে না। গল্পের মোড়কে মুড়িলে কি হয়; গল্পকে মিথ্যা ভাবিয়া কৌতুক উপভোগ করিবার মত সবল মন কোথায়? লেখককে জব্দ করিবার জন্য আইনের খড়্গ উচানোই আছে; তাই সাবধানী লেখক ভূমিকায় প্রায়ই লিখিয়া দেন, এই পুস্তকের সমস্ত চরিত্রই কল্পনাপ্রসূত। সাধারণ পাঠক কিন্তু অলীক কল্পনার পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু বাস্তব লইয়া কারবার করার অনেক অসুবিধা। একে তো আমাদের সঙ্কীর্ণতম জীবন, পরিধিতে বৃহত্তর জগতের স্বাদ বড় একটা মিলে না, ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন লইয়া কারবার। পল্লী-বর্ণনায় অতিশয়োক্তি ও শহর-বর্ণনায় প্রশংসা-কুণ্ঠতার দোষ প্রায়ই লেখনী আশ্রয় করে। যে যুদ্ধ-মহিমায় জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের দর্শন মিলে, আমরা সেই রণক্ষেত্রকে বহুযুগ অতীতের কুরুক্ষেত্র বা সমুদ্রতীরবর্ত্তী লঙ্কার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সুললিত পয়ার ছন্দের মধ্যে মাত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারি; হিন্দু-মুসলমান রাজত্বে যে সব যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যেও বহু অর্দ্ধসত্য ও পূর্ণমিথ্যার গৌরব-কাহিনী ছানিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়া পাঠকের মনোরঞ্জনে প্রয়াস পাইতে পারি, কিন্তু অতি-আধুনিক যুগের পাঠককে সেই 'না ঘরের, না ঘাটের' মোদকখণ্ড তুলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ মুখবিকৃতি করিয়া মাটিতেই নামাইয়া রাখিবেন। অথচ সৃষ্টির প্রেরণায় আমাদের হাত প্রতিনিয়ত উসখুস করিতেছে। ঝরণা-কলম কালিতে ভরা, সাদা কাগজ আকণ্ঠ পিপাসায় নিবের সূচ্যগ্রভাগে লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছে, আকাশে বর্ণের বিকাশ, ঋতুতে ঋতুতে সমারোহ এবং মনস্তত্ত্ব-রসায়নে অন্তর মন শক্তিশালী ও সক্রিয়, না লিখিয়া উপায় কি?

কিন্তু লিখিব কি? লেখার বিপদগুলি ভাবিয়া দেখিলে ঝরণা-কলম

দিয়া কালির প্রবাহ বহিতে চাহে না। যাহাদের লইয়া মনস্তত্ত্বের কারবার ফাঁদিবার বাসনা, তাহাদের মন আছে এবং নিঃসন্দেহে তাহা সক্রিয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ জগতে সেই ক্রিয়া-কলাপের নমুনা আমার জীবন-ধারণের সমস্যাকে যদি প্রতিনিয়তই আঘাত করিয়া চলে তো ঝরণা-কলম ঝরণার জলে (কিম্বা পুকুরের জলে) ভাসাইয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি ? একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, লেখক নির্ভীক না হইলে তাঁহার লেখনীধারণ অসার্থক। অত্যন্ত খাঁটি কথা এবং সত্য কথা। কাপুরুষতা লেখকের সাজে না। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে সমাজ আত্মীয়-স্বজন এমন কি প্রিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ পর্যন্ত অপরিহার্য্য। লেখকের জীবন হয়তো সাধকের জীবন, কিন্তু লেখকের সাধনা নির্জ্জন অরণ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলে না। লেখকের মস্তিষ্ক ও হৃদয় দুইই প্রখর হওয়া আবশ্যক : সংসার-আসক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-ক্ষমতার পরিচয় না দিলে, বাস্তব জগতে তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে কেহই যত্নবান হইবেন না। অথচ বাস্তব জগতের বিপদগুলি শুনুন। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে যাঁহাদের সহিত পরিচয়, তাঁহারা চিরকাল দোষগুণের অতীত। তাঁহারা প্রতিপালক ; বাক্য, অন্ন, জ্ঞান, বিদ্যা ইত্যাদি যত কিছু পার্থিব দানে মানুষকে শক্তিশালী ও সচেতন করার দরকার, তাহা শৈশব হইতেই স্নেহ ও কর্ত্তব্যের খাতিরে সামর্থ্যানুযায়ী অকাতরে (?) দিয়া আসিতেছেন। সুতরাং, তাঁহাদের ঋণভার মাথায় তুলিয়া তাঁহাদের পায়ের পানে না ঝুঁকিয়া আমাদের গত্যন্তর নাই। বাস্তব ক্ষেত্রে কলম ধরিয়া যদি দুঃসাহসীর মত তাঁহাদের যথাযথ চিত্র অঙ্কন করিতেই হয় তো তাঁহারা বিত্তশালী হইলে আমার ত্যাজ্যপুত্র হওয়া বিধাতাও রোধ করিতে পারিবেন না, মধ্যবিত্ত হইলে দৈহিক উৎপীড়ন কিছু ঘটিবেই এবং নিঃস্ব হইলে অভিশাপের অগ্নি প্রতিনিয়ত বর্ষিত হইতে

থাকিবে। এই সমস্তেও তত ভয়ের কারণ নাই, নির্ব্বাক বেদনার ভাষাকে আমার বড় ভয়। তাই তথাকথিত শ্রদ্ধেয় জনের চরিত্র লইয়া আলোচনা প্রথম হইতেই পরিত্যাগ করিয়াছি। বাবা-মায়ের পরই যাঁহাদের প্রভাব জীবনে অত্যন্ত প্রবল, তাঁহারা বন্ধু। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাদের লইয়াই জীবনের যত কিছু সম্পূর্ণতা। তাঁহাদের বাক্য, হাসি, বুদ্ধি ও হৃদয়ের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বিনিময় চলিতেছে; সুতরাং অনুরুদ্ধ না হইলেও তাঁহাদের জীবন যে উপকরণ হিসাবে আমার লেখার অত্যন্ত লোভের সামগ্রী, এ কথা অস্বীকার করি কি করিয়া! অথচ অন্তরঙ্গতার সুযোগ লইয়া যেই মাত্র অন্তরতম সুহৃদের গোপন কথাটি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তিনি মুখে আষাঢ়ের মেঘ নামাইয়া অন্তর-কপাট নির্ম্মম করেই রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। বন্ধুর ভালবাসায় যেখানে স্বার্থের সন্ধান মিলিয়াছে—সেইখানে আমি কপট, যেখানে ত্যাগের পরিচয় লেখা—সেইখানে আমি শক্তিমান। বুদ্ধি জিনিসটা মোটামুটি শুনিতে কর্ণরোচক, প্রতিভামণ্ডিত হইলে তো কথাই নাই, কিন্তু বিশ্লেষণে মর্য্যাদাহানিকর। চাতুরি, পাটোয়ারি, ধূর্ত্তামি ইত্যাদি নিম্নস্তরের জিনিসে মৌলিকত্ব থাকিলেও সে বর্ণনায় বন্ধুর মন বর্ষাকালের অমাবস্যা রাত্রির মতই হয়তো নিদারুণ হইয়া উঠিবে। স্নেহের ক্ষেত্রে বন্ধুকে যদি নির্ব্বোধ বলা যায়, অত্যন্ত উদারমনা হইলে অখুশি হয়তো তিনি নাও হইতে পারেন, কিন্তু পূর্ব্ববৎ প্রাণখোলা স্নেহ-রস উপভোগ করিতে পাইব কিনা সন্দেহ, অন্তত বুদ্ধিপ্রকাশের খাতিরেও তিনি সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য। বিদ্যার ক্ষেত্রে ইঁহাদের উপরে উঠিবার চেষ্টা করা বুদ্ধির পরিচায়ক নহে; বন্ধুত্বের পল্‌কা সূতার তো কথাই নাই, শক্ত কাছিও পট করিয়া ছিঁড়িয়া যায়। আশ্চর্য্য, ইঁহাদের সঙ্গে যত খুশি মনপ্রাণ বিনিময়ের মুহূর্ত্তে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ কর বা

তাঁহাদের দুর্ব্বলতা লইয়া পরিহাস কর, বুদ্ধিকে ধিক্কার দাও, বিদ্যাকে সঙ্কুচিত কর, স্নেহে স্বার্থের প্রকাশ দেখ, তর্কের খাতিরে হাতাহাতি কর, কিছুই স্থায়ী ফল প্রসব করিবে না; কিন্তু দুর্ব্বলতম মুহূর্ত্তের সামান্যতর পরিচয় যদি কাগজে কালির টানে রেখাপাত করিতে চাও তো বিপদের সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। পরম বন্ধু বিগড়াইলে যে চরম শত্রুকেও হার মানায়, এ কথা তো সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশের প্রবাদবাক্য।

অতঃপর আত্মীয়-স্বজন। যেবার ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়া দ্রুত স্থানত্যাগ করিতে পারি নাই, ফল বক্ষ্য হাতে হাতেই মিলিয়াছিল আত্মীয়-স্বজনকে তেমন হুলবিশিষ্ট ভীমরুলের সঙ্গে তুলনা করিবার সাহস আমার নাই, বরং মৌমাছির সঙ্গে তুলনা করিলে কতকটা মানায়; কিন্তু মধুর লোভ একেবারে ত্যাগ না করিতে পারিলে হুলের ভয় কাটানো দুষ্কর।

উহাদের পাশ কাটাইতে গেলে প্রতিবেশীদের সাক্ষাৎ মেলে। ইহারা আত্মীয়ও বটে, অনাত্মীয়ও বটে। ইহাদের সম্বন্ধে রুশ লেখকের উক্তিটুকু স্বতই মনে পড়ে।—

One can love one's neighbours in the abstract, or even at a distance, but at close quarters it's almost impossible.

কিন্তু আমার মতে প্রতিবেশীরা আসলে ভাল, তাঁহাদের সঙ্গে আয়নার তুলনা চলে। মাজিয়া ঘষিয়া যত্ন করিয়া রাখ, সে তোমার প্রতিমূর্ত্তিকে কোথাও অস্পষ্ট বা আবিল করিয়া তুলিবে না, হাই দিয়া মলিন করিলে তোমারই ক্ষতি।

তবে ইহাদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া মধুরসম্পর্কীয়দের লইয়া কিছু লিখিতে বাধা নাই। যেমন ঠানদিদি, বউদিদি। একবার জনৈকা

ঠানদিদির হরিনামের ঝুলি ও পরচর্চ্চা-কীর্ত্তন লইয়া কিঞ্চিৎ চর্চ্চা করিয়াছিলাম, ফলে তিনি সম্পর্ক বজায় রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রখর রসনা-চালনার ফলে সাহিত্যের আবর্জ্জনা আমার মস্তিষ্ক হইতে প্রায় দূরীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ভাগ্যে শহরে দুই দশ দিন বাস করিবার স্থান ছিল, তাই রক্ষা।

বউদিদি আমার আধুনিকা নহেন, সাহিত্যের সংবাদ রাখার চেয়ে গৃহস্থালীর শৃঙ্খলা-বিধানকে বহু মূল্যবান জ্ঞান করেন। গল্প-উপন্যাস না পড়িয়াও তিনি যে সব স্থূল রসিকতা করেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিলে অধুনাবিলুপ্ত বাঙালী সমাজের সুন্দর চিত্র পাঠকের পক্ষে হৃদ্য হইবে বলিয়াই একদা ঐরূপ বাক্‌ভঙ্গির অনুকরণে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু হায়, এক মাস যাইতে না যাইতে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম, বউদিদি আমার সাহিত্য-ভক্ত হইয়া উঠিলেন। আমার পাতে সযত্নে রন্ধিত সুভোজ্য আর তেমন সমাদরে পরিবেশিত হয় না। আমাকে দেখিয়া রসিকতা করা দূরে থাকুক, পাশ কাটাইতে ব্যতিব্যস্ত হন। আমি যদি রসিক হইবার চেষ্টা করি, তিনি মুখ ভার করিয়া বলেন, থাক, আর কাজ নেই। আমরা মুখ্যু মানুষ লেখাপড়া জানি না, আমরা কি কথা কইবার যুগ্যি!

অনেক অনুসন্ধানের ফলে বউদিদির আলমারি হইতে কয়েকখানি পুরানো মাসিকপত্র উদ্ধার করিয়া সমস্যার সমাধান করিয়াছিলাম। উনি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিয়াছেন, আমাকে বুঝি বা সে পরিচয় ভুলিয়া যাইতে হয়। এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য জগতে কোথাও ঘটিয়াছে কি?

ভাবিলাম, দূর ছাই, বাড়ির লোক ও পাড়ার লোক ধরিয়া আর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিব না। কর্ম্মক্ষেত্রে সহকর্ম্মীর উপর কটাক্ষপাত

করাটা মন্দ কি? তাহাদের সঙ্গে দশটা পাঁচটার সম্পর্ক। তাহারা ক্ষুব্ধ হইলে জীবন হয়তো দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে না। রাগ করে, ঘরের অন্ন বেশি খাইয়া মুদির দেনা বৃদ্ধি করিবে · বড় জোর কথা কহিবে না, তাহাতে নির্ব্বিবাদে অফিসের কাজটুকু সুসম্পন্ন করিতে পারিব। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। যে দিকেই তাকাই—লেখার মশলার অত্যন্ত অভাব দেখি। ইহাদের জীবন লবণহীন ব্যঞ্জনের মত, পাতে সাজাইয়া রাখ, মন্দ দেখাইবে না, কিন্তু মুখে দিয়াছ কি পরিপূর্ণ এক গ্লাস জলের প্রয়োজন। Merry-go-round খেলার মত একটি সরলরেখাকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্ত রচনা করিয়া ঘুরিতেছে। সেই সাংসারিক অসচ্ছলতা, ছেলের অসুখ, কন্যাদায়, স্ত্রীর খিটখিটে মেজাজ, লটারির টিকেট, আলু-কপির দর-বর্ণনা, হিট্‌লার-মুসোলিনির মুণ্ডপাত ইত্যাদি ইত্যাদি। উহারই মধ্যে একজনের একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া মনে আনন্দ হইল। ইনি বড়বাবু, কেরানিকুলের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ দেবতা। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ইঁহার আচরণের অসামঞ্জস্য—মনস্তত্ত্বের একটি অলিখিত দিক অপূর্ব্ব হইয়া সারা মনের সঙ্গে ঝরণা-কলমটিকে পর্য্যন্ত নাচাইয়া তুলিল। হাঁ, চিত্রণোপযোগী চরিত্র বটে। ইঁহার মুলে মেঘ-রৌদ্রের খেলা তো প্রতিনিয়তই দেখিতেছি,—এই হাসি, এই হুঙ্কার। কাহাকেও সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া সদ্য মোক্ষ দিতেছেন, কাহাকেও নরকস্থ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না। বিনা প্রয়োজনে অনেকে আসিয়া প্রত্যক্ষে লম্বা কুর্নিশের সঙ্গে স্তুতি নিবেদন করিতেছে, আবার পরোক্ষে অভিধান-বহির্ভূত ভাষায় অভিনন্দিত করিতেও ছাড়িতেছে না। সুন্দর চরিত্র, সুতরাং রঙের পোঁচ দেওয়া গেল। রঙের পোঁচ হয়তো বা গাঢ়তরই হইয়াছিল, সে মুখ অতঃপর sphinx-এর বলিয়াই মনে হইল; এবং সাহিত্যের কন্তধারা

এখানেও যে প্রবহমান, সে কথা বুঝিলাম বেতন-বৃদ্ধির সময়। সে যাহা হউক, প্রভুসম্পর্কীয়দের লইয়া খেলা করিবার প্রতিফল হাতে হাতেই মিলিল। চাঁদ সদাগরকে দেবী মনসা ইহার কত গুণ বেশি নাকাল করিয়া সম্মান আদায় করিয়াছিলেন জানি না, আমার তো মনে হয়, সে যুগে খানিকটা নিষ্ঠুরতা ও জিদের সঙ্গে খানিকটা দয়ার নমুনাও ছিল, এ যুগে যাহা বিরল হইয়া উঠিতেছে।

বড়বাবু যে আক্কেল-সেলামি দিয়াছেন, তাহাতে বড়তম কর্ত্তাদের লইয়া নাড়াচাড়া করিতে সাহস হয় না। অন্য দেশ হইলে রাষ্ট্রের সঙ্গে বোঝাপড়া চলিত, এখানে লালপাগড়িকে সভয়ে সম্মান না দিয়া উপায় কি? প্রেমের সঙ্গে রাজনীতির অহি নকুল সম্বন্ধ বলিয়াই শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক হইবার কামনায় শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হইবার অভিলাষ পোষণ করি নাই। সাহিত্যের বাগানে ফুল ফুটাইবার কাজ লইয়াছি; বড় জোর ফলের আস্বাদন লইতে পারি, কিন্তু গাছের গোড়ায় সার দেওয়া, মাটি কোপানো এ সব আমাদের সাজে কি? স্বাধীন দেশের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের উদ্যান-রচনার উদ্যম আছে; শক্তি, সাহস, নির্ভীকতা—কোন্‌টা নাই? তাঁহারা গাছটাকে শুধু জীয়াইয়া রাখিয়া নিরুদ্যম আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ক্ষুদ্র এবং বিবর্ণ ফুলের ফসল দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করেন না। তাঁহাদের সাহিত্য রাষ্ট্রকে নূতন করিয়া গড়িতেছে, আমাদের রাষ্ট্র সাহিত্যকে একটি কোণে কুণ্ডলীকৃত করিতেছে। সেই কুণ্ডলায়িত বৃত্তে নিরঙ্কুশভাবে যে চর্চ্চা সোৎসাহে ও সবেগে চালানো যায়, তাহা প্রেম। ভূমির প্রতি নহে, ভূমার প্রতিও নহে, স্বকীয়া বা পরকীয়া প্রীতি, যাহাতে সমাজকে নিষ্করুণ-ভাবে আঘাত দেওয়া চলে, শক্তিমান প্রাচীনদের মূল্যবান লেখাকে অনায়াসে অবজ্ঞা করা যায়, যত কিছু ভাল তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া প্রগতিবাদের মহিমার ধ্বজা সগর্ব্বে শূন্যে ঠেলিয়া তোলা যায়।

কিন্তু পরকীয়া-প্রীতি ছাড়া আর একটি বিষয় যেন আছে বলিয়া মনে হইতেছে। যাহাদের ক্ষোভে আমার হয়তো কোন ক্ষতিই হইবে না, সেই পতিতাদের লইয়া যদি কিছু লেখা যায়? মন্দ কি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার পূর্ব্বগামী বহু সাহিত্যরথী আলোকপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আলোকপাত করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, সে আলোক যেমন অস্পষ্ট, তাহার তলায় বা চারিদিকে তেমনই গাঢ় দুর্ভেদ্য অন্ধকার। তাঁহারা কলমের খোঁচায় পঙ্কিল পরিবেশটিকে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে, হাবভাবে ও কথাবার্ত্তায় যথেষ্ট পরিমাণে কৃত্রিমতা আনিয়াছেন। স্থান-বর্ণনা বা বৃত্তি-বর্ণনা ছাড়া সেই ম্লান ক্ষুধিত পতিত আত্মাগুলিকে যদি আমাদের সংসারের মধ্যে বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া সাজাইয়া রাখা যায় তো, এগুলিকে আত্মীয় বলিতে এতটুকু দ্বিধা আমাদের জাগিবে না। ইহাদের ক্ষুধার পরিমাণটা জানাইয়াছেন, হেতু নির্দ্দেশ করেন নাই। ফলে, সত্যকারের গোলাপে ও কাগজের গোলাপে যে তফাৎ, তাহাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণটুকুর মাত্র হুবহু নকল হইয়াছে, আর কিছুই হয় নাই। এই বিষয়ে আর একজন বিখ্যাত রুশ লেখকের কথা মনে পড়িতেছে।—

One must grow accustomed to this life, without being cunningly wise, without any ulterior thoughts of writing. Then a terrific book will result.

সুতরাং এ পথও আমার পক্ষে চিররুদ্ধ। এবং এই কারণেই চাষা ও শ্রমিক আন্দোলনকে পাশ কাটাইয়াছি।

কি করা যায়? ঘরের চেয়ে বাহিরের বিবাদ অধিক বুঝিয়া পুনরায় ঘরেই দৃষ্টিপাত করিলাম। আছে, আছে, লিখিবার বিষয় আছে। ঐ যে গৃহকোণে আবদ্ধ একটি প্রাণী নিঃশব্দে ছায়ার মত দুঃখ-দৈন্যের বোঝা হাসিমুখে মাথায় তুলিয়া শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনা সহিয়া উদয়াস্ত

খাটিয়া মরিতেছে ; বাহিরে অপমানিত হইয়া যাহার উপর তর্জ্জন করিয়া প্রভুত্ব ফলাইতেছি; যাহাকে ভাল জিনিস কিনিয়া দিবার অক্ষমতায় ত্যাগধর্ম্ম শিখাইতেছি ; সন্তানের বোঝা মাথায় তুলিয়া দিয়া মাতৃত্ব-মহিমায় মণ্ডিত করিয়া দেবী বানাইয়া পরম দুঃখেও চরম সুখ উপভোগ করিতেছি, সেই সর্ব্ব কর্ম্ম ও ধর্ম্মের অংশভাগিনী যে বিদ্যমান। ছাই ফেলিতে এমন ভগ্ন কুলা আর কোথায় মিলিবে ?

দুঃখে না পড়িলে সে কি হইতে পারিত, স্ত্রী না হইলে তাহার মধ্যে পরকীয়া-রস কিরূপে উদ্বেল হইয়া উঠিতে পারিত, এক কথায় কল্পনার পুষ্পকরথে চাপাইয়া তাহাকে আমার মানস-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিলাম। ছবি যা আঁকিলাম, নিজেরই বয়স অন্তত কুড়ি বৎসর কমাইয়া আনিলাম। কলেজ, কক্‌টেল, সিগ্রেট, রেস্তোরাঁ, সিনেমা, নুডিজিম, কম্প্যানিয়নেট ম্যারেজ, লেক, বান্ধবী, বেবি অস্টিন, বালিগঞ্জ ইত্যাদি আধুনিক ও তরুণ হইবার যত কিছু উপকরণ হাতের কাছে পাইলাম, সযত্নে আঁকড়াইয়া ধরিলাম। কিন্তু একচক্ষু হরিণের মত দিক্‌নির্ণয়ে আমার ভুল হইল। গৃহকোণের নিরীহ প্রাণীটি অসহযোগ করিয়া বসিলেন। তিনিও কি সাহিত্য-রসিকা হইয়া উঠিলেন ? সর্ব্বনাশ ! পাড়া-প্রতিবেশীরা কি ভয়ানক বস্তু এতদিনে বুঝিলাম। আমার কল্পনার পক্ষচ্ছেদে তাহারা সাংঘাতিক ভাবে পরামর্শ দিয়াছে। স্ত্রীকে বুঝাইয়াছে, এতদিনে তাহার কপাল ভাঙিয়াছে। একান্ত অনুগত ও পরম বিশ্বাসী জন বুঝি বা এমন বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হইয়া গেল, যাহার তুলনায় ইতিহাসের সব কয়টি পূর্ব্বসূরির নাম ম্লান হইয়া যাইবে। হতাশ হইয়া চারিদিকে চাহিলাম। তবে কি মজ্জমান ব্যক্তির কোন অবলম্বনই নাই ? ঝরণা-কলম কি ঝরণার (অভাবে পুকুরের) জলেই ভাসাইয়া দিব ?

করজোড়ে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া মনে মনে আকুল কণ্ঠে আবৃত্তি করিলাম, হে ঈশ্বর, তবে কি কোন উপায় নাই ?

সহসা গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, আছে।

স্পন্দিত বক্ষে ও কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, কি উপায় ?

গম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনি উঠিল, উপায়—আমি।

মূঢ়ের মত ফাঁকা আকাশের পানে চাহিয়াই রহিলাম, অর্থ বুঝিলাম না।

গম্ভীর মৃদু কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, উপায়—আমি। আমাকে লইয়া যে তর্ক অনাদিকাল হইতে চলিতেছে, সেই অমীমাংসিত তর্ক-সভায় যোগদান কর। ধর্ম্মকে লইয়া (অবশ্য পরধর্ম্ম নহে, তাহাতে জীবন-হানির সুযোগ যথেষ্ট) যাহা খুশি লেখ, প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই।

গ্রীক দার্শনিকের মত উলঙ্গ হইয়া 'ইউরেকা' শব্দে আর্তনাদ তুলিয়া রাজপথে না ছুটিলেও কলমটি দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিতেছিলাম, কিন্তু ধর্ম্মকে পরমুহূর্ত্তে ততখানি বে-ওয়ারিস ভাবিতে পারিলাম না। ধর্ম্ম—যাহা ধারণ করেন, তাহা হয়তো নিরাপদ, কিন্তু ধর্ম্মকে যাহারা বহন করিয়া ফিরিতেছেন, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপের অহিংসত্ব সম্বন্ধে আমার সন্দেহ যথেষ্টই আছে।

ভাল খরিদ্দার পাইলে ঝরণা-কলমটি বিক্রয় করিয়া দিব, স্থির করিয়াছি।

শ্রীঋটকেশ্বর শর্ম্মা

The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.

G. Bernard Shaw

রিক্‌শ

আজকাল কলিকাতার তো কথাই নাই, ছোট ছোট শহরেও রিক্‌শ দেখিতে পাওয়া যায়। এক কলিকাতাতেই ৪৫৬৭খানি রিক্‌শ ও ৮৯৫৬ জন রিক্‌শ-টানা কুলী আছে। যদি বলেন, মহাশয়, রিক্‌শ তো একজন লোকেই টানে, তবে ৪৫৬৭খানি রিক্‌শর জন্য ৮৯৫৬ জন কুলী হইল কি করিয়া? তবে আমরা উত্তরে বলিব যে, আপনি রিক্‌শ টানাই দেখিয়াছেন, বড় জোর চড়িয়াছেন দুই এক বার, কিন্তু আসল ব্যাপার কিছুই জানেন না। নূতন রিক্‌শ কিনিতে ৪০০।৪৫০ টাকা লাগে; তার পুলিস লাইসেন্স, মিউনিসিপ্যাল লাইসেন্স ইত্যাদিতে বছরে বছরে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। আর রিক্‌শ মেরামতি, রঙ ইত্যাদি ব্যাপারেও বছরে কিছু যায়। ৬।৭ বৎসরে রিক্‌শ একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া যায়। সুতরাং যে সে লোকে রিক্‌শ কিনিতে পারে না, ধনী রিক্‌শওয়ালা রিক্‌শ কিনিয়া কুলীকে ভাড়া দেয়। সকাল হইতে বেলা ২টা।৩টা পর্য্যন্ত একজন কুলী, আর ২টা।৩টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত আর একজন কুলী রিক্‌শ টানে। প্রত্যেক রিক্‌শতেই যে ২ জন করিয়া রিক্‌শ-কুলী আছে তাহা নহে। ২।৪ জন রিক্‌শ-কুলী টাকা জমাইয়া নিজেরাই রিক্‌শ কিনিয়াছে।

দেখি, তাহা
শেষভাগে
ৎসর মোট
নে ১৯১৮
n লক্ষে

কলিকাতায় আলোকসজ্জা হয়। সেই সময় আমরা সর্ব্বপ্রথম রিক্‌শ চড়ি ও রিক্‌শতে করিয়া আলোকসজ্জা দেখিয়া বেড়াই। রিক্‌শ চড়া কিছুদিন ফ্যাশন ছিল। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান —বাবু, ওরফে ধববাবু, মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড পরিদর্শন উপলক্ষে মিউনিসিপ্যাল-রিক্‌শ চড়িয়া যাতায়াত করিতেন। ক্রমে রিক্‌শর মান কমিতে লাগিল। ইংরেজী ১৯২৫।১৯২৬ সালে যখন থার্ড ব্যাট্‌ল অব গ্যাঁড়াতলায় গুণ্ডারা হারিয়া গেল, রিক্‌শ মধ্যমশ্রেণীতে নামিল, আর এখন (অর্থাৎ ইং ১৯২৮।১৯২৯ সালে) ইহা নিম্নশ্রেণীতে নামিয়াছে। শিয়ালদহের মাছের গাড়ি হইতে জেলেরা পাইকারি দরে মাছ খরিদ করিয়া রিক্‌শতে মাছের ঝাঁকা বসাইয়া বরাহনগর কাশীপুর প্রভৃতি স্থানে ত্য যাতায়াত করেন। ধোপায় কাপড়ের গাঁট লইয়া তাহার উপর বসিয়া যায়। মা সরস্বতীকে রিক্‌শ চড়িয়া ১০।১২ মাইল দূর স্থানেও যাইতে দেখিয়াছি। সময়ে সময়ে রিক্‌শ কেবলমাত্র মাল-টানা রিক্‌শতে পরিণত হইয়াছে, ইহাও আমরা দেখিয়াছি।

রিক্‌শ বড় নিরীহ যান। ইহাতে চাপিলে অ্যাক্‌সিডেণ্ট বা দুর্ঘটনা হইবার সম্ভাবনা খুব কম। এয়ারোপ্লেনের তো কথাই নাই, এই সেদিন মাঝেরহাটের এয়ার ডিস্‌প্লেতে একখানি এয়ারোপ্লেন উল্টাইয়া ৩॥ জন আরোহীর 'চড়াই উল্টাইয়া দিল'। আজকাল রেলে যাওয়া আদৌ নিরাপদ নহে। একমাত্র পূর্ব্ব-ভারতীয় রেলপথে এক বৎসর এক মাসের মধ্যে বার বার পাঁচ বাব রেল উল্টাইয়া ৫৫৫ জন হত বা আহত হইল। মোটরের তো কথাই নাই, শতকরা ১॥টি করিয়া অ্যাকসিডেণ্ট হইবেই হইবে। কলিকাতার গাড়োয়ানেরা যেরূপ নির্ভয়ে ঘর্ঘর ঝরঝর রবে দিক্‌মণ্ডল নিনাদিত করিতে করিতে গাড়ি চালায়, তাহাতে এই অধম লেখকের একবার প্রাণসংশয় হইয়াছিল, তিনি সেই

অবধি ঐ গাড়ি চড়া সভয়ে ছাড়িয়া দিয়াছেন। লেখক কিন্তু হিন্দুসভায় বছরে সওয়া পাঁচ আনা চাঁদা দেন বলিয়া—প্রেসের আঞ্জুমানিয়া ইস্‌লামিয়ার সম্পাদক বাবর মিঞা উহা কম্যুনালিজ্‌ম বলিয়া অভিহিত করেন।

আর জলযানের তো কথাই নাই। সামান্য নৌকায় চড়িয়া গঙ্গা পার হইবার সময় সম্রাট শাজাহানের পুত্র শাহ্‌সুজা—'এক ইঞ্চি তক্তার নীচে অগাধ জল' বলিয়া নদী পার হন নাই, ফলে আকমহলের যুদ্ধে মুর্শিদকুলীখাঁর নিকটে পরাজিত হন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ বিষয়ে বৈদিক যুগের গাওয়া গাড়ি অর্থাৎ বাংলার গরুর গাড়ি বড় নিরাপদ যান। কিন্তু তাহা নহে। গরুর গাড়ি চাপা পড়িয়া মানুষ আহত হইলে তাহাকে ১৮৬১ খ্রীঃ অঃ-এর ৫ আইনের ৩৪ ধারামতে ৫ টাকা জরিমানা দিতে হইবে।

কিন্তু এ যাবৎ বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র পড়িয়া রিক্‌শ চাপা পড়িয়া মানুষ মরার কথা জানিতে পারি নাই।

এইবার আমরা রিক্‌শর ইতিহাস লইয়া কিছু বলিব। রিক্‌শ চীনাদের আবিষ্কৃত যান নহে। চীনারা রিক্‌শ আবিষ্কার করিয়াছে এক হাজার বৎসর, এ কথা সত্য। কিন্তু চীনারা ইহা পাইল কোথা হইতে? আর ইহার নাম রিক্‌শই বা হইল কেন? আসলে ইহা ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট নহুষের আবিষ্কৃত; আর সে কতদিন আগে তা আমরা সঠিক বলিতে পারিব না। তবে 'পুরাণ-প্রবেশ'কার গিরীন্দ্রশেখরবাবুকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি নহুষের সময় খ্রীঃ পূঃ ১৫,০০০ বৎসর হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। Statistical Laboratory-তে এই সম্বন্ধে গবেষণা হইয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, নহুষের সময় ১৫,০০০ $(১+{}^{\cdot}০০০০২\sqrt{-১}\times S_0 - S_5)$ অর্থাৎ

১৮৭,৬৫৪,৩২১,০০০,০০০,০০০ দণ্ড পূর্ব্বে। নহুষ যখন স্বর্গের ইন্দ্রত্ব-পদ পাইলেন, তখন তিনি মুনিঋষিদের দ্বারা বাহিত যানে চাপিয়া স্বর্গের এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাইতেন। ইহাতে আজানুলম্বিতদাড়ি (কাহারাও আবার আপালম্বিতদাড়ি) ঋষিদের বড়ই কষ্ট হইত। এই ঋষি-বাহিত যানই কালক্রমে রিক্‌শতে পরিণত হইয়াছে (ইহাই ভাষাতত্ত্ববিৎ ডাঃ স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত; আর এ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কাশ্যপের মুখেও তিনি এইরূপই শুনিয়াছেন।) স্বর্গের রিক্‌শ।কিন্তু একজন ঋষিতে টানিতেন না।

মহাভারত পুরাণাদি পাঠে আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, সাধারণত চারজন ঋষিতে রিক্‌শ টানিতেন, তবে সময়ে সময়ে ইহার অধিক ঋষিতেও টানিতেন। রিক্‌শ যে একজনের বেশি লোকে টানে, ইহা আমরা স্বচক্ষে, ভারতের ভাগ্যবিধাতারা যেখানে গ্রীষ্মকালে বিচরণ করেন, সেই সিমলা-শৈলে দেখিয়াছি। সেখানে সাধারণত দুইজনে রিক্‌শ টানে। আবার সময়ে সময়ে পাহাড় চড়াই-উৎরাইতে চারজনে রিক্‌শ টানে বা রিক্‌শ ঠেলে। চারজনের বেশি লোককে রিক্‌শ টানিতে বা রিক্‌শ ঠেলিতে আমরা দেখি নাই। যদি সমুদ্রতল হইতে ৬,৫০০ ফুট উচ্চ সিমলাশহরে চারজনে রিক্‌শ টানে, তাহা হইলে স্বর্গে যে সময়ে সময়ে ইহার বেশি লোকে রিক্‌শ ঠেলিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

মোট কথা, রিক্‌শ আমাদের ভারতের নিজস্ব জিনিস। ভারতেরই একজন রাজা, যিনি মধ্যে স্বর্গের ইন্দ্রত্ব-পদ পাইয়াছিলেন, তাঁহার স্বর্গযাত্রা ইন্‌স্পেক্‌শন করিবার জন্যই ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

"যমদত্ত"

তুবড়ি ও ঝরণা

তুবড়ি বলিছে, আমি আলোকের ঝর্ণা,
অরূপের আমি রূপরঙ্গ,
রঙ্গিন মোর গতি রামধনু-বর্ণা,
উৎসব যাচে মোর সঙ্গ।

২

আলোকের হাসি আমি, আলোকের নৃত্য,
করি শত তারকার সৃষ্টি,
করি রূপ-রসিকের বিমোহন চিত্ত,
চলি তার চঞ্চলি দৃষ্টি।

৩

উজ্জ্বল জীবনের ধারা আমি তুবড়ি,
নাই তমঃ মোর জ্যোতি-বর্ম্মে,
উর্ব্বশী রূপসীর প্রসাধন-চুবড়ি—
তুলনা আমার নাই মর্ত্ত্যে।

৪

রূপ কোথা ঝর্ণার, কোথা বৈচিত্র্য,
শুধু জলো জলসার ছন্দ,

শক্তি সে কোথা পাবে ? বল দেখি মিত্র,
পলে পলে উপলে যে বন্ধ !

৫

কবি বলে, তুমি শুধু আলোকের তুড়ি ত—
দেখিতে দেখিতে লীলা অস্ত ;
তার দান দিকে দিকে হয় বিচ্ছুরিত,
তার ভাণ্ডার অফুরন্ত ।

৬

সহজেই ফেটে তুমি মর মেটে গর্ব্বে,
বারুদের ফিন্‌কুটি বন্দী ;
মহাকাল জেনো তারে, মাথা পেতে ধরবে,—
ধারা চির-সুধানিস্যন্দী ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

There are few subjects, outside sex, religion, and politics, on which such nauseating nonsense is talked as folk-music. Let us beware of assuming that the traditional airs bawled out by the village idiot in his cups are going to change the whole theory of melody.

Stephen Williams

তরুণায়ন

আমার সব-চাইতে ইণ্টারেস্টিং কেস ঘটেছিল, ডাক্তার অর্দ্ধেন্দু বোস বললেন, এই কলকাতাতেই।

বড় ছেলে অনুপমের দশম জন্মতিথি। রাত দশটার পরে নিমন্ত্রিতেরা সবাই চ'লে গেলেন, বাকি রইলেন যাঁরা, তাঁরা আজ যাবেন না। বাড়ির সামনেকার লনে ঈজিচেয়ার বার ক'রে আড্ডা বসল; অর্দ্ধেন্দু, তাঁর স্ত্রী সুনীতি, সুনীতির বোন সুরুচি, সুরুচির স্বামী প্রভাত—পাটনার ব্যারিস্টার, আর বোনেদের ভাই তপেন—মেডিক্যালে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র।

সুরুচি বললেন, অর্দ্ধেন্দুবাবু, একটা গল্প বলুন। শুনেছি, আপনি খুব ভাল গল্প বলেন।

অর্দ্ধেন্দু বললেন, বলি না। তোমাকে যে বলেছে, সে লোক ভাল নয়।

সুরুচি বললেন, দিদি বলেছে।

অর্দ্ধেন্দু খাড়া হয়ে উঠে বসলেন। চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, বিশ্বাস ক'র না।

সুনীতি বললেন, তার মানে? তুমি আমাকে মিথ্যেবাদী বলছ?

অর্দ্ধেন্দু। না, অত্যুক্তিকারিণী বলছি।

সুরুচি। ছি ছি।

অর্দ্ধেন্দু। ছি-ছির কিছুই নয়। পতিব্রতা নারীমাত্রেই স্বামীর গুণপনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অত্যুক্তি ক'রে থাকেন। সেটা সদ্গুণ। কিন্তু তার সবটা বিশ্বাস করলে ঠকতে হয়।

প্রভাত। আপনি তা হ'লে স্বীকার করছেন যে, গল্প ওঁকে আপনি বলেন। শুধু সেগুলো উনি যতটা ভাল বলছেন, আপনার মতে ততটা ভাল হয় না। এই তো?

অর্দ্ধেন্দু। রাইট। গল্প বলি—বলি বললে ঠিক বলা হ'ল না, বলতাম। তবে সেগুলো ভাল হয় না।

সুরুচি। তা হোক, ভালমন্দ আমরা বুঝব। আপনি বলুন।

অর্দ্ধেন্দু। ঐ যে বললাম, গল্প আর আজকাল বলি না।

সুরুচি। আচ্ছা, সেই পুরোনো গল্পই বলুন।

অর্দ্ধেন্দু। বলব না। কারণ, প্রথমত, সুনীতিকে যে সব গল্প তখনকার দিনে শোনাতুম, সে তোমাকে শোনাতে গেলে প্রভাতের চটবার কথা। দ্বিতীয়ত, যে বয়সে সে গল্প বলা যায় ও শোনা চলে, সে বয়স আমার আর নেই, তোমারও সে বয়সটা বোধ করি পেরিয়ে—

প্রভাত। ফোর নাইন্টিনাইন।

অর্দ্ধেন্দু। যাওয়া বারণ। তৃতীয়ত, সে সব এখন ভুলেও গেছি। রুগী আর মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে, কাব্যকলা ওগায়রহ যত রকমের রসের ছিটেফোঁটা প্রাণে এককালে ছিল, তার সবটুকু নিঃশেষে উবে গেছে। এখন শয়নে স্বপনে একমাত্র চিন্তা—কেস। তার বাইরে আর কিছু ভাবতেই সময় পাই না তো গল্প বলা। চতুর্থত, সংসারে যে সব বস্তু নিয়ে গল্প বলা যেতে পারে, ভূত অ্যাড্‌ভেঞ্চার বা প্রেম, এর কোনটারই স্টক আমার নেই। ভূত দেখি নি, অ্যাড্‌ভেঞ্চারের মধ্যে হয়েছিল বিলেত যাবার সময় সী-সিকনেস, আর প্রেমের কথা বইয়েই পড়েছি।

সুরুচি। দিদি, সত্যি?

অর্দ্ধেন্দু। দিদি? কিন্তু সে নিয়ে গল্প হয় না। ওটা রিজার্ভ্‌ড্‌ সাব্‌জেক্ট, অপরের অশ্রাব্য ও অপরের সাক্ষাতে অকথ্য অনুচ্চার্য্য।

সুরুচি। সে শুনতেও চাই না। বেশ তো, কেসের গল্পই বলুন না হয়।

অর্দ্ধেন্দু। কেসের গল্প বলতে নেই। ডাক্তারের ডায়েরি গোপনীয় বস্তু। ব্যারিস্টারের নোট-বইয়ের মত প্রকাশ্য আদালতে ও খবরের কাগজে সালঙ্কারে প্রচারণীয় নয়।

সুরুচি। বাজে কথা। বলা যায় না এমন কিছু নেই—এ হতেই পারে না।

অর্দ্ধেন্দু। ডাক্তারের গল্পের মজাই তো ওই। যেটা বলা যায়, সেটা শোনবার মত হয় না। আর যেটা শোনবার মত হয়, সেটা বললে প্রফেশনাল সিক্রেসি ভাঙ্গা হয়।

সুরুচি। ধুত্তোর সিক্রেসি। এত বছর পরে এলাম আমরা কত দূর থেকে, আর উনি খালি সিক্রেসি করছেন!

প্রভাত। ব'লে যান না, কেসে পড়েন আমি সামলাব'। আর আইনে বলে, নিকট-আত্মীয়দের বললে সিক্রেসি-ভাঙার অপরাধ হয় না

অর্দ্ধেন্দু। বিশেষত যখন সেই আত্মীয়দের মধ্যে একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি থাকেন এবং যখন সেই সিক্রেসি-ভাঙার দিকে বড় উৎসাহ থাকে তাঁরই স্ত্রীর এবং যখন সেই স্ত্রী আবার হন নিজের স্ত্রীর আদুরে বোন এবং যখন মনুর আইন অনুসারে নিজের স্ত্রী নিজেরই অঙ্গের সামিল—দেহে আত্মায় ও ডায়েরির অন্তরঙ্গতায়—

সুনীতি চোখ তুলে চাইলেন, কবে আমি তোমার ডায়েরি পড়েছি, শুনি?

অর্দ্ধেন্দু। পড়েছ বলি নি, জান বলেছি। লেখবার আগে শুনলেও জানা হয়।

প্রভাত। May I remind my learned friend that he is digressing from our original issue?

অর্দ্ধেন্দু। এই সেরেছে। একটু ডাইগ্রেস্‌ও করতে পাব না, তাও আবার নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কথা কইতে?

সুরুচি। না, অতিথিকে অনাদর ক'রে নিজের স্ত্রীকে সম্ভাষণ করতে ব্যস্ত থাকাটা রুচিবহির্ভূত।

সুনীতি। এবং অতিথির অনুরোধ রক্ষা না করাটা গার্হস্থ্যাশ্রমের নীতিবহির্ভূত। গল্প বলাই তোমার উচিত।

অর্দ্ধেন্দু। বাপ, কে বলে প্রপার-নেম্‌রা নন্‌কনোটেটিভ! কিন্তু তা হ'লে তো দেখা যাচ্ছে, গল্প বলতেই হয়।

সুরুচি। এবং কেসের গল্প, খুব ইণ্টারেষ্টিং দেখে।

তপেন। এবং খুব ইন্‌স্ট্রাক্‌টিভ দেখে, যেন শুনে আমার লাভ হয়।

প্রভাত। এবং আইন বাঁচাবার খাতিরে গল্পের রসভঙ্গ না ক'রে।

অর্দ্ধেন্দু। মাভৈঃ, আমার গল্পে রস থাকবেই না, সে ভঙ্গ আর হবে কি ক'রে!

সুরুচি তপেন প্রভাত। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি সুরু করুন তো এবার।

শোন তবে।—অর্দ্ধেন্দু কেসে গলা সাফ করলেন, চুরুটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে ঈজিচেয়ারে চিৎ হয়ে এলিয়ে প'ড়ে মিনিটখানেক চোখ বুজে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলতে সুরু করলেন।—

আমার সব চাইতে ইণ্টারেষ্টিং কেস ঘটেছিল এই কলকাতাতেই। ইউরোপ থেকে ফিরেছি বছর দুই হবে, প্র্যাক্‌টিস তখনও বেশি নয়, মেডিক্যালের চাকরিটি ভরসা। বকুলবাগানে ভাড়াটে বাড়িতে

তখন থাকি, কলেজে ক্লাস নিই, কাটাছেঁড়া করি আর বাকি দিনটার বেশির ভাগই শুয়ে শুয়ে চুরুট টেনে কাটাই। সংসারের দায়িত্ব তখন কম ছিল। পুত্রকন্যারা তখনও আসতে সুরু করেন নি, শুধু অনু আসবে ব'লে নোটিস দিয়েছে। সুনীতি সারাদিন ব'সে ব'সে লাল উলের জামা বুনতে ব্যস্ত। আর আমি ব্যস্ত সাংসারিক চিন্তায়।

প্রভাত। May I be permitted to point out যে, আপনি এইমাত্র বলেছেন, দায়িত্ব কম ছিল। তবে আবার চিন্তা এল কিসের?

অর্দ্ধেন্দু। জোর ক'রে গল্প বলাবে তার ওপর আবার জেরা? আমাকে পুলিসকোর্টের সাক্ষী পেয়েছ নাকি? গল্প শুনবে তো চুপ ক'রে ব'সে যা বলি শোন এবং মেনে নিতে থাক। মনে রেখো, বিশ্বাসে মিলয়ে গল্প, তর্কে বহুদূর। আর কথায় কথায় জেরা করবে তো আমিও এই চুপ করলাম। স্কেপ্‌টিকদের আমি গল্প বলি না।

সুরুচি। না না, আপনি বলুন। তুমি চুপ কর তো। যত ব্যারিস্টারি বিদ্যে এইখেনে! আর সেবার যখন সেই ইয়ে ঘোল খাইয়ে দিয়েছিল—

অর্দ্ধেন্দু। সিভিল কলহেও নালম্। প্রভাতের কথার জবাব আমি দিচ্ছি। দায়িত্ব তখনই ছিল না বটে, কিন্তু দায়িত্ব আসন্ন ছিল। অনু নোটিস দিয়েছে, তখনও এসে পৌছতে ছ মাস দেরি। অ্যারাইভ করবার আগে তিনি অনুপম হবেন কি অনুপমা হবেন, জানা ছিল না। সেই এক চিন্তা—হাঁ ক'রে এলেই হয় কন্যাদায়। তারপর ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, দুধ-পেরাম্বুলেটারের দাম আছে। ওদিকে চুরুটের দাম চ'ড়ে গেছে, শুয়ে শুয়ে চুরুট টানতে টানতে যে চিন্তা করব, সেই বা আর কদিন করা চলবে কে জানে! মাস অন্তে কুড়িয়ে বাড়িয়ে জোর শ পাঁচেক টাকা তো আয়। এও চিন্তা। কাজেই প্রভাত, দেখতে

পাচ্ছ, দায়িত্ব না থাকলেও চিন্তা থাকবার পক্ষে কোন বিঘ্ন ঘটে নি। আর একটা কথা তোমরা—ইয়ংম্যানরা—প্রায়ই ভুল কর, সেটাও এই সঙ্গেই ব'লে দিই। তোমরা মনে কর, দায়িত্ব না থাকলে লোকের চিন্তা থাকতে পারে না, কিন্তু কথাটা ভুল। বরং দায়িত্ব আসবার আগেই লোকের চিন্তা থাকে, মানে চিন্তা করবার মত ফুরসৎ থাকে। চিন্তা করাটা অবসর সময়ের ব্যাপার, এক রকমের শৌকসারি। দায়িত্ব যখন সত্যি এসে ঘাড়ে পড়ে, তখন আর লোক চিন্তা করবার সময় পায় না, উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কাজেই দায়িত্ব ছিল না, কিন্তু চিন্তা ছিল বললে ভুল বলা তো হয়ই না, বরং দায়িত্ব ছিল না ব'লেই চিন্তা ছিল বললে আরও সায়ান্টিফিকালি সত্যি কথা বলা হয়।

এই সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ জ্ঞানগর্ভ কথা তোমাদের শোনাতে পারতুম, তোমাদের জীবনে কাজে লাগত। কিন্তু সুরুচি এরই মধ্যে ভ্রুকুটি করছে এবং তপেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অতএব গল্প বলাই চলুক।

সেদিনটা রবিবার এবং আমার তখন প্রায় রোজই রবিবার। স্টেট্‌স্‌ম্যানের বিজ্ঞাপনটা পরের উইক থেকে তুলে দোব ভাবছি। রাত তখন নটা হবে, হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরতে ওদিক থেকে আওয়াজ এল, হ্যালো, ডক্টর বোস আছেন?

বললাম, কে আপনি?

আমি xyz-এর রাজা বাহাদুরের বাড়ি থেকে বলছি।

রাজা বাহাদুরের নামটা শোনা ছিল না। বললাম, কি দরকার?

একটা কেসের জন্যে। আপনি যদি কাল সকালে ফ্রী থাকেন—

ফ্রী আমি সারাক্ষণই। কিন্তু সে কথা স্বীকার ক'রে নিজেকে খেলো

করতে নেই। অতএব স্টাইলসে বললাম, সকালে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে।

ওদিক থেকে জবাব এল, তাই হবে। আমরা ওর ভেতরেই আপনার ওখানে যাব।

সেই রাত্তিরেই স্থির হয়ে গেল, কম ক'রেও অন্তত এক ছড়া চন্দ্রহার আর একটা হীরে বসানো নথের অর্ডার কালই দিয়ে দিতে হবে, নইলে গৃহের শান্তি আর থাকবে না। পরদিন সকালবেলা চান ক'রে সবে বেরিয়েছি, বেয়ারা এসে কার্ড দিয়ে বললে, বাবু ব্যয়ঠে হেঁয়। কার্ডে দেখলাম, নাম লেখা—Mr P. C. Gosh, Private Secretary to the Raja Bahadur of xyz.

ধীরে-সুস্থে ড্রেস ক'রে নিয়ে ড্রইংরুমে এসে গুডমর্নিঙের অর্দ্ধেকটা ব'লে থেমে গিয়ে দেখলাম, পি. সি. আমাদের প্রফুল্ল। আমাদের সঙ্গেই বি. এস. সি. পাস ক'রে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছিল, থার্ড ইয়ারের মাঝামাঝি হঠাৎ দেশে চ'লে যায়। তারপর আর দেখা হয় নি; যদিও কলেজে সে আমার ভয়ানক বন্ধু ছিল। এবং আরও একটি দরকারী কথা হচ্ছে, তার নাম আদপেই প্রফুল্ল নয়। বুঝতেই পারছ, প্রফেশনাল সিক্রেসির খাতিরে আমি সমস্ত নামটাম বদলে বলব। প্রফুল্ল আমাকে দেখে প্রফুল্লতর হয়ে উঠল। বোঝা গেল, আমার সঙ্গে দেখা হবে বা ডক্টর এ. এস. বোস যে তাদেরই দলের অর্দ্ধেন্দু এটা সে কল্পনা করে নি। তারপর ব'সে দুজনে খুব খানিক আড্ডা দেওয়া গেল, চা সার্ভ করবার অজুহাতে সুনীতিও যোগ দিলে। তার কেসও শুনলাম। রাজা বাহাদুর কোনখানের রাজা নন, নর্থ বেঙ্গলের এক জমিদার মাত্র। রাজা খেতাবটা লব্ধ। বাহাদুর বৃদ্ধবয়সে কেঁচে বিয়ে করেছেন, অতএব যৌবন ফিরে পাবার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। মেডিক্যাল কলেজে

খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, আমি ইউরোপ থেকে ভরোনফ্‌স অপারেশনের স্পেশালিস্ট হয়ে এসেছি। অথ প্রফুল্লর আগমন। সংবাদের শেষে প্রফুল্ল একটু প্রাইভেট হিণ্টও দিলে, বুড়োর·ঢের টাকা এবং ছেলেপুলে নেই, অতএব বুড়ো জোয়ান হবার জন্যে বেজায় ক্ষেপে গেছে। অপারেশনটা যদি ঠিক ক'রে দিতে পারি হাতে বেশ মোটা টাকা মিলবে। এই থেকে বুড়োর সার্কলেও রেকমেণ্ডেড হয়ে যেতে পারি, পারল্লে পয়সা আছে।

নগদ টাকা আয়ের ফাঁক পেলে ছাড়ব এমন সাত্ত্বিক অবস্থা তখন আমার নয়। প্রফুল্লর সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম। পথে যেতে যেতে প্রফুল্লর ইতিহাস শুনলাম। সেই যে সে বাড়ি চ'লে গিয়েছিল তার বাবার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে, তারপর তিনি মারা গেলেন, ওরং আর পড়া-শোনা করবার মত সংস্থান রইল না। কিছু দিন এদিক সেদিক ঘুরে শেষে এই চাকরিটি পেয়ে গেছে। এখন ভালই আছে। রাজা বাহাদুরের বাড়ি পৌছতে বেশি দেরি লাগলো না। প্রফুল্লই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল। প্রথমেই একটি জিনিস দেখে আশ্বস্ত হলাম, রাজা বাহাদুর নামে রাজা হ'লেও আসলে বেশ ভদ্রলোক। মোটাসোটা নধর চেহারা, টুকটুকে রঙ, এক সময়ে সুপুরুষ ছিলেন তার পরিচয় এখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায় নি। ঈজিচেয়ারে বিরাট দেহভার রেখে চোখ বুজে প'ড়ে ছিলেন, যেতেই শশব্যস্তে উঠে অভ্যর্থনা করলেন। একটু দূরে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি ছোকরা, অবিশ্যি তখনকার হিসেবে, ব'সে ছিল। সেও এগিয়ে এসে কাছে বসল। কথাবার্ত্তা বেশির ভাগই হ'ল আমাতে আর রাজা বাহাদুরে, প্রফুল্ল দরকার মত যোগ দিচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে সে ব্যক্তিটি ফোড়ন দিচ্ছিল। লোকটাকে প্রথমে তত লক্ষ্য করি নি, কিন্তু দুচারবার

অযাচিত ও অহেতুক ফোড়ন দেবার পর তাকে চেয়ে দেখতেই হ'ল। ছিপছিপে চেহারা, এক সময়ে সুন্দর ছিল, কিন্তু অকালে কাঠ হয়ে গিয়ে সবশুদ্ধ এমন একটা আকৃতি দাঁড়িয়েছে যা দেখলেই অশ্রদ্ধা হয়। সাজ-সজ্জায় বাহারের অভাব নেই, কিন্তু তার চেষ্টা এত খারাপ যে চারপাশের স্মার্ট সারাউণ্ডিংয়ের সঙ্গে মোটেই মানাচ্ছে না। আর সব চাইতে বিশ্রী হচ্ছে তার কথাবার্ত্তা, যেমন অমার্জ্জিত তেমনই ইম্‌পুডেণ্ট।

রাজা বাহাদুরকে বললাম, আপনার শরীরটা একবার আমি এগ্‌জামিন করব।

তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, এখানে যদি সুবিধে না হয় বরং ও ঘরটাতে চলুন।

বললাম, ব্যস্ত হবেন না, এখানেই হতে পারবে। তবে তার সঙ্গে সঙ্গে আমি কিছু কিছু কোশ্চেনও আপনাকে করব। একা হ'লেই ভাল হ'ত।

কোশ্চেন করব তো ছাই, আসলে আমার মতলব হচ্ছে, সে লোকটাকে সরিয়ে দেওয়া। সে কিন্তু তার ধার দিয়েও গেল না, বেশ নিশ্চিন্তি হয়ে ব'সে রইল। প্রফুল্ল বেরিয়ে গেল। আমি বললাম, আপনিও একটু কাইণ্ড্‌লি—

সে বেশ অমায়িকভাবে বললে, আমি থাকলে কিছু ক্ষতি হবে না।

আমার গা জ্ব'লে গেল। রাজা বাহাদুর সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, ও থাকলে আমার কোন অসুবিধে হবে না।

আমার রাগ চ'ড়ে গেল। বললাম, আমার হবে। এসব ব্যাপারে আমাদের কতকগুলো প্রফেশনাল কন্‌ভেন্‌শন থাকে।

রাজা বাহাদুর তার দিকে চেয়ে বললেন, তা হ'লে তুমি না হয়—

বলতে তিনি যেন ভারী সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন মনে হ'ল। ছোকরা

উঠে গটগট ক'রে বেরিয়ে গেল। এবং তারপরই শুনলাম, পাশের ঘরে সে প্রফুল্লকে বলছে, এসব হাম্বাগ জুটিয়ে আনেন কোথা থেকে? ওঃ, আমরা যেন আর কখনও বড় ডাক্তার দেখি নি।

রাজা বাহাদুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দেখলাম, ভদ্রলোক বিব্রত হচ্ছেন। তাই কথাটা যেন আমি শুনতে পাই নি—এমনই ভাব দেখিয়ে তাঁকে এগ্‌জামিন করতে লাগলাম। শেষ হ'লে দুচারটে প্রশ্ন ক'রে বললাম, আপাতত আর কিছু আমার দরকার নেই। রাজা বাহাদুর ডেকে বললেন, প্রফুল্ল, এঁর হাতটা ধুইয়ে দাও। চাকর জল সাবান আর গামলা নিয়ে এল। ডাক্তারের প্রফেশনাল কন্‌ভেন্‌শন রুগীকে ফোন ক'রে কথা বললেও হাত ধুতে হয়। হাত ধুয়ে বসলে রাজা বাহাদুর বললেন, বলুন এবারে আপনার মতামত।

বললাম, দেখুন, আমার অনেস্ট ওপিনিয়ন যদি চান, আপনার বিয়ে করা উচিত হয় নি।

রাজা বাহাদুরের মুখটা কেমন একটু মলিন হয়ে গেল। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, দেখুন, আপনি সব জানেন না, নেহাৎ দায়ে প'ড়েই আমাকে এই বয়সে আবার বিয়ে করতে হয়েছে। এ কথা সব বুড়োই বলে। আমি চুপ ক'রে রইলাম। রাজা বাহাদুর আবার একটু চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, শুনতে চান তো আপনাকে বলতে আমার বাধা নেই। আমার প্রথম স্ত্রী ছিলেন প্যারালিটিক। ছেলেপুলে তাঁর হবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু তিনি বেঁচে থাকতে আবার বিয়ে করতেও আমি পারি নি। কাজেই এই বয়সে আমাকে বিয়ে করতে হয়েছে।

বুঝলাম, লোকটা নেহাৎ অপদার্থ নয়। একটু লজ্জাও পেলাম। বললাম, মাপ করবেন রাজা বাহাদুর, আমার কথাটা হয়তো একটু রূঢ়

হয়ে পড়েছে। কিন্তু কথাটা সত্যি। আপনার শরীর বাইরে সুস্থ হ'লেও তার কাঠামো শক্ত নয়।

রাজা বাহাদুর বললেন, অপারেশন তা হ'লে করা যাবে না?

বললাম, অপারেশনের কথা ব'লেই নয়। অপারেশন মেজর কেস হ'লেও খুব রিস্কি নয়, তার ধাক্কা সামলাতে হয়তো পারবেন, তাতে ফলও হবার কথা। কিন্তু আপনার জেনারেল হেল্‌থ যা, তাকে শুধু অপারেশন ক'রে সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়। সেইজন্যই বলেছিলাম, আপনার এই বয়সে আবার বিয়ে করা উচিত হয় নি। অবশ্য অন্য কারণ যা আছে আপনি বললেন, সে আলাদা কথা।

রাজা বাহাদুর কিছু বলবার আগেই দোরের কাছ থেকে সেই ছেলেটা ব'লে উঠল, অচ্ছা, আপনার কাজ তো আপনি ক'রে যান, বিয়ের ঔচিত্য অনুচিত্য সম্বন্ধে আপনার ওপিনিয়ন যখন চাওয়া হবে—

আমি বললাম, মাপ করবেন রাজা বাহাদুর, এর পরে আর আমি এখানে থাকতে পারি না।—ব'লে ঘর থেকে সোজা বেরিয়ে এলাম। প্রফুল্লও সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল। বাইরে গাড়ি তখনও দাঁড়িয়ে। আমাদের সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখেই সোফার গাড়ি স্টার্ট দিলে, কিন্তু আমি গাড়িতে না উঠে পাশ কাটিয়ে চ'লে আসতেই প্রফুল্ল আমার হাত ধ'রে বললে, ছি অর্দ্ধেন্দু, সে হয় না। গাড়ি ক'রে না গেলে রাজা বাহাদুর ভয়ানক দুঃখ পাবেন।

আমি বললাম, let him। তোমার তিনি মনিব হ'তে পারেন, কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর এমন কোনও অব্‌লিগেশনের সম্পর্ক নেই, যার জন্যে এর পরেও আমার তাঁকে খুশি করবার জন্যে তাঁর গাড়িতে চড়তে হবে। . .

প্রফুল্ল বললে, সে কথা নয়। ও যাই বলুক, তুমিও বেশ জান,

কথাটা রাজা বাহাদুরের নয়। তিনি নিজে অতি ভদ্রলোক, সে তুমি নিজেই দেখেছ। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হবেন ব'লেই বলছি, তাঁকে খুশি করবার কথা আমি বলি নি। তা ছাড়া এমনই ক'রে তুমি হেঁটে বেরিয়ে গেলে সোফার দরোয়ান পর্য্যন্ত একটা স্ক্যাণ্ডালের গন্ধ পাবে। আমার নিজের অনুরোধ রাখ, চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ভেবে দেখলাম, তার কথাটা মিথ্যে নয়। অগত্যা গাড়িতে উঠলাম। গাড়িতে দুজনেই চুপ ক'রে ব'সে রইলাম, সারাটা পথ আমাদের একটা কথাও হ'ল না। বাড়ির সামনে এসে নামতে প্রফুল্ল আমার পেছন পেছন নেমে পড়ল। বললে, অর্দ্ধেন্দু, কিছু মনে ক'র না, ভাই, আমি জানতুম না এমন হবে। তোমাকে আমিই টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম, তার জন্যে তোমার কাছে মাফ চাইছি।

আমারও তখন রাগের ঝোঁকটা ক'মে এসেছে, তার কথায় লজ্জা পেলাম। বললাম, চল, একটু ব'সে যাবে। ঘরে এসে বললাম, ছেলেটা কে হে?

প্রফুল্ল বললে, আর ব'ল না ভাই। উনি হচ্ছেন রাজা বাহাদুরের এ পক্ষের শালা, রাণীজীর দাদা। গরিবের ছেলে হঠাৎ বড়লোকের বাড়িতে এসে জেঁকে বসেছে। ঝাঁজে আমরা অস্থির।

দেখলাম, প্রফুল্ল তার ওপর মোটেই প্রসন্ন নয়। বললে, বাড়িতে এক ঝাঁক পোষ্য, আর রাজা বাহাদুরের নিজের স্বভাবটি অতি চমৎকার। চাকর ব'লে কখনও মনে করেন না, নিজের খুড়ো-জ্যাঠার কাছে এর চাইতে বেশি স্নেহ পেতাম না। তাই স'য়ে যায়।

শুনলাম, শালাটি সব দিকেতেই চৌকস। বিদ্যে ম্যাট্রিকের এধারে পৌঁছয় নি, যত রাজ্যের বখামি ইয়ার্কি ক'রেই কাটত। এখন হঠাৎ বোনের কল্যাণে জবরদস্ত হয়ে বসেছে, তার তাড়ায় আর বেয়াড়ামিতে

বাড়িসুদ্ধ লোক অস্থির। কিছুদিন আগে এরই একটা কথায় অপমানিত হয়ে রাজা বাহাদুরের বহুকালের বিশ্বাসী ম্যানেজার পর্য্যন্ত চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চ'লে গেছেন।

বললাম, রাজা বাহাদুর বরদাস্ত করেন কেন ?

প্রফুল্ল বললে, বোঝ না, তাঁর হয়েছে সাপের ছুঁচো ধরা, গিলতেও পারেন না, ওগরাতেও পারেন না।

বৃদ্ধস্য তরুণীর সোদর ভাই, তাকে কিছু বললে ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি রাণীর কণ্ঠে উঠতে কতক্ষণ।

বললাম, তা হ'লে তো ভদ্রলোকের চটপট ম'রে যাওয়াই উচিত। আবার অপারেশন ক'রে কেঁচে তাজা হবার সখ কেন ? দু ভাই-বোনে মিলে তাঁর দশা নিশ্চয়ই যা ক'রে তুলেছে, বাঁদরের থাইরয়েড কেন কচ্ছপের হার্ট জুড়ে দিলেও ও জান টিকবার নয়।

প্রফুল্ল বললে, এবার ভুল করলে। রাণীজির ভাইয়ের ওপর টান খুবই সত্যি, কিন্তু এমনিতে তাঁর মত মিষ্টি স্বভাব দেখা যায় না। ভাইয়ের দরুন তিনি যে কি লজ্জায় থাকেন, সে না দেখলে বুঝবে না।

বললাম, কি হে, কাব্য করছ যে !

প্রফুল্ল বললে, কাব্য নয়। ম্যানেজারবাবু যেদিন চ'লে যান, রাণীজি নিজে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে বললেন, তার হয়ে আমি আপনার পায়ে ধ'রে মাপ চাইছি, আপনি যাবেন না। আমি যদি আপনার নিজের মেয়ে হয়ে জন্মাতুম, আপনি কক্ষনো এমন ক'রে পরের অপরাধে আমাকে শাস্তি দিতে পারতেন না। ম্যানেজারবাবু যাবার সময় কাঁদতে লাগলেন, বললেন, এর পরে আমার যাওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু আমি তিন সত্যি ক'রে ফেলেছি। তাঁকে কাঁদিয়ে গেলাম, এ দুঃখ আমি মরলেও ভুলতে পারব না। তোমরা আমার হয়ে তাঁকে বলো, আমি মনে কোন

ক্ষোভ নিয়ে যাচ্ছি না, বুড়ো হয়েছি, এখন আমার কাশীবাসের সময়, তাই যাচ্ছি। সত্যি, তার দিন দুই পরেই তিনি কাশী চ'লে গেলেন।

প্রফুল্লর চোখ ছলছল ক'রে উঠল। বুঝলাম এই ম্যানেজারবাবুকে সে সত্যিই ভালবাসে। রাণীজি নেহাৎ পরবশা, নইলে তাঁর ওপরেও এর যা টান, ওকে ভাল ক'রে না জানলে তার একটা সহজিয়া মতের ব্যাখ্যাও দিতে পারতাম, শুনতে মন্দ হ'ত না।

সুরুচি। আচ্ছা, আপনার কি চোখে পড়বার মতো ব'লে কিছু নেই, এমন সুন্দর সিচুয়েশনটার অমন ব্যাখ্যা করতে একটু বাধল না?

অর্দ্ধেন্দু। উঁহু, বাধবে কিসের জন্যে? প্রথমত ডাক্তারদের চক্ষুলজ্জা আর সেন্টিমেন্ট দু'টোরই দারুণ অভাব। দ্বিতীয়ত—

সুরুচি। চুপ, আপনার বক্তৃতা আমরা শুনতে চাই নে গল্প বলুন।

অর্দ্ধেন্দু। আচ্ছা, গল্পই হোক। কিন্তু ব্যারিস্টার, দেখে রাখ, আমাকে ন্যায্য ডিফেন্স নিতে দিলে না।

প্রভাত। নেভার মাইণ্ড। ওর পাওয়ার অব অ্যাটর্নি মুসলিম অ্যাক্ট অর হিন্দু ম্যারেজ অনুসারে আমার ওপর ন্যস্ত আছে। তার জোরে আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি, আপনার বিরুদ্ধে এই অ্যালিগেশন নিয়ে আর বেশি নাড়াচাড়া করা হবে না, যদি আপনি আর তর্ক না ক'রে গল্পটা কন্টিনিউ করেন।

অর্দ্ধেন্দু। অগত্যা। প্রফুল্লকে বললাম, এতই যদি সবাই তাকে নিয়ে অস্থির, তাকে দেশে পাঠিয়ে দিলেই হয়।

প্রফুল্ল বললে, হয় না। হ'লে পাঠানো হ'ত। কিন্তু এর তো রাজাজি তাকে চ'লে যেতে বললে একটা যা চেঁচামেচি কোলাহলের সৃষ্টি হবে, সে দস্তুরমতো স্ক্যাণ্ডাল। রাজা বাহাদুরের ওপরেও বাড়িতে ঘুঘুরা বয়েছেন না, যাঁদের নাম জ্ঞাতি শরিক। তাঁদের ভয়

করতে হয়। আমাদের এমন রাণীজি, যাঁকে মা ছাড়া আর কিছু ব'লে ডাকতে কারও ইচ্ছেই হয় না, তাঁরও উইক স্পট আছে, তিনি ছোট ঘরের মানে এদের তুলনায় গরিবের ঘরের মেয়ে। এর ওপর একটা স্ক্যাণ্ডাল হ'লে ঘরে বাইরে বহু জিভ চঞ্চল হয়ে উঠবে। কাজেই বুঝতে পারছ, ছুঁচোটাকে রাজা বাহাদুর আর রাণীজি দুজনে মিলেই গিলেছেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, শ্রীযুত এখানে তবু সবার চোখের ওপর যা আছেন আছেন, এক রকম মানিয়ে যাচ্ছে। দেশের বাড়িতে তিনি হবেন একেশ্বর, এবং যা কেলেঙ্কারি ক'রে বেড়াবেন সে অনির্ব্বচনীয়।

বললাম, তার মানে ?

প্রফুল্ল বললে, মানে সরল। তিনি নিজেকে বলেন নবযুগের তরুণ, এবং তারুণ্যের লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর মতামত অতি আপ-টু-ডেট। কাজেই তাঁর পরকীয়ায় অরুচি নেই এবং কার্য্যক্ষেত্রে জাত-অজাতের সঙ্কীর্ণতাও তিনি মানেন না। জ্ঞাতিরা তাঁর খোঁজ রাখছিলেন ব'লেই একে এখানে এনে রাখা হয়েছে, এক কথায় নজরবন্দী।

বললাম, তা হ'লে সেই বন্দীটা আরও ভাল ক'রে রাখা উচিত, শেকল দিয়ে।

প্রফুল্ল বললে, আমাদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু সেখানেও ওই ভূতের ভয়—স্ক্যাণ্ডাল। জ্ঞাতিদের কান তো ধামার মত পাতাই রয়েছে কিনা। যাক এবারে উঠে পড়ি, অনেক ঘরোয়া কথা ফাঁস ক'রে গেলাম। কিন্তু ঐ কথাটি মনে রেখো ভাই, আমাদের ওপর রাগ ক'র না। আর যদি কিছু মনে না কর, আজকের ভিজিটের টাকাটা—

বললাম, বাড়াবাড়ি করেছ কি ঘুষি মেরে দোব। আমি গরিব মানি, কিন্তু আজকের টাকা আমি নোব না।

প্রফুল্ল সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, জোর করবার মত মুখ নেই, কিন্তু তাঁরা শুনে কতটা দুঃখ পাবেন, তুমি জান না।

বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে শুনলা..., প্রফুল্ল দুতিনবার ফোনে আমার খোঁজ করেছে। এবং ব'লে রেখেছে, আমি ফিরলেই যেন তাকে খবর ...ওয়া হয়, খুব জরুরি দরকার। জরুরি এ.. কি থাকতে পারে ভেবে ...লাম না। ফোনে তাকে ডাকতেই সে সাড়া দিলে, সেই দুপুর থেকে তোমার ডাকের ভরসায় ব'সে আছি ভাই। তুমি এখন আবার বেরুচ্ছ না তো?

বললাম, অন্তত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নয়। কেন?

সে বললে, খানিক পরে বলছি, ধর মিনিট পনরো।

ব্যাপারটা বুঝলাম না। কিন্তু বুঝতে দেরিও হ'ল না, যখন মিনিট দশ-বারোর মধ্যেই প্রফুল্ল সশরীরে এসে আমার ড্রইংরুমের দোরে হাজির হ'ল এবং আমি কোন কথা বলবার আগেই ব'লে বসল, একটু রাস্তার ওপর আসতে হচ্ছে ভাই, ওঁরা গাড়িতে ব'সে।

ওঁরা কারা?

রাজা বাহাদুর আর রাণীজি।

সেকি! তাড়াতাড়ি নেমে গাড়ির কাছে এগিয়ে যেতেই, রাজা বাহাদুর রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছিলেন, দুহাত জোড় ক'রে বললেন, সকালবেলার ব্যাপারের জন্যে আমরা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে রয়েছি, তার জন্যে আপনার কাছে মাপ চাইতে এলাম।

বললাম, ছি ছি, ওকি করছেন, আপনি আমার গুরুজনের সমান!

রাজা বাহাদুর বললেন, তা হোক, তখন আপনি আমার বাড়িতে অভ্যাগত ছিলেন। বলুন, মাপ করলেন?

বললাম, মাপ করা-করির কি আছে এতে? তবু বিশ্বাস করুন,

আমার কোন নালিশ আর নেই। সকালবেলাই প্রফুল্লর কাছে আমি সব শুনেছি।

রাজা বাহাদুর বললেন, প্রফুল্লর! আপনাদের আগেকার জানা-শোনা ছিল নাকি?

প্রফুল্ল বললে, আমরা কলেজে একসঙ্গে পড়েছি।

রাজা বাহাদুর বললেন, আর সে কথা তুমি এই সারাদিনের ভেতর আমাকে বল নি! যাক, ডাক্তার যখন প্রফুল্লর বন্ধু, তখন তো—

বললাম, স্বচ্ছন্দে নাম ধ'রে ডাকতে পারেন, আমি একটুও রাগ করব না। তবে আমারও কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে, কষ্ট স'য়ে এতদূর যখন এসেছেন, তখন একবার গরিবের দোরে—

রাজা বাহাদুর বললেন, হাতীর পা? নিশ্চয় পড়বে, চার পা এক-সঙ্গেই পড়বে, চিন্তা ক'র না। তা হ'লে হস্তিনীটিকেও তো ডেকে নিতে হয়।—ব'লে তিনি গাড়ির দিকে একটু এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির দোর খুলে রাণীজি নেমে পড়লেন। বছর একুশ-বাইশ হবে বয়স, পাতলা ছিপছিপে চেহারা। সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় আমি দক্ষ নই, কিন্তু এঁর চেহারাটা কবির ভাষায় বর্ণনা করবার মত। সুনীতি তাঁকে দেখেছে; প্রভাত, তাঁকে দেখে যদি অনেস্টলি বর্ণনা করতে, তা হ'লে সুরুচির চ'টে যাবার কথা হ'ত। সুন্দর শান্ত মুখে ভাসা ভাসা বড় দুটি চোখ, কপালের ওপর একটুখানি ঘোমটা টানা। গাড়ি থেকে নামতে নামতে চকিতে রাজা বাহাদুরের দিকে চেয়ে, অতি সুন্দর একটু ভ্রূভঙ্গি ক'রে ফিসফিস ক'রে বললেন, আঃ, যত বুড়ো হচ্ছ—। তারপর কোনও সঙ্কোচ না ক'রে সামনে এসে নমস্কার ক'রে বললেন, আমাকেও মাপ করলেন তো?

আমি ঠিক কি জবাব দিলাম বলতে পারব না, এ কথাটা সত্যের

খাতিরে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ সেই মুহূর্ত্তটির জন্যে আমার কথা বলবার শক্তি যেন হারিয়ে গেল। আমার সমস্ত অন্তর ভ'রে তখন যার সাড়া পাচ্ছিলাম, সে হচ্ছে একটি অতি অকৃত্রিম ও বিপুল দীর্ঘশ্বাস। মনে মনে বললাম, হায় রে, সুনীতি যদি আমাকে অমন ক'রে ভুরু কুঁচকে বুড়ো বলতে জানত!

সুনীতি। তুমি বুড়ো হও, তখন দেখো বলতে জানব।

অর্দ্ধেন্দু। তেমন ক'রে বলতে পারবে না। এই তো আধ-বুড়ো হয়েছি, ও বেয়াল্লিশও যা পঞ্চান্নও তাই। কই বল তো তার অর্দ্ধেকও মিষ্টি ক'রে, কেমন পার একটা টেস্ট হয়ে যাক।

প্রভাত। আঃ, digressing again।

অর্দ্ধেন্দু। অস্থির হয়ো না হে আইনজ্ঞ। শুকনো রেলের ওপর কলের গাড়ি চলতে পারে, গল্প চলে না। রস জমাতে হ'লে তার জন্যে অবসরের ইণ্টারস্পেস চাই। তুমি কোর্টে স্পীচ দিতে দিতে বারবার চশমা মোছ না?

সুরুচি। আঃ, একটু ফুরসৎ মিলেছে কি অমনই—

অর্দ্ধেন্দু। মেয়েদের মত খচখচি বাধিয়ে দিয়েছে। যাক, শোন। গরিবের দোরে হাতীর পা বেশ গভীর ক'রেই পড়ল। রাণীজি সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে গিয়ে সুনীতিকে আক্রমণ ও দখল করলেন। এদিকে রাজা বাহাদুর অনেক বার অনেক রকম ক'রে প্রশ্ন ক'রে আমি যে তাঁদের ওপর রাগ ক'রে নেই, তার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে নিলেন; এবং তারপর আর একবার ধ'রে পড়লেন, তাঁর অপারেশন আমাকেই করতে হবে, নইলে তাঁর বিশ্বাস হবে না যে, আমার রাগ সত্যিই ভেঙেছে। শেষ পর্য্যন্ত আমাকেও স্বীকার করতেই হ'ল।

তাঁরা চ'লে যাবার পর সুনীতি মতপ্রকাশ করলে, তার বিবেচনায়

প্রফুল্ল বললে, চল, তোমাকে এগিয়ে দিই।

রাজা বাহাদুর বললেন, বঙ্কু ফিরেছে? তাকে ডাক।

বঙ্কু আসতেই রাজা বাহাদুর বললেন, এঁর কাছে মাপ চাও।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না না, সেকি!

রাজা বাহাদুর বললেন, সেকি নয়। চাইতেই হবে। চাও বলছি মাপ।

বঙ্কু ঘাড় গোঁজ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। মাপ সে মুখ ফুটে চাইবে না, জানা কথা। অথচ তখন না চাইবার মানে আমার মাথাটা আরও ভাল ক'রে কাটা যাওয়া। কাজেই খুব সাত্ত্বিকভাবে সার্মন দিয়ে বললাম, আপনি মিথ্যে একটা সীন ক্রিয়েট করছেন রাজা বাহাদুর। আমি রাগ ক'রে নেই, আপনাকে বলেছি। তার ওপর, উনি বয়সে আমার চাইতে ঢের ছোট। যদিই কিছু অন্যায় ক'রে ফেলে থাকেন, সে যা হবার হয়ে চুকে-বুকে গেছে, তাকে খুঁচিয়ে তোলবার দরকার নেই।—ব'লে চট ক'রে বেরিয়ে এলাম।

বাড়ি ফিরে দেখি—অগ্নিকাণ্ড। সুনীতি রেগে ফুলে যা হয়ে রয়েছে একেবারে পাকা টম্যাটো। কি বার্ত্তা? নিশ্চয়ই সেই নথের অর্ডার দিতে ভুলে গেছি ব'লে। নিজে থেকেই ঘাট স্বীকার ক'রে বললাম, দেবি, প্রসীদ। এক্ষুনি অক্ষয় নন্দীকে ফোন করছি। সুনীতি বললে, নথটথ নয়, আরও গুরুতর ব্যাপার। বললাম, তবে নিশ্চয়ই চন্দ্রহার। কিন্তু তার অর্ডার তো দেওয়া হয়েই যাচ্ছিল, শুধু যদি না—। সুনীতি চ'টে:বললে, চুলোয় যাক চন্দ্রহার। এদিকে মানসম্ভ্রম নিয়ে টানাটানি, আর তুমি করছ ইয়ার্কি।—ব'লে চোখে আঁচল দিলে।

অর্দ্ধেন্দু নিবে যাওয়া চুরুটটা ফের ধরিয়ে নিয়ে চিৎ হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে খুব দমভরে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

স্বরুচি বললেন, তারপরে ?

অর্দ্ধেন্দু চুরুটে আর একটা জোর টান দিয়ে বললেন, দাঁড়াও, আগে মন ঠাণ্ডা হোক।

প্রভাত বললেন, হয়েছে, বলুন।

অর্দ্ধেন্দু। বাপ রে বাপ, বউয়ের সঙ্গে কথা কইতে দেবে না, চুরুট খেতে দেবে না, এ তো আচ্ছা মাস্টার-মাস্টারণীর পাল্লায় পড়লাম দেখছি; এমন জানলে আমি গল্প বলতেই বসতাম না।

প্রভাত। If যদি be হয়—থাক। এখন বাকিটা না বললে ব্রীচ অব কণ্ট্রাক্ট।

অর্দ্ধেন্দু। আর এদিকে ব্রীচ অব কণ্ট্যাক্ট হয়ে যাচ্ছিল। শালীর চাইতে চুরুটের সঙ্গে খাতির বজায় রাখবার তাড়া তুমি কম মনে কর ? বিশেষত যখন সেই শালীর বয়স পঁচিশ পেরিয়ে—

স্বরুচি। ফের !

অর্দ্ধেন্দু। আইজ্ঞা না। যাক, কান্নাটান্না থামতে স্বনীতিকে জিজ্ঞেস করলাম—

স্বনীতি। হ্যাঁ, কেঁদেছিল বই কি !

অর্দ্ধেন্দু। আচ্ছা, না কেঁদে থাক, নেই নেই। তারপর কান্না না থামতে স্বনীতিকে—। দেখলে গো, সেরে নিয়েছি কিন্তু। হ্যাঁ, স্বনীতিকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে। স্বনীতি বললে, সেই কে একটা লোক এসেছিল, মানে বন্ধু, তাকে ভয়ানক অপমান ক'রে গেছে। তার যদি অবিলম্বে তীব্র প্রতিকার না করি, তবে তার সঙ্গে আমার এই জন্মের মত বিচ্ছেদ, জীবনে আর কক্ষনো সে আমার রুমালে ফুল তুলে দেবে না। কি ব্যাপার ? না, বন্ধু যখন আসে, স্বনীতি তখন ড্রইংরুমে ব'সে খুব নিবিষ্টচিত্তে ক্যাটালগ খুলে পেরাম্বুলেটারের মডেল পছন্দ

করছে—না না, চ'টো না, আই মীন, লাল উলের ছোট্ট সোয়েটার বোনবার জন্যে উলের ডিজাইন পছন্দ করছে। বন্ধু বোধ হয় বাইরে দরোয়ান বরকন্দাজ কারুর সাড়া পায় নি, সে এসে সোজা ঘরে ঢুকেছে এবং তারপর হাঁ ক'রে সুনীতির দিকে কি রকম ক'রে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কি রকম ক'রে সে তাকিয়েছিল, অবিশ্যি খুব ভাল বুঝলাম না, কারণ আমার দিকে কেউ কখনও কি রকম ক'রে তাকিয়েছে ব'লে মনে পড়ে না। তবে সুনীতির কথা থেকে বোঝা গেল, সে তাকানোর রকমটা ভাল নয়, মানে সুনীতির পছন্দ হয় নি। তারপর যখন সুনীতি পেছন ফিরে তাকে দেখতে পেয়েছে, তখনও সে একটুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নি; যতক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলেছে, সারাক্ষণই তার মুখের ওপর, গলার ওপর এট্সেট্রা চোখ ফিক্স ক'রে বলেছে। সুনীতির মতে সেটা তার আত্মার ভালত্বের পরিচায়ক নয়। অতএব অবিলম্বে সেই দুরাত্মার শাস্তিবিধান করা চাই।

জ্বালিয়ে তুললে। এদিকে আমার পয়সার অভাব, ওদিকে টাকা আয়ের পথে এসে এই হতভাগাটা বারবার ক'রে জঞ্জাল সৃষ্টি করছে; ওদিকে আবার শাস্ত্রের বিধান, সময়বিশেষে স্ত্রীর সব খেয়াল পূরণ করতে হয়, নইলে ভবিষ্যৎ দেশবাসীর স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা। সুনীতি তো যা কান্না সুরু ক'রে দিয়েছে, ঘরে প্লাবন হয় আর কি! প্রভাত সেই যে গেল বারে সঙ্গে টাকা নেই ব'লে বড় হীরে বসানো ব্রোচটা নিতে পারলে না, একটু ছোট সাইজের একটা ব্রোচ কিনে নিয়ে গেলে তখনও সুরুচি, অত কাঁদতে পার নি।

সুরুচি বললে, কবে আবার আমি—

অর্দ্ধেন্দু অন্যমনস্কভাবে বাঁ হাতটা একটু তুলে বললেন, আঃ, তর্ক ক'রে রসভঙ্গ ক'র না, আমি এখন ক্রমেই উত্তেজিত হচ্ছি। হতে হতে

শেষে একসময় আমি দস্তুরমত চ'টে গিয়ে স্থির ক'রে ফেললাম, এর একটা হেস্তনেস্ত করবই। তাতে যদি ক্লায়েন্ট হাতছাড়া হয়ে গিয়ে নথটা এ যাত্রা কেনা নাও হয়, সোভি আচ্ছা আমি গরম হয়ে উঠতেই তার আঁচে সুনীতির চোখের জল চট ক'রে বাষ্প হয়ে উবে গেল। বর্ষণশ্রান্ত আষাঢ় রাত্রির অবসানে সদ্য-ধোওয়া কচি ঘাসের ওপরে প্রথম রোদের ঝলকানির মত তার সমস্ত মুখ খুশিতে এমনই ঝকমক ক'রে উঠল যে, আমার তখনকার মত মনেই রইল না নাক থাঁদা ব'লে তার দু-দুবার বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল।

সুনীতি। আঃ।

অর্দ্ধেন্দু। গোল ক'র না। আমি ইদানীং পরিশ্রান্ত, এক নিশ্বাসে অনেকখানি কাব্য ক'রে ফেলেছি। তারপর চ'টে গিয়ে দুম ক'রে ফোন তুলে নিলাম। লালবাজার নয়, প্রফুল্ল। তাকে বললাম, শিগশির এস।

প্রফুল্ল এলে তাকে বন্ধুর কীর্ত্তি বললাম। সে বলবে, আর ব'ল না ভাই। বুঝলে তো কি চীজ। আমরা চব্বিশ ঘণ্টা দেখছি। রাণীজি নিজে তার সামনে গায়ের চাদর খোলেন না।

বললাম, কিন্তু আমি এ স'য়ে যাচ্ছি না, ওর বাঁদরামো আমি ঘোচাব।

প্রফুল্ল বললে, সে যদি পার ভাই, তো আমরাও বেঁচে যাই—রাজা বাহাদুর রাণীজি সুদ্ধ। কিন্তু একটি কথা, মামলা করলে তাঁরা বড় লজ্জায় পড়বেন।

আমি বললাম, সে ইচ্ছে আমারও নেই, থাকলে তোমাকে ডাকতাম না। ঘরের কেচ্ছা নিয়ে কোর্টে যাওয়া আমার পক্ষেও প্যালেটেব্‌ল নয়। দাঁড়াও, সুনীতিকে ডাকি।

তারপর তিনজনে মিলে আমাদের ঘোরতর ওয়ার-কাউন্সিল বসল. প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে অত্যন্ত গোপন পরামর্শের পরে স্থির হ'ল, বন্ধুকে কেসে ফেলা চলবে না, রাজা বাহাদুরকেও বলা হবে না। গুণ্ডা লাগানো চলে কি না, তার আলোচনা শেষ হয়ে ভোটে 'না' খাড়া হতে হতে সাড়ে দশটা বেজে গেল। তার পরের প্রস্তাব ছিল, তাকে নিজেই চাবকে দেওয়া। কিন্তু এগারোটায় আমার একটা এক্সপেরিমেণ্টের ফল জানতে যাবার কথা। প্রফুল্লকে বললাম, আপাতত তা হ'লে ও আলোচনাটা মুলতুবি থাক, বেলা হয়ে গেল। সোফারকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, প্রফুল্লই আমাকে ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে নামিয়ে দিয়ে গেল।

সেদিনটা ছিল বুধবার। বিষ্যুৎ গেল, শুক্কুর গেল, শনিও যায়, চাবুক আর কেনা হয় না। সুনীতি ঝনঝন ক'রে হাতের চুড়িগুলো খুলে দিয়ে বললে, এই নাও, বিক্রি ক'রে যাও চাবুক নিয়ে এস। আমি বললাম, একটু র'স, আর একবার ভেবে দেখি, চাবুক আর্মস-অ্যাক্টে পড়ে কি না। সুনীতি রেগে বললে, আর্ম তো এমনিই দুটো দুপাশে ঝুলছে, ওগুলোকেও তা হ'লে কেটে ফেলে দিলেই তো হয়, জামা করতে কাপড়ও কম লাগত। যতই বুঝিয়ে বলি কথাটা নেহাৎই মেয়েমানুষের মত বলা হ'ল, আর্ম কাটা গেলে তখন জানা যাবে তার সঙ্গে আরও কত কি গেল, এবং সে অভাব শুধু আমিই নয়, তিনিও আমার চাইতে কম ফীল করবেন না। কে সে কথা কানে তোলে! সে বলে, হাতে চাবুক না থাকলে পুরুষমানুষের হাত থাকবার কোন মানেই হয় না, ঠিক যেমন সোনার চুড়ি হাতে না থাকলে মেয়েদের হাত থাকা না-থাকারই সামিল। এর পরে বুঝতেই পার, আমার তরফ থেকে একমাত্র লজিকাল উত্তর হচ্ছে যে, তাই যদি তার ধারণ হয়, তবে সুনীতি খুব ভাল দেখে একটি গাড়োয়ানকে বিয়ে কর:

উচিত ছিল। কিন্তু ততদূর এগোবার আগেই একটা ব্যাপার ঘ'টে গেল, যা আশ্চর্য্য এবং অভিনব।

অর্দ্ধেন্দু আর একটা চুরুট ধরালেন, ধীরে ধীরে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, সোমবার খুব ভোরবেলা প্রফুল্ল এসে হাজির হ'ল। শেষ রাত্তির থেকে বন্ধুর হঠাৎ গলাটা ফুলে ব্যথা হয়ে উঠেছে, ভয়ানক পেন, আমাকে এক্ষুনি একবার যেতে হবে। পুনশ্চ সংবাদ, বন্ধু নিজে বারবার ক'রে ব'লে দিয়েছে, আমাকে যেতেই হবে, আমাকে না দেখতে পেলে সে আর কিছুতেই বাঁচবে না স্থির করেছে। তার কোনও অপরাধ যেন আমি মনে না রাখি।

চটপট ওভারকোট চড়িয়ে গাড়িতে চেপে বসলাম। শোবার ঘরে টেবিলে দেশলাই ছিল, স্থনীতি তার ওপরকার কালির ছবিটার দিকে খুব ভক্তিভরে খানিক চেয়ে থেকে, তারপর আশেপাশে কেউ কোথাও নেই দেখে নিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম জানিয়ে মনে মনে বললে, ভগবান, তুমি নিশ্চয় আছ।

স্থনীতি বললেন, হুঁ। তুমি জানলে কি ক'রে?

অর্দ্ধেন্দু বললেন, মনে নেই, শালগ্রাম হুড়ি সামনে রেখে বলেছিলে, যদেতৎ মে হৃদয়ং?

স্থনীতি রেগে বললেন, কক্ষনো বলি নি। আমার ব'লে তখন ঘুমে দুচোখ ভেঙে আসছে—

অর্দ্ধেন্দু। আরে চুপ চুপ, রাগের মাথায় বেফাঁস কথা ব'লে ফেলতে নেই। ব্যারিস্টারকে জিজ্ঞেস কর, এক্ষুনি ব'লে দেবে, চাটিং কেস বড় শক্ত মোকদ্দমা।

প্রভাত। আঃ, কি সুরু করলেন দুজনে! ডক্টর, continue please, মানে ঝগড়া নয়—গল্পটা।

অর্দ্ধেন্দু। বলি। রাজবাড়িতে গিয়ে দেখি বন্ধু শয়ান, গলায় কম্ফর্টার জড়ানো। কণ্ঠার দু পাশ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। ব্যথা আছে, একটু জ্বরও হয়েছে। ব্যথাটা তখন পর্য্যন্ত খুব বেশি ব'লে মনে হ'ল না ; কিন্তু যতটুকু হয়েছে এবং আরও যতখানি হবে ব'লে তার ধারণা হয়েছে, এই দুইয়ে মিলে বন্ধুকে একেবারে জেণ্টলম্যান বানিয়ে দিয়েছে। হাউ-মাউ ক'রে বললে, ডাক্তারবাবু, আমি ম'রে গেলাম।

ধমক দিয়ে বললাম, সে যখন মরবেন তখনকার কথা। এখন চুপ করুন, দেখতে দিন।

দেখা শেষ হ'লে রাজা বাহাদুর বললেন, কি দেখলেন ?

বললাম, অ্যাকিউট টাইপের টিউমার হয়েছে। কাটাতে হবে।

রাজা বাহাদুর বললেন, টাইপটা কি রকম ?

বললাম, খুব মাইল্ড হবার তো কথা নয়, এক রাত্রের মধ্যে যখন এতটা হয়েছে। কাল কিছু টের পান নি ?

বন্ধু কেঁদে উঠল, কিচ্ছু না। আমাকে বাঁচান।

বললাম, এক্ষুনি মরবার আপনার কিছু হয় নি। উঠে রেডি হয়ে নিন। অপারেশন আজই করতে হবে, আরও বাড়বার আগে। প্রফুল্লকে বললাম, দেরি না ক'রে মেডিক্যাল কলেজে পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও। আমি তাদের ফোন করছি। বন্ধু আবার হাউমাউ ক'রে উঠল। ওরে বাবা রে, গলা কাটলে আমি ম'রে যাব। আমি ওখান থেকেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলাম।

এগারোটার মধ্যে অপারেশন হয়ে গেল। প্রফুল্লকে তার কাছে রেখে নার্স টার্সের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে বারোটা আন্দাজ বাড়ি ফিরলাম। স্নীতিকে বললাম, বেচারী যা কান্নাকাটি করছিল, তার

ওপর কেমন মায়া প'ড়ে গেল। তায় ডাক্তারের প্রফেশনাল কন্‌ভেন্‌শন আছে, রুগীর ওপর রাগ রাখতে নেই। তাকে একেবারে মাপ ক'রে ফেলেছি। স্থনীতির মুখটা ঠিক পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া গোছের দেখতে হ'ল না।

বিকেলে গিয়ে দেখলাম, বন্ধু ভালই আছে। রাজা বাহাদুর, রাণীজি তাকে তখন দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁরা খুব একচোট ধন্যবাদ জানালেন। আমি বললাম, আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে ভালই হ'ল। খবর আছে।

রাজা বাহাদুর বললেন, কি, জবাব পেয়েছেন?

বললাম, শুধু জবাব নয়, একেবারে জিনিসই পেয়ে গেছি এখানে একজনের কাছে; সকালবেলা তাড়াতাড়িতে আপনাকে বলা হয় নি। আর এক ভদ্রলোক নিজের দরকারে আনিয়েছিলেন, তাঁর কাজে লাগবে না। তাঁরও স্থরাহা হয়ে গেল, আমারও।

রাজা বাহাদুর বললেন, তা হ'লে অপারেশনটা কবে করতে চান?

বললাম, কালই। দেরি ক'রে লাভ নেই।

রাণীজির মুখ মলিন হয়ে গেল। বললেন, একসঙ্গে দুজনই?

তাঁকে সাহস দিয়ে বললাম, তাতে আর কি হয়েছে? ওরা শিগগিরই সেরে উঠবেন তো। আপনি যখন খুশি এসে দেখে যাবেন. আমি বন্দোবস্ত ক'রে দোব।

তাই হ'ল, পরদিন রাজা বাহাদুরের অপারেশন করলাম। দিন দশেকের ভেতর দুজনেই সেরে উঠে বাড়ি চ'লে গেলেন।

অর্দ্ধেন্দু পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে চুরুট টানতে লাগলেন।

স্থরুচি বললেন, তারপর?

অর্দ্ধেন্দু বললেন, তারপর আর নেই। বছর দুই পরে স্থনীতিকে

সঙ্গে ক'রে গিয়ে অন্নপ্রাশনের নেমতন্ন খেয়ে এসেছি। And they have been blessed with the brightest boy I have ever seen, মানে আমার ছেলেপিলে ছাড়া।

তপেন বললে, আর সেই বন্ধু ?

অর্দ্ধেন্দু বললেন, বর্ত্তমান খবর জানি না, অন্নপ্রাশনের সময় শেষ দেখেছি। দারুণ মোটা হয়েছে আর স্বভাবটা একদম বদলে গেছে। এখন সে অত্যন্ত শান্তশিষ্ট লোক। আমাকে যে ভক্তিশ্রদ্ধাটা দেখালে, সুনীতি পর্য্যন্ত ঈর্ষান্বিতা। প্রফুল্লকে বললাম, ভারী বাধ্য হয়ে পড়ছে তো হে, কত লোকেরই তো হাত পা গলা কাটি, এমন ভক্ত রুগী আর কখনও পাই নি।

প্রফুল্ল বললে, শুধু তুমি ব'লে নয়, ওর স্বভাবটাই এখন অমনই হয়ে গেছে। আগের আর কিছু বাকি নেই। রাণীজি কালীঘাটে জোড়া মোষ দিয়েছেন।

অর্দ্ধেন্দু উঠে দাঁড়ালেন, আর নয় রাত ঢের হ'ল।

সুরুচি বললেন, এটা একটা গল্প হ'ল ? মিথ্যে খানিক বাজে বকুনি শোনালেন।

অর্দ্ধেন্দু বললেন, কি করব, আমি তো ব'লেইছিলাম, গল্প বলতে পারি না। আমার কাজ ছুরি ছোরা নিয়ে, আমি কি ব্যারিস্টার যে, অনর্গল সুসজ্জিত রোমাঞ্চকর মিথ্যে ব'লে যাব !

সুরুচি ঠোঁট ফুলিয়ে বললেন, যান যান, আর ইয়াকি করতে হবে না, যত সব বাজে কথা ব'লে রাত জাগালেন।

অর্দ্ধেন্দু নিঃশব্দে চাদরটা তুলে গলায় ফেললেন।

সুরুচি আপীল করলেন, দেখ তো দিদি, এতে রাগ হয় না ?

সুনীতি স্মিতমুখে বললেন, হয়, কিন্তু হওয়া উচিত নয়।

প্রভাত বললেন, আপনি তো ওঁর হয়ে বলবেনই। কেন উচিত নয়, শুনতে পাই?

সুনীতি বললেন, পান। গল্পটার সবটা আপনারা শোনেন নি। একটুখানি বাকি আছে।

তপেন সুরুচি প্রভাত কোরাসে বললেন, কি? কি?

সুনীতি বললেন অ্যানথ্রোপয়েড গ্ল্যাণ্ড পাওয়া যায় নি। রাজা বাহাদুরের অপারেশন হয়েছিল বঙ্কুর থাইরয়েড নিয়ে।

সুরুচি প্রভাত তপেন। তার মানে

অর্দ্ধেন্দু। সুনীতি, তুমি ডায়েরি পড় না বলেছ।

সুনীতি। পড়ি না, তুমিই বলেছ। কিন্তু এও বলেছ যে, শুনি এবং কাজেই ইচ্ছে করলে বলতেও পারি, কারণ আমার প্রফেশনাল ভাউ নেই।

তপেন সুরুচি। দিদি, বল।

প্রভাত। বলুন।

সুনীতি। ওঁর প্ল্যানমত প্রফুল্লবাবু বঙ্কুকে একটা ব্যাকটিরিয়া অ্যাড্‌মিনিস্টার ক'রে দেন। তাই তার থাইরয়েড ফুলে উঠেছিল। উনি অপারেশন ক'রে তার থাইরয়েড বার ক'রে নেন এবং সেটাকেই পরিষ্কার ক'রে নিয়ে রাজা বাহাদুরের শরীরে বসিয়ে দেন।

সুরুচি উত্তেজিতভাবে বললেন, অর্দ্ধেন্দুবাবু, সত্যি?

অর্দ্ধেন্দু উদারভাবে বললেন, নিজের মুখে কিছু স্বীকার করা প্রফেশনাল কনভেনশনের বহির্ভূত। স্ত্রী যা খুশি বলুক, সেটা আদালতে গ্রাহ্য নয়, কারণ বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, মেয়েরা স্বামীর কীর্তিকাহিনী বাড়িয়ে বলতে গিয়ে এমন অনেক কিছু বলে, যা তাদের বোনরা বা ভগ্নীপতিরা বিশ্বাস করলেও অন্য লোকে করবে না।

সুরুচি। হেঁয়ালি নয়, সত্যি বলুন।

অর্দ্ধেন্দু। ভদ্রে, ভ্রূকুটি করলেই অমনই ভড়কে গিয়ে একটা যা তা খারাপ কথা স্বীকার ক'রে ফেলব, সে বয়স আমার আর নেই।

প্রভাত। আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?

অর্দ্ধেন্দু। Provided it will be nothing to incriminate me।

প্রভাত। না, অতি অ্যাকাডেমিক প্রশ্ন। মানুষের গ্ল্যাণ্ড নিয়ে অপারেশন হয় ?

অর্দ্ধেন্দু। অ্যাকাডেমিকালি বলতে পারি, না হবার কোন কারণ নেই। বরং মানুষের গ্ল্যাণ্ডই মানুষের পক্ষে সব-চাইতে স্যুটেড। মানুষের পাওয়া যায় না ব'লেই বাঁদরের গ্ল্যাণ্ড নিতে হয়। আর সে বাঁদর জাতে মানুষের যত কাছাকাছি হয় ততই ভাল।

তপেন। আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি ?

অর্দ্ধেন্দু। Oh yes, you are a student।

তপেন। কি ব্যাক্‌টিরিয়া ব্যবহার করেছিলেন ?

সুনীতি। আমি বলছি। Strepto-Staphylococcus।

তপেন। কিন্তু তাকে না জানিয়ে ইন্‌জেক্ট করলেন কি করে ?

অর্দ্ধেন্দু। তুমি কলেজ ছেড়ে দাও। এইটুকু জ্ঞান নেই যে ডিজীজ্‌ড গ্ল্যাণ্ড নিয়ে অপারেশন হয় না, তোমার কিছু হবে না।

তপেন। তবে ?

অর্দ্ধেন্দু। ইয়ংম্যান, আরও বয়েস হোক, তখন জানবে, স্ত্রীকে প্রসন্ন করবার জন্যে মানুষ গণ্ডার মারে, তাজমহল বানায়, উপস্থিতমত দুচারটে রুচিকর কথা ব'লে দেওয়া তো সামান্য কথা।

সুনীতি। তার মানে ? তুমি আমাকে তখন ঠকিয়েছিলে ?

অর্দ্ধেন্দু। আহা, ছেলেমানুষকে শান্ত করতে কি বললাম, তুমি তাতে কান দিচ্ছ কেন ? তোমায় আমায় কি সেই সম্পর্ক ?

প্রভাত। উহুঁ, ব্যাপারটা বুঝে নিতে হচ্ছে। Where are we standing exactly ?

অর্দ্ধেন্দু। এই লনের ওপর।

প্রভাত। Hang it, এতক্ষণ ধ'রে আমরাই বোকা বনলাম, না উনিই এতদিন ধ'রে বোকা ব'নে ছিলেন ?

অর্দ্ধেন্দু। (ঈষৎ হেসে) ওহে, জগৎটা গোলমেলে জায়গা, এর কোথায় কে কখন কি ভাবে বোকা বনে, তার মীমাংসা করা কি সহজ কথা ! রাত অনেক হয়েছে, সব শুতে যাও। সম্বুদ্ধ

আলোকচিত্রে প্রগতি (১)

দি রাইট মোমেণ্ট

চিনাবাদাম

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া কম্প্যাস ছাড়াই দিকনির্ণয় করিতে গেলে যে অবস্থা হয়, পিনাকীলালের অনেকটা সেই অবস্থাই হইল। সে চুপচাপ আসিয়া মনুমেণ্টের তলায় বসিয়া পড়িয়া একটা সিগারেট ধরাইল। না ধরাইলেও হইত, তবু ধরাইল। "নেই কাজ তো খই ভাজ" কথাটাকে বদলাইয়া পিনাকীলাল করিয়া লইয়াছে, "নেই কাজ তো ধরা সিগারেট"। কেন না খই ভাজা অপেক্ষা সিগারেট ধরানোর হাঙ্গামা অনেক কম।

আজ পিনাকী যেন হঠাৎ দার্শনিক হইয়া গিয়াছে। সব কিছুই সে দর্শন করিতেছে চর্ম্মচক্ষু দিয়া নহে—দর্শনের চক্ষু দিয়া। উপরের দিকে চাহিয়া সে দেখিল, ঠিক যেন মনুমেণ্টেরই মাথার উপর দিয়া কয়েক খণ্ড নির্জ্জলা স্বচ্ছ সাদা মেঘ উড়িয়া যাইতেছে। পিনাকীর মনে হইল, মনুমেণ্ট সিগারেট বুঝি সাদা ধোঁয়া ছাড়িতেছে।

মালবিকা তাহাকে ইডিয়ট বলিয়াছে, জানোয়ার বলিয়াছে, বলিয়াছে আরো অনেক কিছু। তা বেশ করিয়াছে। আর কয়টা দিন যাক না। তারপর আবার ঠিক ঐ কথাগুলিরই উল্টা কথা অভিধান দেখিয়া দেখিয়াই হয়তো বলিবে। কয়টা দিন কি আর সহ্য করিয়া থাকা যাইবে না? কেন যাইবে না? চেষ্টা করিলে পৃথিবীতে কি না সহা যায়? পিনাকী মনুমেণ্ট দেখিতে লাগিল।

পিনাকী ইতিহাস জানিত। মনুমেণ্ট দেখিয়া তাহার মনে পড়িল সাহেব অক্‌টার্লোনির কথা। পড়িয়াই তাহার মনটা করুণ রসে ভরিয়া উঠিল, দুঃখ হইল সাহেবের জন্ম। মনুমেণ্ট আছে, অক্‌টার্লোনি

নাই। স্মৃতিস্তম্ভ আছে, স্মৃতি নাই। লক্ষ লক্ষ লোক মনুমেণ্ট দেখে, তাহাদের মধ্যে ইতিহাস কয়জন জানে? যাহারা জানে, তাহাদের মধ্যেই বা কয়জন মনে করে? বুদ্বুদের মত স্মৃতি মিলাইয়া গিয়াছে, খাড়া আছে স্মৃতিস্তম্ভ। স্মৃতির চেয়ে স্মৃতিস্তম্ভই কি বড়? পিনাকী ভাবিতে লাগিল।

ক্রমে অকটার্লোনি হইতে সিপাহী-বিদ্রোহের কথা মনে হইল। হায়! সে সব দিন এখন কোথায়? তখনকার দিনে কোনও রাত্রে আজিকার রাত্রের মত এই জায়গায় এমন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবার কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত কি? তখন এই সবুজ মাঠই হয়তো নররক্তে ও অশ্বরক্তে লাল হইত। এখন ঐ ওখানে কয়েকটা ফাজিল ছোকরা প্রেমের গল্প করিতে করিতে হো হো করিয়া হাসিতেছে তখনকার দিনে কত লোক ঠিক ঐখানেই হয়তো ওহো হো করিয়া কাঁদিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছে। সময়ের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! সময়-বহুরূপীর অদ্ভুতরূপ পরিবর্ত্তনের কথা ভাবিতে ভাবিতে পিনাকীলাল নিজের কথা ভুলিয়া গেল।

এভাবে কতক্ষণ সে নিজেকে ভুলিয়া থাকিত বলা শক্ত, কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ "চিনাবাদাম চাই বাবু, গরমাগরম" কথাটা কানে যাইতেই সে আবার নিজের কথা ভাবিতে লাগিল। কারণ, সে-ই চিনাবাদামওয়ালার লক্ষ্য। তাহার যে চিনাবাদাম দরকার, সে কথা লোকটা যেন কি করিয়া আন্দাজ করিয়াছিল।

লোকটা বাঙালী নহে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, তাহার বাড়ি মুঙ্গের জিলায়। শুনিয়া পিনাকীর মন সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সুদূর মুঙ্গের হইতে আসিয়া বাঙালী বাবুদের জন্য সে চিনাবাদাম ভাজিয়া ফিরি করিতেছে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সবাইকে হয়তো সে

দেশেই ফেলিয়া আসিয়া এই বিদেশে তাহাদের বিরহ-ব্যথা মুখ বুজিয়া সহ্য করিতেছে। হয়তো বা কখনও কখনও ব্যথা এত গভীর হইয়া উঠে যে, সে তাহার ঐ ময়লা কাপড়ের আঁচল দিয়াই চোখের জল মুছিয়া ফেলে। হয়তো কত রজনীতে বিরহিণী প্রিয়ার কথা ভাবিয়া অশ্রুজলে বালিশ ভিজাইতে ভিজাইতে সে জাগিয়া থাকে। নির্ম্মম বিধাতার এই নির্ম্মম বিধানের রহস্য বহু চেষ্টাতেও হয়তো সে ভেদ করিতে পারে না। আর ওদিকে হয়তো সুদূর মুঙ্গেরে জনৈক মুঙ্গেরী নারী কাতরপ্রাণে সুদূর বাংলা হইতে তাহার স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় দিন গুনিতেছে। হয়তো সেও বিধাতার এই হৃদয়হীন বিধানের নিন্দা করিতেছে। হয়তো স্বামী বাংলার টাকা মাঝে মাঝে মনি-অর্ডার করিয়া পাঠায় এবং সেই টাকাই স্বামীর স্পর্শমাখানো বলিয়া কত আদরে সে বক্ষে চাপিয়া ধরে। বিধাতা কর্ত্তৃক বাংলায় নির্ব্বাসিত পিতার জন্য তাহার কচি কচি ছেলেমেয়েগুলি হয়তো কত কাঁদে, কিন্তু সে কান্না হয়তো বা নির্ব্বাসিত পিতার প্রাণে গিয়া আঘাত করে, তবু বিধাতার পাষাণ প্রাণে আঘাত করে না।

এই রকম কত শত মুঙ্গেরী দীর্ঘশ্বাসে বাংলার আকাশ-বাতাস ভরিয়া আছে, কে তাহার হিসাব রাখে? শুধু মুঙ্গেরই বা কেন? ভারতের বহু প্রদেশের বহু জিলার এইরূপ কাতর আর্ত্তনাদে বাংলার আকাশ ছাইয়া গেল, বাতাস ভারী হইয়া গেল। হে বাঙালী! তাহা কি শুনিতে পাও নাই? সে আর্ত্তনাদ শুনিয়া কোনদিন এক ফোঁটা অশ্রু ঝরাইয়াছ কি? এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়াছ কি?

মনুমেণ্টের তলায় বসিয়া বসিয়া এভাবে চিন্তা করিতে করিতে পিনাকী আকুল হইয়া উঠিল। মনুমেণ্টের উপর দিয়া তখনও দুই এক খণ্ড সাদা মেঘ উড়িতেছে।

চিনাবাদামওয়ালা কহিল, "গরমাগরম চিনাবাদাম, বাবু।" তাহার কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত রকমের আকুতিপূর্ণ করুণ ছলছল ভাব। শুনিয়া পিনাকীলালের দুইটি নয়ন-শতদলে অশ্রু-শিশির টলমল করিয়া উঠিল।

পকেট হাতড়াইয়া পিনাকী দেখিল, একটি মাত্র পয়সা রহিয়াছে।

তাহাই বাহির করিয়া সে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে কহিল, "দে যাও এক পইসাকা।"

চিনাবাদাম দিয়া চিনাবাদামওয়ালা চলিয়া গেল। গরমাগরম চিনাবাদাম মুহূর্তে কিরূপে ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে পারে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে মনুমেণ্টের তলায় বসিয়া পিনাকী ঠাণ্ডা চিনাবাদাম খাইতে লাগিল। শ্রীঅক্রূর

আলোকচিত্রে প্রগতি (২)

দি রাইট অ্যাঙ্গেল

'আনন্দমঠে' অনৈতিহাসিকতা

(আলোচনা)

পৌষ মাসের (১৩৪৫) 'শনিবারের চিঠি'তে "সোনার বাংলা'র পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত আমার "'আনন্দমঠে' অনৈতিহাসিকতা" শীর্ষক প্রবন্ধটির একটি "সমালোচনা" পড়িলাম। ইহাকে ঠিক সমালোচনা বলিতে পারি না ; কারণ, ইহা গালাগালিতে ভরা ; এবং এই গালাগালি মনে হইতেছে যেন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-প্রসূত। তাহা না হইলে সমালোচক মহাশয় মূল বিষয়টি ছাড়িয়া দিয়া একটি সামান্য অবান্তর কথা লইয়া মিছামিছি এতটা ঘাঁটাঘাঁটি করিতেন না এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ব্যতিরেকে এতটা গাত্রদাহের অন্য কোন কারণও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গালিবর্ষণ ও অভিসন্ধি আরোপের সুলভ সুযোগ পাইয়া তিনি তাহার পূর্ণ "সদ্ব্যবহার" করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বুঝা উচিত ছিল যে, কটূক্তি যুক্তি নহে। বোধ হয়, ইহা ভদ্রতাও নহে ; এবং এই প্রকার সমালোচনা শিষ্টজনানুমোদিতও নহে।

যদিও একশ্রেণীর লোকের মত সমালোচক মহাশয় অনেক আবোলতাবোল বকিয়াছেন, তথাপি তিনি আমার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি এক প্রকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তবে তিনি "বিজ্ঞের" মত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে "মীরজাফরের মত ব্যক্তিকে দশ বিশ বৎসর আগে পরে কবর দিলে উপন্যাস তো দূরের কথা ইতিহাসেরও কিছু আসে যায় না।" এই প্রকার মনোবৃত্তি লইয়া ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে—যতই তাঁহারা নিন্দনীয় হউক না কেন—কিছু বলিতে যাওয়া, সমালোচক মহাশয়ের নিজের কথায় বলিতে গেলে, নিতান্ত "ধৃষ্টতা" ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি যাহাই বলুন না কেন, আমি এখনও মনে করি যে "যেখানে উপন্যাস রচনা করিতে যাইয়া ঔপন্যাসিক ইতিহাসের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, সেখানে প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা বা তথ্যগুলি সম্বন্ধে তাঁহার পাঠকগণের মনে তাঁহারও ভুল ধারণা উৎপাদন করিবার কোন অধিকার নাই"। বঙ্কিমবাবু নিজেও এই মত পোষণ করিতেন। তাহার প্রমাণ, তাঁহার 'আনন্দমঠের' "তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন" ও "পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন" পড়িলেই পাওয়া

যাইবে। এ সম্বন্ধে আমি আমার প্রবন্ধে পূর্ব্বেই সবিস্তারে লিখিয়াছি। সুতরাং এখানে আর বেশি কিছু বলিব না। তবে মাত্র এইটুকু বলিতে চাই যে, ইতিহাসের সহিত উপন্যাসের সমন্বয় রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার প্রবল প্রয়াস দেখিয়া আমি এই দাবি করিতে পারি যে, আমি আমার আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁহার প্রিয় কার্য্যই করিয়াছি।

"ছিয়াত্তরের' মন্বন্তরের জন্য কে বা কাহারা দায়ী, বা কেনই বা ঐ মন্বন্তর হইয়াছিল, ঐ সব বিষয়ে আমি কোনও মত আমার প্রবন্ধে প্রকাশ করি নাই। কারণ তাহা আমার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল না। আমার মূল কথাটি বলিতে যাইয়া প্রসঙ্গত আমি কেবলমাত্র বলিয়াছি যে 'বাংলা ১১৭৬ সালে (ইংরাজি ১৭৬৯-৭০ সালে) মীরজাফর জীবিত ছিলেন না। ঐ সময়ের অনেক পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, এবং ঐ সময়কার ঘটনাবলীর জন্য তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা যায় না'। এই মত আমি এখনও পোষণ করি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ সম্বন্ধে সমসাময়িক অনেক দলিলপত্র (records) Imperial Record Office এ (New Delhi) আছে। জানি না, সমালোচক মহাশয়ের সেই সব দলিল দেখিবার সুযোগ হইয়াছে কি না। বোধ হয়, না। কারণ তাহা হইলে এ সম্বন্ধে যে সব মত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তিনি অত সহজে করিতেন না। অজ্ঞতার একটা মস্ত সুবিধা আছে। সেটা এই যে কোন একটা বিষয়ে অতি সহজে মতামত প্রকাশ করা যায়। কিন্তু একটা জিনিসের সব দিক জানা থাকিলে সহজে কোনও মতামত প্রকাশ করা যায় না। আমি Imperial Record Office এ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সম্বন্ধে সমস্ত সমসাময়িক কাগজপত্র পড়িয়াছি, এবং জানি, কেন এ মন্বন্তর হইয়াছিল। কিন্তু সে কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। সেইজন্য সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব না। তবে মাত্র এইটুকু বলিতে চাই যে, দুই একখানা স্কুলপাঠ্য পুস্তক পড়িয়া বা দুই একখানা উপন্যাস পড়িয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা ঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত, সমালোচক মহাশয় একটি ফুটনোটে বলিয়াছেন—

"দেবব্রতবাবু Forrest, Malcolm এবং Millএর ভুল দেখাইয়া বাহবা লইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন বহির কোন পৃষ্ঠায় ভুল আছে কিছু লিখেন নাই। অন্তত Forrest সাহেব মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে ভুল করেন নাই। 'He (*Meer Jafar*) fell seriously ill···died at this (his হওয়া উচিত ছিল)

capital on February 6, 1765. (See Forrest, *Life of Lord Clive*, Vol. ii, p. 256, line 6 from top) সুতরাং প্রমাণ হইতেছে, দেবেন্দ্রবাবু এই সর্ব্বজনপরিচিত বহিখানা না পড়িয়াই Forrest সম্বন্ধে এই মন্তব্য করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন "রাজনীতি"র অধ্যাপকের পক্ষে ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা"।

এই মন্তব্যে সমালোচক মহাশয়ের মাত্রাজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। James Mill, Sir John Malcolm বা Sir George Forrest-এর মতের ভুল দেখানো আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল না। কাজেই সে সম্বন্ধে সবিস্তারে লিখিবারও কোন আবশ্যকতা ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে আমি তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমি লিখিয়াছিলাম—

"এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শুধু বঙ্কিমবাবু কেন, James Mill, Sir John Malcolm, Sir George Forrest প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা ঐতিহাসিকও মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে ভুল সংবাদ দিয়াছেন। এমন কি, পার্লামেণ্টের একটি রিপোর্টেও এই বিষয়ে ভুল সংবাদ রহিয়াছে"।

সমালোচক মহাশয়ের এতটুকু "সাধারণ বুদ্ধি" থাকা উচিত ছিল যে, যখন আমি এই গ্রন্থকারদের সম্বন্ধে একটি উক্তি করিয়াছি, তখন তাঁহাদের লিখিত পুস্তকগুলি না দেখিয়া ঐ প্রকার উক্তি করি নাই। প্রকারান্তরে তিনি আমাকে তাঁহাদের ভুল দেখাইতে বলিয়াছেন। আমি আনন্দের সহিত তাঁহার এই "চ্যালেঞ্জ" গ্রহণ করিতেছি। যাহা ঠিক নহে, তাহাই ভুল। আশা করি, ভুলের এই সংজ্ঞা তিনি গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন না। সরকারী দপ্তরখানায় রক্ষিত সমসাময়িক দলিলের সাহায্যে আমি আমার আলোচ্য প্রবন্ধে নিঃসংশয়ভাবে দেখাইয়াছি যে, মীরজাফরের মৃত্যুর ঠিক তারিখ হইতেছে ১৭৬৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী। Forrest সাহেব বলিয়াছেন (*The Life of Lord Clive*, Vol. ii, 1918, p. 256), "He (Mier Jaffier বা Mir Jafar) ...died at his capital on February 6, 1765." Sir John Malcolmও বলিয়াছেন (see his *Life of Robert, Lord Clive*, 1836, Vol. ii, p. 291 & the footnote on the same page) যে, মীরজাফর ১৭৬৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী মারা গিয়াছিলেন। James Mill বলিয়াছেন, (see his *History of British India*, 4th Edition, by H. H. Wilson, Vol. 3, 1848, p. 356) যে, মীরজাফর "died

in January, 1765." সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, Forrest, Malcolm বা Mill মীরজাফরের মৃত্যুর ঠিক তারিখ দেন নাই। এবং আমি যে Parliamentary Report-র উল্লেখ করিয়াছি, তাহার নাম হচ্ছে: 'The Third Report of the Select Committee (House of Commons) on the Nature, State, and Condition of the East India Company', dated 8th April, 1773। এই Report-এর এক স্থানে লেখা আছে: "That at the death of Myr Jaffier, which happened in the month of January in the year 1765,..."। আশা করি, সমালোচক মহাশয় এখন স্বীকার করিবেন যে, তাঁর "ইষ্ট দেবতারা" মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ ভুল দিয়াছেন। তবে যদি তিনি বলেন যে, তাঁহারা ভুল করিতে পারেন না, যেহেতু তাঁহাদের গায়ের রং কটা, তাহা হইলে অবশ্য আমার কিছু বলিবার নাই। Forrest সাহেব এক সময় ছিলেন ভারত গভর্ণমেণ্টের Director of Records। সুতরাং তাঁর পক্ষে ভুল তারিখ দেওয়া কোনও মতেই সমর্থন করা যায় না। যাক।

Forrest সাহেবের বইগুলি আমাকে অনেক সময়ই নাড়াচাড়া করিতে হয়। তার একটি প্রমাণ ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত আমার *Early Land Revenue System in Bengal and Bihar*, Vol. I. 1765-1772, Longmans, p. 213 দেখিলেই সমালোচক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন। আরও প্রমাণ আমার আর একখানি বহিতে শীঘ্রই পাইবেন; আরও প্রমাণ দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা দিব না। কারণ, সেটা নিতান্ত ছেলেমানুষি হইয়া যায়। সমালোচক মহাশয় Forrest সাহেবের যে বইখানির নাম ফুটনোটে উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানি না পড়িয়া আমি তাঁর সম্বন্ধে মত প্রকাশ করি নাই। সুতরাং আমার "লজ্জিত" হইবার কোনও কারণ নাই। বরং যে উদ্‌ভ্রান্ত সমালোচক মহাশয় পরের লেখার সমালোচনায় নিজের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার এবং ভদ্রতা ও মাত্রাজ্ঞানের অভাবই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাঁহারই লজ্জিত হওয়া উচিত। তিনি এতটা উদ্‌ভ্রান্ত না হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, Forrest সাহেবের গ্রন্থখানি আমি দেখিয়াছি কি না। বোধ হয় তিনি দেখিয়াও দেখেন নাই।

আমি আমার আলোচ্য প্রবন্ধের কোনও স্থানেই বলি নাই যে, আমিই সর্ব্বপ্রথম মীরজাফরের মৃত্যুর ঠিক তারিখ দিয়াছি। সুতরাং তিনি এইরূপ মনে করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না।

এখন কথা উঠিতে পারে যে, আমি কেন সরকারী দপ্তরখানায় রক্ষিত সমসাময়িক দলিলের সাহায্য লইলাম। তাহার একমাত্র কারণ যে, মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়ভাবে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দিতে চাহিয়াছিলাম। যখন দেখিলাম যে, Parliamentary Report, James Mill, Sir John Malcolm, Sir George Forrest, Peter Auber (*Rise and Progress of the British Power in India*, Vol. 1, 1837, p. 98), William Bolts (*Considerations on India Affairs*, 1772, p. 43, এ বইখানা বোধ হয় সমালোচক মহাশয়ের দেখিবার সুযোগ হয় নাই), Edward Thornton (*The History of the British Empire in India*, 1841, Vol. 1, p. 467), *The Cambridge Shorter History of India* (edited by Prof. H. H. Dodwell), Part III, 1934 প্রভৃতির মধ্যে মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ * রহিয়াছে, তখন এই সম্বন্ধে সরকারী দপ্তরখানায় রক্ষিত সমসাময়িক দলিলগুলিকেই চূড়ান্ত প্রমাণস্বরূপ দেওয়াটা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলাম। ইহাতে ঐতিহাসিক এবং রসজ্ঞ সমালোচকগণের কোনও আপত্তি হইবার কারণও দেখি না। ইংরাজ আমলে ভারতের বা বাংলার যথার্থ ইতিহাস জানিতে হইলে কয়েকখানি সাহেবের বা এদেশী লোকের লেখা পুস্তকই চূড়ান্ত গ্রন্থ নহে। সমসাময়িক হস্তলিখিত দলিলগুলিই (records) এ বিষয়ে চরম প্রমাণ। সমালোচক মহাশয়ের বোধ হয় এই সব records দেখিবার কোনও সুযোগ হয় নাই। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তিনি কয়েকখানা স্কুল বা কলেজ পাঠ্য পুস্তককে প্রামাণিক গ্রন্থস্বরূপ লইতে উপদেশ দিতেন না। এখানে ইহাও বলিতে পারি যে, তিনি যে সমস্ত "প্রামাণিক" গ্রন্থগুলির নাম করিয়াছেন, সেগুলি সব নির্ভুল নহে। তবে সে কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

তৃতীয়ত, সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন যে, "নাজিমুদ্দৌলা" "নামের কোন ব্যক্তি মুরশিদাবাদের নবাব-বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।" ইহাকেই বলে 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী'।

---

* Peter Auber, William Bolts, ও *Cambridge Shorter History of India*-র Part III-র গ্রন্থকার মহাশয় ঠিক তারিখই দিয়াছেন—১৭৬৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী। Thornton সাহেব কেবল February (১৭৬৫) মাসের কথা বলিয়াছেন, কোনও নির্দ্দিষ্ট তারিখ দেন নাই। Mill, Malcolm ও Forrest সাহেবের কথা তো আগেই বলিয়াছি।

Aitchison-র *Treaties, Engagements and Sanads*, etc, (শুধু *Treaties and Sanads* নহে), 1909, পুস্তকে (Volume I) যাঁহাকে Nudjum-ul-Dowlah ও Nudjum ul Dowla বলা হইয়াছে, সমসাময়িক সরকারী দলিলে (records) তাঁহাকেই কখনও Nazim-O-Dowla, Najim-O-Dowla, Nayym al Dowlah, Nadjum ul Dowla, এমন কি Nezemal Dowlah বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। ইনিই মীরজাফরের পরবর্তী বাংলার নবাব। আমার যুক্তির ভিত্তি যখন সমসাময়িক দলিলপত্র, তখন দলিলে প্রদত্ত বানান অনুসারে বাংলায় নাড্জুম্-উল-দৌলা বা নাজমুদ্দৌলাকে নাজিমুদ্দৌলা লিখিলে কোনও দোষ হতে পারে না। আর কেনই বা আমরা বাংলায় পারসী বা আরবী নামের উচ্চারণ পারসী বা আরবীর মত করে করিব? সেটা পাণ্ডিত্য হবে না, তবে pedantry হবে বটে। ইংরাজির বেলাও আমরা সে রকম করি না। Calcuttaকে কলিকাতা বলি; Delhiকে দিল্লী বলি; Bombayকে বোম্বাই বলি; এবং অনেক খ্যাতনামা গ্রন্থকারও সেক্সপীয়ারকে সেক্সপীয়র বলিয়া অভিহিত করেন। অনেক জার্মান ও ফরাসী নাম ইংরেজরা ইংরাজির মতন করিয়াই লেখেন ও উচ্চারণ করেন। সমালোচক মহাশয়কে আরও জানাইতে পারি যে, তাঁর Forrest সাহেব পর্যন্ত "Nudjum-ul-Dowlah" বা Najmu-d-daulah"কে তাঁহার পূর্বে উল্লিখিত বইয়ের textএ (See his *Life of Lord Clive* Vol. II, p. 261) Najim-ud-Dowla (নাজিমুদ্দৌলা বা নাজিম্-উদ-দৌলা) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁকে আরও জানাইতে পারি যে, তাঁর Peter Auber সাহেবও (See his *Rise and Progress of the British Power in India*, 1837, Vol. I.) এই নবাবের নাম দিয়াছেন একবার (p. 163) "Nujeem-ool-Dowla" ও আর একবার (p. 98) "Nazim-ood-Dowla"; Thornton সাহেব তাঁর নাম দিয়াছেন (See his *History of the British Empire in India*, 1841, Vol. I, p. 467) Noojum-ad-Dowlah; এবং James Mill তাঁর নাম দিয়াছেন (See his *History of British India*, 4th Ed., Vol. III, pp. 357-58) "Nujum-ad-dowla"। কই, সমালোচক মহাশয় তো এঁদের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই? এঁরা সাহেব বলিয়া বুঝি? ইহারই নাম "slave mentality"। Forrest সাহেব যদি ইংরাজিতে Najim-ud-Dowla লিখিতে পারেন, আমরাও বাংলায় নাজিমুদ্দৌলা বলিতে পারি।

উপরে যে সব কথা বলিলাম, Syef-ul-Dowlaর (Nudjum-ul-Dowlahর পরবর্ত্তী নবাব) বেলায়ও সে রকম যুক্তি দিতে পারিতাম। এই উত্তরের কলেবর ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

তবে আশা করি, এস্থলে একথা বলিলে বিশেষ দোষ হইবে না যে, আমার প্রবন্ধে যাহা "বঙ্গানুবাদ" ভাবে দেওয়া হইয়াছে, তাহার জন্য আমি আইনত দায়ী হইলেও—কারণ আমার নামে যখন বাহির হইয়াছে—প্রকৃতপক্ষে আমি তাহার জন্য দায়ী নহি। কারণ, ঐ বঙ্গানুবাদ সমগ্রভাবে আমি নিজে করি নাই। আমি করিলে হয়তো কিছু কিছু তফাৎ হইত। আমার প্রবন্ধে আমি ইংরাজি extractগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। তাহাদের বঙ্গানুবাদ কে করিয়াছিলেন, আমি জানি না। 'সোনার বাংলা'র সম্পাদক মহাশয় তাহা জানেন। কিন্তু এইটুকু আমি এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, আমার প্রতিপাদ্য বিষয়টি ছাড়িয়া আমাকে শুধু গালাগালি করিবার জন্য নানা প্রকার অবান্তর প্রসঙ্গ তুলিয়া সমালোচক মহাশয় নিজেই "মক্ষিকাবৃত্তি"র চূড়ান্ত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষাতেই তাঁকে উত্তর দিলাম। নতুবা এই প্রকার ভাষা আমাদের অব্যবহার্য্য।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, মীরজাফরের কলঙ্ক ক্ষালন করা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল না। এবং তাহা আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ও ছিল না। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তির সহিত ইতিহাসের অনৈক্য দেখানই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্কিমবাবু সমালোচক মহাশয়ের যেমন পূজনীয়, সেইরূপ তিনি আমারও পূজনীয়। সাহিত্যসৃষ্টির কথা ছাড়িয়া দিলেও, যতদিন পৃথিবীতে অকৃত্রিম দেশভক্তির আদর থাকিবে, ততদিন তিনি আমাদের পূজ্য হইয়া থাকিবেন। বাংলা সাহিত্যের ও বর্ত্তমান বাংলার ইতিহাসে তাঁহার স্থান এত উচ্চে যে, যদি কেহ বলেন যে, তাঁহার লেখার মধ্যে এখানে ওখানে একটু আধটু অনৈতিহাসিকতার দোষ আছে, তাহাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না। কিন্তু আমার সমালোচক মহাশয় তাঁহার সমালোচনায় যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অন্ধ ও নির্ব্বুদ্ধিতাসূচক "গোঁড়ামি"র পরিচায়ক, তাঁহার প্রতি প্রকৃত ভক্তির পরিচায়ক নহে। এবং এই প্রকার সমালোচনাও কেবল পরছিদ্রানুসন্ধানের দূষিত মনোবৃত্তির নিদর্শন। বস্তুত আমি বঙ্কিমবাবুর প্রিয় কার্য্যই করিয়াছি। ইহারই যথার্থ নাম ভক্তি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের পক্ষে জবাব

আমাদের পূর্ব্বপ্রকাশিত সমালোচনার উত্তরে শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমেই, আমাদের ভয়-ভক্তি উদ্রেক করিবার জন্য, তিনি যে কেউ-কেটা নহেন, তাহা ভাল করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন, নামের সঙ্গে উপাধি, পদবী ও উপ-পদবীর প্রদর্শনী সাজাইয়াছেন। আরও এক কাজ করিয়াছেন—এবার তিনি 'শনিবারের চিঠি'র খরচায় বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, ১৯৩৬ সালে তাঁহার *Early Land Revenue System in Bengal*, Vol. I, 1765-1772, Longman, p. [?] 213 প্রকাশিত হইয়াছে। অতঃপর আসিতেছে তাঁহারই আর একখানি বহি—ইহার এখনও নামকরণ হয় নাই। 'সোনার বাংলা'য় তাঁহার মৌলিক গবেষণা পড়িয়া আমাদের যে সন্দেহ হইয়াছিল, এবার তিনি স্বয়ং তাহার হাঁড়ি হাটে ভাঙিয়াছেন। প্রবন্ধে দলিলগুলিই যাহা কিছু সারবস্তু; অবশিষ্ট অংশটুকুতে বঙ্কিমচন্দ্রকে ও ফরেষ্টপ্রমুখ ঐতিহাসিকগণকে "হম্ মারা হ্যায়"-বাহবা লইবার চেষ্টা ভিন্ন আর কেহ কিছু পাইয়াছেন কিনা জানি না।

দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমাদের তর্কের বিষয় ছিল, বঙ্কিমকর্ত্তৃক ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় মীরজাফরকে বাঁচাইয়া রাখার কারণ কি?—দেবেন্দ্রবাবু তাহা খুঁজিয়া না পাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র" ইহা জানিতেন না; শুধু তিনি কেন, Mill, Forrest পর্য্যন্ত মীরজাফরের মৃত্যুর ঠিক তারিখ জানিতেন না। 'আনন্দমঠ' ও ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের বালকপাঠ্য ইতিহাস পড়িয়া যদি সপ্তম কি অষ্টম মানের কোন ছাত্র আমাদিগকে একই প্যারায় বঙ্কিমচন্দ্রের তিন তিনটি মারাত্মক ভুল দেখাইয়া দিত,—আমরা তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিতাম, সে বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছে; তাহার ইতিহাস পাঠ সার্থক হইয়াছে; কেন না, উপন্যাসকে ইতিহাস বলিয়া ভুল করা বালকের পক্ষে দোষাবহ নহে। 'রাজসিংহে' বঙ্কিমচন্দ্র আওরঙ্গজেব ও উদিপুরী বেগমের প্রতি ঘঃঐতিহাসিক অবিচার করিয়াছেন, এতদিন কোন ইতিহাসবেত্তা সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই; কেন না, বাংলা দেশে দেবেন্দ্রবাবু ছাড়া চক্ষুষ্মান আর কেহ নাই। ঢাকায় চাকরি করিলেও দেবেন্দ্রবাবু ভদ্রলোক; সুতরাং তাঁহার এক কথা—বঙ্কিমচন্দ্র ভুল করিয়াছেন; জানিতেন না বলিয়াই তাঁহার এ ভুল। মূল প্রবন্ধে দেবেন্দ্রবাবু এমন ভাব দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বে মীরজাফরের মৃত্যুর সঠিক

তারিখ এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাংলার নবাব কে ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র দূরের কথা, ক্রেষ্ট প্রমুখ ঐতিহাসিকেরাও অন্তত মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ ঠিক ঠিক জানিতেন না। এটা "সাধারণ জ্ঞানে"র অভাববশত আমাদের কাছে কেমন কেমন ঠেকিয়াছিল বলিয়া আমরা লিখিয়াছিলাম, ঐ সমস্ত ঐতিহাসিকগণের কোন্ পুস্তকে কোন্ পৃষ্ঠায় ভুল আছে, তাহা দেখানো হয় নাই। দেবেন্দ্রবাবুর গবেষণা যে "বে-নজীর", তাহা আমরা জানিতাম না। তাঁহার কাছে প্রমাণ-সূচী (reference) চাহিয়া আমরা যেন সতী-সাধ্বী বিধবার কাছে অনবধানতাবশত চুণ চাহিবার মত গুরুতর অপরাধ করিয়া বসিয়াছি। দেবেন্দ্রবাবু এক কাল্পনিক "চ্যালেঞ্জ" গ্রহণ করিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত বহি তিনি ভাল রকম পড়িয়াছেন; যাহা কোন-মূর্খও কোন দিন সন্দেহ করিবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভুলের কারণ দেবেন্দ্রবাবু বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া আমরা দেখাইয়াছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস পড়িতেন এবং তাঁহার জন্মের এক বৎসর পূর্ব্বে পিটার অবারের বহিতে দেবেন্দ্রবাবুর বহু গবেষণার ফল সাধের সেই ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৭৬৫ খ্রীঃ লেখা আছে। পিটার অবারের বহি বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সুলভ না হইলেও মিলের বহিখানা তখন ভারতে অপ্রাপ্য ছিল না। মিল সাহেব ভুল করিয়াছেন; রিপোর্ট ভুল করিয়াছে—কিন্তু ভুলটি ফেব্রুয়ারির স্থলে জানুয়ারি অর্থাৎ ৩০ দিনের তফাৎ। মিল সাহেবের বহিতে যদি ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৭৬৫ খ্রীঃ মীরজাফরের মৃত্যুর তারিখ লেখা থাকিত, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভুল করিয়াছেন উহা হইতে কি তিনি নিবৃত্ত হইতেন? সুতরাং দেখা যাইতেছে, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফর মরিয়াছে জানিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছা করিয়া তাহাকে ১৭৭০ সাল পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন; ইহাই ছিল আমাদের কথা। কেন বঙ্কিমচন্দ্র ইহা করিয়াছিলেন, আমরা সাহিত্যের দিক দিয়া তাহারই সংক্ষেপ আলোচনা করিয়াছি। কাব্য নাটক ও উপন্যাস সাহিত্যে শিল্পকলার প্রয়োজনে আখ্যানবস্তুর একটা ঐতিহাসিক আবেষ্টনী সাহিত্যিকেরা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এ আবেষ্টনী ইতিহাসের দিক দিয়া শুধু ভাবত সত্য হওয়া চাই; সন তারিখ নাম হিসাবে সত্য হওয়া শুধু অপ্রয়োজনীয় নহে, রসসৃষ্টির পক্ষে ক্ষতিকর, দেবেন্দ্রবাবু কিছুতেই তাহা স্বীকার করিবেন না. কারণ তাহা হইলে তাঁহার এই 'মৌলিক' গবেষণা মাঠে মারা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র কেন ভুল করিয়াছেন, এইজন্য মাথা না ঘামাইয়া ঐতিহাসিকেরা কেন

এ ভুল করিয়াছেন এটা বিচার করিলেও বুঝিতাম তাঁহার বুদ্ধির অভাব নাই। কথাটা যখন উঠিয়াছে, আলোচনা করাই ভাল। বিলাতে যে সমস্ত রিপোর্ট গিয়াছে, যথা দেবেন্দ্র-বাবু-কথিত Third Report, 1773—তাহাই দেখিয়া মিল সাহেব তাঁহার বহিতে ভুল লিখিয়াছেন। Third Reportএর ভুলটা লেখার দোষেই ঘটিয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য। দেবেন্দ্রবাবু ৮ই ফেব্রুয়ারির (১৭৬৫ খ্রীঃ) দলিল পাইয়াছেন—১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কে কি ভুল করিল এই চীৎকার ছাড়ার অর্থ জগৎকে জানাইয়া দেওয়া, তিনি একটা মারাত্মক রকম ভুল সংশোধন করিয়াছেন। স্কট ও মাল্‌কমের বহি হইতে দেবেন্দ্রবাবু যে অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার গবেষণার পাহাড় অবশেষে মূষিক প্রসব করিয়াছে। এখন এই দাঁড়াইতেছে, মীরজাফর কি ৫ই ফেব্রুয়ারি (১৭৬৫) মরিয়াছিলেন, না ৬ই ফেব্রুয়ারি? ভয়ানক কথা, প্রায় ২৪ ঘণ্টার তফাৎ! এমন অঘটনঘটন কি প্রকারে সম্ভব হইল? ৫ই ফেব্রুয়ারির পক্ষে প্রবন্ধ লিখিবার সময় দেবেন্দ্রবাবু নিতান্ত একা ও অসহায় অবস্থায় ছিলেন; আমাদের সমালোচনার প্রসঙ্গে তাঁহার সাথী জুটিয়াছেন—পিটার অবার; দুইজনের মধ্যে ১০১ বৎসরের ব্যবধান। অপর পক্ষে আছেন, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্কট ও মাল্‌কম—যাঁহাদিগকে দেবেন্দ্রবাবু 'সোনার বাংলা'র সেরেস্তাদারী প্রবন্ধে নামাইয়া একটা sensation সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কোন্ পক্ষে পাল্লা ভারী বিচার করিবার শক্তি ও বিদ্যা আমাদের নাই; তবে দলিল পড়িতে গিয়া দেবেন্দ্রবাবু যে "বাঁশ বনে ডোম কানা" বনিয়াছেন, তাহার আর একটা প্রমাণ আমরা পাইতেছি। Imperial Record Department হইতে প্রকাশিত 'Calender of Persian Correspondence'গুলির প্রথম খণ্ডটি (vol. I, 1759-1767) পড়িয়া লওয়া তিনি আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই; কারণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে দেবেন্দ্রবাবুর চোখে তাহার কোন মূল্য নাই—তাঁহার চাই খাঁটি কাঁচা মাল। এই কাঁচা মাল উদরস্থ করিয়া এবং হজম করিতে না পারিয়া পূজার হিড়িকে সাহিত্যের আসরে যে কার্যটি করিয়াছেন, আমরা ভদ্রসমাজের পক্ষ হইতে তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, যেদিন দুপুরবেলার পর মীরজাফর মারা যান, সেদিন তিনি কলিকাতায় একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন এবং সকালবেলা মহারাজা নন্দকুমারের কোলে মাথা রাখিয়া রাজ্য-সংক্রান্ত শেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছিলেন। সেদিন ছিল মঙ্গলবার, মুসলমানী শাবান মাসের ১৪ তারিখ। ঐ চিঠি এবং মহারাজা নন্দকুমার ও নজমউদ্দৌলা লিখিত

মীরজাফরের মৃত্যু-সংবাদ একই দিনে অর্থাৎ ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল (vol. I. পৃ. ৩৭৭-৩৭৮)। সার্ ই. ডেনিসন রস পাদটীকায় (পৃ. ৩৭৭) লিখিয়াছেন, "This is the last letter from the Nawab Mir Jafar, as he died on the 6th Feb. 1765"। ফরেষ্ট সাহেব দেবেন্দ্রবাবুর চেয়ে ঢের বেশিদিন দলিল লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছেন। তিনি ১৪ই শাবান মঙ্গলবার, 6th Feb, 1765 ধরিয়া এ তারিখ দিয়াছেন, অথবা অন্য ইংরেজী দলিলে ৬ ফেব্রুয়ারি পাইয়াছেন, আমরা বলিতে পারিব না। তবে আমরা মোটামুটি জানি, new style এবং old styleএর গণনায় প্রায়ই একদিন গোলমাল হয়। বার মিলাইতে গেলে তারিখ মিলে না; তারিখ মিলাইতে গেলে বার মিলে না। দেবেন্দ্রবাবুর মিঃ মিডল্‌টন ব্যতীত জর্জ গ্রে, মিঃ ড্রেক এবং অন্যান্য সাহেব মীরজাফরের মৃত্যুর সময় মুরশিদাবাদে ছিলেন। ফরেষ্ট, মাল্‌কম, সার্ ডেনিসন রসকে অপ্রতিভ করিতে হইলে আরও কয়েকখানা দলিলের প্রয়োজন, 'শনিবারের চিঠি'তে এ বিষয়ে আর আলোচিত হইবে না, কলিকাতায় এজন্য বহু ঐতিহাসিক পত্রিকা আছে। এক দিনের ভুল হইলেও ভুল তো বটেই—ইহাই দেবেন্দ্রবাবু "উত্তরে" উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, কারণ এইরূপ ভুল দেখাইয়াই তিনি বোধ হয় স্কুলে first prize পাইতেন। দেবেন্দ্রবাবু ঐতিহাসিক না হইয়া দৈবজ্ঞ হইলে অধিক সুনাম অর্জ্জন করিতেন। তাঁহার ধারণা, ইতিহাস একটা দিন-পঞ্জিকা। আমাদের "মনোবৃত্তি"কে দেবেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "ধৃষ্টতা"; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকীর বৎসরে নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য সেই মহাপুরুষের বিদ্যা ও বুদ্ধির ছিদ্র অন্বেষণ করাকে আমরা কি নাম দিব ?

দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার উত্তরে "আমি জানি" "অপ্রাসঙ্গিক" "বলিব না" ইত্যাদি মুরব্বিয়ানার কথা বলিয়াছেন। ভাবখানা অনেকটা সেই "হেলায় লঙ্ঘিতে পারি শতেক যোজন"-এর মত; কিন্তু কেহ কোন দিন লম্ফটা দিতে দেখিল না। আমরা এটা পড়ি নাই, সেটা পড়ি নাই বলিয়াছেন। উইলিয়ম বোল্‌টসের পুস্তকখানা পড়ি নাই, নামও শুনি নাই, ইহা আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিতেছি। কিন্তু যেখানে ১৭৬৫ খ্রীঃ ৫ কি ৬ই ফেব্রুয়ারি—ইহাই নির্ণয় করিবার বিষয়, সেক্ষেত্রে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের কোনও দলিল আদৌ প্রয়োজনীয় হইতে পারে,—এমন সন্দেহ দেবেন্দ্রবাবুর মত পণ্ডিত ব্যতীত আর কে করিবে ? ঠিকমত জায় বোঝাই না হইলে দেবেন্দ্রবাবুর মত পণ্ডিতেরা বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করেন।

ইহার পর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা। এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রবাবু আক্ষেপ করিয়াছেন, আমাদের অজ্ঞতার একটা মস্ত সুবিধা আছে—যাহা তিনি "সমসাময়িক" অনেক দলিল-পত্র পড়িয়া হারাইয়াছেন। পাছে সে সমুদয় পড়িবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদের হয়, সেজন্য ইহাও জানাইয়াছেন যে, ঐগুলি নূতন দিল্লীতে চলিয়া গিয়াছে। খবরটাও কি মারাত্মক রকম নূতন! ইহাকেই বলে, "খবরদার"! মীরজাফর সম্বন্ধে তিনি জোর গলায় বলিয়াছেন "ঐ সময়ের ঘটনাবলীর জন্য তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা যায় না"; কেন না, তিনি প্রমাণ করিয়াছেন পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মীরজাফরের মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাহা বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন না। অতি সত্য কথা। মীরজাফর দেশের যে দুর্দ্দশা চোখে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, সেজন্য কেমন করিয়া তাঁহাকে "প্রত্যক্ষ" দায়ী করা যায়? "প্রত্যক্ষ" শব্দের অর্থ দেবেন্দ্রবাবু 'চলন্তিকা' দেখিয়া ঠিক করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার ভুল হইতে পারে না। মন্বন্তরের জন্য "প্রত্যক্ষ" শব্দের এ অর্থে দায়ী মীরজাফর কিম্বা ক্লাইভ নহে; দোষী হইতেছেন পর্জ্জন্যদেব। বৃষ্টি না হইলে দুর্ভিক্ষ হয়, মানুষ মরে—এ কথা সকলেই জানে। অতএব দেখা যাইতেছে, দেবেন্দ্রবাবু যেমন মনে করিয়াছেন তাঁহার প্রতি আমাদের "ব্যক্তিগত বিদ্বেষ" আছে, সে রকম বঙ্কিমচন্দ্রেরও মীরজাফরের প্রতি নিশ্চয়ই একটা "ব্যক্তিগত বিদ্বেষ" ছিল; নতুবা হাতের কাছে মিল সাহেবের বহিখানা থাকা সত্ত্বেও তিনি মীরজাফর-চরিত্রকে মন্বন্তরের কলঙ্ককালিমায় বিকৃত করিলেন কেন? দেবেন্দ্রবাবুর মতে মীরজাফর 'আনন্দমঠে'র একজন প্রধান (?) ঐতিহাসিক ব্যক্তি! তাঁহার সম্বন্ধে "ভুল ধারণা" জন্মাইবার অধিকার বঙ্কিমচন্দ্রের নাই—আমরা বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের এ অধিকার ছিল; তিনি উহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

বড়ই আক্ষেপের বিষয়, আমাদের "অজ্ঞতা" দেখিয়া দেবেন্দ্রবাবুর দারুণ অভিমান হইয়াছে। তিনি আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা-কাটাকাটি করিবেন না; কেন না, ইতিপূর্ব্বেই তিনি একখণ্ড মোটা বহি ছাপাইয়াছেন, আর একখানি লেখা শেষ করিয়াছেন; অতএব মন্বন্তর সম্বন্ধে তাঁহার সব-কিছুই জানা আছে। কিন্তু এই মন্বন্তর-পারদর্শী অধ্যাপক মহাশয়ের সেই সর্ব্বজ্ঞতা তাঁহার বহিতে কোথায়ও চোখে পড়িল না, শুধু একটা দিক তিনি দেখিয়াছেন—সেটা হইল ভারত গভর্মেণ্টের দপ্তরখানার দলিল, যাহা এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক চক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে মনে করিয়া তিনি আত্মপ্রতারিত

হইয়াছেন। এহেন দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমরা কেমন করিয়া "মন্বন্তর" সম্বন্ধে তর্ক করিব? স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই বলিয়াছেন—আমাদের সম্বল "খোলা আর সিটে"; তবুও আমাদের দুরাশা 'তিতীর্ষুঃ দুস্তরং মোহাৎ উড়ুপেনস্মি সাগরম্।" কিন্তু দেবেন্দ্রবাবুই যে মন্বন্তর সম্বন্ধে মন্ত্রদ্রষ্টা হইয়াছেন, ইহার "নিঃসংশয়" প্রমাণ তিনি কোথায় দিয়াছেন? তাঁহার সম্বলের মধ্যে তো দেখিতেছি, ইংরেজের সরকারী দপ্তরে রক্ষিত দলিল এবং ইংরেজের লেখা কেতাব। সুধীবর্গ বিবেচনা করিবেন, ইংরেজ রাজত্বের ঘোরতর কলঙ্ক ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য কে দায়ী—ইংরেজের দপ্তরে গরু খোঁজা করিয়া কি কোন ঐতিহাসিক তাহার সন্ধান পাইবে? এক-তৃতীয়াংশ মরিলেও মন্বন্তরের সময় এ দেশে লোক কিছু কিছু ছিল। বাদী ও বিবাদী দু-পক্ষের সাক্ষ্যবিচার না করিয়া একতরফা ডিক্রী দিলে কাজির বিচার হয় বটে; কিন্তু ইতিহাস হয় না।

এ সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে দেবেন্দ্রবাবু স্বপ্রণীত *Early Land Revenue System in Bengal and Bihar*, vol I. 1765-1772 পুস্তকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; যেহেতু তিনি যে ফরেষ্ট সাহেবকে ঝাঁকুনি দিয়া কাবু করিয়াছেন, উহাতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। ইহা ছাড়া আরও প্রমাণ তাঁহার কাছে আছে; "ছেলেমানুষি হইয়া যায় বলিয়া ওইগুলি দিব না"—ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু তাঁহার পুস্তক পড়িয়া মনে হইল না, তিনি ফরেষ্ট সাহেবকে কোথাও 'হাঁটুর নীচে ছাড়া' উপরে বিদ্ধ করিতে পারিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অবশ্য আমাদের মতামতের কোন স্থায়ী মূল্য নাই। ঐতিহাসিকেরা উহা বিবেচনা করিবেন। বহিখানিতে আছে কেবল "সঞ্জয় উবাচ", "বৈশম্পায়ন উবাচ" ইত্যাদি, কিন্তু গ্রন্থকার 'কিমুবাচ' বুঝিয়া লওয়া দুষ্কর। শুনিয়াছিলাম স্বর্গীয় গৌরাঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শোচনীয় মৃত্যুর পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অমূল্য আঠার শিশি ও ধারালো কাঁচিখানার কোন হদিস মিলে নাই। দেবেন্দ্রবাবু সগোত্রাধিকারসূত্রে ৺গৌরাঙ্গবাবুর জিনিসগুলি পাইয়াছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উহার নোটিস দেওয়া উচিত ছিল।

দেবেন্দ্রবাবু টিপ্পনী কাটিয়াছেন, আমাদের ইষ্টদেবতারা ভুল করিয়াছেন; ইহা আমরা স্বীকার করিব। আমাদের ইষ্টদেবতা পিটার অবার ও ডড্‌ওয়েল যে দেবেন্দ্রবাবুর বহু পূর্ব্বেই এই সত্যটুকুরও সন্ধান পাইয়াছিলেন, একথা গলা টিপিয়া ধরার পূর্ব্বে ভদ্রলোকের মত তাঁহার মূল প্রবন্ধে স্বীকার করিলে তাঁহাকে এতটা নাকাল হইতে হইত

না, ইহা বোধ হয় তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, রাজনীতিক্ষেত্রে ইংরেজের সহিত আমাদের বিরোধ থাকিলেও ইংরেজ তথা সমগ্র ইউরোপীয় মনীষিগণকে আমরা ইষ্টদেবতা জ্ঞানে চিরকাল শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আসিতেছি। এজন্য বৎসর বৎসর আমাদের ছেলেরা তাঁহাদের কাছে বিদ্যাশিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা করে। না হয় এবার হইতে ঢাকাতেই যাইবে!

আমরা দেবেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধেরই সমালোচনা করিয়াছিলাম; কোন সাহেব তো পালার ভিতর আসেন নাই। আমরা যে সমস্ত "প্রামাণিক" গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করিয়াছি, দেবেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, সেগুলি সব নির্ভুল নহে। দেবেন্দ্রবাবুর বিদ্যার মাপে নিশ্চয়ই কোনটা নির্ভুল নহে—প্রামাণিক হওয়া তো দূরের কথা। তাঁহার প্রবন্ধ ও "উত্তর" পড়িয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন "ভুল" অর্থে দেবেন্দ্রবাবু কি বুঝেন—বড় জোর ৫ই কি ৬ই ফেব্রুয়ারি। বঙ্কিমচন্দ্র বৎসরটা হয়তো জানিতেন, কিন্তু ৫ই কি ৬ই তাহা তো জানিতেন না। এতদিন পরে শ্রীদেবেন্দ্র সেই স্বর্গত আত্মার প্রীত্যর্থে এই ভুলটি বাহির করিয়াছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রও নিশ্চয় গলদশ্রুলোচনে ও গদগদভাবে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন। আমাদের পাদটীকায় *this* (his হওয়া উচিত ছিল) এবং অন্যত্র Aitchison-র Treaties, Engagements and Sanads, etc. (শুধু Treaties and Sanads নহে) ইত্যাদি ভুল দেবেন্দ্রবাবুর চোখে বড় লাগিয়াছে—কাজেই "নির্ভুল" অর্থে দেবেন্দ্রবাবু কি বুঝেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের দেশে এ রকম Proof-readerএর নিতান্ত অভাব। কি করিব? আমাদের তো Longman নাই! দেবেন্দ্রবাবু ইতিহাসের লোক নহেন বলিয়াই "Treaties and Sanads" লিখিয়াছিলাম; কোন ঐতিহাসিককে লিখিতে হইলে শুধু "Treaties" লিখিতাম—ইহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না—মাছি আর কাহাকে বলে?

তবু, ভুল না হয় হইয়াছে, মূর্খ লোকের ভুল হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু, ১৭৬৫ সালে মীরজাফরের মৃত্যু, ইহা কেহ তাঁহার পূর্ব্বে আবিষ্কার করে নাই, তাঁহার প্রবন্ধের সেই প্রতিপাদ্যটি কোন্ জাতীয় মূর্খতা? আমরা মূর্খ হইলেও হস্তিমূর্খ নই।

দেবেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "আমার যুক্তির ভিত্তি যখন সমসাময়িক দলিলপত্র, তখন দলিলে প্রদত্ত বানান অনুসারে বাংলায় নাড্জুন্-উল-দৌলা বা নাজমুদ্দৌলাকে নাজিমুদ্দৌলা লিখিলে কোনও দোষ হইতে পারে না।" যুক্তিটি যেমন মৌলিক তেমনই

অদ্ভুত। দেবেন্দ্রবাবু ভুলিয়া গিয়াছেন, দলিল His Master's Voice নহে যে, চোঙ্গার ভিতরে মুখ ঢুকাইয়া দিলে উচ্চারণ শুনিতে পাইবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ৫ কি ৬ই লইয়া যিনি আকাশ-পাতাল তোলপাড় করিতে পারেন, একটা নাম শুদ্ধ করিবার বেলায় তাঁহার গবেষণা এমন হোঁচট খায় কেন? Calender-এর vol. I—যেখানে স্বয়ং ডেনিসন রস মীরজাফরের চিঠি হইতে তাঁহার পুত্রের নামের শুদ্ধ উচ্চারণ ইংরেজী করিয়া দিয়াছেন, সেখানে দপ্তরী-বিদ্যা পৌঁছিতে পারিল না কেন? তাঁহার দাবি—"অনেক জার্মান ও ফরাসী নাম ইংরেজরা ইংরাজির মত করিয়াই লেখেন ও উচ্চারণ করেন"; সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া "কেনই বা বাংলায় পারসী বা আরবী নামের উচ্চারণ পারসী বা আরবীর মত করে" করিবেন? ইংরেজের সহিত ফরাসী কিম্বা জার্মানদের যে সম্বন্ধ, মুসলমানের সহিত হিন্দুদের কি সেই সম্বন্ধ? ইহাকেই বলে, ঐতিহাসিক উপমা এবং ইতিহাসবেত্তার কাণ্ডজ্ঞান! সুতরাং আশা করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাঁ বাহাদুর নাজির্ উদ্দীন্ সাহেবকে দেবেন্দ্রবাবু এখন হইতে নজীর্ উড্ডান্ সম্বোধন করিয়া জাত্যাভিমানের পরিচয় দিবেন। দেবেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, "ইংরাজির বেলাও আমরা সে রকম করি না। Calcuttaকে কলিকাতা বলি; Delhiকে দিল্লী বলি; Bombayকে বোম্বাই বলি"। এ যুক্তি কোন্ পক্ষে? "উত্তর" দিতে হইবে বলিয়া এমনই দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইতে হয়! যে ফরেষ্টের উপর, ৫কে ৬ করার দরুন, দেবেন্দ্রবাবু দারুণ খাপ্পা হইয়াছেন, তিনিই textএ নাজিম-উদ্দৌলা লিখিয়া নীচে পাদটীকায় ঐ নাম শুদ্ধ করিয়া নজমুদ্দৌলা লিখিয়াছেন। দোহাই দেবেন্দ্রবাবু! ইহার উত্তর আর আমরা চাহি না।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, হস্তলিখিত দলিল ভিন্ন আর কিছুতেই যখন দেবেন্দ্রবাবুর আস্থা নাই; তখন তাঁহার বহি লেখার পূর্ব্বে যে সমস্ত দলিল ছাপা হইয়া গিয়াছে, ঐগুলি সবই নিশ্চয় বাতিল হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে ভয়ের কথা এই যে, তাঁহার সমধর্ম্মী ভবিষ্যৎ গবেষকগণও তাঁহার এই ছাপা দলিলগুলির প্রতি হয়তো সেই রকমই আস্থাহীন হইবে। তাহারাও হস্তলিখিত দলিল ভিন্ন আর কিছুই মানিবে না, এবং যেহেতু ঐরূপ দলিল নকল করাই গবেষণার পরাকাষ্ঠা, অতএব স্বয়ং Longmanও তাহাদের ভক্তি উদ্রেক করিতে পারিবেন না—সেই কথা ভাবিয়া আমরা দেবেন্দ্রবাবুর প্রতি আমাদের "ব্যক্তিগত বিদ্বেষ" সম্বরণ করিলাম।

নেতার উক্তি

(ড্রয়িং-রুমে)

মূল্য আমার আছে কি না আছে, কে করিবে বল নির্দ্ধারণ ?
মর-মানুষের মূল্য লইয়া কেনই বা এত শিরঃপীড়া !
জনতার মন করেছি হরণ, মুগ্ধ জনতা মোর চারণ—
বাহাদুরি নাই ? শুষ্ক কথায় ভিজাই কেমন শক্ত চিঁড়া !
মূল্য আমার থাক্ না থাক,
চিরকাল ধ'রে রেডিও কাগজে বাজিছে, বাজিবে আমারি ঢাক।

২

যাহা বলি, তার গভীর অর্থ এখনও বন্ধু বোঝ নি নাকি ?
আপেল আঙুরে নিন্দা করিয়া চুম্বন করি কুমড়ো কদু,
বুলবুল শ্যামা তাড়াইয়া দিয়া পুষিয়াছিলাম ছাতারে পাখী,
তাহাও তাড়াব, মশা ছারপোকা চাহে আধুনিক রামা ও যদু।
আসল অর্থ কথার নয়,
আসল অর্থ ব্যাঙ্কেতে থাকে, দুনিয়া জুড়িয়া যাহার জয়।

৩

সেকেলে-মার্কা বিবেকের সখা, কি ব'লে এখনও দোহাই দাও ?
নতুন রকম নানান বিবেক ছেয়েছে বাজার, ভরেছে গোলা,
নাৎসি, জাপানী, খদরি, ফ্যাসিস্ত, লাঙল, কাস্তে—যা খুশি চাও,
তোমার বিবেক, আমার বিবেক ? শিকায় সেগুলি থাকুক তোলা
এবার বন্ধু কুম্ভীপাক,
কাকের পালক চুরি ক'রে ক'রে ময়ূরেরা সব সাজিছে কাক।

"বনফুল"

মীরজাফরীয় বিভ্রাট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং Corresponding Member, India Historical Records শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধের সমালোচনা আমরা 'শনিবারের চিঠি'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "প্রসঙ্গ কথা"র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য ঐ সমালোচনা আমাদের অনুমোদিত ছিল বটে, কিন্তু ঐ সমালোচনা আমাদের কৃত নয়; কারণ আমরা পণ্ডিত নহি, কোনও বিদ্যার বিশেষজ্ঞ বলিয়া আমাদের কোনও দাবি নাই। এক্ষণে ঐ সমালোচনার উত্তর এবং তাহারও প্রত্যুত্তর প্রকাশিত করিয়া আমরা যুযুধান পণ্ডিতযুগলের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করিলাম; ফলাফল মীমাংসার ভার অবশ্যই 'চিঠি'র পাঠকগণের উপরেই রহিল। কি উদ্দেশ্যে আমরা এইরূপ বাদ-প্রতিবাদকে এতখানি স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলাম, তাহারই প্রসঙ্গে দুই চারি কথা নিম্নে লিখিতেছি।

* * * *

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে যে, "কেঁচো খুঁড়িতে গেলে অনেক সময়ে সাপ বাহির হইয়া পড়ে"। আমরাও আশ্চর্য্য হইতেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া মূল প্রবন্ধলেখক কিরূপ সাপের মুখে পড়িয়াছেন! 'শনিবারের চিঠি'র সমালোচনা যে একটু

তীব্র হইয়াছিল, তাহা আমরাও জানি; কিন্তু ইহাও স্বীকার করি যে, সমালোচকের এইরূপ মনোভাবের হেতু ছিল; কারণ কোনও পণ্ডিতম্মন্য বিদ্যাভিমানী ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ তুচ্ছ বিষয়কে এরূপ উচ্চ করিয়া তোলা নিতান্তই বিরক্তিকর। এবার দেবেন্দ্রবাবু তাঁহার সেই তুচ্ছ প্রবন্ধটিকে গুরুত্ব দিবার জন্য, আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তিনি অর্থাৎ সেই প্রবন্ধলেখক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান অধ্যাপক, এবং Corresponding Member ইত্যাদি! শেষোক্ত পদবীটির গুরুত্ব বুঝিবার মত জ্ঞান আমাদের নাই। কিন্তু সেই প্রবন্ধ ও তাহার সমালোচনার উত্তরে এই পণ্ডিত-মানুষটির যে পাণ্ডিত্য ও যুক্তিশীলতার পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রধান অধ্যাপক হইতে হইলে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন কি থাকা চাই, তাহাই ভাবিয়া পাইতেছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বপণ্ডিতগণের গবেষণার নমুনা আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেক পাইয়াছি, এবং 'চিঠি'র পাঠকবর্গকে তাহার পরিচয়ও দিয়াছি। এবার ঢাকাই গবেষণার ও তথা গবেষকের বিচারবুদ্ধির একটি মনোরম নমুনা দৈবক্রমে লাভ করিয়া 'চিঠি'র সৌভাগ্য সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। কলিকাতার সহিত ঢাকার প্রভেদ এই যে, এখানে বিশ্বপণ্ডিতগণ ছোট কথায় কান দেন না—এরূপ সমালোচনার উত্তরে কিছুই না বলিয়া অতি গম্ভীরভাবে মৌন অবলম্বন করিয়া চাণক্য পণ্ডিতের উপদেশ পালন করেন। কিন্তু ঢাকা একটি storm-centre, সেখানকার বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ কিছু বেশি, তাই সেখানকার বিশ্বপণ্ডিতগণের কচ্ছ সহজেই মুক্ত হইয়া পড়ে। দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ দিন দিন কোথায় নামিতেছে! প্রধান অধ্যাপকের মতিগতি ও বিদ্যাবুদ্ধি

যদি এই দরের হয়, তবে সেই অনুপাতে অপ্রধানদের চিত্তপ্রকর্ষ কিরূপ হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি।

লেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা জানিতাম না, সেটা আমাদেরই দুর্ভাগ্য ; তিনি যে এত বড় একজন পদস্থ ব্যক্তি, এবং শুধু তাহাই নয়, বিলাতী লংম্যান কোম্পানি তাঁহার পুস্তক ছাপাইয়াছে, তাহা না জানিয়া আমরা কি ভুলই করিয়াছি! 'গবর্মেণ্ট রেজিস্ট্রিকৃত' বলিয়া অনেক বস্তু বাজারে বিজ্ঞাপিত হয়, সেগুলিও নিশ্চয় ঐ লংম্যান কোম্পানির প্রকাশিত পুস্তকের মতই মহামূল্যবান! লেখকের বক্তব্য বস্তু যাহা, তাহা তো এক আঁচড়েই সাফ হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু তবুও এই অতি তুচ্ছ বিষয়টিকে অবলম্বন করিয়া স্বমহিমা প্রচারের কি প্রাণান্ত প্রয়াস! আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক, আমি corresponding clerk, আমি মোটা মোটা বহি লিখিয়াছি! অথচ আসল কথাটা যে কোথায় গিয়া ঠেকিল, তাহার আর উদ্দেশ নাই! বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'আনন্দমঠে' ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সম্পর্কে মীরজাফরের নাম করিয়াছেন, ঐ মন্বন্তরের জন্য তাঁহাকেও দায়ী করিয়াছেন, ইহা তাঁহার ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাববশতই ঘটিয়াছে, কারণ মীরজাফর ঐ ঘটনার প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছিলেন। ইহাই ছিল দেবেন্দ্রবাবুর যুগান্তকারী গবেষণার ফল। ইহার উত্তরে আমাদের সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র মীরজাফরের মৃত্যু-তারিখ যে জানিতেন না, তাহা মনে করিবার কারণ নাই ; কারণ ঐ তারিখ দেবেন্দ্রবাবুর আবিষ্কার নহে, বঙ্কিমবাবুর বহু পূর্ব্বে ও সমসময়ে নানা ঐতিহাসিক আলোচনায় তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এবং আজ যাহা দেবেন্দ্রবাবু নিজ আবিষ্কার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা শুধুই বড়

বড় ইতিহাস-গ্রন্থে নয়, স্কুলপাঠ্য পুস্তকেও স্থান লাভ করিয়াছে। এই কথাটা আমাদের সমালোচক বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কারণ, দেবেন্দ্রবাবুর লেখাটি পড়িলে কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'কে অবলম্বন করিয়া ঐ তারিখটির সঠিক সংবাদ নিজ আবিষ্কার বলিয়া ঘোষণা করাই এবং তজ্জন্য বাহাদুরি লওয়াই ছিল লেখকের আসল অভিপ্রায়। আমাদের সমালোচক একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, ঐতিহাসিক হিসাবেই তাঁহার কিছু প্রতিষ্ঠা আছে এবং সে প্রতিষ্ঠা যে অমূলক নহে, তাহা এই বাদানুবাদ যাঁহারা পড়িবেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন। দেবেন্দ্রবাবু সম্পূর্ণ পরাস্ত হইলেও হাল ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি এক্ষণে পাঁচ বৎসরের ব্যাপারটাকে ২৪ ঘণ্টার সূক্ষ্মতায় টানিয়া ধরিয়া মল্লভূমি কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র কথা যাহাই হউক, তাঁহার বিদ্যা তো নিষ্ফল হয় নাই। ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার পক্ষে ৫ বৎসরও যাহা ৫ ঘণ্টাও তাহাই, ইহা যে না মানে এবং সেই সঙ্গে দেবেন্দ্রবাবুর আবিষ্কারের মাহাত্ম্য যে না স্বীকার করে, তাহার মত দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির ঐতিহাসিক বিচারে অবতীর্ণ হওয়া ধৃষ্টতা নহে কি ? আমাদের ইতিহাস-নিষ্ঠা যে এতখানি নাই তাহা স্বীকার করি ; কিন্তু বঙ্কিমবাবুকে লইয়া টানাটানি কেন ? উত্তরে দেবেন্দ্রবাবু সে সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন নাই। কেবল ইহাই বলিয়াছেন যে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য মীরজাফর দায়ী হইতে পারেন না। কেন, তাহা তিনি অন্যত্র বিশদভাবে বুঝাইয়া দিবেন।

ইহাকেই বলে 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' ; স্পর্দ্ধারও একটা মাত্রা আছে আমরা স্বীকার করি, তথ্য এক হইলেও তত্ত্ববিচারে পণ্ডিতগণের মত ভেদ হইয়া থাকে এবং হওয়াও অসঙ্গত নহে। বঙ্কিমবাবু যে বুদ্ধি, যে বিদ্যা, যে দৃষ্টিশক্তির বলে, তথ্যবিচার করিয়া ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য মীরজাফরকেও দায়ী করিয়াছেন, আমাদের এই নবদপ্তরবিদ্যা-বিশারদের মতে তাহা ঠিক নহে ; অর্থাৎ যেহেতু ৫ই ও ৬ই-এর গুরুতর প্রভেদ সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর ঐতিহাসিক সূক্ষ্মজ্ঞান ছিল না এবং যেহেতু

এই দপ্তর-মুদ্রারাক্ষসের সেইরূপ তথ্যঘটিত জ্ঞান পরিমাণে অত্যধিক হইয়া উঠিয়াছে, অতএব তাঁহার বিচার বঙ্কিমবাবুর অপেক্ষা নির্ভুল হইতে বাধ্য। অর্থাৎ মাছিমারা কেরানির বিদ্যাই একজন মহামনীষী লেখকের চেয়ে বেশি। দেবেন্দ্রবাবুর এই প্রতিবাদটিব মধ্যেই যে যুক্তি-জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে মীরজাফরের কলঙ্কস্থালনে তিনি যে বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিবেন, সে সম্বন্ধেও আমাদের কোনও কৌতূহল নাই। দেবেন্দ্রবাবুর প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই; বরং যথেষ্ট হিতৈষণা আছে, সেই কারণেই তাঁহাকে আমরা এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, অতঃপর এইরূপ গবেষণার ফল প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বে তিনি যেন কেবলই দলিল-সাহায্যে তৃপ্ত না হন এবং দলিলের টুকরা উদ্ধৃত করিয়াই যে পণ্ডিত হওয়া যায় না, ইহা মনে করিয়া প্রধান অধ্যক্ষ প্রভৃতির অভিমান ত্যাগ করেন; কারণ তাহাতে বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবহানিই হয়, আমাদিগেরও লজ্জা হয়। প্রতিবাদ লিখিবার কালে তিনি এতই অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছেন যে, প্রতিপক্ষকে ইংরেজ পণ্ডিতের অন্ধ স্তাবক বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, দেন্দ্রেবাবুর বিদ্যা কোথা হইতে? ইংরেজ পণ্ডিতের আরাধনা না করিলে তাঁহার মত পণ্ডিত আমাদের দেশে এত সস্তা হইতে পারিত? তিনি কোন্ দেশীয় বিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছেন? ভারতীয় বিদ্যার কোন্ বিভাগে তিনি কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন? বাংলাও তো ভাল লিখিতে পারেন না। বরং সেই ইংরেজ পণ্ডিতদের নিকটেই আরও ভাল করিয়া পাঠগ্রহণ করিলে তিনি সমধিক উপকৃত হইবেন। তাঁহাদেরই এক পণ্ডিত তাঁহাকে এই উপদেশ দিবেন যে—

> He who possesses a sense of values cannot be a Philistine; he will value art and thought and knowledge for their own sakes, not for their possible utility...Knowledge is not a direct means to good: its action is remote. An exact knowledge of the dates of the Kings and Queens of England will put no one into a flutter. Knowledge is a food of infinite potential value which must be assimilated by the intellect and imaginatian before it can become positively valuable.

ভূয়োদর্শন

১৮

যুগলবাবু লোকটিকে আগে অবশ্য চিনিতাম, অল্প দিন হইতে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে ভদ্রলোক সুগন্ধি কেশ-তৈলের ব্যবসায় করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এখনও সে প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু অধুনা গোপনে গোপনে (কেন যে গোপন করিতেছেন, জানি না) তিনি কেরোসিন তৈলের ব্যবসাতেও লিপ্ত হইয়াছেন শুনিতেছি। চোরাবাজারেও যাতায়াত আছে। রাই কুড়াইয়া একটি নয়, কয়েকটি বেলই তিনি বানাইয়াছেন—এইরূপ জনশ্রুতি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অর্থবান বলিয়া ভদ্রলোকের এতটুকু অহমিকা নাই, তাঁহার গর্ব্ব হৃদয় লইয়া। তাঁহার নিজের হৃদয় তো সর্ব্বদাই গল-গল করিতেছে, তাঁহার সংস্রবে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাও নিস্তার পান নাই, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।

আসিয়াই বলিলেন, একটা সিগারেট দিন।

দিলাম। সিগারেট ধরাইয়া ভদ্রলোক পকেট হইতে একতাড়া নানা রঙের খামের চিঠি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, পঁচিশ জনের চিঠি; বাড়িতে আরও অনেক আছে।

উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সহসা বক্তৃতা দিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। এই বাই আমার আছে এবং একবার চাগিলে রোধ করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং সোৎসাহে বলিলাম, একটি বক্তৃতা দিব। শুনিবেন কি?

সিগারেটে টান মারিয়া যুগলবাবু বলিলেন, নিশ্চয়। বলুন বলুন, আপনার কথা শুনিতে আমার বেশ লাগে।

হাঁটু দোলাইতে লাগিলেন। আমিও গলা-খাঁকারি দিয়া সুরু করিলাম, দেখুন, পুরাকালে ফুলবাগানের সখ ছিল। সখ ছিল, কিন্তু সুবিধা ছিল না। যে বস্তু থাকিলে মানবের অধিকাংশ আধিভৌতিক অসুবিধাই বিদূরিত হয়, সেই বস্তুটিরই অভাব ছিল,—টাকা ছিল না। অল্প মাহিনায় সর্ব্বদিক রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে যে সকল কলা-কৌশল ক্ষুদ্রত্ব-মহত্ত্ব-সরলতা-কপটতার চর্চ্চা করিতে হয়, আমাকেও সে সকল করিতে হইয়াছিল। দারুণ দুর্য্যোগের মধ্যে ফুটা সংসার-তরণীটিকে ময়ূরপঙ্খীর মত সাজাইয়া সগৌরবে যে বিদ্যার জোরে সেটি তীরস্থ করিয়াছি, তাহাকে ভোজবিদ্যা আখ্যা দিলে অসঙ্গত হইবে না। বাক্‌চতুর বাজিকর অন্যমনস্ক দর্শকের মূঢ়তার সুযোগ লইয়া যে ভাবে অসম্ভবকে সম্ভবপর করিয়া দেখায়, অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত আমিও সম্ভবত ভোজবিদ্যাবলে বলীয়ান হইয়াই সেই ভাবে বাহিরের ভড়ং বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এই জাতীয় কোন একটা অঘটনঘটনপটিয়সী নিপুণতা না থাকিলে আমার স্বল্প আয় সত্ত্বেও শোভনতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ কোন নিমন্ত্রণ-বাড়িতে অথবা থিয়েটার-সিনেমায় গৃহিণীকে বেশবাস-অলঙ্কার-দৈন্যে কখনও বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইতে হয় নাই, বাড়ির ভোজ-কাজে শাকভাজা চচ্চড়ি হইতে সুরু করিয়া লুচি, পোলাও, দইমাছ, মাছের কালিয়া, চিংড়িমাছের মালাইকারি, মাংসের কোর্ম্মা, কাট্‌লেট্, চপ, দ্বিবিধ ডাল ও চাটনি, দই, পায়েস, রসগোল্লা, সন্দেশ, বুঁদিয়া, জিলাপি, পুডিং কাস্টার্ড প্রভৃতি শালপাতার উপর থরে থরে সাজাইয়া হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান তিনটি সভ্যতারই মান রক্ষা করিয়াছি, নিজের দরিদ্র আত্মীয় অথবা আত্মীয়াকে অকারণে কখনও কিছু কিনিয়া দিবার সামর্থ্য হয় নাই বটে, কিন্তু লৌকিকতা-ব্যাপারে ছোট নজরের

পরিচয় দিয়াছি, অতি বড় শত্রুও এ কথা বলিতে দ্বিধা করিবে। সংক্ষেপে চিঠির ভাষা ও ভাব যেমনই হউক না কেন (তাহা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না), চিঠির কাগজ, বিশেষত চিঠির লেফাপা দ্বারা সকলকে সম্মোহিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি। এই অসাধ্যসাধনের ইতিহাস একাধিক কুসীদজীবী মহাজনের খাতায় কড়ায় ক্রান্তিতে বিধিবদ্ধ হইয়া আছে।

অভিভূত যুগলবাবুর হাঁটু-নাচানো বহুক্ষণ পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এইবার সুযোগ পাইয়া তিনি কণ্ঠাগত প্রশ্নটিকে বাঙ্ময় করিলেন, সবই বুঝিলাম, কিন্তু যাহা বলিলেন, তাহার সহিত আমার এই চিঠিগুলির সম্পর্ক কি? সম্পর্ক কিছুমাত্র নাই। বক্তৃতা দিতে হইলে অবান্তর কথা দুই-চারিটা অনিবার্য্য ভাবেই আসিবে, উহাতে কিছু মনে করিবেন না। আসল কথা, ফুলবাগানের সখ ছিল। কিন্তু তখন সমাজের যে স্তরে বিরাজ করিতাম, সে স্তরে এ সখের মূল্য কেহ দিত না, সুতরাং ইহার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে সঙ্কুচিত হইতাম। দামী জুতা, শাল, গহনা অথবা শাড়ির জন্য অর্থ জুটাইতে হইত, কারণ সেগুলি প্রতিবেশীগণের অন্তরে শ্রদ্ধা সম্ভ্রম এবং হিংসার উদ্রেক করিয়া বিচিত্র পদ্ধতিতে আমাদের সুখোৎপাদন করিত। সংক্ষেপে ফুলবাগানের জন্য উদ্বৃত্ত বিশেষ কিছু থাকিত না, এবং ফলে উঠানের এক কোণে অপরের নিকট হইতে চাহিয়া আনা কয়েকটি ফুলগাছ পুঁতিয়া সসঙ্কোচে মনের সখ মিটাইতাম। আমার সেই নগণ্য বাগান কোন লোকের প্রশংসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই বটে, কিন্তু সে যুগের আমার লেফাপা-লাঞ্ছিত জীবনে উঠানের সেই ছোট বাগানটুকুই আমার প্রাণের সত্যকার আশ্রয় ছিল। ওইটুকুর মধ্যেই কোন লেফাপা ছিল না। বস্তুত সেই ছোট বাগানটিকে আজও আমি ভুলি নাই। সর্ব্বসমেত বোধ হয় গুটি

দশেক গাছ ছিল, কিন্তু প্রত্যেক গাছের প্রত্যেক পাতাটি আমি চিনিতাম। প্রতি গাছের প্রতি ফুলটির উন্মেষ হইতে অবসান পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতাম। কোন্ গাছে কখন কুঁড়ি হইল, কুড়িটি কতদিনে ফুটিয়া ফুল হইল এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে কেমন করিয়া ঝরিয়া পড়িল—কিছুই আমার দৃষ্টি এড়াইত না। প্রত্যেক গাছের প্রতিটি আচরণ সাগ্রহে দেখিতাম। মনে হইত, উহাদের ভাষা যেন আমি বুঝি। প্রথম যেদিন গোলাপ গাছটায় কুঁড়ি হইল, সেদিনের কথা এখনও আমার বেশ মনে আছে। মনে হইয়াছিল, গোলাপ গাছটার ডালে ডালে পাতায় পাতায় বেশ যেন একটু অহঙ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া যেন বলিতেছে, কেমন কুঁড়ি হইয়াছে, দেখিতেছ তো!

সেই ফুল ফুটিয়া যখন ঝরিয়া গেল, তখন তাহার নীরব শোকও আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। তাহার পর দ্বিতীয় ফুলটি যখন ফুটিল, তখন তাহারও মুখে আবার হাসি ফুটিল বটে, কিন্তু তাহা বিষণ্ন সশঙ্ক। ফুল ফোটে, ফুল ঝরে। প্রতিদিন দুই একটি ফুল ফুটিত, দুই একটি ঝরিত। প্রতি গাছটির হাসিকান্না আমি শুনিতে পাইতাম। আমার বাগান নগণ্য ছিল বটে, কিন্তু তাহাতেই আমি তন্ময় হইয়া থাকিতাম।

যুগলবাবু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া একবার আমার প্রতি চাহিলেন। একটু থামিয়া আমি পুনরায় সুরু করিলাম, তাহার পর অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। আমার প্রথম জীবনের অর্থকৃচ্ছ্রতা আর নাই বাগান বড় করিবার মত আর্থিক সঙ্গতি হইয়াছে এবং সত্য সত্যই বাগানকে বিস্তৃত করিয়াছি। এখন আমার বাগানখানা ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে অন্ততপক্ষে একবেলা কাটিয়া যায়। অনেকখানি জমি, অনেক রকম সার, অনেক রকম যন্ত্র, অনেক রকম গাছ, অনেকগুলি মালী জুটাইয়া বাগানের খ্যাতি বাড়াইয়াছি। আভিজাত্যগর্ব্বিত বহু

দুর্লভ ফুল আমার বাগান আলো করিতেছে, কিন্তু আমার সেকালের সেই ছোট বাগানের শীর্ণ গাঁদা, কীটদষ্ট গোলাপ, অপরিপুষ্ট মল্লিকা, আলোক-বঞ্চিত রজনীগন্ধাকে আজও ভুলি নাই। তাহাদের যত ভালবাসিতাম, ইহাদের তত ভালবাসি না। ইহাদের আমি চিনিই না। এই ভিড়ের সহিত আমার প্রাণের পরিচয় নাই। সহস্র সহস্র ফুল রোজ ফুটিতেছে ও ঝরিতেছে, খবর রাখা আর সম্ভবপর নহে। ইহাদের সকলের কুল, গোত্র, বংশপরিচয়, বৈশিষ্ট্য অবশ্য অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি। আপনিও পারিবেন, কারণ যে কোন ভাল ক্যাটালগে তাহা আছে। শুধু ফুল কেন, বইয়ের কথাই ধরুন না। সেকালে যখন বই কিনিবার ক্ষমতা ছিল না, অপরের বই চাহিয়া অথবা চুরি করিয়া যখন পড়িতে হইত, তখন কি আগ্রহেই না পড়িতাম! প্রত্যেকটি পুস্তকের সহিত, প্রতি পুস্তকের প্রতি পাতাটির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। এখন নিজের লাইব্রেরি প্রকাণ্ড, প্রতি মাসে নানা দেশের বিখ্যাত লেখকদের বই কেনা হইতেছে, কিন্তু সে আগ্রহ তো আর নাই। আলমারিতে সারি সারি বই জমিতেছে, অধিকাংশ পুস্তকেরই বাহিরের সৌষ্ঠব দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছি, হয়তো দুই-একখানা খুলিয়া দুই-চারিপাতা উল্টাইতেছি, উহাদের সম্বন্ধে দুই-চারিটা ধার করা জ্ঞানগর্ভ বুলিও হয়তো আওড়াইতে পারি, কিন্তু সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, ইহাদের কাহাকেও আমি চিনি না। যাহাদের চিনি, বহুপূর্ব্বেই তাঁহাদের চিনিয়াছি। নূতন করিয়া চিনিবার আগ্রহ আর নাই। এখন যাহা আছে, তাহা সংগ্রহ করিবার আগ্রহ।

মুগেলবাবু অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। বলিলেন, এ চিঠিগুলোর সম্বন্ধে বলিতে চান?

বলিতে চাই, আপনার বাগান অথবা লাইব্রেরিটি মন্দ নয়।

ইংরেজী ভাষায় যাহাকে বলে, এ গুড কালেকশন! শত বাধাসত্ত্বেও কখনও লুকাইয়া কাহাকেও যদি ভালবাসিয়া থাকেন (বাসিয়াছেন কি না জানি না), তাহা হইলে সেই একমাত্র ভালবাসা যাহা সত্য, এবং তাহাকে যদি আপনি সত্য-মর্য্যাদা না দিয়া থাকেন ঠকিয়া গিয়াছেন।

বাকিগুলি ?

বাকিগুলি আপনার অর্থ, খ্যাতি অথবা রূপের টানে স্বতই জুটিয়াছে অথবা আপনি জুটাইয়াছেন। বলিলাম তো, গুড কালেকশন। কিন্তু উহারা আমার বর্ত্তমান বাগানের ফুলের মত। আয়ত্তের মধ্যে থাকিয়াও অনায়ত্ত।

কেন ?

আসল কথা কি জানেন, আমরা যতই বড়াই করি না কেন, আমাদের প্রাণ সত্যই এত বড় অথবা মজবুত নহে যে, একাধিক নিবিড় পরিচয়ের ধাক্কা সামলাইতে পারে। সত্যকার প্রেম বড় সঙ্গীন বস্তু। অধিকাংশ লোকের জীবনে তাহা আসেই না। কিন্তু মজা এই যে, অধিকাংশ লোকই একাধিক রমণীর সংস্পর্শে আসিয়া মনে করেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই আদিঅন্ত তিনি নখদর্পণে দেখিতে পাইয়াছেন। আসলে আমরা প্রায় সকলেই দরিদ্র দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, পিটুলিগোলা পান করিয়া উদ্বাহু হইয়া নৃত্য করিতেছি।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সহসা অত্যন্ত দমিয়া গেলাম। সহসা মনে পড়িয়া গেল, প্রাণকান্তের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সন্ধ্যাবেলায় এক গ্লাস সিদ্ধি পান করিয়াছি। বিবেকের ধমকে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। বার দুই ঢোঁক গিলিলাম। যুগলবাবু বলিলেন, দিন মশাই, আর একটা সিগারেট

দিলাম।

যুগলবাবু সিগারেটটি ধরাইয়া সন্দিগ্ধভাবে আমার প্রতি চাহিতে লাগিলেন। আমার মনে হইতে লাগিল, আহা, লোকটি মানুষ না হইয়া যদি গাছ হইত, বাগানে পুঁতিয়া রাখিতাম।

"বনফুল"

"কবিতা একরকমের ব্যাধি, জীবাণু তার অগ্রদূত

—'জীবাণু' মাসিক পত্রিকার শিরোনামা, পৌষ ১৩৪৫

অর্থাৎ 'কবিতা' যদি ম্যালেরিয়া-জাতীয় ব্যাধি হয়, 'জীবাণু' তাহার অ্যানোফিলিস-মশক-বাহন; 'কবিতা' তিন মাসে একবার প্রকাশ পায়, 'জীবাণু'র সাক্ষাৎ পাই মাসে মাসে; 'জীবাণু' কামড়ায়, কিন্তু 'কবিতা' ভোগায়।

এমন অর্থপরিপূর্ণ অত্যুক্তিহীন "মটো" কদাচিৎ দেখা যায়।

* * *

গত পৌষে দুইটিরই প্রকাশ দেখা গিয়াছে, সুতরাং দৃষ্টান্ত দিতে পারিব।

ম্যালেরিয়া :— সেখানে এখন
পদসঞ্চরণ
বন-ভোজন
কাঁপন
শিহরণ
গোধূলি-রক্তিম আঁচে
সভ্যতার ছাঁচে
স্বভাবের তাড়নায় নাচে
শতাব্দীর
কৃষ্টির
দৃষ্টির
সোল্লাস মিলন।

—'কবিতা', পৌষ, পৃ. ২৫-২৬

ম্যালেরিয়ার কাঁপুনির সহিত তাল রাখিয়া ইহা রচিত। বিকারের ঘোরে প্রলাপেরও অভাব নাই। যথা—

১। মৈনাক, সৈনিক হও
ওঠো কথা কও।
দূর কর মন্থর মন্থরা—
এ সুদীর্ঘ দিন-রাত্রি প্রেত পদক্ষেপে
স্মৃতিরে করেছে পিরামিড।
আর সুব উর্মিময় আরক্ত প্রহর
মিশরের মাম. হায়, শিশিরে ধূসর।
মৈনাক, সৈনিক হও
ওঠো কথা কও।

—ঐ, পৃ. ২২

২। সন্ধ্যায় ভিড়াক্রান্ত মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা
দেবতারো চোখে অনিদ্রা আনে;
পুজোর পচা ফলে ফুলে পিচ্ছিল পথে
রক্তচক্ষু পুরোহিত হাঁকে,
হাঁকে জগদ্দল বৃষভ।

—ঐ, পৃ. ৫৫

*

মশক-গুঞ্জনও কম চিত্তাকর্ষক নয়! যথা—

১। হে পুরানো পাণ্ডুর সুদূর!
তোমার বেহায়াপণা, সুন্দর ছেনালী—

—'জীবাণু', পৌষ, পৃ. ৮

২। নিরালা ঘরেতে নিরাপদ মোর আক্রমণ,
মালতী, তোমার দুই ঠোঁট ভরো নীল বিষে,—
মালতী, তোমার দু'চোখে বাড়াও আজ বোমা

—ঐ, পৃ. ১৭

অমিতার ওষ্ঠপ্রান্তে দ্রাবিকার রবে না তিমিত
পৃথিবী মরুভূ হলে ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিবে বায়স?

—ঐ, পৃ. ২৩

৪। আর এই পৃথিবীর কঠিন নীল ছাদে
জোনাকি যোনির আলোর বিচরণ।

—ঐ, পৃ. ৩১

কুইনিন-তিক্ত ও মশারি-কঠোর হইয়া উঠিয়া যে এই কম্পন ও গুঞ্জন রোধ করিব, তাহারও দেখিতেছি উপায় নাই—মশা ও ম্যালেরিয়া ক্রমশই চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

—

বাংলা দেশের মন্ত্রীমণ্ডলী যে কত অসহায়, তাহা তাঁহাদের রক্ষা-কবচের বহর দেখিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। চারিদিকেই শত্রু, সুতরাং দ্বারবান্ ও গুপ্তচরের প্রয়োগবাহুল্য স্বাভাবিক বিশেষত তাহাদিগকে বশে রাখিবার যাবতীয় উপকরণ যখন অপরে যোগাইতেছে, তখন তাহাদের সাহায্য না লওয়াটাই অসমীচীন। মন্ত্রীদের আক্ষেপ ছিল, তাঁহাদের গুণগ্রামের কথা কেহ প্রচার করে না, মিথ্যা দোষকীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে হেয় করা হয়; সুতরাং সপ্তাহে সপ্তাহে প্রচুর অর্থ-ব্যয় করিয়া 'বাংলার কথা' ও 'দি বেঙ্গল উইকলি' বাহির করা হইল, কিন্তু তাহাতেই কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? 'দি স্টার অব ইণ্ডিয়া' ও 'আজাদ' এই শত্রুব্যূহমধ্যে দ্বাদশ (১৬ই পর্য্যন্ত) অভিমন্যু সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার যে সৎসাহস এতাবৎকাল দেখাইয়া আসিতেছিলেন, নিন্দুকে সে সম্বন্ধে নানা নিন্দা রটাইতেছিল। কিন্তু যাঁহারা দেশপ্রাণ মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবকে চেনেন, তাঁহারা জানেন, কি নিদারুণ নির্যাতনের মধ্য দিয়া তিনি ভারতের স্বাধীনতাযজ্ঞে এই 'আজাদ'রূপী দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন। আজ যাঁহারা কৌরবরাজসভায় এই একবস্ত্রা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণলাঞ্ছনা দেখিয়া লজ্জায় ও সহানুভূতিরত অধোবদন হইয়া আছেন, তাঁহারা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন, ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেটে বিপদবারণ মধুসূদন দ্রৌপদীর জন্ত ত্রিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন, ঈশ্বরানুগ্রহের এমন প্রত্যক্ষ, এমন চমকপ্রদ নিদর্শন দেখিলে অতি বড় নাস্তিকও বিশ্বাসী হইয়া উঠিবে।

'আজাদে'র প্রসঙ্গ অবান্তর, আমাদের কথা লাঞ্ছিত মন্ত্রীমণ্ডলীকে লইয়া। তাঁহাদের অত্যধিক ঔদার্য্যই তাঁহাদের কাল হইয়াছে। যেখানে অতি সহজে তাঁহারা চোর ধরিয়া কয়েদে দিতে পারিতেন (জেলখানার অভাব বাংলা দেশে এখনও হয় নাই), সেখানে সহজলভ্য সুলভ পয়সার বিনিময়ে আরও কতকগুলা চোর নিযুক্ত করিয়া চোর ঠেকাইবার এই পন্থা আমাদের ভাল ঠেকিতেছে না। আশা করি, পরবর্ত্তী বাজেটে আমাদের এই কথা বিবেচিত হইবে।

—

ফাল্গুনের 'ভারতবর্ষে' "শুক্রাচার্য্যের স্বপ্ন" চিত্রটি কোন্ স্টুডিয়োয় গৃহীত তাহা লিখিতে ভুল হইয়াছে। ভূমিকায় কাহারা অভিনয় করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে আমরা অধিক উৎসাহিত হইতাম। শুক্র কবে মঙ্গল হইবে ?

—

'মন্দিরা'য় (ফাল্গুন, ১৩৪৫) শ্রী (মতী ?) পরিমল দাসের "ভাঙনের গান" বাক্-অর্থ সকল দিক দিয়াই সার্থক হইয়াছে। এরূপ হরগৌরী-সম্মিলন এযুগে ক্বচিৎ দেখা যায়।

[হে ধনিক]

মানুষেরে তুমি যন্ত্র করেছ, অন্তরে তুমি করনি স্বীকার,
তাই যত আজ বিদ্রোহী আত্মা করে দাবী অধিকার।

[শোষিত-মানব,]

ধরিতে হইবে রুদ্রের বেশ, পুরাতন জরাজীর্ণ
লাথি মারি তোমা প্রবল আঘাতে করিতে হইবে দীর্ণ।

ভাঙনের গানও বাঁধা ছন্দে লিখিলে ভাল শোনায়, এইটাই আশ্চর্য্য।

—

মাঘের 'ভারতবর্ষে' একটি "শিকার-কাহিনী" বাহির হইয়াছে। আলিপুর দুয়ারের প্রবীণ শিকারী শ্রীপুলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

জানাইয়াছেন, লেখাটির কাহিনী-অংশ সম্ভবত ঠিক আছে, কিন্তু শিকার-অংশ নির্ভুল বলিয়া তিনি স্বীকার করিতে পারেন না।

লেখাটি পড়িয়া দেখিলাম। কাহিনী-অংশও সমর্থনযোগ্য নয়। এমন পঙ্গু ভাষায় লেখা রচনা 'ভারতবর্ষে' যে স্থান পাইতেছে, তাহার কারণ সম্ভবত সম্পাদকীয় শৈথিল্য; রবিবাসরের ভোজবাহুল্যে শ্রবণ এবং দৃষ্টি দুইই গিয়াছে, ঘ্রাণের সাহায্যে রচনা নির্ব্বাচিত হইতেছে।

* * *

শিকার সম্বন্ধে যাঁহাদের সখ আছে, অথচ যাঁহাদের বিদ্যা এই জাতীয় প্রবন্ধ হইতে আহৃত, তাঁহারা হাতে-বন্দুকে শিকার করিতে গিয়া পাছে বিপন্ন হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় পুলিনবাবু প্রতিবাদ করিয়াছেন। হাতুড়ে ডাক্তারের শাস্তির ব্যবস্থা আছে, হাতুড়ে শিকারীর শাস্তি হওয়া উচিত কি না, আইনকর্ত্তারা বিবেচনা করিবেন। গাঁজাখুরির একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি।

জঙ্গলে দুটা বাঘের বাচ্চা খেলা করছিল। বাচ্চা দুটি ছোট—বেশ সুন্দর—খুব পুষ্ট। মেঘু নামে আমাদের এক সঙ্গী গিয়ে একটা বাচ্চা ধরে কোলে তুলে নিল এবং গায়ের মোটা চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে ফেলল।

ছমরু চীৎকার করে উঠল—মেঘা, ও মেঘা, ও পাজী, সর্ব্বনাশ হবে রে—এখনই এটার চেঁচা-মেচিতে বাঘিনী এসে উপস্থিত হবে। উপায় থাকবে না রে পাজী, শীগ্‌গির ছাড়—ছাড়—এ গহিন জঙ্গল—ছাড়—

মেঘা বলে বসল—হঃ, হাতে দোনালা বন্দুক, উঠব গিয়ে ঐ তেঁতুল গাছে—বাঘের বড় ভয় লাগছে।

হারামজাদা পাজী, সবাইর জীবন শেষ করবি নাকি। বাঘিনীর কোপে আজ আর রক্ষা থাকবে না।

অদূরে বাঘিনীর ভীষণ গর্জ্জন শোনা গেল। মেঘার কোলে বাচ্চাটাও চীৎকার করেছিল। অনন্যোপায় হয়ে আমরা গাছে উঠে পড়লাম। আমাদের দলের 'চাঁদ ঠাকুর'

গাছে উঠতে পারেন না জানালেন। তাঁকে যে ভাবে উপরে তোলা হ'ল—তা বলবার নয়। ছম্‌কুর মত শক্তিমান লোক ছিল বলেই আমরা চাঁদকে বুকে চাদর বেঁধে গাছে ওঠাতে পেরেছিলাম।

ততক্ষণ বাঘিনীর গর্জ্জনে বন তোলপাড়। রক্তচক্ষু বাঘিনী গাছের দিকে চেয়ে যে রকম ঘোঁ ঘোঁ করেছিল, তাতেই আমাদের আত্মাপুরুষ তুলারাম খেলারাম করতে লেগে গেল। মেঘা বলল—গুলি লাগাও, একবারে পাঁচটা সাতটা।

ছম্‌কু বলল—সাবধান, যদি কখনও সময় হয় গুলি ছোঁড়বার—আমিই বলব।

ক্রমে তিনটা বাঘ সেই গাছতলায় এসে চীৎকার আরম্ভ করল। চাঁদ-ঠাকুরকে কাপড় দিয়া গাছে বেঁধে না রাখলে যে কি দশা হ'ত, তা বলাই বাহুল্য। আমি শীকার দুর্ব্বল যুবক, কোন মতে গাছ ধরে বেঁচে আছি মাত্র।

বেলা পশ্চিমে হেলে পড়ল। ছম্‌কু বলল—শীঘ্র জঙ্গল থেকে বার হতে না পারলে আজ এখানেই রাত্রিযাপন করতে হবে।

আমি প্রস্তাব দিলাম—বাঘের বাচ্চাটা ফেলে দাও—গোলমাল চুকে যাক।

ছম্‌কু বলল,—তবু বাঘ এখান থেকে সরবে না। এখন মনে হয়, কাছে আর বাঘ নেই—যারা ছিল, এসেছে; এখন ঠিক নিশান-সই করে গুলি ছোঁড়। ঐ যে একটা খাল দেখা যায়—ওটা পার হয়ে না গেলে বাঘকে বিশ্বাস নাই।

পরামর্শমত দুজনে বাঘিনীটাকে, দুজনে বাঘটাকে 'রাম, এক, দো' বলে গুলি ছুঁড়লাম। বাঘিনী ঠায় পড়ে গিয়ে লম্বা দিল—বাঘা মাথা ঝাঁকতে ঝাঁকতে গোঁ গোঁ করে ছুটতে লাগল। অপর বাঘ পালিয়ে গেল। ছম্‌কু গুলী-লাগা বাঘটাকে তাক্ ক'রে আর একটা গুলি ছুঁড়ল—বাঘা লম্ফ দিয়ে খালের জলে গিয়ে পড়ল—তারপর চুপ।

(১) বাঘের বাচ্চা মায়ের কাছ হইতে দূরে খেলা করে এবং বিড়ালের ছানার মত অবলীলাক্রমে তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাওয়া যায়; (২) বাচ্চাবতী বাঘিনীর আশেপাশে ছলো-মেনি অন্যান্য বাঘেরা এমন ভাবে অবস্থান করে যে এক ডাকেই কাছে আসিয়া পড়ে; (৩) ধৃতবাচ্চা বাঘিনীর গর্জ্জন শোনার পরেও বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল শিকারীরা

সদলবলে তেঁতুলগাছে চড়িয়া বসিবার এবং একজনকে বুকে চাদর বাঁধিয়া টানিয়া তুলিবার অবকাশ পায়—এগুলি মারাত্মক সংবাদ।

'ভারতবর্ষ' যাহা শিকার করিতেছেন, তাহাই করিতে থাকুন বাঘীয় 'পরিস্থিতি'র মধ্যে তাঁহারা নাই গেলেন।

বন্ধুত্ব নানা প্রকারের হইতে পারে; প্রণয়াত্মক, প্রেমাত্মক, ঋণাত্মক, ধনাত্মক, অবসর-বিনোদনাত্মক ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সহিত শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দের যে বন্ধুত্ব সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, তাহা উপরোক্ত কোন পর্য্যায়েই পড়ে না; ইহা সম্পূর্ণ অভিনব বন্ধুত্ব—ধ্বন্যাত্মক বন্ধুত্ব। ফাল্গুনের 'পরিচয়ে'র ১৬৮ পৃষ্ঠায় শ্রীবিষ্ণু দের দুই নম্বর প্রার্থনা দেখুন—

> বৃষস্কন্ধে সূর্য স্থির, বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মের মড়কে
> বর্ষভোগ্য রুক্ষ শাপ চৈতালির গড্ডলচড়কে
> আজো দেখি খষ্টি বর্ষে। বৈশাখের অজবন্ধু মেঘে
> কর্কটক্রান্তির পাপ ক্লান্তিহীন দুর্বাসার রোষে
> তাপমানে আজো জাতিস্মর। বজ্রপাণি উদাসীন,
> স্বয়ম্বশ অমরার শীতকক্ষ ফরাসে আসীন!
> দয়াহীন ইরম্মদ!

গোপালদা বলিলেন, থাম। সম্মুখেই টেবিলের উপর 'শব্দকল্পদ্রুম' ছিল, তিনি তাহাতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন এবং তুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে মুখে শুধু বলিলেন, অজ বন্ধু মেষ!

আমরাও বলি, সময় ও সুযোগ পেলে এবং ধীর-স্থির-চিত্তে কাব্যসাধনায় নিয়োজিত থাকলে ডি. এন্নানৎসিও, রবীন্দ্র-নজরুল তিনি (জসীম-উদ্দীন) না হ'তে পারেন—কালিদাস, ফেরদৌসী বা মাইকেল হ'তে পারেন।"

—হজলুর রহমান, 'মাসিক মোহাম্মদী,' মাঘ ১৩৪৫, পৃ. ২৮৪

গোপালদা এবারে যাহা বলিলেন, তাহা ছাপা যায় না। কিন্তু কটূক্তি তো আর যুক্তি নয়! ডেনান্‌ৎসিও-রবীন্দ্র-নজরুলে আমাদের প্রয়োজন নাই, কিন্তু কালিদাস-মাইকেলকে আমরা চাই। তজ্জন্য জসীম-উদ্দিন সাহেবকে সম্পূর্ণ সময় ও সুযোগ দিতে বাঙালীমাত্রেই প্রস্তুত আছে ; সদ্যপ্রসূত বাজেটে একটা সংশোধনী প্রস্তাব দিতেও কেহ আপত্তি করিবে না। কিন্তু এমনিতেই ব্যক্তিগত এবং সম্প্রদায়গত নানা কারণে তিনি যেরূপ অধীর এবং অস্থির আছেন, উপরোক্ত মন্তব্যের পর যদি সম্পূর্ণ অধীর-অস্থিব হইয়া উঠেন, তাহার জন্য 'মাসিক মোহাম্মদী'র সম্পাদক মহাশয় কি দায়ী হইবেন? বাঙালী বড় দুর্ভাগ্য জাতি, তাই ভয় হয়।

—

আধুনিক "Last Ride Together"-পড়া চালাক মেয়েদের ট্র্যাজেডি সত্যই ভয়ানক। ললিতার অবস্থা কি করুণ নয়? ফ্ল্যাট-বাড়ির কত তাজা তরুণীর প্রাণ যে এই বেদনায় জীর্ণ হইয়া গেল, সিটি-ফাদাররা তার কি খবর রাখেন?

পাশাপাশি তিনটি ফ্ল্যাট। একটিতে পরেশরা থাকে, সে কলেজে পড়ে, বয়স বাইশ বছর। একটিতে থাকে ললিতারা। তৃতীয়টিতে থাকেন ধীরেনবাবু। তাঁহার বোন লীলা ললিতার কাছে দুপুরে পড়িতে আসে।

উচ্ছ্বসিত যৌবনের ফেনাকে শীতল করা ললিতার সাধ্য নয়। পরেশকে ও ভালবাসে—হ্যাঁ ভালই বাসে বলা যায়। কিন্তু পরেশ ভালবাসার সব ইঙ্গিত বোঝে না। মেয়েদের সঙ্গে মেশে নাই বলিয়াই হয়ত'। খালি ভালবাসার উপর কল্পনার রঙ চড়াইয়া একটা মাদকতা অনুভব করিতে চায়, ভালবাসার আনুসঙ্গিকগুলো ছাঁটিয়া ফেলিতে পারিলেই যেন ও বাঁচে। পরেশ কি বোঝে না ললিতার প্রায়-ব্যক্ত ইঙ্গিতগুলো?

কিন্তু ধীরেনবাবু বোঝেন। ভগিনী বীণার মারফৎ তিনি চিঠিও পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু ললিতা চায় পরেশকে জাগাইয়া তুলিতে। সেদিন দুপুরে ললিতার দুঃখ খুব গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। পরেশ

আজকের দুপুরটা থাকিলেও পারিত। আজকে তাহ'লে পরেশকে ও জোর করিয়া এ ঘরে আনিতে পারিত। কিংবা নিজেই হয়ত ওদিকে যাইতে পারিত। যাওয়া তো আর কঠিন কিছু নয়—বাথরুমের পাশের ঐ ছোট্ট দরজাটা খুলিয়া ফেলিলেই তো পরেশদের রান্নাঘর। পরেশটা বোকা।

সুতরাং দি আদার ফ্ল্যাট—ধীরেনবাবুর চিঠি—

পরেশের মত ফাঁকা এবং কল্পনাসর্ব্বস্ব নয়—এর পিছনে বাস্তবতার একটা উগ্র, রিমঝিমে [?] গন্ধ আছে। চিঠির শেষে একটা অনুগ্রহ চাহিয়াছেন—তাঁহার সহিত নির্জ্জনে দেখা করিবার সুবিধা ললিতার হইবে কি? দুপুরে তিনি বাড়ীই থাকেন।

তা' হইবে না কেন? দুপুরে তো ললিতাও থাকে; আর যদি নির্জ্জনতার কথা বল, ললিতার বাড়ীর মত পাড়ায় আর একটিও নির্জ্জন বাড়ী আছে কি না সন্দেহ। বুড়ো পিসী কানে শোনেন না—দুপুরে আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়া ঘুমান। বাপ অফিসে যান, ফিরিবেন তো সেই সাতটায়। অফুরন্ত নির্জ্জনতা! ধীরেনবাবু যে কোনওদিন আসিতে পারেন; ইচ্ছা করিলেই কালকেই।

একটি অতি-আধুনিক পত্রিকায় গল্পটি মাঘ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। নমর্থা কন্যাদের লইয়া কলিকাতায় যাঁহাদের ঘর করিতে হয় এবং অর্থাভাবে যাঁহাদিগকে ফ্ল্যাটের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাঁহাদের অবগতির জন্য গল্পের মোদ্দাকথাগুলি উদ্ধৃত করিলাম। পরেশদের ভয় নাই, কিন্তু ধীরেনবাবুরা যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছেন, দৈনিক সংবাদপত্রের আইন-আদালতের পৃষ্ঠায় তাহার প্রমাণ মিলিবে। ধীরেনবাবুদের উগ্র বাস্তবতার রিমঝিমে গন্ধ হইতে দুপুরে বেকার ললিতাদের উদ্ধার করাটা প্রতিদিনই একটা সমস্যার মধ্যে দাঁড়াইতেছে। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান পরেশদের হাতে, তাহাদিগকেই আর একটু বাস্তব করিয়া তুলিবার জন্য অতি-আধুনিক সাহিত্যিকেরা চেষ্টা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে আমরা নূতন বৎসরের সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার এবং ডায়েরি পাইয়া আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
ক্যালকাটা বিল্ডার্স স্টোর্স লিমিটেড
ইস্টার্ন টাইপ ফাউণ্ড্রি
বালিকা টাইপ ফাউণ্ড্রি
বেঙ্গল ড্রাগ স্টোর্স
ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স লিমিটেড
হুগলি ইঙ্ক কম্পানি লিমিটেড
মার্টিন এণ্ড কোং
ইসাভি ইণ্ডিয়া ম্যাচ ফ্যাক্টরি ও ইণ্ডিয়ান সিল্ক উইভিং কম্পানি

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত ও শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জব্দ-প্রতিযোগিতা

নির্ম্মাণকর্ত্তা—একাদশ ধর

কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না, 'শনিবারের চিঠি'তে জব্দ-প্রতিযোগিতা দিবার কারণ ঘটিয়াছে। উত্তুঙ্গ হিমালয় আজ যেখানে মাথা খাড়া করিয়া আছে, একদিন সেখানে উত্তাল সমুদ্র ছিল বিশ্বাস করিতে পারেন? 'ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লি' একদিন ক্রস-ওয়ার্ড পাzল ছাড়া বাহির হইত বিশ্বাস হয়? ভবিষ্যতের আশা প্রকাশ করিয়া বলিতে নাই; তবে অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে অদূর-ভবিষ্যতে জলে জাহাজ, স্থলে ট্রেন, আকাশে এরোপ্লেন, হোটেলে মদ, রাষ্ট্রে শাসন, কর্পোরেশনে ঘুষ এবং গোপনে প্রেম যথাবিধি চালাইবার জন্যও যে ক্রস-ওয়ার্ড বা শব্দ-প্রতিযোগিতার সাহায্য লইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাধ্য হইয়া জাত দিবার পূর্ব্বে সাধ করিয়া গলায় কণ্ঠিধারণ বুদ্ধিমানের কাজ। 'প্রবাসী'-দিদি ও 'ভারতবর্ষ'-দাদাকেও বেশি দিন কৌলীন্য-গর্ব্ব বজায় রাখিতে হইবে না—অক্টোপাসের বাহু সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতেছে। ইহাই আমাদের কৈফিয়ৎ। নিয়মাবলী অত্যন্ত সহজ।

১। প্রতিযোগিতায় যাঁহারা যোগদান করিবেন, তাঁহারা আমাদিগকে লজ্জা দিতে পারিবেন না, আমরাও তাঁহাদিগকে লজ্জা দিব না।

২। কুপনে জবাব পাঠাইলে আমাদের লাভ হয়, কিন্তু আমাদের হইলে সকলে খুশি না হইতেও পারেন; সুতরাং কুপন বাদ দিয়াও জবাব দেওয়া চলিবে।

৩। জব্দ-প্রতিযোগিতা জবাবের অপেক্ষা রাখিবে না।

৪। আমাদের জবাবই শিরোধার্য্য করিতে হইবে।

৫। উকিলে মানহানির ভয় দেখাইয়াছে, সুতরাং কোনও সমাধানই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না, বিবিধ পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট গাঙ্গুলী-উপাধিধারীদের মুখে মুখে সমাধান প্রচারিত হইবে। ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় কেহ নির্দ্দেশ করিলে তাহা গৃহীত হইবে।

৬। পুরস্কারের পরিমাণ সমাধানের মধ্যেই দেওয়া থাকিবে—পুরস্কৃত ব্যক্তি যে কোন উপায়ে তাহা লইতে পারিবেন।

৭। আমাদের উদ্দেশ্য বর্ত্তমানে সাধু।

৮। চিঠিপত্র জব্দ-প্রতিযোগিতা সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

১			■	■	২		
	■	৩		■	৪		
	■	■	৫	৬			■
■	৭	৮	■	৯		■	১০
১১			■			■	
■	১২		■		■	■	■
১৩				■	১৪		
■	১৫		■	১৬			

সঙ্কেত

পাশাপাশি

১। এঁর পরিচয় ইনি দিয়েছেন নিজে।
স্থবির লেখনী চালে চটুল গতি যে॥
সাহিত্য-সীমানা হ'ল জীবনবীমায়।
বিদেশী বাদ্যের সাথে ধ্রুপদ ঝিমায়॥

২ মূল্য এঁর নেই কিছু বিদ্যা ঘোরে পিছু পিছু
ভূষণে জড়িত দেহ নির্ঘোষিত তাই।
কোষ-অগ্রে মহা-মারী ক্ষিপ্ত-জ্ঞান অম্বুবারি
ধারে ভারে কাটে তবু অতৃপ্তি সদাই।

৩। প্রতিভাবান্ কবি।

৪। বিবেকানন্দের শ্বশুর।

৫। প্রথমে রয়েছে দেখ আধশিশি মাল।
প্রথমে দ্বিতীয়ে তার শুভ চিরকাল॥
বিপরীত শব্দ রাশি প্রথমে তৃতীয়ে।
প্রথম চতুর্থে রাঁধ ব্যঞ্জনেতে দিয়ে॥
অর্দ্ধেক দেবতা তার আধখানা নর।
দুইটি পুরুষে জোড় লেগেছে সুন্দর॥

৭। কালিদাস নালিস করেছে।

৯। অনন্ত নজির।

১১। বর্ত্তমান বাংলার অর্থসচিব ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অনর্থসচিব।

১২। এই শব্দসন্ধানের নির্ভুল সমাধান যিনি করতে পারবেন, তিনি পাবেন "—"।

১৩। অ-চতুর্ নিরাকার সাহিত্যিক।
বিরাম লভিয়া মন তাঁহারেই বন্দে—
মোহনে দোহন করি আছেন আনন্দে।

৫ এঁর নামটি শুনলেই মনিব্যাগটির কথা মনে পড়ে।

১৬। আধখানা অনামুখ আদি তৃতীয়ে।
দ্বিতীয়ে চতুর্থে কুড়ি আছে থিতিয়ে॥
বান ডাকে মাঝে তায় দুকূল ছেপে।
শরতের কালে শুনি গিয়েছে ক্ষেপে॥
পিছনে সাঁতার কাটে গোপনে খাসা।
ঘোলের ভিতরে ডুবে অনাদি চাষা॥

উপর থেকে নীচে

১। রবিরে দেখাতে ইনি জ্বালেন লণ্ঠন।
তরুণে করেন কভু প্রগতি বণ্টন॥
নহে পিকপুচ্ছ—গায়ে ব্রাউনিঙ-জামা।
মরে গেল ভাগিনেয়, বেঁচে গেল মামা॥

২। জনৈক মহিলা-কবি। ডুমুরের ফুলের মত ইনি। হ'ল,—একটিবার ঔপন্যাসিক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে এর জিজ্ঞাসা করবেন, মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

৬। এঁর নামটি তো আপনাদের কাছে বলাই আছে। তবু সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর এ নামের বিশেষ কোন মূল্য নেই।

৭। জগতের সাহিত্যিকদের সাধনার উপাদান। এবং বা তরুণ সাহিত্যিকদের অন্যতম সাধনক্ষেত্র ছিল।

৮। চুণিনা ধনী হয়ে বেসামাল।

১০। রাণীত্ব ত্যজিলে ইনি নৃপতি বৈষব।
কৃষ্ণনাম জুড়ে নিত্য করে যার স্তব॥
কলিকালে ভালোবাসা সুলভ তো নয়।
ভাগ্যগুণে হইয়াছে ইহার আশ্রয়॥